সুধীরচন্দ্র সরকার প্রতিষ্ঠিত

(ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র)

শ্রীসুপ্রিয় সরকার সম্পাদিত

৫০ বর্ষ, ১৩৭৬

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

বর্ণানুক্রমিক সূচী

সুপ্রভাত

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৫০শ বর্ষ] বৈশাখ : ১৩৭৬ [১ম সংখ্যা

উল্টো ছিষ্টি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মাগো সরস্বতী,

থাক্ না পড়া, বই তুলে রাখ,

আয় খেলাঘর পাতি ;

তুই যেন মা, ওদের পাড়ার

শৈলী, দুষ্টু মেয়ে,

বই-সেলেটের নাইক হিসেব,

বেড়াস নেচে-গেয়ে।

আমি হচ্ছি সেকেন-টীচার,

মেজাজ ভারী কড়া,

বেত উঁচিয়ে বলছি তোকে,

'সরি, নে'আয় পড়া।'

তোর চোখেতে জল-ছলছল
ঘাড় হেঁট করে রবি,
এক অক্ষর পড়িস নি তো
কী-ইবা পড়া দিবি ?
আমি তখন আছড়াব বেত,
সত্যি কথা বল্‌,
আস্ত তোকে রাখব নাক',
করলে কোথায় ছল।

অঙ্কে পাবি গোল্লা, সরি,
গোল্লা ইংরিজীতে।
তুই বলবি, 'এবার থেকে
থাকবে বীণা তোলা,
ক্ষমা করুন, এবার শুধুই
অঙ্ক কষার পালা।

কবি বলে শঙ্কা ভরে,
'মাগো, ছাড়লে বীণা,

তুই বলবি তখন আমায়,
ভীষণ ভয়টা পেয়ে,
'রাত কেটেছে, দিন কেটেছে
বীণা-যন্ত্র নিয়ে।'
আমার হবে চক্ষু রাঙা,
বলব নে'আয় বীণা
একটা বীণা আছড়ে করি
আটখানা দশখানা।
সামনে আসছে পরীক্ষা তোর
থাকলে বীণায় মেতে

স্বর্গে-মর্ত্যে যত বিদ্যে
নীরস, অর্থহীনা।
তাই বলি মা, যেমন আছিস
র' তোর বীণা নিয়ে,
অঙ্ক, ইতিহাসের পাতা
সুরে ভিজিয়ে দিয়ে।
তাই বলি তোর সেকেন্‌-টীচার
যতই বকুক কিনা,
যেমন আছিস, থাক মা মেতে,
ছাড়িসনে তোর বীণা।'

পঞ্চাশ বছরেও মৌচাক

কেন লিখি? মনের মধ্যে একটি অনিবার্য আহ্বান অনুভব করি বলে। শিশু সাহিত্য-রচনার বেলায়ও সে নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। শুধু লেখার জন্যে লেখা নয়, সম্পাদকের ফরমায়েসে নিযুক্ত হওয়া নয়, অন্তরে যে এক নিত্য শিশু আছে, তারই ডাকে অস্থির হয়ে অগত্যা লিখে ফেলা। পঞ্চাশ বছর ধরে মৌচাক সকল সাহিত্যিকের অন্তরের এই শিশুটিকে জাগিয়ে রেখেছে, তাকে দিয়ে ডাকিয়ে ছেড়েছে। তিন যুগে এমন কোনো সাহিত্যিক দেখি না যে লেখনীমুখে তার হৃদয়ের মধু বিন্দু বিন্দু করে মৌচাকে বিতরণ করেনি। মৌচাকের এই কৃতিত্ব কিসের দরুন? কারণ শুধু একটাই। কারণ মৌচাক নিজেই এক নিরবদ্য নির্মল শিশু। সে তাই খুঁজে নিয়েছে তার অন্তরের সহচরদের।

ধারে ভারে বাহারে শাঁসালো-জাঁকালো অনেক শিশু-পত্রিকা আছে, কিন্তু রুচির পরিচ্ছন্নতায়, পরিবেশনের স্বচ্ছতায় ও আস্বাদনের মাধুর্যে মৌচাক শুধু অগ্রণী নয়, মৌচাক অনন্য।

সময় যায়, দিন বদলায়, মানুষ বিমুখ হয়, কিন্তু মৌচাকের মধু-র ভাণ্ডার অক্ষয়ই থাকে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

*

মৌচাক-অর্ধশতক

ভাবতেই পারা যায় না যে সেদিনকার 'মৌচাক' এর মধ্যে পঞ্চাশে পড়ল। এখনো আমার পরিষ্কার মনে আছে, তার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমার এক বন্ধুর হাতে। তার একটিতে ছিল কবি নরেন্দ্র দেবের ধাঁধা। বাদশা বেগম। এইটুকু মনে পড়ে।

তখন আমার বয়স পনেরো কি ষোল। লেখার শখ খুব, কিন্তু সম্পাদকের কাছে পাঠাতে সাহস হয় না। এক বছর কি দু'বছর বাদে বেনামীতে একটি লেখা দিয়ে ভয়ে ভয়ে 'মৌচাকে'র সভায় অনধিকার প্রবেশ করি।

পরে আমার 'ইউরোপের চিঠি' ও ছড়া 'মৌচাকে'র মণ্ডলীতে আমার আসন কায়েম করে। সম্পাদকের সঙ্গে পত্রালাপ ক্রমে বন্ধুতার পর্যায়ে ওঠে। সেই সূত্রে আমি 'মৌচাকে'র একজন আপনার লোক হয়ে যাই।

শেষে একদিন ছেলেদের জন্যে লেখার দরুন 'মৌচাক' পুরস্কারও পাই।

হায়! আজ যদি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় বেঁচে থাকতেন। দুঃখ হয় যে তাঁর জীবনের সে সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। কিন্তু 'মৌচাকে'র প্রায় সমবয়সী সুপ্রিয় তার ভার নিয়েছে দেখে ভরসা হয় যে, সে আরো অনেককাল বাঁচবে। দু'জনেরই দীর্ঘায়ু কামনা করি। 'মৌচাকে'র আর তার নবীন সম্পাদকের।

অন্নদাশঙ্কর রায়

*

মৌচাকের জন্মকথা

স্রষ্টা যেদিন নিজের খেয়ালেই রচনা করলেন
ইন্দ্রলোকে একটি নন্দনকানন,
সেদিন পৃথিবীর কোনও কুসুমকলিই পছন্দ হ'ল না তাঁর
যাঁকে তাঁর সেই সদ্য-নির্মিত নূতন নন্দন-বনে সযত্নে স্থান দিতে পারেন।

চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন চিন্তামণি।
ভাবাকুল অন্তর তাঁর হঠাৎ যেন উপায় খুঁজে পেয়ে উদ্বেল হয়ে উঠলো!
দেখা গেল স্বর্গলোকে সহসা অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে
দু'টি অভিনব নবজাতক শিশু তরু
কুসুম-লোকে যে দুটি আজও অতুলনীয়;
প্রথমেই উদ্গত হতে দেখা গেল
নিখিল-বন্দিতা 'পারিজাত', পাদপ শ্রেণী,
তারই পশ্চাদনুসরণে এলো
কৈলাস-শিখর-শোভাকর মনোহর 'মন্দার' দ্রুমদল

সৃজনমত্ত শিল্পী স্রষ্টার খেয়াল ছিল না কিন্তু সে দিন—
এই পেলব পারিজাত ও মকরন্দ-মঞ্জরী মন্দার তরু যেদিন ওদের লীলায়িত শাখে শাখে

নব নব কিশলয় পুঞ্জে মুঞ্জরিত হয়ে উঠবে কত না মঞ্জুল মুকুল-কলি, তার অনুপম সুরভি
সম্ভারে সেদিন ভরে উঠবে যে দেবলোক!
সারা স্বর্গ সুবাসিত হয়ে উঠবে যে সে সুবাস সুমধুর অমৃত-মদিরায়!
কোন মধুকর সে মকরন্দ সযত্নে সঞ্চয় করে রাখবে •
তার বহু দিনে বহু ক্ষণে বহু ক্লেশে বিরচিত বিচিত্র মধুথ-মহলে?

ধ্যানস্থ হলেন স্রষ্টা পুনর্বার।
ক্ষণ-পরেই অতি প্রসন্ন হাস্য দেখা দিল
তাঁর জ্যোতির্ময় চতুর্মুখে।
পেয়েছেন! পেয়েছেন তিনি সেই দুর্লভ অমৃত-ভাণ্ডারীর সন্ধান,
ফুলে ফুলে অবিরাম উড়ে উড়ে বিচরণ করবে যে অক্লান্ত মধুপ
চয়ন ক'রে রাখবে সযত্নে সেই পুষ্পপরাগ-রেণুর সুরভিত চিত্ত-সুধা।
বিন্দু বিন্দু আহরণে তার অগণিত মৌভাণ্ডার রচনা করে,
অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দিবানিশি রক্ষণাবেক্ষণ করবে
তাদের সেই বহু আয়াসে সঞ্চিত সুষমাময় কুসুম-সুধা—
নিখিলের মধুপিয়াসী নরনারীর চিত্ত পরিতৃপ্তির জন্য।

কে সে? কোন ভাগ্যবান?
অবিরাম অবিশ্রাম বিধুনিত যার অতি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম পক্ষ দু'টি
অশ্রান্ত চঞ্চলগতি উড়ে উড়ে বেড়ায় ফুলে ফলে বুলে বুলে।
গুনগুন শব্দে আনন্দের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি তুলে?
অবিরত নিয়ত সে অভিযান তার।
সঞ্চয় করে ফেরে সেই অমৃত-গন্ধঢালা সুস্বাদু মধুরস প্রতি পুষ্পের মর্ম-কোরক হতে।
তার সে দুর্লভ সুধাস্বাদ চির অজ্ঞাতই থেকে যেত আমাদের
যদি না সংগ্রহ ক'রে রাখতো ওরা ওদের ওই মৌভাণ্ডারে সে মধুরসায়ন
যা পান করে আমরা আনন্দে বেঁচে আছি—
সেই তো আমাদের সকল বয়সের অন্তরঙ্গ বন্ধু 'মৌমাছি'!
সেই মধু-প্রিয় মৌমাছিরাই তো গড়ে তোলে অরণ্যে-পর্বতে এই 'মৌচাক'
যা এই 'পঞ্চাশ বছর' কেন, পঞ্চাশ হাজার বছরেও পারবে না কেউ করে দিতে নিঃশেষ!

*

নরেন্দ্র দেব

মৌচাক চিরকালের

'মৌচাক' কাগজটির সঙ্গে আমার কতকালের পরিচয়, তার হিসেব খুঁটিয়ে দেখতে গেলে অনেক দিনের অনেক কথা আলোচনা করতে হয়। আজ শুনছি 'মৌচাক'-এর বয়স ৫০ বছর হতে চলল। তা হবে। কিন্তু ৫০ বছর মানে বাঙ্গলা সাহিত্যের এক বিশাল খণ্ডকালের ইতিহাস। সাহিত্যের প্রায় তিনপুরুষের ইতিহাস। মৌচাককে কেন্দ্র ক'রে এই তিন পুরুষের কাহিনী যিনি রচনা করেছেন, সেই সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় ছিলেন বিগত সেই ত্রিযুগের মধ্যমণি। তিনি মারা গেছেন এই সেদিন। কিন্তু যে-গ্রন্থি তিনি দিয়ে গেলেন, এবং মৌচাকের সঙ্গে লেখক-সমাজকে যে বাঁধনে তিনি বেঁধে গেলেন—সেই বাঁধন একালে এবং ভবিষ্যৎ কালেও থাকবে।—

প্রবোধকুমার সান্যাল

*

পঞ্চাশের কোঠায়

পঞ্চাশ বছর কম কথা নয়। সবে যারা সেদিন সেফ্‌টি রেজার কিনেছিল, তাদের চুল দাড়ি পেকে গেল। আমাদের বেলা যা হয়েছে, 'মৌচাক'-এর বেলা তার কিন্তু চিহ্নই নেই। পঞ্চাশ বছরটা ঝকঝকে মলাটের ওপর দিয়ে এমন পিছনে চলে গেছে যে একটা ভাঁজও পড়েনি। মলাট উল্টালেও তাই। পুরোনর জায়গায় হয়ত বেশ কিছু নতুন নতুন নাম, কিন্তু সেই সুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাল কাটতে দেননি সম্পাদকেরা। সেই একই রসের ধারা বয়ে চলেছে একটানা। সেইটেই আমাদের মত লেখকদের টেনে আনে বারবার। পুরোন কলম 'মৌচাক'-এ ছোঁয়ালেই নতুন হয়ে যাবে এমনি একটা দুরাশা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

'মৌচাক'-এর পঞ্চাশ বছর

'মৌচাক' পঞ্চাশ বছরে পড়লো শুনে আমার মনে পড়ছে ছেলেবেলার দিনগুলিকে —যখন আমি ছিলাম 'মৌচাক'-এর এক মুগ্ধ পাঠক, তাতে লেখা ছাপাবার চেষ্টা ক'রে ক'রে বার-বার ব্যর্থ হচ্ছি - ছিলাম এক মফস্বলবাসী, স্কুলে-না-পড়া বালকমাত্র, খাতার গায়ে আঁচড় কাটা যার মুদ্রাদোষ। সুকুমার রায়-সম্পাদিত 'সন্দেশ' উঠে যাবার পরে সেই মস্ত ফাঁক ভর্তি করেছিলো 'মৌচাক', সাজিয়েছিলো এক নতুন উৎসবের ডালি তখনকার বাঙালি ছেলেমেয়েদের জন্য সেই 'মৌচাক' আজ পর্যন্ত টিকে আছে, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হ'তে পারে।

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে বেদনার অংশ অনেকখানি, কেননা ইতিমধ্যে—আমরা যাঁকে 'মৌচাক'-এর প্রাণপুরুষ ব'লে জেনেছিলাম, সেই সুধীরচন্দ্র সরকারের মৃত্যু হয়েছে। সুধীরচন্দ্রের কাছে আমার ব্যক্তিগত ঋণ অনেক; আমার ছেলেবেলায় তিনি আমাকে যথাযোগ্য তিরস্কার করেন, আমার যৌবনে তিনি আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানান 'মৌচাক'-এ লেখার জন্য, আর প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধুতার পরিচয় বহুবার পেয়েছি। আমি, তখনকার দিনে এক কুখ্যাত ও কুখ্যাতি নিয়ে গর্বিত তরুণ—আমি কখনো ভাবিনি ছোটোদের জন্য কিছু লিখবো (বা লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হবো), আমাকে এই পথের যাত্রী করেছিলেন সুধীরচন্দ্র; যদি তাঁর সম্পাদনায় 'মৌচাক' পত্রিকা তখন না-বেরোতো, তাহলে আমি হয়তো কখনোই ছোটোদের জন্য লিখতাম না। শিশু-সাহিত্যের সেই সরল স্বর্গ থেকে বহুকাল ধ'রে ভ্রষ্ট হয়েছি আমি; তবু আজও সেই সময়কার কথা ভাবতে ভালো লাগে, যখন ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, টিনের ঘরে ব'সে আমি প্রথমে লেখেছিলাম একটি ছোটোদের কবিতা, তারপর একটি গল্প, তারপর আরো অনেক গল্প আর কবিতা—সবই 'মৌচাকে'র জন্য, সুধীরচন্দ্রের আহ্বানের প্রেরণায়। কী সহজে লেখা হয়েছিলো সেগুলো, যেন বিনা চেষ্টায়—আর লেখার সময় কী স্নিগ্ধ আর নির্মল মনে হ'তো নিজেকে! সেই টানে প্রায় পঁচিশ বছর ধ'রে গদ্যে-পদ্যে ছোটোদের জন্য প্রচুর লিখেছিলাম, কিন্তু তারপরে এমন এক সময় এলো, যখন আমার মনে হ'তে লাগলো যে জীবন বড়ো কর্কশ, লেখা কষ্টকর, আর তারই ফলে আস্তে-আস্তে ছোটোদের লেখা বিদায় নিলো আমার মন থেকে।

'মৌচাক' আরম্ভ হয়েছিলো 'ভারতী'-গোষ্ঠীর লেখকদের নিয়ে; তারপর বিভূতিভূষণ থেকে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত তথাকথিত 'কল্লোল'-যুগের অনেকেই তার নিয়মিত লেখক ছিলেন; এমনি ক'রে বাংলা শিশু-সাহিত্যের একটি বড়ো অধ্যায় ঐ পত্রিকায় ধরা পড়েছিলো। সুধীরচন্দ্র সরকারের বিশেষ কৃতিত্ব এইখানে যে তাঁর সময়কার প্রবীণ ও সদ্যোজাত সব লেখকেরই জন্য উদার ছিলো তাঁর অভ্যর্থনা। আমার মনে প্রশ্ন জাগে: আজকের দিনে যাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণ লেখক, তাঁরা ছোটোদের জন্য নতুন ধরনে লেখেন না কেন? এই প্রশ্নের একাধিক উত্তরও আমি ভাবতে পারি: ছোটোদের রুচি হয়তো বদলে গেছে, লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো বদলে গেছে, দেশের মধ্যে (অন্তত উত্তেজনাময় কলকাতার শহরে) হয়তো সেই আবহাওয়া আর নেই, যাতে বালক-বালিকারা বই প'ড়ে অবসর কাটাতে লুব্ধ হবে। তবু ভাবতে বেদনা বোধ হয়—বিশ্বাস হয় না—যে বাংলা শিশু-সাহিত্য—যার সূত্রপাত করেন বিদ্যাসাগর, এবং যার পুরোভাগে আছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়েরা—তা রেডিও, সিনেমা, 'কমিক' অথবা দৈনন্দিন হুজুগের চাপে পিষ্ট

হ'য়ে যাবে। 'মৌচাক' নিজেই আজ প্রবীণ হ'লো, কিন্তু তার অন্তর থাক চিরতরুণ, তাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠুক আবার এক নতুন ও সৃষ্টিশীল লেখকগোষ্ঠী—এই আমার প্রার্থনা ও শুভকামনা।

বুদ্ধদেব বসু

*

মধু-ভরা মৌচাক

পঞ্চাশ বছর একটানা মৌচাক মধু বিলিয়ে আসছে। অফুরন্ত নির্ঝর। স্বর্গের অমৃতের কথা শুনে থাকি, এ মধুও তাই। বুড়ো হয় না, যারা এর স্বাদ নিয়েছে। চিরকিশোর থেকে যায়। পাঠকদের কাছ থেকে কত মজার মজার চিঠি আসে, দু-একটা চোখে পড়ে। পঞ্চাশ বছর আগে ছোট্ট বয়সে যিনি মৌচাক পড়তেন—এখন অনেক বয়স, কিন্তু লোভ আছে ঠিক তেমনিটি। ছেলে হয়েছে, নাতি হয়েছে—তাদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে মৌচাক পড়েন। কাঁচা চুল ছিল তখন, কচি মুখ ছিল—বিধাতাপুরুষ চুল পাকিয়ে সাদা করে দিয়েছেন, দাঁত উপড়ে গাল তুবড়ে দিয়েছেন। কিন্তু পণ্ডশ্রম—এত করেও বুড়ো করতে পারলেন না কিছুতে। কিসে এমন। হ'ল, ঠাহর পান না বিধাতাপুরুষ—গালে হাত দিয়ে ভাবছেন।

মৌচাকের স্রষ্টা, মধুর প্রধান পরিবেশক সুধীরচন্দ্র সরকার—আমাদের সুধীর-দা'ও ছিলেন তাই। সত্তর বছর বয়স—বাইরের চেহারায় যাই হোন, মনে-প্রাণে তাজা তরুণটি। আজকে তিনি নেই। মৌচাক পঞ্চাশে পা দেবার সামান্য কিছু আগেই তিনি চলে গেছেন, তাই বড় খারাপ লাগছে।

আমি মৌচাকের দলে জুটেছি অনেক পরে। সুধীর-দা ডেকে আনলেন। দেখলামও বটে তাই—এ দলের কেউ তারুণ্য হারান না। তারুণ্য হারানোর পরে আমি জুটেছি জিনিসটা ফিরে পাবার বাসনায়। পাচ্ছি একটু একটু—আমার তো তেমনি মনে হয়। তোমরা কি বলো?

মনোজ বসু

*

মৌচাকেতে শুরু

মৌচাকেতে শুরু করি
লেখার যে হাতেখড়ি
সে কারণে ভাই!

মৌচাকের সাথে মোর
বাঁধা চির-প্রীতিডোর
(হেথা) তাহাই জানাই।

শিবরাম চক্রবর্তী

মৌচাকের প্রত্নকথা

শ্রীচারু রায়

আমার স্বর্গত বন্ধু সুধীরচন্দ্র সরকারের ছোট ছেলে সুপ্রিয় এসে বললো, "আপনার একটা লেখা চাই। প্রথম পাতায় আপনার আঁকা কনেবউ-এর ছবি দিয়ে শুরু হয়েছিল মৌচাক, এই বছরে সেই মৌচাকের স্বুবর্ণ-জয়ন্তীর পঞ্চাশ বছর পূর্তি হবে।"···

তাই তো, অন্যমনে দিন কাটিয়েছি, খেয়াল করিনি, কখন কোন ফাঁকে এতগুলো বছর পঞ্চাশের বেড়া ডিঙ্গিয়ে অতীত হয়ে গেল—আর আমরা অতীত হতে পারলাম না। ভারতীর আড্ডার এই অবশিষ্ট তিনটি বিগ্রহ—নরেন দেব, প্রভাত গাঙ্গুলী আর আমি। তিনজনে খেয়াঘাটের পাড়ে বসে উদয়-অস্তের মালা টপকাচ্ছি। নরেন পুরোপুরি দুই গজ আশির পশ্চিমে আর প্রভাত ও আমি মাত্র অর্ধ গজ আশির পূর্ব দিক। মায়াজাল কেটে পালাতে পারিনি তাই বর্তমানেই হয়ে গেলাম জীয়ন্ত অতীত—কি তাজ্জব ব্যাপার!

—"ছোট থেকে আপনাকেই বেশী করে দেখেছি আমাদের বাড়িতে, তাই আপনার কাছ থেকেই শুনতে চাই সে সব দিনের গল্প, আমরা কেউই তো জন্মাইনি তখন, আজ চলি, অন্যদিন আসবো লেখাটা নিতে।"

চলে গেল সুপ্রিয়। ··একদিন তোড়জোড় করে লিখতে বসলাম, কিন্তু লিখবো কি? সুপ্রিয়র সেই 'তখন' কথাটার ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ঝংকারে মথাটায় ঝিম ধরে গেল, লিখতে গেলেই ঘটনার বর্ণনা ছাপিয়ে বার বার উপছে ওঠে ঘটনার ছবিগুলো—দুই সতীনের রেষারেষিতে লেখা মোটে এগোয় না। কলম বন্ধ করে বসে রইলাম কিছুক্ষণ; তারপর শক্ত হাতে গাঁতি-কোদাল মেরে নেমে গেলাম মগজের পঞ্চাশ বছরের স্তরে।

সেটা হলো ইংরেজী ১৯১৯ সাল। পশ্চিমে তখনো চলছে হিংসার মহাযুদ্ধ, আর এখানে রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংসার যুদ্ধ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবীনতার যুদ্ধ—পথ কেটে কেটে চলেছে নতুনপন্থীর সেনাদল। 'বিচিত্রা' ও 'সবুজ পত্র'র যুগ সেটা। আমাদের সবারই তখন সবুজ রক্তে ভরা ডাঁশা যৌবন। আমরাও চলেছিলাম সেই পথে তাদের সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও উদ্দীপনার কেন্দ্রস্থল ছিল ঠাকুরবাড়ি ও 'ভারতী'র আড্ডা। সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির দু'টি পীঠস্থান ছিল, দুই ঠাকুরবাড়ি। সেইখানেই বসত 'বিচিত্রা'র আসর—সেই আসরের সদস্য ছিলাম আমরা সবাই। আর ভারতীর আড্ডা ছিল প্রগতিশীল লেখকদের আসর—সেখানেও আমরা ছিলাম আড্ডাধারী। এই দুই জায়গার সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল 'মৌচাক'-এর। অবনী ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' দিয়ে শুরু হয়েছিল মৌচাক, আর ভারতীর আড্ডার কান্তিক প্রেসে হয়েছিল তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। অবশ্য কাঠামোটা বাঁধা হয়েছিল অন্যত্র—তার কথা পরে বলবো।

সুকিয়া স্ট্রীটের (এখন যেখানে কৈলাস বোস স্ট্রিট) একটা তেতলা বাড়ির নিচের তলায় ছিল কান্তিক প্রেস, দোতলায় 'ভারতী'র আপিস ও তিনতলার বড় একটা হলে বসত আমাদের আড্ডা। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী ব্রুহাম গাড়ি করে রোজ সন্ধ্যার সময় আসতেন মণিলালের কাছে 'ভারতী' পত্রিকার খোঁজ-খবর নিতে। কী জম্‌জমাট জলুস-ই ছিল এই ভারতীর আড্ডার। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল আমাদের জীবনের মৌচাক। ঘটনাচক্রে সেই নামটাই জুটে গেল এই ছোটদের পত্রিকার অদৃষ্টে। এই আড্ডার একটা পকেট-এডিশন আড্ডা ছিল আমাদের ছ'জনকে নিয়ে—সুধীর, প্রভাত, হেমেন্দ্র, প্রেমাঙ্কুর, নরেন ও আমি। প্রথম তিনজন তখন কৃতদার আর পরের তিনজন তখন অবারিত-দ্বার। কী মিষ্টি সুরে বাজাতো আমাদের ছয়-ফুটোর এই বাঁশি, আর কি মিষ্টি লাগতো শ্যালকের ডাকনাম "শ্যালু" বলে সম্বোধন। ঐ ডাকটা এখনো চালু আছে আমাদের জীবিত তিনজনের মধ্যে।

এই ছয়জনে এসে জুটতাম সুধীরের দোকানে সন্ধ্যার সময়। দোকান ছিল হ্যারিসন রোডে—এখন যেটা মহাত্মা গান্ধী রোড। ঐ বইয়ের দোকানের এক কোণে আলমারি দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় নাতিদীর্ঘ এক টেবিলের চারপাশে গায়ে গায়ে লাগালাগি হয়ে বসতাম—'কাঁঠাল পাতায়' আমরা ছ'জন। মাঝে মাঝে শরৎবাবু (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) এসে জুটতেন ঐ কাঁঠাল পাতার আসনে। এইখানে সুধীর একদিন বলেছিল, "ছোটদের জন্য একটা পত্রিকা বের করলে কেমন হয়?" প্রেমাঙ্কুর ছিল তার পাশে। টেবিল চাপড়ে বললো, "ঠিক হ্যায় শ্যালু—চালাও পানসী বেলঘরিয়া।" এই বলে আবেগের উৎসাহে সুধীরকে দিল ধাক্কা। সেটা সবার গায়ে ঠোকাঠুকি খেয়ে, প্রীতির স্বীকৃতি জানিয়ে, ফিরে এসে আবার লাগালো সুধীরের গায়ে—গোল করে সাজানো ইঁটের সারির মত। সুধীরের প্রিয় খাদ্য ছিল চাকভাজা। পেটের সব অবস্থাতেই তার সেটা চলতো। তাই চাকভাজা আর চা আনিয়ে শুরু হয়ে গেল শুভকর্ম।

কাগজপত্র, প্রেস, দপ্তরী, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির আয়-ব্যয়ের হিসাবটা ছিল সুধীরের নখদর্পণে। লেখালেখি করে তখনই কাঠামোটা পাকাপোক্ত বাঁধা হয়ে গেল। তারপর যথাসময়ে দোকান বন্ধ করে পানসী চালিয়ে এলাম 'বেলঘরিয়ায়' মানে ভারতীর আড্ডায়।

লেখকের আসরে নতুন পত্রিকার প্রস্তাব! শুঁড়ির দোকানে মাতাল ঢুকলে যা হয়, প্রায় সেই রকম অবস্থা হলো সুধীরের। মত্ত উল্লাসে চারধার থেকে ছেঁকে ধরলো সবাই তাকে। এই ভাবে কিছুক্ষণ হইহল্লা ও কথা-কাটাকাটির পর, সত্যেনবাবুর (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) দেওয়া নাম 'মৌচাক' একবাক্যে মেনে নেওয়া হলো। তখন মণিলালই (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)

প্রথম বল্লো, "কোনো চিন্তা নেই সুধীর, পায়ের তলায় প্রেস, মুঠোর মধ্যে লেখা, ঘর ভর্তি কাগজ (যুদ্ধের দরুণ তখন কাগজ পাওয়া মুস্কিল ছিল), পাল তুলে দাও ডিঙ্গায় দিনক্ষণ দেখে।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মণিলালের উক্তির ফল হাতে হাতে ফলতে শুরু হল। তারই আন্তরিক উৎসাহ ও প্রস্তাবের মূলধন নিয়ে শুভদিনেই সুধীর পাল তুলে ভাসিয়েছিল ছোটদের খুশী করার বাণিজ্যের ডিঙ্গা, 'মৌচাক' নাম দিয়ে। সে ডিঙ্গা চলে চলে এসে পৌঁছেবে পঞ্চাশের জয়ন্তীর ঘাটে। সোনার প্যাঁটরা-ভরা খুসীর সওদায় বোঝাই ডিঙ্গা এখনো চলেছে—নতুন মাঝি-মাল্লারা আনন্দ উল্লাসে হাঁকছে —"চলছে চলবে, চলছে চলবে!"···

ধীরেসুস্থে কাজকর্ম সুরু হতে থাকল। এক রবিবারের সকালে সুধীরকে নিয়ে গেলাম ঠাকুরবাড়ি, রবিবাবু তখন ছিলেন না। গেলাম অবনীবাবুদের বাড়ি। অম্বুরি তামাকের গন্ধে ভরা প্রখ্যাত সেই দক্ষিণের বারন্দায়, রূপার গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে বসেছিলেন তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্র, যুগ-প্রবর্তক দুই শিল্পী। আর মধ্যম সমরেন্দ্র, তিনিও ছবি আঁকতেন তবে তাঁর দীপ্তি বাইরের লোকের নজরে এসে পৌছয় নি। আমাদের আগমনের কারণ শুনে, "বেশ বেশ" বলে উৎসাহ ও আশীর্বাদ করলেন। মুখের নল নামিয়ে অবনীবাবু বললেন, 'শুনেছি সব মণিলালের কাছে—দিব্যি নাম দিয়েছেন সত্যেনবাবু, 'মৌচাক'।—হুঁ, ঐ মধুই সব, পূজোয় মধু, ওষুধে মধু, আর শিশুরা জন্মাবার পরেই মুখে দিই মধু। আপনার শিশুদের পত্রিকাও শুরু হলো ঐ মধু দিয়েই – হুঁ, বেশ-বেশ মধু হোক, অমর্ত্য হোক", বলে মুখে নল দিয়ে বললেন, "ছবি হলে চারু এসে নিয়ে যাবে—লেখাটা পাঠিয়ে দেবো মণিলালের হাত দিয়ে।" আবার তামাক টানা শুরু হল। প্রণাম করে চলে এলাম।

মণিলালের হাতে লেখা পাঠানোর ব্যাপারে একটা মজার গল্প মনে পড়লো। বাঁধানো খাতা কি প্যাড কিংবা পুরো ফুলস্কেপ কাগজে কখনো অবনীন্দ্রনাথ লিখতে পারতেন না। নাতি-নাতনীদের কাছ থেকে তাদের কৃপণের ধন, খাতা-ছেঁড়া টুকরো টুকরো কাগজ যোগাড় করে অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে একটানা লিখে যেতেন। কালো পিঁপড়ের সার সব চলছে তো চলেইছে—কমা, সেমিকোলন, ছেদ, প্যারা, পরিচ্ছেদ থামাথামির কোন বালাই নেই। তারপরেও আছে অন্য ব্যাপার। টুগরোগুলোতে এক-দুই-তিন নম্বর লিখে পর পর সাজানো তো থাকতই না, উপরন্তু এক পিঠের লেখার অংশ অন্য কোন্ টুকরোর কোন্ পিঠে আছে, তারও সাংকেতিক কোন চিহ্নও দেওয়া থাকতো না। লেখার আশেপাশে কাটাকুটি করে, বিচিত্র চিত্র-আঁকা কতগুলো টুকরো কাগজ জড় করে, সুতো বেঁধে, ছোটবড় বাণ্ডিল বানিয়ে, মণিলালের হাতে দিয়ে বলতেন, "মৌচাকের জন্যে লেখা।" সেই লেখার পাঠোদ্ধার করার ভার মণিলালের। কিছুদিন পরে মণিলালের হাতের লেখা

কপি 'বুড়ো আংলা' এলো সুধীরের হাতে। ঠাকুরবাড়ির ফুলের মধুই হলো মৌচাকের প্রথম সঞ্চয়। নমো ব্রাহ্মণায়ঃ বলে কান্তিক প্রেসে পাঠানো হলো 'বুড়ো আংলা'র কপি —হলো মৌচাকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

নানা ফন্দি-ফিকির খেলতো সুধীরের মথায়। নতুন একটা বাস কিনে, আমার আঁকা কভারের ছবি আঁকিয়ে এবং ঐ 'মৌচাক' নাম দিয়েই কলকাতার রাস্তায় সে বাস চালাতে লাগলো। উদ্দেশ্য, ব্যবসাও হবে, মৌচাক পত্রিকার বিজ্ঞাপনও হবে। ব্যবসাটা চালু থাকলে, ফেঁপে উঠে আরো বড় হয়ে, তখনকার বনবাদাড়-কাটা নতুন বালিগঞ্জের রাস্তায় বাসটা হয়ত ছুটে বেড়াত আজ অবধি। কিন্তু তা হয়নি। প্রধানতঃ আইনের বই নিয়ে শুরু হয়েছিল সুধীরের দোকান। তাই সেই বইয়ের ব্যবসার সঙ্গে বাসের ব্যবসার মান-মর্যদাগত মিল না থাকায়, গুরুজনের নিষেধ-নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায় বাসটা।···

মধু আহরণের কাজ যেমন চলছিলো, চলতে লাগলো। নানা জনের লেখা যোগাড় করা, ছবি আঁকা, ব্লক করা, প্রেসে যাতায়াত ইত্যাদি। দু' মাসের মত খোরাক হাতে রেখে, শেষ বরাবর সেই বছরের বৈশাখের 'উদয় দিগন্তে' দেখা দিল মৌচাক—১৩২৭ সালে।··· দেখতে দেখতে গ্রাহক-গ্রাহিকার সংখ্যা বাড়লো, বিজ্ঞাপনের, পাতায় সংখ্যা বাড়লো, মহাজনের বাক্সে মুদ্রার সংখ্যাও বাড়লো, সব মিলিয়ে বাড়লো মৌচাকের যশ ও খ্যাতি। এমনি করে তার হাঁটি-হাঁটি-পা-পা পায়ের চলার গতি বেড়ে চল্লো দ্রুতগতিতে, ছোটদের অন্য সব মাসিক পত্রিকার গতি অতিক্রম করে।

নিরুদ্ধগতিতে মৌচাক হেলায় এসে পড়ল পঞ্চাশের কোঠায়। এই দীর্ঘদিন কত শত সহস্র ছোটদের মন জয় করে এসেছিল যে, সেই সুধীরচন্দ্র সম্পাদক, প্রকাশক ও লেখক—তার দক্ষতা ও গুণাবলীর ন্যায্য অধিকারের ব্যাপ্তি ও সীমানা আঁকা আছে সাহিত্য মহলের সেট্‌ল্‌মেন্টের ম্যাপে। বন্ধুত্বের ঋণের দায়ে মৌচাকের সম্পাদক তার প্রভূত ভূসম্পত্তির ঐ দলিলটা বন্ধকী হিসাবে গচ্ছিত রেখেছিল আমার কাছে। খবরটা গোপন ছিল, আজ নামমাত্র পঞ্চাশ খণ্ড কাঞ্চন মুদ্রার বিনিময়ে ডাকযোগে ফেরত পাঠালাম দলিলটা মৌচাকের আপিসে, ছাপার অক্ষরে লেখা হয়ে থাক কাগজে। উক্ত সম্পত্তির পুরা তালিকা, যথা—প্রথম দফায়—গ্রাহক-গ্রাহিকাদের তৈরা যে সব ফুলবাগান, দ্বিতীয় দফায়—উঠতি-নবীনদের দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল বন কেটে বানানো যে সব ক্ষেত-খামার ও তৃতীয় দফায়—তৎকালীন খানদানী জমিদারদের খাস ফল-বাগিচার ভূদানে পাওয়া যে সব অংশ এবং ঐ সঙ্গে উদ্‌ধৃত লেখা দিয়ে ভরাট-করা সুপ্রতিষ্ঠিত শিশু-সাহিত্যের নতুন টাউনশিপের চল্‌তি প্রথা অনুযায়ী এক তৃতীয়াংশ ভূমিখণ্ড ইত্যাদি···। উল্লিখিত এই সব ভূ-সম্পত্তির ফল, ফুল, শস্য, মায় খাজনা ও সেলামী সমেত পুরা মালিকানি স্বত্ব একা সুধীরচন্দ্রের প্রাপ্য। ভালই হল প্রকাশ করে—পরের ধন বুকের কোটরে নিয়ে মরতাম, পুড়ে ছাই হয়ে যেতো সব!

(শেষাংশ ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

['ভবঘুরে কুকুর ল্যাম্পো'র মূল কাহিনীটি ইতালীয় ভাষায় লেখা। বইটির লেখক হলেন এলভিও বারলোত্তানি (**Elvio Barlottani**)। ইংরেজীতে এটি অনুবাদ করেন, এলেন হটন ব্রোডিক (**Alan Houghton Brodrio**) এবং বইখানির নাম হয় **'Lampo the travling dog'**. বইখানি ইতিপূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং অভূতপূর্বভাবে পাঠকমহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বাংলা ভাষায় এই প্রথম বইখানি অনূদিত হ'ল। এলেন হটন ব্রোডিকের ইংরেজী থেকে এটি অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী প্রণতা দে। এই কাহিনীর স্থানগুলি সবই ইতালীয়। কিন্তু ইংরেজী উচ্চারণ মতই লেখিকা সেগুলি ব্যবহার করেছেন।

তোমাদের মধ্যে যারা কুকুর পোষ, কুকুরকে ভালবাস, কুকুরের অসাধারণ প্রভুভক্তি, উপস্থিতবুদ্ধি ও মানুষের জন্যে তার আত্মোৎসর্গের চমকপ্রদ কাহিনী পড়েছ, শুনেছ বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, তাদেরও ল্যাম্পোর এই কাহিনী অভিভূত করবে এবং সকলকেই ভাবতে হবে—একটি মূক জীব কি বিস্ময়কর কার্যকলাপ করতে পারে,—কি অসাধ্য-সাধন ঘটাতে পারে। অনুবাদিকার কৃতিত্বও এখানে কম নয়। তিনি মূল গ্রন্থের মতই কাহিনীর বিস্ময় ও কৌতূহলকে সদা জাগ্রত রেখেছেন তার সহজ ও সুন্দর রচনার গুণে।—মৌ. স.]

॥ আগমন ॥

আজ প্রায় বিশ বছর ধরে রেলওয়ের চাকরি করছি। যে সময়কার কথা বলছি, তখন আমি ক্যাম্পিগ্‌লিয়া মারিত্তিমা ষ্টেশনে আণ্ডার-ষ্টেশন-মাষ্টার ছিলাম। মেরেম্মার যে জায়গাটিতে এই ষ্টেশনটি আজ দাঁড়িয়ে আছে, একদিন এটা ছিল সুবিস্তৃত জলাভূমিতে ভরা। জায়গাটি ছিল হাজার হাজার ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী মশার জন্মভূমি, আর তা'তে চরে বেড়াতো দল বেঁধে মোষের পাল।

এটা ছিল পিওম্বিনো থেকে আট মাইল দূরে একটা জংশন ষ্টেশন। যদিও আর পাঁচটা ছোট ষ্টেশনের মত এটাও দেখতে একটা ছোট ষ্টেশন, তবুও জায়গাটার একটা বিশেষত্ব ছিল।

কারণ এটা টুরিন-রোম লাইনের ওপরে হবার দরুণ প্রায় সব ট্রেনই এখানে থামত। যদিও এল্‌বা দ্বীপে যেতে হলে সমুদ্রযাত্রা করবার ষ্টেশন (বন্দর) পিওম্বিনো, কিন্তু তার জন্য যাত্রীদের ক্যাম্পিগ্‌লিয়া মারিত্তিমা ষ্টেশনেই মেন লাইনের গাড়ি বদলাতে হয়। এইসব কারণে, এই জংশন ষ্টেশনটি বেশ একটু তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়া পিওম্বিনোর ইটেলসাইডার কারখানা থেকে অনেক লোহালক্কড় প্রতিদিন ইটালীর বিভিন্ন অংশে মালগাড়ি করে চালান যাচ্ছে, —এই পথেই।

তিরহেনিয়ান সমুদ্রসৈকতের দুটি মনোরম স্নানের জায়গা সান্‌-ভিসেনজো থেকে ফলোনিকা যেতে ক্যাম্পিগ্‌লিয়াকে মনে হয় যেন ছোট্ট একটি মরুদ্যান। একটি শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে জায়গাটি অবস্থিত। এর সামনেই সেকেলে ধরণের বড় বড় মুরগীর ফার্ম। মুরগীগুলো বে-তকল্লুফ রেল লাইনের ওপরে ঘুরে বেড়ায়। একদিকে শান্ত মাঠ, স্নিগ্ধ গ্রাম্য পরিবেশ, আর অপর দিকে কোলাহলময় ব্যস্ত রেলওয়ে বিভাগ।

এই হ'ল ক্যাম্পিগ্‌লিয়া মারিত্তিমা ষ্টেশন। যে ঘটনাগুলি এই বইতে জানানো হয়েছে, এর আসল খ্যাতির কারণ হ'ল সেইগুলি।

আমার বাড়ী পিওম্বিনোতে। এখানেই আমরা সপরিবারে থাকি। এটি একটি আনন্দোজ্জ্বল ছোট শিল্প-শহর, এল্‌বা দ্বীপের দিকে মুখ করে একটি অন্তরীপের ওপরে অবস্থিত।

সময়টা ছিল ১৯৫৩ সালের অগষ্ট মাস। এই সময়ই আমি প্রথম দেখি কুকুরটাকে—যে পরে 'ভবঘুরে কুকুর ঃ ল্যাম্পো', নামে বিখ্যাত হয়েছিল। গরমটা সেদিন প্রচণ্ড ছিল। অনবরত গাড়ির ঘর্ষণে রেলের লাইন থেকে ধোঁয়ো আর তার দরুণ আলকাতরার বিশ্রী পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছিল। চারদিকে বিস্তৃত ক্ষেতের পাকা ফসলের ওপর রোদের ছটায় বিস্ফুরিত হয়ে উঠেছিল স্বর্ণমুদ্রার সোনালী আভা।

ষ্টেশনে গুটিকয়েক মাত্র যাত্রী। কেউ বেঞ্চে বসে ঢুলছিল, কেউ বা সচিত্র কাগজ দেখছিল, আর ষ্টলের ভেতরে বুড়ো কাগজওয়ালা নাক ডাকিয়া তোফা ঘুম লাগিয়েছিল।

আপিস-ঘরে বসে কাজ করা রীতিমত কষ্ট। একটা অসহ্য গুমোট ভাব। কলমটা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে গদাইলস্কর চালে এগিয়ে গেলাম, আর ঠিক সেই সময় একটা মালগাড়ি এসে দাঁড়ালো। এরকম তো সারাদিনই ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে আসছে-যাচ্ছে। কখনও মাল-ভরা, কখনও খালি। কতকটা অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে গাড়ির শান্টিং দেখছিলাম। মনে হ'ল একটা ওয়াগনের ভেতর থেকে কী যেন একটা ষ্টেশনের ওপরে টুপ্‌ করে পড়ল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, একটা কুকুর। কিছুমাত্র আশ্চর্য হইনি। প্রায়ই দেখতে পাই এইভাবে অনেক রাস্তার কুকুর, বিড়াল এখানে এসে পৌঁছয়। এদের মালিকরা এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য নিরুদ্দেশের পথে এদের খালি গাড়িতে তুলে দেয়।

প্রথমে দেখে মনে হ'ল একটা সাধারণ কুকুর। মাঝারি সাইজ। কোন বিশেষ জাত নয়। গায়ে সাদা বড় বড় লোম। এদিক-ওদিকে কিছু বাদামী ছোপ। গাড়ি থেকে নেমে ও যেন একটু ঘাবড়েছে। হাওয়াটা একটু শুঁকে নিল, তারপর আড়মোড়া ভাঙল। এবারে দেখে নিলো একটু ডাইনে-বাঁয়ে। ভাবখানা, যেখানে আসতে চাই ঠিক সে জায়গায় এসেছি

তো? এরপর বেশ নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে জলের কলের কাছে এগিয়ে গেল সে। হাবভাবে বুঝিয়ে দিল জায়গাটার সঙ্গে ও বেশ পরিচিত।

আপিস-ঘরে এসে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজ সুরু করলাম। মাত্র ক'মিনিট বাদেই খেয়াল হ'ল, দুটি জ্বলজ্বলে চোখ আমার প্রতি নিবদ্ধ। ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি থেকে লাফিয়ে-পড়া কুকুরটা। প্রশ্ন করি—'কী হে! এখানে কী করছ? কী চাই তোমার?' আমার বলবার ভঙ্গীতে যে একটা বন্ধুত্বের সুর ছিল, সেটা বোধহয় ও বুঝতে পেরেছিল। লেজ নাড়তে সুরু করে দিল। আদুরে স্বরে খানিকটা কুঁই কুঁই করল, তারপর আমার পায়ে নিজের নাকটা ঘষতে লাগল। এইভাবে আমরা পরিচিত হলাম। চট্ করেই আমার কাছে ও বেশ সহজ হয়ে গেল। আমার টেবিলের নীচে কুঁকড়ে বসে পড়ল। গোটাকয়েক বড় বড় শ্বাস ছাড়ল, তারপর চোখ তুলে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন বলতে চাইছিল—"কিছু মনে করবেন না দাদা? কেমন তো?" ব্যস তারপরেই ঘুম। এমন বেঘোরে ঘুমুলো যে কোন ট্রেনের আওয়াজ বা তাদের তীব্র বাঁশী ওকে জাগাতে পারল না। যখন আমি কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবার জন্য পিওম্বিনোর ট্রেন ধরব বলে উঠলাম, তখনও ও পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছিল।

বাড়িতে সেদিনও আমার স্ত্রী, আমার চার বছরের মেয়ে মির্ণা ও আমাদের এ্যালসেশিয়ান কুকুরটা আমার প্রতীক্ষা করছিল।

আমার মেয়ে জন্তু-জানোয়ারের গল্প শুনতে খুব ভালবাসে।

তাই রাত্রে খেতে বসে ল্যাম্পোর আসবার কাহিনী তাকে জানালাম। মেয়েকে মজা দেবার জন্য সত্যির সঙ্গে একটু রং চং দিয়ে বেশ গল্প জমিয়ে তুললাম। আমাদের নিজদের কুকুর টাইগারের সঙ্গে ওর কী পার্থক্য তাও বুঝিয়ে বললাম মেয়েকে। যেমন,—টাইগারের ঘর আছে, রাত্রে শোবার জায়গা আছে, একটি পুরো পরিবার ওকে দেখাশুনা করবার জন্য আছে। এ বেচারা পথের কুকুরটার পৃথিবীতে কেউ নেই। ঘর নেই। তাকে দেখাশুনো করবার ছোট্ট একটি কর্ত্রীও নেই।

'আচ্ছা! বেচারা জন্তুটার কী হবে?' আমার ছোট্ট মেয়েটি গল্প শুনে খুবই অভিভূত হ'ল! দেখলাম মির্ণা খুবই বিচলিত হয়েছে বাচ্চা জন্তুটার কী হবে ভেবে। সত্যি কথা বলতে কি, সেকথা ভেবে আমার নিজেরও দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু উপায় কী?

শেষকালে বললাম, 'আমরা ওকে সাহায্য করব। যদি ও আমাদের বাড়িতে আসতে চায়, আমাদের কাছে থাকতে চায়, তবে ওর জন্য আমাদের দরজা খোলা থাকবে।'

আমরা সকলেই তৃপ্তির হাসি হাসলাম, আর মির্ণা আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে একটি মিষ্টি চুমো দিল।

(ক্রমশঃ)

বোশেখ এলো

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বোশেখ এলো বোশেখ এলো আম-কাঁঠালের বনে,
বোশেখ এলো খোকাখুকুর মত্ত-মাতাল মনে।
নুন মাখিয়ে আমের কুসি
কপ কপাকপ যতই খুশী
দেখলে মাকে লুকিয়ে পড়া একলা ঘরের কোণে—
বোশেখ এলো খোকাখুকুর মত্ত-মাতাল মনে।
বোশেখ এলো কালবোশেখীর কালো হাওয়ায় উড়ে,
বোশেখ এলো বৈরাগীদের উদাস করুণ সুরে;
শুকনো পাতা থরে থরে
নিঃস্ব হয়ে পড়লো ঝরে
নতুন জীবন উঠলো গেয়ে আকাশ বাতাস জুড়ে—
বোশেখ এলো বৈরাগীদের উদাস করুণ সুরে।

ইচ্ছে যদৃচ্ছে

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

আমাদের ইচ্ছের শেষ নেই।
বেশভূষা নেই তার, দেশ নেই।
কখনো ইচ্ছে যায় গোনা কি?
তারা আঁধারের নাকি জোনাকি।
কানে কানে বলি ঃ শেষ-ইচ্ছেরও
শেষ নেই।

ইচ্ছের চোখ নেই, নেই পা ও দন্ত।
তবু ইচ্ছের নেই ইচ্ছের অন্ত।
সব পথে হরদম ঘুরছে;
ডানা নেই, কার ভরে উড়েছে!
কখনো সে ঠগী হয়, কখনো
সে সন্ত।

ইচ্ছে নেই বা কার? আছে খোকা-খুকীদের।
মনের গোপনে আছে সব বুড়ো-বুড়ীদের।
ইচ্ছের ছায়া আছে, আছে দাবী মস্ত।
মনের ভেতরে থাকে ইচ্ছের হস্ত।
হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেদিও তুড়ি ঢের॥

ডাকাত-ধরা

শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়

পুলিশগুলো একেবারে বোগাস বুঝলি—হাঁদু। খালি আমাদের পিছনে লাগে। কিন্তু সেদিন যে নেবুতলা ব্যাঙ্কে অত বড় ডাকাতি হয়ে গেল, আজও পর্যন্ত পেরেছে সেই ডাকাত ধরতে ?

চীনেবাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ভোলারাম তলাপাত্র খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলল কথাটা।

পারট-টু পরীক্ষার সবে রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমাদের হইহই সংঘের চারজন সক্রিয় সদস্য পরীক্ষায় পাশ করেছে। কিন্তু তবু আমাদের মনে ফুর্তি নেই। আমাদের সভাপতি ভোলারাম তলাপাত্র এবারও পরীক্ষায় ফেল করেছে। ভোলা এই নিয়ে চারবার পরীক্ষা দিল। চারবারই ফেল। এবারে পরীক্ষায় কোশ্চেন কঠিন হয়েছে বলে ভোলা ইংরেজী পরীক্ষার দিন হল থেকে বেরিয়ে এসে ইঁটপাটকেল ছুঁড়ছিল। একজন পুলিশ ওর চুল ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে আবার পরীক্ষার হলে এনে বসিয়ে দিয়েছে। পুলিশের ওপর ভোলার তাই খুব রাগ। ভোলা বলেছে, এটা আমাকে অপমান করবার জন্যেই করেছে, হাঁদু। আমাকে দরকার হলে অ্যারেষ্ট করে থানায় নিয়ে যাও, তা না আবার সেই হলের মধ্যে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া ! এমন কোশ্চেন এসেছে যে পড়ে অর্ধেক মানেই বুঝতে পারলাম না। কী আর করি, ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার গল্পটা মুখস্থ ছিল লিখে দিয়ে এলাম। তা একটা নম্বরও দিল না মাইরি—নীট লেখার জন্য পাঁচটা নম্বরও তো দিবি !

অবশ্য ফেল করেছে বলে ভোলা ঘাবড়ায় নি। শুনলাম, সে এখন শুধু সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছে। আজ এক সপ্তাহ পরে ভোলাকে আমাদের হইচই সংঘের আড্ডায় পেয়েছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুই এতদিন কি করছিলি, কোথায় ছিলি রে ভোলা ?

ভোলা বলল, মনটা বড় খারাপ রে হাঁদু। পিসেমশায় বলেছিলেন বি. এ.টা এবার পাশ করতে পারলে হাকিম করে দেবেন। তা এমনই কোশ্চেন এল যে কিছু লিখতে পারলাম না; মনটা খারাপ বলে সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছিলাম। ঐ সিনেমা দেখতে-দেখতেই একটা আইডিয়া মাথায় এল। ওঃ, হিন্দী সিনেমা না দেখলে ব্রেন খোলে না মাইরি !

আমরা হইচই সংঘের চারজন অনুগত সদস্য—আমি, কালু, মানিক আর ঝণ্টু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, কী আইডিয়া রে ভোলা ?

পুলিশকে সায়েস্তা করতে হবে।

আমি বললাম, ভোলা, আমি একটা মতলব এঁটে রেখেছি। তোকে যে পুলিশটা

অপমান করেছিল তাকে দেখিয়ে দিবি। আমি তার পায়ের কাছে কলার খোসা রেখে আসব। তারপর বাছাধন একেবারে চিৎপটাং।

ভোলা বলল, বোগাস। শোন পুলিশকে ওভাবে জব্দ করব না। ও তো কাপুরুষের কাজ। অন্য ভাবে জব্দ করতে হবে। ওদের ইজ্জতে ঘা দিতে হবে। শোন, কাকপক্ষীকে বলবি না। নেবুতলা ডাকাতি কেসে পুলিশ এ পর্যন্ত কাউকে ধরতে পারেনি। আমরা যদি ডাকাতদের ধরে দেই তাহলে ওদের গালে চড় মারা হবে, তাই না?

আমি বললাম, বাঃ! গ্র্যাণ্ড আইডিয়া তোর ভোলা। তুই উঠবি।

কিন্তু ঝণ্টু বলল, ওরে বাবা ডাকাত! আমরা ডাকাত ধরব, তুই বলছিস কি ভোলা? মানে, তোর নয় স্যাণ্ডো করা তাগড়াই চেহারা, তারপর অতবড় জুলফি রেখেছিস, কিন্তু আমার এই ক্যাংলা চেহারা। হাঁদুরও তো অম্বলের ব্যামো। কালু আর মানিক তো বাপ-মায়ের এক ছেলে এখনও হাপ-প্যাণ্ট পরে, ওরা কি ঐ বড় বড় ডাকাত ধরতে পারবে?

ভোলা বলল, কেন পারবে না? আরে গল্পের বইতে পড়িস নি? 'ডাকু কা লেড়কী' ছবিটা দেখে আয়। একটা মেয়ে গান গাইতে গাইতে ডাকু চানা সিংকে ধরে ফেলল। আর তোরা জলজ্যান্ত পুরুষমানুষ! আমার ওপর সব ছেড়ে দে। আমি যা বলব তোরা তাই করবি।

ঝণ্টু আর মানিক আমতা আমতা করল। ভোলা তখন রেগে গিয়ে বলল, ঠিক আছে, তোদের যেতে হবে না। আমি আর হাঁদু দু'জনেই তাহলে ধরব। ডাকাতদের হাতে আর কোমরে দড়ি বেঁধে সোজা লালবাজারে পুলিশের নাকের কাছে নিয়ে যাব। দেখি বাছাধনদের এত হাঁকডাক কোথায় থাকে!

আমি শ্রীহাঁদারাম বক্সী বড় বিপদে পড়ে গেলাম। ভোলার পাল্লায় একবার পড়লে রক্ষে নেই। কিন্তু ভোলার হাতের মাস্‌ল দেখে আমি কিছু বলার সাহস করলাম না। হয় ডাকাতের হাতে মরতে হবে, না হয় ভোলার হাতে মরতে হবে। তার চেয়ে ডাকাতের হাতে মরাই ভাল। তবু খবরের কাগজে নাম উঠবে। চাইকি ছবিও বার হতে পারে।

ভোলা আমায় বলল, কাল থেকে আমাদের অভিযানে বেরুতে হবে। তুই কাউকে কিছু না বলে সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই রোয়াকে আমার সঙ্গে দেখা করবি। সঙ্গে কিছু টাকা নিয়ে আসবি। দরকার হবে।

সেদিন রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে আমি স্বপ্ন দেখলাম, একদল ডাকাত আমাকে তাড়া করেছে। আমি আর ভোলা প্রাণপণে ছুটছি। হঠাৎ একটা ডাকাত, ইয়া বড় তার গোঁফ, ভোলাকে ধরে

ফেলল। তারপর একটা তলোয়ার দিয়ে ঘ্যাঁচ করে তার মুণ্ডুটাকে দেহ থেকে আলাদা করে ফেলে দিল। তাই না দেখে আমি আরও জোরে চোঁচা দৌড় লাগালাম। কিন্তু আমার পা যেন কিছুতেই চলছে না, আর ডাকাতরাও আমাকে ধরে ফেলে আর কি! এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

পরদিন দুরু দুরু বুকে হইচই সংঘের রোয়াকে গিয়ে দেখলাম, ভোলা অস্থির ভাবে পায়চারি করছে। তার পরনে পাজামা। গায়ে পাঞ্জাবী। আমকে বলল, এটা আমার ছদ্মবেশ। আর এই ছাখ, ব'লে ভোলা আমায় পকেট থেকে বার করে দেখাল। আমি সভয়ে বললাম, ওগুলো কি ভালা? পটকা। আমাদের তো পিস্তল নেই। দরকার হলে এই পটকাই ঝাড়ব। এখন চ'।

আমি বললাম, ভোলা আমাকে বাদ দিলে হয় না। বড্ড পেটটা কামড়াচ্ছে।

ভোলা বলল, ওতে কিছু হবে না। আজ সারাদিন কিছু খাসনে। কমে যাবে। টাকাটা এনেছিস তো? আজ আমার দুপুরে রেস্টুরেন্টেই খেতে হবে।

ভোলা তুই বরং এই পাঁচটা টাকা রাখ। আমায় ছেড়ে দে।

ভোলা বলল, খবরদার হাঁদু, বেশী ন্যাকামো করবি তো এই পটকা তোর মাথায় ভাঙব। যেটুকু ঘিলু আছে, ওটুকুও বেরিয়ে যাবে। অগত্যা যেতে হ'ল ভোলার সঙ্গে। সেই যে কথায় আছে না, পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।

বড় রাস্তা থেকে আমরা ট্রামে উঠলাম। ভোলা আমায় বলল, ডাকাতিটা হয়েছিল নেবুতলা ব্যাঙ্কে, তাই না?

হ্যাঁ।

কী ভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল একবার বল তো? কাল রাত্তিরে পুরনো 'আনন্দবাজার পত্রিকা'টা বার করে পড়লাম, আর আজ এর মধ্যেই ভুলে গেছি। ব্রেনটা ঠিকমত ওয়ার্ক করছে না, মাইরি!

আমি বললাম, দুপুর বেলা ব্যাঙ্কে পুরোদমে কাজ হচ্ছে। চারজন লোক এসে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়রকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে, ক্যাশ বাক্সটা নিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে কালো মোটর গাড়িতে চেপে পালিয়ে গেল।

ভোলা বলল, ঠিক ঠিক। এবার মনে পড়েছে। আরে এই তো নেবুতলা ব্যাঙ্ক। এই কন্‌ডাকটর রোখো রোখো। ব'লে ভোলা লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। আমিও পিছনে পিছনে লাফ দিলাম। পড়বি তো পড় একেবারে কাদা-জলের মাঝখানে। ফচাৎ করে কাদা ছিটকে এক ভদ্রলোকের গায়ে লাগল। তিনি বললেন, কী মশায় দেখতে পান না? ভদ্রলোক

'সন্দেহজনক মনে হচ্ছে, না?'

গজর গজর করতে করতে চলে গেলেন। হঠাৎ দেখি ভোলা ব্যাঙ্কে না গিয়ে পাশে এক চায়ের দোকানে ঢুকল।

আমি বললাম, ভোলা ব্যাঙ্কটা একবার দেখবি না। ভোলা বলল, যাব। তার আগে কিছু খাওয়া, মাইরি।

ওঃ, খিদেয় নাড়ি চোঁ-চোঁ করছে। এই বয়, ডাবল মামলেট আর চা-টোস্ট বানাও। তুই তো আবার খাবিনে। শোন হাঁদু, সবসুদ্ধ কত টাকা হবে মনে হয়?

পাচ লাখ।

পাচ লাখ তুই ঠিক বলছিস?

ঠিক।

আচ্ছা তোর কি মনে হয় হাঁদু, আমাদের কলকাতার বাইরে যাওয়ার দরকার আছে?

আমি বললাম—না। আগে কলকাতায় দেখি। তারপর দরকার হলে তুই বরং—

ভোলা বলল, দেখলি হাঁদু কারুর ওপর বিশ্বাস করা যায় না। ঝণ্টু আর মানিক কেমন পেছিয়ে গেল, দেখলি। ওদের আমি এমন শিক্ষা দেব না!

রেস্টুরেন্টের এক কোণে বেশ ষণ্ডামত একটি লোক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় উস্কোখুস্কো চুল, বসে বসে চা খাচ্ছিল আর ওদের কথা শুনছিল। হঠাৎ ভোলার ওদিকে চোখ পড়ে যেতেই ভোলা আমাকে বলল, হাঁদু লোকটাকে দেখেছিস?

হ্যাঁ।

সন্দেহজনক মনে হচ্ছে, না?

তাই তো মনে হচ্ছে। আমার পিসতুতো দাদা তো পুলিশে আছে। উনি বলেন, অপরাধ

করার পর অপরাধীরা নাকি ঘটনাস্থলে এসে নজর রাখে। ব্যাঙ্কটা তো পাশেই। আর লোকটিকে দেখে—ফিসফিস করে আমি বললাম কথাটা।

ভোলা বলল, ঠিক বলেছিস হাঁদু। তোর ব্রেন খুলছে। সাধে কি আর পাশ করেছিস। শোন, লোকটা নির্ঘাত ডাকাত দলের কেউ।

লোকটা কিছুক্ষণ পরে উঠে ফিসফিস করে দোকানের মালিকের সঙ্গে কিছু কথা বলে বেরিয়ে পড়ল।

ভোলা বলল, এই হাঁদু, চটপট উঠে আয়। লোকটার মতলব ভাল বলে মনে হচ্ছে না। ওকে ফলো করতে হবে।

একটু পরে পাশে একটা গলির ভিতরে লোকটাকে পাওয়া গেল। লোকটা সিগারেট টানছে আর কটমট করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

ভোলা ও আমি একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

পাঁচ মিনিট। দশ মিনিট। আধ-ঘণ্টা। পেটে চনচনে খিদে। আমারই টাকায় ভোলা ফেল। অথচ আমার পেট ব্যথা বলে যেতে দিল না। ওঃ, কী কুক্ষণেই মিথ্যে কথা বলতে গিয়েছিলাম।

উঁকি মেরে দেখলাম লোকটা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। ভোলা বলল, নাঃ হাঁদু, আমার সন্দেহ বাজে নয়। ডাকাত দলের কেউ না হলে অতক্ষণ ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? রেস্টুরেন্টে বসে আমাদের কথা শুনে বুঝতে পেরেছে আমরা ফেউ লেগেছি। এখন ওকে ধরতে পারলে কেল্লা ফতে।

কিন্তু ওদের হাতে যদি পাইপ গান থাকে?

দাঁড়াও আমরা এই বাড়ির পাশটা দিয়ে যে গলি চলে গেছে, ঐ গলি দিয়ে বড় রাস্তার মুখে দাঁড়াব। তারপর লোকটি যেই গলির মুখে আসবে, অমনি আমি আর তুই ওকে জাপটে ধরে চেঁচাতে থাকব। রাস্তার লোকেরা নিশ্চয়ই ওকে ধরে ফেলবে।

তাই হ'ল। আমরা চুপি চুপি গিয়ে গলির মুখে দাঁড়াতেই দেখি লোকটাও এগিয়ে আসছে। ভোলা বলল, হুঁশিয়ার হাঁদু, এইবার তৈরি হ। দরকার হলে পটকা চালাব। এক সেকেণ্ড। দু'সেকেণ্ড। দশ সেকেণ্ড।

হঠাৎ কোথা থেকে দু'খানি বলিষ্ঠ হাত এসে আমাদের সাপের মত জড়িয়ে ধরল। তারপর মাথায় একটা বিরাট আঘাত। শুনলাম, লোকজন হইহই করে উঠছে। তারপর অন্ধকার, আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখি আমরা একটা ঘরে শুয়ে আছি। চোখ মেলে তাকালাম। মনে করতে চেষ্টা করলাম কী হয়েছিল। ভাবলাম, ডাকাতদের আড্ডায় আমাদের ধরে আনা হয়েছে। ভোলার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ। চোখ পিটপিট করছে।

ভাল করে তাকিয়ে দেখি, ওমা, ঘরে দারুণ ভিড়, অধিকাংশই পুলিশ। আমাদের চোখ মেলতে দেখে একজন বলল, আসামীরা চোখ মেলেছে। এইবার বড়বাবুকে ডাক। এমন সময় হুড়মুড় করে একগাদা লোক হাতে তাদের ক্যামেরা, ঘরে ঢুকে বলল, কই ডাকাত কই ?

সেই লোকটি, যাকে আমরা নেবুতলা ব্যাঙ্কের সামনে ফলো করছিলাম, সেই লোকগুলোকে আমাদের দেখিয়ে বলল, এই যে স্যর, একেবারে আসল গ্যাং। পকেটে পটকা পাওয়া গিয়েছে।

নাম বলেছে কিছু ?

লোকটি আমার আর ভোলার পেটে খোঁচা দিয়ে বলল, এই নাম বল? ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমরা নাম বললাম।

ক্যামেরাওলা একজন জিজ্ঞাসা করল, কী করে ধরলেন ?

লোকটি বলল, আমি নেবুতলা ব্যাঙ্কের সামনে ক'দিন ধরেই শাদা পোশাকে নজর রাখছি। আজ এই ছোকরা দু'জন রেস্টুরেণ্টে বসে ঐ ডাকাতির টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে আলোচনা করছিল। ওদের আচরণ দেখে আমার সন্দেহ হ'ল। আমি এক ফাঁকে লালবাজারে ফোন করে দিলাম। এরা দুর্দান্ত ডাকাত স্যর। দেখতে ছেলেমানুষ হলে কী হবে! এইবার এমন মার দেব কোথায় টাকা রেখেছে সুড়সুড় করে দেখিয়ে দেবে।

শুয়ে শুয়ে আমি ঘামতে লাগলাম। ওরা বলো কি! তাহলে এরা পুলিশ—আমাদেরই ডাকাত মনে করে ধরে এনেছে! কি একটা বলতে গেলাম, মুখ দিয়ে চিঁ চিঁ আওয়াজ ছাড়া কিছু বেরুল না।

পটাপট ছবি উঠল। ঐ লোকটিরও ছবি তুলল ফোটোগ্রাফাররা। ওদের একজনকে বলতে শোনা গেল, যাই রেডিওকে আগে খবরটা জানিয়ে দেই। আর একজন জিজ্ঞাসা করল, পুরনো গ্যাং বলে মনে হচ্ছে কি ?

লোকটি বলল, একেবারে ঝানু স্যর। চেহারা দেখছেন না, একেবারে জেলখানার পাখি। ওদের কি কষ্ট করে যে ধরেছি। কাগজে আমার নামটা একটু দেবেন স্যর। আমার নাম শ্রীহারাধন ধাড়া। সাব-ইন্সপেক্টর—ডাকাত-ধরা বিভাগ। কে যেন বলে গেল, ডাকাতদের

দেখবার জন্য রাস্তায় দারুণ ভিড় হয়েছে। সমস্ত ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঢাল আর কাঁদানে গ্যাসের স্কোয়াড রেডি।

ভোলা এবার চিঁ চিঁ করে বলল, স্যর আমরা ডাকাত নই, আমরা—

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, কথা বলেছে, কথা বলেছে। কে একজন বলল, গলার স্বর শুনছিস না, ঠিক ডাকাতের মত। আর একজন বলল, কেন এই ছোঁড়াটার চুলের বহর দেখলেই তো বোঝা যায়।

এমন সময় ভিড় ঠেলে একজন পুলিশ অফিসার ঢুকলেন। সবাই স্যালুট দিল। অফিসার বললেন, কই হে, কোথায় ডাকাতরা? তারপর আমার দিকে তাকাতেই অফিসার বলে উঠলেন, আরে এ যে হাঁদু!

ঘাম দিয়ে যেন জর ছাড়ল। আমার সেই পিসতুতো দাদা, আমি এবার ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলাম।

আমাদের তখনই পুলিশ কমিশনারের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি সব শুনে গম্ভীর ভাবে ভোলাকে বললেন, ডাকাত না ধরে বাড়ি গিয়ে বসে পড়গে যাও। নয়ত আসছে বছরও পরীক্ষায় পাসের কোন চানস্ নেই। তারপর কাকে যেন বললেন, সাব-ইন্সপেক্টর হারাধন ধাড়াকে ডেকে আনতো—ব্যাটাকে আজ আমি সাসপেন্ড করব। আর এই ছোকরা দু'জনকে গাড়ি করে বাড়ি পৌছে দাও।

রবি-বাউল

শ্রীবিশ্বনাথ দে

ভুবনডাঙার রুক্ষ মাটির বুকে
যে কোন্ বাউল গান শোনালো ভাই!
বিশ্বভুবন সেই গানেতে ভরা
তার সে গানের তুলনা আর নাই।

ভুবনডাঙার গাছের যতো পাখি
সে সুর শুনে জাগবে সকাল-ভোরে,
ভুবনডাঙার গানের সুরের মায়া
দেশ-বিদেশে, বাহির বিশ্বে ঘোরে।

জোব্বা পরা সেই সে মজার বাউল
তার তুলনা কে আর বলো আছে?
রবি-বাউল ছিল যে তার নাম,
সে নাম শুনে হৃদয় আমার নাচে।

প্যারিসে দেখানো ম্যাজিক

যাদুকর এ. সি. সরকার

সেবার একটা সহজ অথচ মজাদার যাদুর খেলা দেখিয়ে ফরাসী দেশের প্যারী শহরের এক মজলিসে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলাম। তখন আমি ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী শহরে। একদিন সোকালে সরবর্ণ ইউনিভারসিটির একজন গবেষক ছাত্র আমার পূর্ব-পরিচিত মিঃ মিশ্র এসে হাজির আমার হোটেলে। বল্লেন, 'যাদুসম্রাট, আজ দুপুরে কি খুব ব্যস্ত থাকবেন ?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম তাঁর দিকে।

"আমাদের খুব ইচ্চা যে আজ দুপুরের আহার আপনি আমাদের সঙ্গে করেন।" বিনীতভাবে বললেন মিঃ মিশ্র।

তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

তার সঙ্গে দুপুর বেলার গিয়ে উপস্থিত হলাম তাদের হোস্টেলে। মধ্যাহ্ন ভোজ ভালই হ'ল। ভোজের শেষে ভোজবাজি দেখার বায়না ধরলো সবাই। জানতাম এমন ব্যাপার ঘটবেই, তাই প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। ছাত্র-বন্ধুদের শান্ত করে পকেট থেকে বের করে নিলাম একটা রুমাল। এরপরে রুমালটাকে পাক খাইয়ে আর তার মাথায় গাঁট বেঁধে সেটাকে করলাম একটা মানুষের আকৃতির পুতুল। এই মজার পুতুলটাকে ঘরের কোণের একটা টেবিলের উপর আবছা আলো-আঁধারী জায়গায় রেখে আমি দাঁড়ালাম তার পাশে। সবার দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করে পড়তে লাগলাম ম্যাজিকের মন্ত্র :

ডুগ ডুগাডুক ডুগাডুক
নাই ভুলচুক নাই ভুলচুক
মনে নাই সুখ, মনে নাই সুখ
তবু উৎসুক সব উৎসুক

মন্ত্র পড়া শেষ হতে পুতুলের দিকে তাকিয়ে বললাম, ওয়ান-টু-থ্রি—লাফাও দেখি। সঙ্গে সঙ্গে পুতুলটা আপনা-আপনি লাফিয়ে উঠলো। আবার—আবার—এমনি ধারা চারবার। ব্যাপার দেখে সবাই অবাক। এমন মজা কে কবে দেখেছে বলো? শোন তবে এই ব্যাপারটা কেমন করে করেছিলাম, তাই বলি।

আসলে রুমালটার এক কোণে লাগানো ছিল একটা সরু কালো সুতো। এই সুতোর এক প্রান্ত ধরা ছিল আমার বাঁ হাতে, আর এই বাঁ হাতটা আমি বরাবর আড়াল করে রেখেছিলাম আমার শরীরে ঢেকে। ডান হাত নেড়ে পুতুলকে আদেশ দেবার ফাঁকে, ওপাশ থেকে বাঁ হাত দিয়ে সুতো টেনে রুমাল-পুতুলের নাচ দেখানোটা মোটেই অসুবিধার ব্যাপার হয়নি আমার পক্ষে। ঘরের ওই কোণটা ছিল একটু ঘুপচি মত—আলো ছিল কম। কালো সুতো কেউ তাই দেখতে পায়নি একটু দূরে থেকে। করে দেখ। এই মজার ম্যাজিক তোমার বন্ধুদের খুব মজা দেবে।

কর্পূরের মতো

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

॥ উপন্যাস ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

স্কুলের গাড়ী উধাও হয়ে গেছে ? সে কি ?

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রূপজামে একটা বিহ্বল বিষণ্ণতা নেমে এল ! দু'একটি বাড়ীর মহিলারা গলা ছেড়ে চীৎকার স্বরু করলেন। দুশ্চিন্তার কালো ছায়া রূপজামে সান্ধ্য-আকাশের বর্ণাঢ্যতাকে মুহূর্তের মধ্যে ঢেকে ফেললে !

রাতুলদা আমাকে নিয়ে বের হলেন তাঁর গাড়ীতে করে। ইতিমধ্যে আরো দু'একটি গাড়ী রোটাংডি'র দিকে চলে গেছে শুনলাম।

তিলুড়ি যখন এলাম—তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দিনের আলো ঘোলাটে ঝাপসা হয়ে এসেছে, অন্ধকার নামতে যে আর বেশী দেরি নেই—তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তিলুড়িতে এসে দেখি—সেখানে ইতিমধ্যে দু'একটা গাড়ী এসে জমায়েত হয়েছে। কিছু লোকও নেমেছেন—সকলের চোখে-মুখে ঐ একই জিজ্ঞাসা—মাধু সিং আর তার গাড়ীর কি হলো ?

তিলুড়ির মোড়ে পাম্পিং স্টেশনের গায়েই বীরুয়ার ছোট্ট একটা চায়ের দোকান ;—বীরুয়া রোটাংডি-রূপজাম-লুন্টি—মানে এধারের যত গ্রাম বা আধা-শহর আছে—সেখানের সকলেরই পরিচিত লোক ; বিশ বছর সে এই দোকান চালাচ্ছে। এই পাম্পিং স্টেশন বানাবার সময় সে কুলি হয়ে এ অঞ্চলে আসে, তারপর এখানেই থেকে যায় ; ঐ চায়ের দোকান করে খায়।

বীরুয়ার দোকানে মাধু সিং রোজ এক খুরি চা খেয়ে যায়। রূপজাম ফেরার সময় খালি গাড়ী নিয়ে সন্ধ্যার পর যখন মাধু সিং রোটাংডি যায়—তখন সে এই দোকানের চা না খেয়ে গাড়ী ছাড়ে না। এমন কি বীরুয়ার যদি অসুখবিসুখ করে—তবুও ঘুঁটে জেলে মাধু সিং নিজে চা তৈরী করে, নিজে এক কাপ খায় আর বীরুয়াকে এককাপ খাইয়ে চায়ের দাম চুকিয়ে তবে গাড়ীতে ওঠে।

বিকেলে রূপজামের দিকে যাবার সময়ও এখানে থামে মাধু সিং। লুন্টি যাবার জন্য কৃষ্ণমূর্তির ছেলেকে এখানে নামাতে হয়, কোনোদিন যদি কৃষ্ণমূর্তির আসতে একটু দেরি হয়—তবে বীরুয়ার জিম্মায় তাঁর ছেলেকে রেখে মাধু সিং রূপজামে চলে যায়। মোদ্দাকথা, রোটাংডি থেকে ছাড়ার পর মাধু সিং-এর এইটাই প্রথম থামার জায়গা—বীরুয়ার চায়ের দোকান।

সুতরাং তিলুড়ি পাম্পিং স্টেশনের ধারে উদ্বিগ্ন মানুষের ভিড় হওয়া আশ্চর্যের বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বীরুয়ার কাছেই মাধু সিং-এর ঠিক খোঁজ-খবর পাওয়া যাবে।

বীরুয়া বললে—আজ তো গাড়ী এখনো রূপজামে যায়নি বাবু।

যায়নি কিরে? মাধু সিং কবে দেরি করেছে এমন?

দেরি তো কখনো মাধু সিং করে না বাবু—তবে কিনা, আজ এখনো আসেনি।

ঠিক বলছিস?

ঠিক বলবো না তো কি মিথ্যা বলবো?

তুই হয়তো অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলি, সেই ফাঁকে মাধু সিং-এর গাড়ী বেরিয়ে গেছে!

না গো বাবুমশায়, তা হয়নি। আমি আজ নজর রেখেছি খুব জোর—এই দেখেন না বাবু, এই তরিতরকারি—এগুলি রূপজামে সেনবাবুর বাড়ীতে পৌছুতে হবে। সেনবাবুর বাগান আছে ভোজুডিতে, সেই বাগান থেকে ওনার ছোটভাই এগুলি পাঠিয়েছেন—ওনার বাড়ী পৌছে দিতে। আমার দাদা ওনার বাগানের মালী—চাষবাসের কাজকর্ম করে; আজ ডাকগাড়ীর বাবুর দ্বারা আমার কাছে ভেজেছে। তাই আজ আর অন্য কোনো দিকে মন দিই নাই—তাকিয়ে আছি কখন ফুক করে মাধু সিং আসবে, শুধু সে দিকে নজর রাখছি।

মাধু সিং-এর গাড়ী যেতে তুই তাহলে দেখিস নি বলছিস?

না, বাবু। এখনো মাধু সিং গাড়ী নিয়ে আসেনি।

স্টেশন ওয়াগন নষ্ট হয়ে যেতে পারে মাঝ-পথে, তাই অন্য কোনো গাড়ীতেও আসতে পারে। এই ভেবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অন্য কোন গাড়ী যেতে দেখেছো?

বীরুয়া বললে—অন্য গাড়ী দু'একটা গেছে, কিন্তু বাবু, বাচ্চাদের নিয়ে কোনো গাড়ী এদিকে আসেনি। আমি আজ বিলক্ষণ নজর রাখছি, মাধু সিং-কে আজ আমার দরকার।

অন্যদিনের চেয়ে খুব কমই গাড়ী গেছে। রোটাংডি-হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর গাড়ী গেছে, লুন্টি কলিয়ারীর গোটা দুই গাড়ী দেখেছি, কাঁচা কয়লা বোঝাই লরিও একটা গেছে, একটা ভ্যান, ধানবাদের পুলিশের গাড়ী—এই সব গেছে।

তুই কি বসে গাড়ী গুনছিলি নাকি ?

না বাবু, আজ আমাকে একটু সতর্ক থাকতে হয়েছে—মাধু সিং-এর মারফৎ সেনবাবুদের বাড়ী তরকারি পাঠাতে হবে রূপজামে।

এমন সময় হঠাৎ কৃষ্ণমূর্তি রোটাংডি থেকে ফিরলেন; তাঁর চোখ দুটো ছলছল করছে! সন্ধ্যার অন্ধকারেও চোখের কোণের জল দেখা যাচ্ছিল।

কৃষ্ণমূর্তির প্রায় সংগে সংগেই আর একটা গাড়ী থেকে নামলেন, রোটাংডি থানার দারোগাবাবু। স্কুলের হেড মাষ্টারমশাই তাঁকে খোঁজ করার জন্যে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া এমন একটা অভুতপূর্ব ব্যাপারে পুলিশেরই তো দায়িত্ব বেশী।

দারোগা সাহেবও সে কথা বেশ গুছিয়ে বললেন—এ ব্যাপারে তো আমাদেরই দায়িত্ব। কিন্তু কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। মাধু সিং চারটে বেজে পনেরো মিনিটের সময় থানা ছেড়েছে। অন্য দিন লক্ষ্য থাকে না, কিন্তু আজ আমি নিজে দেখেছি মাধু সিং ঐ সময় তিলুড়ির দিকে গাড়ী নিয়ে চলে গেল—ছেলেরাও যথারীতি গাড়ীতে বসে; মাধু সিং বিকেলে আমাকে একখানা চিঠি পৌছে দিয়েছে বলেই আজকের ঘটনাটা বেশ মনে পড়ছে—এই তো কিছুক্ষণ হলো!

কৃষ্ণমূর্তি ভিজে ভিজে গলায় বললেন—আমি তো দু'তিনবার রোটাংডি আর তিলুড়ির পথটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই!

রাতুলদা-ও ব্যথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—পথের ধারে কোনো জংগল-টংগলে গাড়ী নিয়ে মাধু সিং আটকে পড়েনি তো ?

অন্য একজন বললেন—মাধু সিং কি তা করবে ? বিশ্বাসী লোক—

আমি বললাম—বিশ্বাসী বলে কোনো কথা এখন আর নেই!

দারোগাবাবু বললেন—তা ঠিক, তবে মাধু সিং-কে আমরা এখনো বিশ্বাসী বলেই জানি। তাছাড়া একগাড়ী ছেলেসুদ্ধ সে জঙ্গলে ঢুকবেই বা কেন ?

কোনো য়্যাকসিডেণ্ট তো হতে পারে ?

তা হতেই পারে, তা হলেও তো পথের ওপর তার চিহ্ন থাকতো, এমন কি আশপাশে যদি পড়েও গিয়ে থাকে, তারও চিহ্ন থাকবে।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—আমি খুব নিবিষ্ট মনেই দেখেছি। দু'ধারেই দেখেছি; আমার প্রথমে ভয় হয়েছিল—গাড়ীটা বুঝি তিলুড়ির জলের ভেতর গিয়ে পড়েছে। আর তিলুড়ি-হ্রদ যা গভীর!—

এ কথা শুনেই সকলে সমবেতভাবে যেন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন; বেদনায় আমারও মনটা টনটন করে উঠলো।

দারোগাবাবু বললেন—এই রকম সন্দেহ যে আমার হচ্ছে না—তা নয়, তবে জলের দিকের পাঁচিল, রেলিং, পোষ্ট—কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। আমি আসার সময় ভালো করেই তা দেখেছি।

কৃষ্ণমূর্তি সায় দিয়ে বললেন—সে তো আমিও দেখেছি, তিন-চারবার দেখেছি।

কিন্তু কোথায় গেল তাহলে?

দারোগা সাহেব বলতে লাগলেন—সব কাজেরই একটা মোটিভ থাকে; মাধু সিং গাড়ী নিয়ে কোথায় যেতে পারে? আর যাবেই বা কেন? রোটাংডি থেকে গাড়ী নিয়ে কোথাও ভাগতে গেলে তাকে তো তিলুড়িতে আসতেই হবে—অথচ বীরুয়ার কথা শুনে মনে হচ্ছে মাধু সিং এখানে আসেনি।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—বীরুয়া কেন আমি তো সওয়া চারটে থেকেই এখানে অপেক্ষা করছিলাম, রোটাংডি থানা ছাড়ার পর যে মাধু সিং এখানে আসেনি—এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই!

দারোগা সাহেব বেশ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন—তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, রোটাংডি আর তিলুড়ির মধ্যেই স্টেশন ওয়াগনটি হারিয়ে গেছে।

কে একজন বললেন—বড়ধেমো পাহাড়ের ওপর দিকে যায়টায় নি তো—অন্ধকারে পথ হারিয়েছে—

(ক্রমশঃ)

"ত্যাগের আগুনে না পুড়িয়া কেহ কোন দেশকে উন্নত করিতে পারে নাই। শিশুর প্রাণের জন্য মা কষ্টভোগ করে, বীজ আপনাকে ধ্বংস করিয়া গাছ, ফল ও শস্য জন্মায়, মৃত্যু হইতে জীবন আসে।"

—মহাত্মা গান্ধী।

গাবুল পেল গুপ্তধন

শ্রীরবিদাস সাহারায়

সেদিন বাজারের পথে একটা সেফটিপিন কুড়িয়ে পেয়েছিল পিকলু। তাতেই তার ক আনন্দ!

পেছন থেকে গাবুল তা দেখতে পেয়ে বলেছিল—ছিঃ পিকলু, ওটা ফেলে দে। পথের জিনিস কুড়ুতে নেই।

সে কথা শুনে পিকলু বলে উঠল—কেন, কুড়ুলে কি দোষ হয় রে? জানিস, আমার মামা একদিন পথের পাশে দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

এমন সময় সেখানে হাজির হ'ল পটলা। সে বলল—দশ টাকার নোট, সে আবার এমন কি জিনিস রে! জানিস, আমার মাস্টারমশাই-এর কাকা একবার গুপ্তধন পেয়েছিলেন।

গুপ্তধন! সে আবার কি জিনিস? কেমন করে পেলেন রে? গাবুল শুধায়।

পটলা বলে—সে এক মজার কাহিনী। বস্তা ভরতি সোনা পেয়েছিলেন একদিন পথের পাশে।

এঁ্যা! তাই নাকি? চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল গাবুলের।

শুধু কি তাই? সেই সোনা পেয়ে মস্ত বড়লোক হয়ে গেছে মাস্টারমশাই-এর কাকা। বিশ্বনাথ কলোনীতে পাঁচতলা বাড়ী হাঁকিয়েছেন। আর রোজ দু'বেলা গাড়ী হাঁকিয়ে চলাফেরা করেন। কি ডাঁট তার!

ইস্, কি ভাগ্য লোকটার! কেমন করে পেল রে বস্তা ভরতি সোনা? অবাক হয়ে শুধায় গাবুল।

ওটা ছিল কোন বড়লোক বা রাজা-মহারাজার সম্পত্তি। গুপ্তধনও বলতে পারিস। গভর্নমেণ্ট যখন বড় বড় লোকদের কালো-টাকা বের করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন, তখন সেই রাজা-মহারাজারাও তাঁদের ধনসম্পত্তি এদিক-ওদিক চালান করতে লাগলেন। অনেক সম্পত্তি ধরাও পড়লো।

বস্তা ভরতি সেই সোনাও বুঝি সরাতে চেয়েছিলেন কেউ। কিন্তু বিপাকে পড়ে পথের পাশে ফেলেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। মাস্টারমশাই-এর কাকাবাবু যাচ্ছিলেন সেই পথ দিয়ে। ব্যস্, তাঁর কপাল খুলে গেল।

পিকলু বলল—দেখলি গাবুল। পথের মাঝেও গুপ্তধন পাওয়া যায়। আমি পথের মাঝ থেকে সেফটিপিন কুড়িয়েছি বলে ঠাট্টা করলি? কোন জিনিসকে অচ্ছেদ্দা করতে নেই। হয়ত এমনি করে একদিন গুপ্তধনও পেয়ে যেতে পারি।

গাবুলের আর আপত্তি করার কিছু রইল না। বরং গুপ্তধন পাবার নেশা তাকে পাগল করে তুলল। সে চুপি চুপি মাঝে-মাঝেই বেরিয়ে পড়তে লাগল গুপ্তধনের খোঁজে।

কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করার পর তার হুঁশ হ'ল, মানুষের চলতি পথে তো কখনো গুপ্তধন পাওয়া যায় না। গুপ্তধন পাওয়া যায় মাঠে জঙ্গলে বা কোন নির্জন জায়গায়।

গাবুল এবার নূতন পথ ধরবে ঠিক করল। যে ছোট্ট শহরে তারা বাস করে, সেই শহরের পূর্বদিকের সীমানায় আছে একটি খাল। সেই খালের ধার দিয়ে আছে জঙ্গল। সে জায়গাটা ভয়ানক নির্জন—সহজে কেউ যায় না। সেখানেই যাবে গাবুল ঠিক করল। গুপ্তধন সেখানেই হয়তো পাওয়া যাবে।

কিন্তু একা যেতে বড্ড ভয় করে। তাই পিকলুকে বলল—পিকলু চল যাই।

কোথায় ?

গুপ্তধন খুঁজতে। ঐ খালের ধারে জঙ্গলের পাশে।

তুই খেপেছিস! ওখানে যায় মানুষ!

গুপ্তধন তো ঐ সব জায়গাতেই পাওয়া যায় রে। যারা গুপ্তধন পেয়েছে তারা কি ঘরে বসে পেয়েছে ? কত দুঃখ, কষ্ট সহ্য করে, কত দুর্গম স্থানে—

বুঝিয়ে বলবার মত ভাষা আর খুঁজে পেল না গাবুল। কিন্তু তাতেই কাজ হ'ল। পিকলু রাজী হয়ে গেল।

একদিন বিকেলে দু'জনেই রওনা হ'ল সেই খালের ধারে জঙ্গলের দিকে। ভয়ানক নির্জন জায়গা। খাঁ খাঁ করছে জায়গাটা। যেন হাঁ-করে খেতে আসছে। অনেক সাহস করে দু'জনে এগিয়ে গেল। বাবলা ও হিঙ্গুল গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে যেন মূর্তিমান যমের মত। এদিক ওদিকে কড়া নজর রাখতে রাখতে এগিয়ে চলতে লাগল তারা—গুপ্তধন যেন চোখ এড়িয়ে না যায়।

খালের ধার দিয়ে তারা হাঁটতে লাগল। পিকলুর চোখ কিন্তু গাছের ডালগুলোর দিকেই বেশী। তার ঠাকুরমা বলেছে নির্জন জায়গায় গাছের ডালে ভূত-প্রেত, শাকচুন্নী এসব থাকে।

চলতে চলতে সত্যি দেখতে পেল একটা ঝাঁকড়া গাছের ডাল একটু একটু নড়ছে। কি রকম যেন শব্দও আসছে সেখান থেকে। পিকলু থমকে দাঁড়িয়ে বলল—গাবুল, ঐ ছাখ্।

গাবুল জিজ্ঞেস করল—কি!

গাছের দিকে তাকিয়ে পিকলু বলল—ঐ দেখছিস না গাছের ডাল নড়ছে আর কি রকম শব্দ হচ্ছে!

গাবুল বলল—দূর বোকা, গাছের ডালে কি গুপ্তধন থাকে নাকি ?

পিকলু বলল—গুপ্তধন নয়, ঐ যে গাছে যারা থাকে, অপদেবতা—

গাবুল জোরে চেঁচিয়ে হেসে উঠল—ধ্যেৎ, তোর যত আজগুবি খেয়াল! কিন্তু হেসেই আবার থেমে গেল সে। বুকটা তারও ধুকপুক করে উঠল। শব্দটা যেন সত্যি বিদ্ঘুটে। গাছের ডালটাও যেন নড়ছে বিচ্ছিরি ভাবে।

পিকলুই আগে ছুট দিল। তার পেছনে পেছনে গাবুল। ছুটে ছুটে তারা একেবারে পাড়ার ভেতরে চলে এল।

সেদিনের মত গুপ্তধন অভিযানের ঐখানেই ইতি।

পরের দিন গাবুল পিকলুকে ডেকে বলল—আমাদের কাল অমন করে পালিয়ে আসা ঠিক হয়নি রে। লোকে আমাদের ভীরু বলবে। আজকেই দেখলাম একটা বইয়ে লেখা আছে—ভয় করলে কেউ কখনো বড় কাজ করতে পারে না। আর কোন কাজে ব্যর্থ হলেও নিরাশ হতে নেই। বার বার চেষ্টা করতে হয়।

পিকলু বলল—সে তো আমার বইয়েতেও লেখা আছে।

গাবুল বলল—তা হলে চল্ আমরা আবার যাই। এবার ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসবো না। সাহস করে এগিয়ে গেলে গুপ্তধন আমরা পাবোই।

এবার তা হলে বিকেলে যাবো না রে। দুপুরের একটু আগে আগে যাবো।

বেশ তাই চল্।

আবার তারা একদিন রওনা হ'ল। সেদিন অবশ্য বাড়ী থেকে বের হ'ল দুপুরের অনেক আগেই। আগেকার সেই পথ দিয়ে না গিয়ে এবার গেল অন্য পথে।

চলতে চলতে খালের ধারের এক জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পিক্‌লু। গাবুলকে ডাক দিয়ে বলল—ঐ ছাখ্।

কি?

ছাখ্ না, ঐ মোটা গাছটার তলায় একটা চটের বস্তা রয়েছে।

হ্যা রে, তাইতো! পটলা বলেছিল কে একজন বস্তা ভরতি সোনা পেয়েছিল। এটাও হয়তো তাই।

আনন্দে আর গর্বে দু'জনের বুকই ফুলে উঠল। তা হলে সত্যি গুপ্তধন পাওয়া গেল এবার। গাবুল বুক ফুলিয়ে বলল—আমি বলেছিলাম না, ব্যর্থ হলেও নিরাশ হতে নেই। বারবার চেষ্টা করতে হয়। দেখলি তো এবার?

পিকলু বলল—কিন্তু এখনই কি ঐ বস্তাটা তুলে নেওয়া ঠিক হবে? যদি এর মালিক আশে-পাশে কোথাও থাকে? খপ্ করে ধরে ফেলবে যে আমাদের।

গাবুল বলল—ঠিক কথা চল্ আমরা ঝোপে ঝাড়ে কোথাও লুকিয়ে থাকি। সন্ধ্যা হলে তারপর বেরোবো।

পিকলু বলল—এতক্ষণ লুকিয়ে থাকবো ঐ ঝোপে-ঝাড়ে? সর্বনাশ!

গাবুল বলল—বইয়ে পড়িস নি, ভয় করলে কোন বড় কাজ করা যায় না। গুপ্তধন যখন পেয়েই গেছি তখন ভয় কিসের? চল্ এখনই লুকিয়ে পড়ি। তা ছাড়া ওটার ওপর আমাদের নজরও রাখতে হবে।

তখন যুক্তি-পরামর্শ করে দু'জনে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের মধ্যে। এমন জায়গায় গিয়ে লুকালো যেখান থেকে ঐ বস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়।

চুপচাপ বসে রইল দু'জনে। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারল না। দুপুর গড়িয়ে যতই বিকেল হ'তে লাগল ততই শুরু হল মশার আক্রমণ। কি দুরন্ত মশা। হুল ফুটিয়ে একেবারে কাবু করে দেয়। মশার কামড় খেতে খেতে আর উঃ আঃ করতে করতে দু'জনের অবস্থা কাহিল। পিকলু বলল—আর পারিনা রে গাবুল।

গাবুল পিকলুকে উৎসাহ দিতে লাগল—কষ্ট কর্—কষ্ট না করলে দুনিয়ায় বড় হতে পারবি না। এত কষ্ট করছি বলেই তো গুপ্তধন পাচ্ছি আজ।

এত সব কথা বলছে তবু চোখ রাখছে তারা গাছের তলায় ঐ বস্তাটার দিকে। তখনো বস্তাটা ঠিক ঐ ভাবেই আছে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।

এবার দু'জনেই বেরিয়ে পড়ল ঝোপ ছেড়ে। এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে এসে দাঁড়াল সেই গাছটার কাছাকাছি। কেউ দূর থেকে তাদের লক্ষ্য করছে না তো?

গাবুল বলল—পিকলু, বস্তাটা উঠিয়ে নিয়ে আয়।

পিকলু বলল—তুই নিয়ে আয়। আমি চারদিকে লক্ষ্য রাখছি।

গাবুল কাছে গিয়ে বস্তাটা তুলে নিল। বেশ ভারী বস্তাটা। নিশ্চয়ই অনেক সোনা আছে ভিতরে।

কিন্তু বস্তাটা একটু নড়ে উঠল যেন!

অত কিছু ভাববার সময় নেই। গাবুল তাড়াতাড়ি বস্তাটা নিয়ে ছুটতে শুরু করল। পিকলুও ছুটল তার পেছনে। কিছুদূর এসে পিকলু বলল—ওরে গাবুল, অমন করে ছুটিস না। লোকে সন্দেহ করবে। এমন কি পুলিশও পাকড়াও করতে পারে।

ছোটার গতি একটু কমিয়ে দিল গাবুল।

বাড়ীর কাছাকাছি যখন তারা এসে পৌছল তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। গাবুল বলল—বস্তাটা কোথায় রাখি বল্ তো? পিকলু বলল—তোদের বাড়ীর পেছনে যে কচুর ঝোপটা আছে সেখানেই রেখে দিই চল্।

'থলির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো একটা বিড়াল।'—পৃঃ ৩৪

গাবুল বলল—রাত্রে যদি চোরে নিয়ে যায়? তার চেয়ে চল্ সোনাগুলো বের করে মাটিতে পুঁতে রাখি। সময় মত বের করে নেবো।

যুক্তি করে দু'জনেই চুপি চুপি ঝোপের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। চটের থলির দড়ি দিয়ে শক্ত করে থলির মুখটা বাঁধা। দু'জনে অনেক কষ্ট করে বাঁধনটা খুলল।

অসীম কৌতূহল নিয়ে গাবুল হাত দিল থলির ভিতরে। কিন্তু একি! থলির ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা বেড়াল। আর থলির মধ্যে রইল মাত্র কয়েকটা থান ইঁট।

পিকলু বলল—এটা তো পটলাদের সেই বেড়ালটা রে! পাড়ার লোকদের জ্বালিয়ে খায় এই বেড়ালটা। পটলাই হয়তো এটাকে বস্তায় পুরে খাল ধারে রেখে এসেছে।

গাবুল বলল—চুপ, কাউকে বলবি না কিছু। এই বেড়ালটাকে আমরা ফিরিয়ে এনেছি জানতে পারলে দাদা আমার মাথায় গাঁট্টা মেরে নৈনিতাল আলু বানিয়ে দেবে। সেদিন এই বেড়ালটা দাদার থালা থেকে মাছের মুড়ো নিয়ে পালিয়েছিল।

বলতে বলতে মুষড়ে একেবারে মাটিতে বসে পড়ল গাবুল। হায় রে, এত কষ্টের এই গুপ্তধন!

বিবিধ ধরা

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

লোরা নামে ছোট্ট মেয়ে,
রিষড়ে ধরো বাড়ি,
ধ'রে বসল বাপকে সেদিন
চড়বে উটের গাড়ি।
ধর্তাপুরের ট্রেন ধরল
বাপ লোরাকে নিয়ে;
উট নেইকো, গাধার গাড়ি
দেখল সেথায় গিয়ে।
মনে ধরল গাড়ি খুকির,
চড়ল দু'জন তাতে;
গাড়োয়ানটা ধরা-গলায়
গান ধরল ছাতে।
ধরমশলায় গিয়ে দেখল
চোর পড়েছে ধরা;
দারোগার পা কেঁদে ধরলেও
হাতে পড়ল কড়া।
জেলেরা মাছ দেদার ধরে,
গাছে আপেল ধরে,
পেটে ধরল যত খেল
কিনে সস্তা দরে।
রাম-তেঁতুলের আচার খেয়ে
বাপকে ধরে জ্বরে;
দু'দিন বাদে বৃষ্টি ধরলে,
লোরা ফিরল ঘরে।

রাস্তার নাম-বদল

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

দেশে স্বাধীন হয়ে যাবার পর ইংরেজ রাজত্বে যে সব রাস্তায় ইংরেজদের নাম ছিল বা অন্য নাম ছিল, সেই সব অনেক রাস্তার নাম বদলে দেশ-প্রেমিকদের নামে হয়েছে। যেমন হ্যারিসন রোড হলো, মহাত্মা গান্ধী রোড ; ক্লাইভ ষ্ট্রীট, নেতাজী সুভাষ রোড ; কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হলো, বিধান সরণি ; রসা রোডের অর্ধেক হলো, আশুতোষ মুখার্জী রোড ; অপর অর্ধেক, শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জী রোড। পিতা-পুত্রে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছেন। আপার সার্কুলার রোড হলো, আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড ও লোয়ার সার্কুলার রোড হলো, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। দুই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞান অধ্যাপক এই রাস্তাটিকেও ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। ওদিকে চিৎপুর রোড হলো, রবীন্দ্র সরণি।

উত্তর কলিকাতায় একটা রাস্তার নাম ছিল ফড়িয়াপুকুর লেন, সেটাকে করা হলো শিবদাস ভাতুড়ী ষ্ট্রীট। জান তো, এই শিবদাস ছিলেন মোহনবাগান ফুটবল ক্লাবের বিখ্যাত ফরোয়ার্ড খেলোয়াড়। তাঁরই আমলে এই বাঙালী দল সেকালের দুর্দান্ত মিলিটারি ও সাহেব দলদের হারিয়ে প্রথম আই. এফ. এ শিল্ড জয় করে নিয়ে আসেন ১৯১১ সালে। সেই দলে শুধু একজন ব্যাক বুট পরে খেলতেন, আর সবই খালি পায়ে। শিবদাস যখন পায়ে বল পেতেন, তখন বল নিয়ে এমন ছুট দিতেন যে, বুট পরা প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর নাগাল আর পেত না।

এরপর মিশন রো বদলে হলো, রাজেন্দ্র মুখার্জী রোড। জান তো, প্রথমে Sir R. N. মার্টিন কোম্পানির পার্টনার ছিলেন, তারপর মালিক হন। কিছুকাল আগে উত্তর কলিকাতায় সুকিয়া ষ্ট্রীট নামে এক বিখ্যাত রাস্তা ছিল। এই রাস্তার এক বাড়ীতে প্রথম বিধবা-বিবাহ হয় বিদ্যাসাগর মশায়ের নেতৃত্বে। সে বাড়ীটা এখনও আছে, আর তার গায়ে লেখা আছে "শশিকণা"। যাই হোক, সেই সুকিয়া ষ্ট্রীট এখন আর নেই। সে রাস্তাটা আছে বটে পুরোটা, কিন্তু তার অর্ধেক হলো, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট ; অপরার্ধ মহেন্দ্র শ্রীমানি রোড। তাজ্জব ব্যাপার ! তাজ্জব এইজন্য বলছি যে, সুকিয়া ছিলেন একজন ইহুদী দানবীর। কত গরীব দুঃখীকে দান করেছেন, কত বিপন্নকে উদ্ধার করেছেন, কত সংকটে পতিত ধনীকেও তিনি সাহায্য করেছেন। তিনি ছিলেন বিরাট ব্যবসায়ী, কিন্তু মনটা ছিল দয়ায় পূর্ণ। তাঁকেও দয়ার সাগর বলা চলতো। তিনি যত অর্থ উপার্জন করেছেন, এদেশেই প্রায় তার সর্বস্ব দান করে গেছেন। তাঁর নামে এই রাস্তাটার নাম বদল হবার সময় বহুলোক আপত্তি জানিয়েছিলেন। এমন কি আমাদের জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতি চ্যাটার্জী মশায়ও খবরের কাগজের পাতায় বিস্তর প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সুকিয়া সাহেবের মহানুভবতা, বদান্যতা ও দান-কীর্তিরও বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু

সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। পৌরপিতাগণ তাতে কর্ণপাত না করে, স্থকিয়া নাম লুপ্ত করে দেন। কি তাঁদের স্বার্থ ছিল জানি না!

যাই হোক, এইবার বলি একটি করুণ কাহিনী। কলকাতার ভবানীপুরে একটি রাস্তার নাম আছে নফরচন্দ্র কুণ্ডু লেন। রাস্তাটার আগে অন্য নাম ছিল। কলকাতার রাস্তার ম্যান হোল দিয়ে নিচে নেবে ড্রেন সাফ করতে হয় মাঝে মাঝে। ধাঙড়দের ছেলেরাই এই ভাবে নাবে। কিন্তু মাঝে মাঝে রাস্তার নিচেকার ঐ ড্রেনে দূষিত গ্যাস জমা হয়। এই রকম গ্যাস জমা হয়েছিল একবার ভবানীপুরের ঐ রাস্তায়। তা আগে থাকতে বোঝা যায়নি। ছুটি ধাঙড় ছেলে ভিতরে নেবে গেল ড্রেন সাফ করতে, কিন্তু আর সাড়া পাওয়া গেল না তাদের! উপরের লোকেরা আতঙ্কিত, কিন্তু নেবে গিয়ে ছেলে ছুটিকে সাহায্য করতে এগুচ্ছে না কেউ, খালি হইচই করছে। তখন নফরচন্দ্র কুণ্ডু নামে এক যুবক সটান নেবে গেলেন ঐ ছেলেদের কাছে এবং তাদের তুলে আনতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দূষিত গ্যাস তাঁকেও আক্রমণ করলো। ফলে, তিন জনেরই জীবন অবসান হলো! এই যে নফরচন্দ্র পরের জন্যে নিজের জীবন দান করলেন, এই মহৎ কাজের জন্যেই কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁর নামে ঐ রাস্তার নাম দিয়েছিলেন নফরচন্দ্র কুণ্ডু লেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পৌরপিতাগণ মহতের সমাদরই করেছিলেন।

আচ্ছা, থিয়েটার রোডকে বদলে করা হলো, শেক্সপিয়ার সরণি। এখানে গুণীর সমাদর করা হ'ল। সেখান হ'ল 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে'। স্বদেশ-বিদেশ বিচার চলে না এ ক্ষেত্রে।

নিচে আরও কয়েকটা রাস্তার নাম বদলের তালিকা দেওয়া গেল—যে নাম আগে ছিল এবং এখন যে নাম হয়েছে, এ থেকে তা তোমরা জানতে পারবে।

ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীট—রফী আহামেদ কিডোয়াই রোড; ওয়েলিংটন স্ট্রীট—নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট; বাছুড়বাগান স্ট্রীট—বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট; মেছুয়াবাজার স্ট্রীট—কেশব সেন স্ট্রীট; মির্জাপুর স্ট্রীট—সূর্য সেন স্ট্রীট; বেলগাছিয়া রোড—আর, জি, কর রোড; ক্যানিং স্ট্রীট—বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড; গ্রে স্ট্রীট—অরবিন্দ সরণি; মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের অংশ—রাজেন্দ্র দেব রোড; মানিকতলা স্ট্রীটের পূর্ব অংশ—শিশির ভাদুড়ী পথ; মানিকতলা স্ট্রীটের পশ্চিম অংশ—রামদুলাল সরকার স্ট্রীট। খুঁজলে এরকম নাম-বদলের নমুনা আরও পাওয়া যাবে।

কলকাতায় 'টোলা', 'টটুলি' ও 'তলা'

কলকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলের নামের মধ্যে অনেক 'টোলা', 'টুলি' বা 'তলা' আছে। অনেক সময় যে সম্প্রদায়ের লোক এক জায়গায় বেশী বসবাস করত বা যে অঞ্চলে যে ধরণের গাছপালা বেশী ছিল, সেই নামেই সেই জায়গার নাম হয়ে গেছে 'টোলা', 'টুলি' বা 'তলা' দিয়ে। এখানে সেই অনেক জানা নামের মধ্যে কয়েকটি তোমাদের বলছি। যেমন: কলুটোলা, আহিরিটোলা, পটুয়াটোলা, শাঁকারিটোলা, কম্বুলিটোলা, কুমারটুলি, গোয়ালটুলি, তালতলা, নিমতলা, বেলতলা, আমড়াতলা, চাঁপাতলা, ডালিমতলা, নেবুতলা প্রভৃতি।

এক যাত্রায় পৃথক ফল

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

গল্পটা আমার শোনা অনেক কাল আগে—গল্পের যাদুকর আমাদের সৌরীনদা'র মুখ থেকে।

কৈশোরকালে তাঁর 'মাকালীর খাঁড়া'-র তলায় পড়ে আমি খুন হয়েছিলাম—সেই থেকেই তাঁর আমি ভক্ত। তোমাদের অনেকেই হয়তো সেই চমৎকার বইটি পড়ে থাকবে। তাঁর মতন কলমের যাদু আমার নেই যে সেই রুপালী ভাষার রূপকথার স্বাদ তোমাদের দিতে পারি। নিজের ভাষণেই আমার সাধ্যমত সেই কাহিনীটি বলছি তোমাদের···

একছিল মাকড়সা···

আর ছিলো জ্বর।

একদা কি করিয়া মিলন হোলো দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে! জ্বর গিয়ে ধরলো সেই মাকড়সাকে···

মাকড়সাটা একটা জালার মধ্যে ঘর বেঁধে নিজের মায়াজাল বিস্তার করছিল, এমন সময় জ্বরটা গিয়ে তার মধ্যে পড়ল।

'কে আবার জালাতে এলো ত্যাখো!' খিঁচিয়ে উঠলো মাকড়সা: 'বলে আমি মরছি নিজের জ্বালায়···'

'তোমার আবার জালা কি?' জ্বর তার ভুল শুধরে দিতে যায়—'জালা তো গেরস্তর।'

'আর জ্বালিয়ো না দাদা! কে তুমি বলো তো বাপু! তোমার আবির্ভাবেই আমার গা হাত পা কেমনতর কাঁপছে যেন।'

'কাঁপবেই তো! আমি জ্বর যে। জ্বর হলেই কাঁপুনি ধরে! জ্বরের নাম শোনোনি নাকি কখনো? সেই জ্বর···তোমাকে ধরতে এসেছি।'

'জ্বরের নাম শুনব না কেন? দেখেছিয়ো তো জ্বরকে। এই বাড়ির একটা ছেলেকে ধরেছিল। ১০৮° উঠে গেছল তার, প্রায় যায় যায় অবস্থা, ডাক্তার এসে মাথায় বরফ-টরফ দিয়ে কোনোরকমে তাকে বাঁচালো।'

'আমিই তো! আমিই তো ধরেছিলাম ছোঁড়াটাকে।' সগর্বে জানালো জ্বরটা।

'ধরেছিলে বেশ করেছিলে। ছেলেটা ভারী দুষ্ট। বেজায় বদ। আমি তো এই ঘরের দেওয়ালের ঐ কোণটায় থাকতাম, কিন্তু ছেলেটা খালি এসে আমার জাল ছিঁড়ে দিত। তাই বাধ্য হয়ে এই জালার মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছি—তার ভয়েই। বেশ করেছিলে ধরেছিলে তাকে—তা ছাড়তে গেলে কেন আবার?'

'সাধে কি ছাড়লাম আর ! ডাক্তারটা এত কুইনিন ফুঁড়ে দিয়েছে ওর গায়, এমন ধারা কুইনিন গিলিয়েছে ছোঁড়াটাকে যে সব রক্ত তেতো হয়ে গেছে ওর, কোনো আর সোয়াদটুকু নেই, তাই বাধ্য হয়েই তাকে ছাড়তে হোলো। কোথায় যাই, কাকে ধরি এখন। কাউকে না ধরে তো থাকবার জো নেই আমার। আপাতত তাই তোমাকেই'…

'রক্ষে করো দাদা ! শুনেই কিনা কে জানে, কাঁপুনি আমার বেড়ে যাচ্ছে আরো যেন। ভাবলুম, একটা মশা-টশা এসে পড়লো বুঝি আমার জালে…আটকালো ভালোই…আরাম করে খাওয়া যাবে ধীরে-সুস্থে…কে জানে যে মশা নয়, স্বয়ং মশাই !'

'মশা নয়, এনোফিলিস। আমার বাহন। মশা নয় মশাই, মশার ছদ্মবেশে সাক্ষাৎ ম্যালেরিয়া…আমিই স্বয়ং।' গুনগুন করে নিজের গুণ-বর্ণনা করল জ্বর, 'এখন এই ধরতে এলাম তোমায় !'

'আমাকে ধরে কী সুখ পাবে ! দেখছ এই তো চেহারা আমার। অনেক দিন ধরে না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে রয়েছি। রসকস কিছু নেই দেহে। এই জালার ভেতর পথ ভুলেও কোনো পোকামাকড় কি মাছিটাছি এসে পড়ে না, তাই এখান থেকে যাই যাই করছিলাম, এমন সময় তুমি এসে বাধা দিলে আবার !'…

'তাই নাকি ? তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাইছিলে বুঝি ? তা, আমারও তো এখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেইকো, নাদুসনুদুস ছোঁড়াটার রক্ত চুষে হাড় সাড় করতেও পারলাম না, তার আগেই তাকে ছেড়ে দিতে হোলো। কুইনিন গিলিয়ে বিষিয়ে দিয়েছে তাকে। আমিই আর এখানে থেকে কী করব বলো ?…চলো, দু'জনেই তবে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়া যাক। এখান থেকে চলে যাই আমরা—যেদিকে দু'চোখ যায়…'

এই বলে সেই গেরস্ত বাড়ি ছেড়ে দু'জনেই তারা বেরিয়ে পড়ল সটান।

এ-পথ সে-পথ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তারা একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে দাঁড়লো এসে।

মাকড়সা বলল—'কতো বড়ো বাড়িটা দেখেছিস্ ! কার বাড়ি কে জানে !'

একটা চাষীও সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল বাড়িটা।

'হাঁ, রাজবাড়ি একেই বলে বটে ! এমনটা না হলে কি রাজবাড়ি হয় !' নিজের মনেই সে উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

জ্বর বলল—'শুনলি তো ! এখানকার রাজার বাড়ি, বুঝেচিস ?'

মাকড়সা বলল—'আমি আর এক পাও বাড়াব না। এখানেই দাঁড়ালাম। হাঁটতে হাঁটতে আমার আট পায়ে খিল ধরে গেছে, আষ্টেপৃষ্ঠে ব্যথা, আর আমি এগুব না বাবা ! ওই রাজবাড়িতেই বাস করব আজ থেকে। অঢেল ঘর দেখছি, তার একটা না একটায় নিরাপদ

ঠাঁই মিলবেই। এবং যতগুলো ঘর ততগুলো ছেলেপিলে নিশ্চয় নেই রাজার—তাদের দৌরাত্ম্য আর সইতে হবে না আমাকে।'

'তাহলে আমি এই চাষীটার ঘাড়ে ভর করি, কী বলিস? এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় কেন বল্!' বলল জ্বর: 'লোকটা যেমন হৃষ্টপুষ্ট দেখছি, অনেক রক্ত মাংস আছে শরীরে, একে ধ'রে এখন আরাম করা যাক দিনকতক!'

এই বলে জ্বর মশার রূপ ধরে কামড় বসাল চাষীর গায়। আর সেই ফাঁকে মাকড়সা সুরুৎ করে ঢুকে পড়ল রাজবাড়িতে।

নিজের কুটীরে ফিরে চাষী কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। দেখে তায় বৌ বলল—'কাঁপতিছ কেন গা? হ'ল কি তোমার বলতো?'

'ক্যা জানে!' নির্বিকার ভাবে বলল চাষী: 'শীত শীত লাগতিছে কেমন, তাই কাঁপতেছি!'

'এই গরমে শীত কিগো!' অবাক হয়ে গেল ওর বৌ, কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল—'ওমা! গাটা বেশ গরম যে। জ্বর হয়েছে দেখছি।'

'জ্বর না হাতী!' নির্বিকার জবাব চাষীর: 'জ্বর ধরে আমার তো ছাইটা করবে!'

'বটে! এমন কথা! আমার মুখের ওপর এত্ত বড় কথা!' জ্বর বলল ওর ভেতর থেকে: 'জ্বর কাকে বলে, এইবার হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাছাধন!'

চাষী বলল—'আজ আর কিছু খাব না বৌ। উপোষ করব সারারাত। তাহলেই জ্বর বাপ বাপ বলে পালাবে। জ্বর আর পর, বুঝলি বৌ? খেতে না পেলেই পালায়। যেমন ধর তুই, তুই আমার আপনার, তোকে খেতে-পরতে দিতে যাদ নাও পারি, তাহলেও তুই আমার থাকবি, পালাবি না—কিন্তু পর দু'দিন না খেতে পেলেই দে ছুট! তারপর আর সে নেই!'

'ও বাবা! এ আবার বলে কী রে!' কাঁপতে কাঁপতে বলল জ্বর: 'সারা রাত না খাইয়ে রাখবে নাকি আমায়! তাহলে আর আমি বাড়ব কিসে, আপনার থেকেই আমার রস শুকিয়ে যাবে যে!'

বলা বাহুল্য, জ্বরের কথা চাষীর কানে ঢুকল না। পেটে কিল মেরে শুয়ে রইলো সে।

সকালে ঘুম ভাঙতে সে দেখল দেহটা আর তত ভার ভার নেই বটে, তবে জ্বরটা তখনো ছাড়েনি। বৌকে বলল—'পান্তা ভাত নিয়ায়! কালকের রাত্তিরের ভেজানো ঠাণ্ডা ভাত থাকে তো আন্! পাতি নেবু কাট্। সারারাত উপোষ থেকে বেজায় খিদে পেয়েছে আমার পান্তা নিয়ায় খাই!'

'জ্বরের ওপর পান্তা ভাত!' শুনেই আঁতকে উঠেছে জ্বর।

চাষীর বৌও ওর কথারই প্রতিধ্বনি করল—'জর গায়ে পান্তা খাবে কি গো! তার চেয়ে একটু দুধ সাবু করে দিই বরং তাই খাও।'

'দুধ সাবু!' মুখ বিকৃত করে বলল চাষী: 'ওসব হচ্ছে বাবুদের খাদ্য। পান্তা ভাত আন্, খাই, খেয়ে মাঠে যাই। তিনটে জমিতে লাঙল দিতে হবে আজ। ঢের কাজ।'

পান্তা খেয়ে লাঙল ঘাড়ে বলদ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চাষী।

রাত ভোর উপোষ, ভোর বেলায় পান্তা। তার ওপর সারাদিন লাঙলের ঠেলা খেয়ে না, জ্বর তো এদিকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লেগেছে। সন্ধ্যে বেলায় লাঙল কাঁধে চাষী মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে, রাজবাড়িটার সামনে এসেছে যখন, কপালের ঘাম মুছেচে সে, আর সেই ঘামের সঙ্গে টস্‌টস্ করে খসে পড়ল জ্বর। রাস্তায় পড়ে বললে—বাঁচলাম বাবা এতক্ষণে। এই পাপদেহ ত্যাগ করে বাঁচলাম!

আর চাষী বলেছে—ঘাম দিয়ে জ্বরটা বুঝি ছেড়ে গেল এতক্ষণে! বলে হাঁপ ছেড়েছে সে।

রাস্তায় নেমেই জ্বর দেখল, মাকড়সাও ওদিক থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে আসছে—সেই রাজবাড়ির থেকে।

'এসো বন্ধু! দেখা হ'ল আবার।' আগ বাড়িয়ে জ্বর বলেছে মাকড়সাকে।

'একি! তোমায় এখানে যে দেখছি ফের! অবাক হয়ে বলল মাকড়সা—'চাষীর বাড়ি যাওনি নাকি?'

'ঝকমারির কথা আর বলো কেন ভাই। সেখানে গিয়ে যা নাকালটা হয়েছি! লোকটা আমায় সারা রাত কিচ্ছুটি খেতে দেয়নি, ঠাহাক্কা উপোস করিয়েছে, আর সকাল বেলায় দিল ঠাণ্ডা বাসি ভাত, তাও আবার পান্তা! আর দিনভোর যা ধকল গেল আমার ওপর দিয়ে! যা খাটনিটা খাটলাম আজ—আমার জীবনে এমন খাটিনি! ভেবেছিলাম খাটিয়ায় শুয়ে আরাম করব, আঙুর বেদনা খাব। বৌ এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে, কত আহা উহু করবে, কেমন সেবা-শুশ্রূষা পাব, তা না, উল্টে হাড়ভাঙা খাটুনি তার ওপর এই লাঙলের ঠেলা! আরেক দিন এমন ঠেলা সইতে হলে আমি তো আমি, আমার বাবা নিউমোনিয়াও পালাবার পথ পাবে না! দূর দূর! এসব চাষাভূষোর বাড়ি আবার মরতে যায় কেউ!'

'যা বলেছো! বেঁচে ফিরেছো যে এই তোমার বাপের ভাগ্যি!' সায় দিল মাকড়সা তার কথায়।—'তোমার ঠাকুর্দা টাইফয়েডের পুণ্যির জোরে বেঁচে গেছ এযাত্রা।'

'তা, তুমি রাজবাড়ির থেকে চলে এলে যে! তোমার খবর কি?' প্রশ্ন করল মাকড়সাকে জ্বর।

'রাজবাড়িতেও অষ্টরম্ভা!' বলল মাকড়সা: 'শুনেছিলাম রাজা আঁটকুড়ো, ছেলেটেলে নেই তার, সুখে থাকব সেখানে, কিন্তু হা কপাল। ছেলে না থাকলেও তার পিলে বিস্তর!

আট গণ্ডা চাকর। সব সময় ঘরদোর ঝেড়ে-পুঁছে তকতকে রাখছে—ঝাড়া মোছা করাই তাদের কাজ সারাদিন। আমি যে কোথাও একটু জিরোব, ধীরে-সুস্থে জাল পাতব আমার, তার জো নেই। আর জাল পাতলে পোকামাকড় মাছিটাছি কীটপতঙ্গ তার ফাঁদে এসে পা দেবে, আর আমি তাদের মেরে ধরে তারিয়ে তারিয়ে খাব অনেকদিন ধরে, সে সুযোগই জুটলো না আমার কপালে! একটুখানি নিজের জাল ছড়িয়েছি অমনি একটানা একটা চাকর

'রাজা আরাম করে বিছানায় শুয়ে সময় কাটান।'—পৃঃ ৪২

ঝাড়ন হাতে হাজির—বলে যে, এর মধ্যেই ঝুল হয়েছে এখানে! ঝাড়ো ঝাড়ো! এমন করে ঝাড়লে ভূত-বেহ্মদত্যি পালিয়ে যায়, আমি তো কোন্ ছার! রাজবাড়িতে থাকা আমার পোষালো না ভাই, বেরিয়ে এলাম তাই।'

'তা বেশ করেছো ভায়া! এবার এসো, আমরা বাসা বদল করে বসি। তুমি চাষার আস্তানায় যাও আর আমি রাজবাড়িতে সেঁধোই।'

জ্বর গিয়ে রাজদেহ আশ্রয় করল তারপর। রাজাও অমনি নিজের নরম পালঙ্কে গিয়ে শুয়ে পড়লেন ধপ করে।

রাণী এসে রাজার শিয়রে বসলেন তক্ষুনি, হাত বুলোতে লাগলেন রাজ-কপালে। রাজা আরামে চোখ বুজে বললেন—আহা! পরিচারিকারা এসে রাজার পা টিপতে লাগল।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় আঙুর বেদানার রস আসতে লাগল গেলাস গেলাস। জ্বর বললো—আহা! রাজসেবা বুঝি একেই বলে থাকে। এমন খাবার, এত আরাম আমার জীবনে পাইনি। কী পুণ্যি করেছিলাম, এহেন রাজভোগ ছিল আমার বরাতে!

ডাক্তার এসে রাজাকে দেখে মিষ্টি মিষ্টি ওষুধের ব্যবস্থা করে গেলেন তাঁর জন্য। রাজা খেয়ে বললেন, 'বাঃ! খাসা ওষুধ!'

দিন যায়, রাজার অসুখ আর সারে না।

রাজা আরাম করে বিছানায় শুয়ে সময় কাটান। আঙুরের সরবৎ আর সরবতি ওষুধ খান, আর জ্বর রাজ-অঙ্গে ভর করে আরাম পায়।

মন্ত্রী একদিন ডাক্তারকে আড়ালে ডেকে বললেন—'ডাক্তার বাবু, কুইনিন দিন না ঠেসে। কুইনিন না খেলে কি জ্বর সারে নাকি?'

'বলেন কি মন্ত্রী মশাই! রাজা মশাইকে কি তেতো ওষুধ দিতে পারি কখনো? রাজা কি সেটা বরদাস্ত করবেন? হয়ত বা উলটে তিক্ত হবেন আমার ওপর'...

'তাহলে কাজ নেই দিয়ে।' ব্যস্ত হয়ে বললেন মন্ত্রী: 'তেতো-বিরক্ত হয়ে হয়ত আমাদের সবাইকেই বরখাস্ত করে দিতে পারেন তখন।' ব'লে অন্য উপদেশ দেন তিনি—'কুইনিন না খাইয়ে ইন্‌জেকসানও তো দিতে পারেন তাঁকে। তাতেও তো বেশ কাজ হয় বলে শুনেছি। বেশিই কাজ হয় বরং।' শুনেই না আঁতকে উঠেছেন ডাক্তার—'রাজ-অঙ্গ বিঁধতে যাব, আরে বাপ! আমার ঘাড়ে কটা মাথা! না, মন্ত্রী মশাই ও কম্মো আমার দ্বারা হবে না। রাজাকে আমি সূচিভেদ্য বলে মনে করিনে। না মন্ত্রী মশাই, আপনি মাপ করবেন আমায়—সেটি আমি পারব না।'

মন্ত্রী মশাই বুঝলেন যে ডাক্তার রাজাকে সারাতে চান না, অসুখটা জিইয়ে রেখে নিজের ভিজিটের অঙ্কই বাড়াতে চান। জ্বরও সেটা বুঝতে পারল বেশ, বুঝলো যে, তার কোনো ডর নেই আর, রাজাকেও সারতে হবে না, তাকেও আর সরতে হবে না এখান থেকে। রাজভোগ চালিয়ে যাবে হরদম।

রাণী বলেছিলেন—'ওষুধে যখন ফল হচ্ছে না, তখন হাওয়া বদল করলে হয় না ডাক্তারবাবু?' এই সুযোগে দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে দেখার ইচ্ছে বুঝি জেগেছিল রাণীর।

ডাক্তার জবাব দিলেন—'সেটা বরং মন্দ নয়। তা বিকেল বেলা ফীটন চেপে একটুখানি ময়দানের হাওয়া খান না, ক্ষতি কি!'

বিকেল বেলায় হাওয়া বদলাতে বেরুলেন রাজামশাই। তাঁর গাড়ি চাষীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় জ্বরের নজর পড়ল—আরে, এই তো সেই চাষীটার কুঁড়ে ঘর। তার বন্ধু মাকড়সা এইখানেই তো আড্ডা গেড়েছে। যাই একটু দোস্তের সঙ্গে মুলুকাত করে আসি!'

'মাকড়সা ভাই মাকড়সা ভাই! বাড়ি আছো হে!' হাঁক পাড়লো সে চাষীর দরজায় দাঁড়িয়ে। ভেতরে সেঁধুলো না ভয়ে, ঘর কুঁড়ে হলে কি হবে চাষী মোটেই কুড়ে নয়। তার ভয় পাছে তাকে পাকড়ে নিজের অঙ্গে নিয়ে, সঙ্গে করে আবার তাকে দিয়ে লাঙল ঠেলায়।

আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এলো মাকড়সা—'এই যে বন্ধু! অনেকদিন পরে দেখা! কেমন আছ বলো?'

'খাসা! এমন আরাম জীবনে পাইনি আর। কী সব খানা রে ভাই! ঘণ্টায় ঘণ্টায় আঙুর আর বেদনা! আরো কতো কী! রাণী আমার পা টিপে দেয়···বুঝেছিস?'

'বলো কি হে? রাণী তোমার পা টেপে!'

'রাণী নয় ঠিক, চাকরাণী। তা হোক, সেও তো রাণীই একটা। নয় কি? তবে খোদ রাণী আমার মাথায়, মানে, রাজা মশায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। রাজার আপাদমস্তক জুড়ে তো আমারই আওতা এখন। রাজাও যা আমিও এখন তাই—একই কথা ভাই!'

'তা বটে।' সায় দিলো মাকড়সা।—'তা আমিও নেহাৎ মন্দ নেই এখানে। চারধারে আমার জাল বিস্তার করেছি। ঝাড়-পোঁছের বালাই নেই কোথাও।

'চাষী এসব জঞ্জাল নজরেই আনে না। ছেলেপুলেরও অত্যাচার নেই বাড়িতে। অনেকগুলি ছানাপোনা হয়েছে আমার। তারাও জাল ছড়াচ্ছে। আমার আস্তানার সামনেই আঁস্তাকুড় দিনরাত ভন্ ভন্ করছে মাছি। তার একটা না একটা ছটকে এসে লট্‌কে পড়ছে আমাদের জালে দেখতে না দেখতেই। খেয়েদেয়ে বেশ সুখে আছি সপরিবারে আমরা।'

জ্বরটা নেমে যাবার পর রাজা সাহেব নিজের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন—'বাঃ! রাণীর পরামর্শ তো বেশ কাজ দিয়েছে। হাওয়া বদলে জ্বরটা সত্যিই ছেড়ে গেল তো! অমার রাণী ডাক্তারের কান কেটে দেয় দেখছি!'

'তা বেশ, তা বেশ।' শুনে খুব খুসী হোলো জ্বর: 'সুখে থাকলেই ভালো। এক যাত্রায় পৃথক ফল হলো না সেটাও সুখের। যাত্রার প্রথমটা আমাদের পৃথক পৃথক ফল হয়েছিল বটে, কপালে ভারী দুর্ভোগ গেছে কিন্তু—এবার আমরা যার যথা স্থান খুঁজে পেয়েছি যথার্থ!'

'তা, তুমি তো রাজা মশাইকে ছেড়ে চলে এলে ! এখানেই আমার সঙ্গে এখন এ বাড়িতেই থাকবে নাকি তাহলে ?' শুধালো মাকড়সা।

'পাগল হয়েছো ! আবার এখানে ! আবার সেই লাঙলের ঠেলা ! সেই পান্তা গেলা ! সেই হাড়ভাঙা খাটুনির গুঁতো ! আবার, আবার ! তাহলে আমাকেই কাবার হয়ে যেতে হবে, আমি আর কাউকে সাবাড় করতে পারব না। আর তা নয় ভাই—আমি এখন আক্ষেপ করছি।'

'কিসের অপেক্ষা ?' কোতূহলী হল মাকড়সা।

'রাজা মশায়ের। তিনি এই পথেই ফীটন চেপে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। এই পথেই ফিরবেন ফের। বাড়িটার সামনে গাড়িটা এলেই আমি টুপ করে আবার তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ব। ভাবছ কেন ?'

পথ বার করো
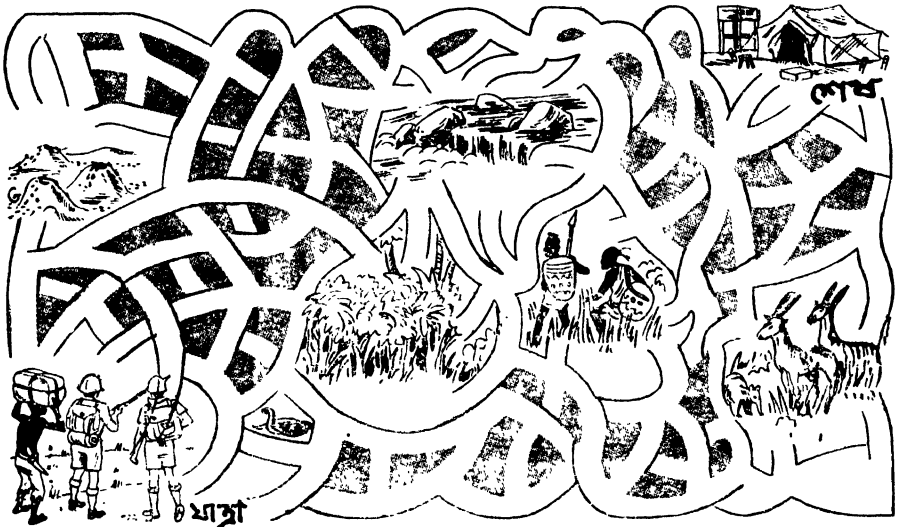
দু'জন স্কাউট আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে তাদের পথ হারিয়ে ফেলেছে। এখন তারা কোন পথ দিয়ে গেলে, 'যাত্রা' থেকে 'শেষ' পর্যন্ত তাদের ক্যাম্পে গিয়ে পৌছবে, তা কি তোমরা বার করতে পার ?

উট নয়—ভেড়া নয়—লামা

শ্রীঅমরনাথ রায়

খানিকটা উটের মতন কিন্তু উট নয়।

খানিকটা ভেড়ার মতন কিন্তু ভেড়া নয়।

উট ও ভেড়ার আদলে গড়া প্রাণী হচ্ছে 'লামা'।

বাস দক্ষিণ আমেরিকার 'অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালা'।

লামা

মরুভূমিতে আরবরা যেমন উটের ওপর নির্ভরশীল, ল্যাপ-ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা যেমন বল্গা হরিণের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়ীরা লামার ওপর নির্ভরশীল। লামা তাদের মাংস যোগায়, পশম যোগায়, দুধ যোগায়, ঘুঁটে যোগায়, আর যোগায় চামড়া। খাড়া পাহাড়ে লামা তাদের বয়ে নিয়ে যায়। 'মরুভূমির জাহাজ' যেমন উট, তেমনি 'অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালার জাহাজ' হচ্ছে এই লামা।

এক-একটি লামা সাধারণতঃ তিন থেকে চার ফুট উঁচু হয়। এদের পাগুলি বেশ লম্বা এবং লেজটি হয় ছোট। সারা গা সাদা বা অল্প বাদামী রঙের পুরু লোমে ঢাকা থাকে। দেহের তুলনায় মাথাটি ছোট, কিন্তু গলা বেশ লম্বা হয়। লামার ঝোলানো ভ্রূর নীচে ডাগর ডাগর চোখ দুটি বড় সুন্দর দেখায়। আর লম্বা কান দুটির আগা বাইরের দিকে বেঁকানো থাকে। ঐ কান দুলিয়েই ওরা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে।

পাহাড়ীরা লামা পোষে। তাদের দিয়ে ভার বয়ায়। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে পিঠে বোঝা নিয়ে লামার দল হেঁটে চলে। তিন চারদিন জলপান না করেও ভার বয়ে নিয়ে যেতে পারে ওরা। হাঁটার গতি অবশ্য বেশী নয়। সারা দিনে বড় জোর দশ কি পনেরো মাইল!

বড় গোঁয়ারগোবিন্দ প্রাণী এই লামা। যা করতে চাইবে না, জোর ক'রে তা তাকে দিয়ে করানো যাবে না। পাহাড়ীরা তা জানে। তাই তারা ভালো কথায় ভুলিয়ে, আদর ক'রে ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে। মারধোর করলেই বেঁকে বসে লামারা।
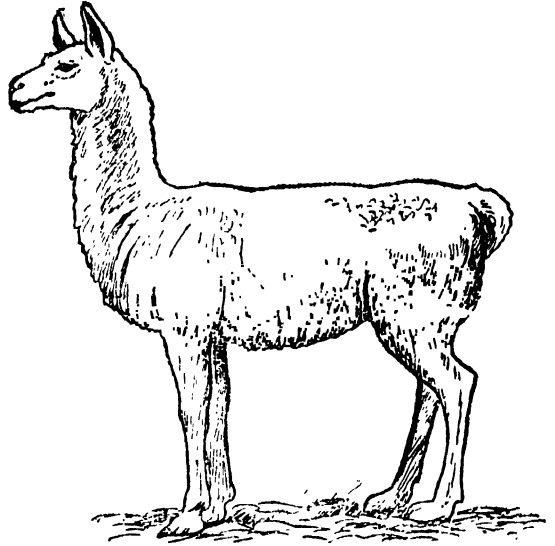
ভার বয় পুরুষ লামারা। দুধ আর পশম যোগায় স্ত্রী লামারা। ওদের পশম দিয়ে বোনা এক রকম গরম জামা তৈরি করে পাহাড়ীরা। সেই গরম জামার নাম 'পঞ্চ'। 'পঞ্চ' একটি গরম চাদর—মাঝখানে তার একটি বড় ফুটো। ঐ ফুটো দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলেই 'পঞ্চ' পরা হয়।

লামারা তৃণভোজী প্রাণী। অহিংসা এদের পরম ধর্ম। শত্রুকে পর্যন্ত এরা কামড়ায় না বা লাথি মারে না। আক্রান্ত হলে অথবা বিরক্ত হলে ওরা শুধু শত্রুর দিকে থুতু ছিটিয়ে দেয়। সেই থুতুর সঙ্গে অর্ধেক হজম হওয়া খাদ্যও থাকে। তাতে বড় দুর্গন্ধ। সেই দুর্গন্ধের ভয়েই লামাদের চট্ ক'রে কেউ চটাতে সাহস করে না।

অভিযান

শ্রীসুশীল রায়

রাখ্ এ-চড়ুইভাতি,
মিথ্যা এ-ঘোরা খানাখন্দে।
চল্, অভিযানে যাই,
অভিযানে যাই চল্ চন্দ্রে।
চাঁদ এতকাল ছিল
ধরা-বাঁধা শুধুই তো পদ্যে,
ঝাঁপ দিয়ে পড়া যাবে
সেইখানে জ্যোৎস্নার মধ্যে।
চল্ চল্, চাঁদে যাই—
কখনোই এ-দুঃশাহস না,
দেখে নেব জমা থাকে
কোন্‌খানে কতখানি জ্যোৎস্না।
আমরা হারব কেন,
হবে হবে নির্ঘাৎ জিত্‌তে,
'আয় চাঁদ, আয় চাঁদ'
ব'লে ডাকাডাকি কেন মিথ্যে!
সাগরের কত ঢেউ
পাহাড়ের মত যারা উচ্চ
কত অভিযাত্রীর
অভিযানে হল সব তুচ্ছ।

আমরা হয়তো ছোট
কিছুতেই নই তবু ক্ষুদ্র,
পাড়ি দিতে পারব না
আকাশের শূন্য সমুদ্র ?
ওই-যে আকাশ নীল
মিটিমিটি তারা ওই জ্বলছে
ওরা বুঝি আমাদের
ওদের পাড়ায় যেতে বলছে।
দল বেঁধে যাই যদি
তবে বেশ মজা হয় সত্যি,
কোনো ভয়-ভাবনার
ধারব না ধার একরত্তি।
আকাশের ঘনঘটা
কিংবা ভীষণ মেঘমন্দ্রে
আমরা তুচ্ছ ক'রে
অভিযানে চলে যাবে চন্দ্রে।
এ কি, চুপ ক'রে কেন,
দিচ্ছিস না যে কোনো উত্তর—
একা চলে যাই তবে,
তোরা পড়ে থাক্ পিছে—দুত্তোর!

ডবল-তালা

শ্রীশান্তিকুমার মিত্র

দরজায় ডবল তালা। দেখেই বুবু কেঁদে ফেলে। তোলা বয়সে বছর দুই বড়। আশ্বাস দেবার চেষ্টা করে, আহা! কাঁদছিস কেন? মাসী হয়তো ও-বাড়ী কিংবা কাছে-পিঠে কোথাও গিয়েছে। বুবু ঘাড় নাড়ে—না, মা কোথাও যাবে না। এই তো একটু আগে সে মাকে ফোন করেছিল। তোলাকে এবার একটু ভাবিত দেখায়, তা'হলে?

বুবু তালা দুটো নেড়েচেড়ে দেখতে যাচ্ছিল বুঝি। তোলা ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গিয়ে বাধা দেয়, করিস্ কী, করিস্ কী! বুবু হকচকিয়ে যায়। তোলা মৃদু ভারিক্কী স্বরে বলে, তালায় হাত দিবি না। খবরদার। ঐ তো একটা মস্ত বড় 'ক্লু'।

বুবুর কান্না থেমে গিয়েছে। ও অবাক হয়ে তোলার মুখের দিকে তাকায়। তোলা কী ইঙ্গিত করছে? বুবুর কেমন যেন ভয় ভয় করে।

তোলার তখন বুবুর দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই। আপন মনে কী বিড়বিড় করে। ঘাড় নাড়ে। হঠাৎ বুবুকে কাছে টেনে নেয়, ফিসফিস করে বলে, তুই ঠিক বলছিস্, মাসী বাইরে যেতে পারে না? বুবু সায় দেয়।

'দাঁড়া, একেবারে গোড়া থেকে সুরু করি।' তোলা ক্রমশঃ রহস্য হয়ে পড়ে। বুবু তখন ওকেই দেখতে থাকে।

তেতলা ফ্ল্যাট বাড়ী। সামনে এক চিল্‌তে উঠোনের মত রাস্তা। রাস্তার উপরেই মুচিরা বসে কাজ করে। এই ভর-দুপুরে অবশ্য ওরা কেউ নেই। একটু ডান দিক ঘেঁষে ওদের ছোট ছোট খুপরি। তোলা ভেবে নেয়, দেখাই যাক ওদের জিজ্ঞেস করে। কেউ কিছু দেখে থাকতে তো পারে।

সবাই চেনা। নিবারণ মুচি ঘাড় নাড়ে, না ছোটবাবু সে ছিল না, কিছু জানে না। যুগল মুচির ছেলে বলে, একটা লোক অনেকক্ষণ ধরে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। তখন তালা বন্ধ ছিল কিনা খেয়াল নেই।

তোলা তারই সমবয়সী ক্ষেপাকে জেরা করে, 'তুই আজ ওখানে খেলিস্ নি?'

'খেলেছি।' ক্ষেপা ঘাড় নাড়ে।

'মাসীকে বেরুতে দেখেছিস্?'

'হাঁ, হাঁ, যেন দেখনু তো।'

'কোন্ দিকে গেল?'

'বেইরে গিয়ে আবার ফির‍্যা এ্যাল।'

'দূর, বেরিয়ে গিয়ে আবার তখুনি ফিরবে কেন ?'

'থালে ? একজন মেয়েলোককে তো দ্যাখলাম।'

'তালা দেওয়া দেখেছিস ?'

'হঁা, দ্যাখলাম।'

'ক'টা তালা ?'

'তা একটা-দুটো হবে।'

'দূর', তোলা কোন কিনারা পায় না। ওখান থেকে সরে আসে। বুবুও সেই সঙ্গে।

তোলা এবার যেদিক থেকে যতটা পারা যায়, বাড়ীটা পর্যবেক্ষণ করে। বেলা ২টা। স্বভাবতঃই এ সময়টা গলিটা নিঃঝুম থাকে। হঠাৎ স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় ওরা ফিরেছে। তারপরেই এই বিপত্তি। বুবুর আবার কান্না পায়। তোলা তখন রাস্তার পশ্চিম দিক থেকে ওকে চাপা স্বরে ডাকছে, এই বুবু ? বুবু ছুটে এগিয়ে যায়। তোলা আঙ্গুল তুলে দেখায়, ওই দেখ জানালা বন্ধ। রাস্তার ঠিক এখানটা থেকে ওদের তেতলার শোবার ঘরের দুটো জানলাই দেখা যায়। সাধারণতঃ ঘরে কেউ থাকলে একটা না একটা জানলা খোলা থাকেই। অর্থাৎ তোলা আপন মনে বলে, হয় ঘরে কেউ নেই, আর না হয় তো—। নাঃ, এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তোলা মাথা চুলকোয়। কিন্তু দুটো তালা কেন ? মাসী বাইরে গেলে তো একটা তালা দেয় !

সহসা মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। বুবুকে ডাকে, আয়। এই, তোর কাছে টিফিনের পয়সা নেই ? বুবু কুড়িটা পয়সা বার করে। ঠিক আছে। আমার কাছে দশ পয়সা আছে। তোলা বুবুকে একরকম তাড়িয়ে নিয়ে চলে। সদর রাস্তাটা পেরিয়েই একটা ডাক্তারখানা। ডাক্তার নেই। কম্পাউণ্ডারবাবু বসে বসে ঝিমুচ্ছেন। ওরা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। তোলা চটপট মিনতি জানায়, একটা ফোন করবো, এই পয়সা নিন। ত্রিশটা পয়সা সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে রাখে। ঝিমুনিটা কেটে যাওয়ায় কম্পাউণ্ডারবাবু প্রথমে একটু চটে যান, পরমুহূর্তেই দুটি কিশোরের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া বোধ করেন। সংক্ষেপে সম্মতি দেন, আচ্ছা করো।

তোলা ডায়াল ঘুরিয়ে বাড়ীর ফোন নম্বর ডাকে। রিং বেজেই চলে। কারুর ধরার লক্ষণ নেই। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ। ছেড়ে দিয়ে আবার ডাকে। একই ব্যাপার। হতাশ হয়ে ফোন রেখে ফিরে চলে। কম্পাউণ্ডারবাবু হঠাৎ পিছু ডাকেন, ওঃ খোকা ! ফোন তো পেলে না ? পয়সা নিয়ে যাও। এবার তোলার অবাক হবার পালা। ফোন তো করেছ, তবে ? না, ওসব পরে ভাবা যাবে। এগিয়ে গিয়ে পয়সা ফেরত নেয়।

আবার সেই বাড়ীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি। তোলাকে ক্রমশঃ গম্ভীর হতে দেখে বুবু

বলে উঠে, তোলা'দা, ফোনটা হয় তো নীচের ঘরে রয়েছে, তাই—। তোলার মুখচোখ আরো বেশী গম্ভীর দেখায়, হুঁ, তাই ভাবছি। তোলা ভাঙ্গে না, কিন্তু মনে মনে ঠিকই হিসেব ক'ষে চলে, তা অনেকক্ষণ ধরেই তো বাজিয়েছি, মাসী উপর থেকে শুনতে পেয়ে কি আর নেমে আসতো না? তা ছাড়া, বুবুই তো বলেছে কিছুক্ষণ আগে সে মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা কয়েছে। তারপর আর টেলিফোন নীচে যাবে কেন? তোলা কোন দিশা পায় না। আর ভাবতে পারছে না। সামনের রোয়াকটায় বসে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। বুবু যত ভয় পাচ্ছে, তত ছায়ার মত তোলার সঙ্গে লেগে থাকছে। তোলা নিজের মনের ভেতর আঁতিপাঁতি হাতড়াতে থাকে। না, এত সহজেই হার মানতে সে রাজী নয়।

উঠে পড়ে তালার স্পর্শ বাঁচিয়ে, দরজা দুটোর ফাঁকে মুখ লাগিয়ে চীৎকার করে ডাকে, মাসী! মাসী গো—। বুবু কী বোঝে, ও গিয়েও ডাকতে শুরু করে, মা—মা—

না, কোন সাড়াশব্দ নেই। তোলা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠে। আজকাল ফ্লাটে প্রায়ই খুন হওয়ার খবর শোনা যায়। খুন করে তালা দিয়ে—। তোলা ভয় পায়। তবু ডিটেকটিভকে ভয় পেলে চলে কি? তোলা ছুটে যায় বাড়ীর লাগোয়া নর্দমাটার দিকে। উপর থেকে ময়লা জল ওখানে এসে পড়ছে। হুমড়ি খেয়ে বিড়াল-দৃষ্টি নিয়ে নর্দমায় কী দেখতে আরম্ভ করে। বুবুও এসে পাশে উবু হয়ে বসে। না, রক্তটক্ত কিছু দেখা যাচ্ছে না। তোলা একটু আশ্বস্ত হয় যেন। তখনই মনে পড়ে, তবে বিষটিস খাইয়ে মারলে তো আর রক্ত গড়াবে না! বুবুর দিকে তোলা কেমন একদৃষ্টিতে তাকায়, বিড় বিড় করে, অচৈতন্য করে ফেলে যায় যদি! বুবু বোঝে কি বোঝে না, হাপুস নয়নে কেঁদে ফেলে। ইস্, কাঁদিস নি, এখনো বাকী আছে। দাঁড়া। অচৈতন্য হয়ে থাকলে এখনো উদ্ধার করলে বেঁচে যাবে। তোলা সান্ত্বনা দিতে-দিতেই লাগোয়া পাশের ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে। একই রকমের ফ্ল্যাট এটা। আসলে একটা বাড়ীরই দু'ভাগ। তরতর করে ছাদে উঠে যায়। বুবু তাকে নীরবে অনুসরণ করে। তারপর সুরু হয় রীতিমত দুঃসাহসিক অভিযান। তোলা হেঁচড়ে হেঁচড়ে এ বাড়ীর জলের ট্যাঙ্কের উপর ওঠে। বুবুকেও টেনে তোলে। সেখান থেকে পার্টিশনের পাঁচিলে ওঠা যায়। তাই ওঠে। উঠেই ভয় পেয়ে যায়। এই তিনতলা থেকে একেবারে নীচের উঠোনে পড়লে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবে। না, ভয় পেলে চলবে না। তাদের বাড়ীর দিকে পার্টিশনের দেওয়ালে দুটো লোহার শিক পোঁতা। তাতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে এদিকে ফিরে ট্যাঙ্ক থেকে বুবুকে হেঁচকে টানে। বুবু সবেগে এসে তাদের বারন্দায় পড়ে গিয়েই কেঁদে ফেলে। বেশ লেগেছে। তোলা লাফিয়ে নেমেই কলতলা থেকে জল নিয়ে এসে বুবুর হাঁটুতে দেয়। জোরে জোরে হাঁটু ডলে দিতে থাকে। বুবু ততক্ষণ তাদের

অভিযানের গুরুত্বটা হয় তো বুঝেছে। চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়, হাঁটুটা একটু ব্যথা ব্যথা করছে। তা করুক। তোলার দিকে তাকিয়ে বলে, ঠিক আছে। তোলা একটু বুঝি হাসে। তারপরই ঘরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। পাশাপাশি দুটো ঘরেই তালা ঝুলছে। তোলা শোবার ঘরের দরজা ফাঁক করে কান পাতে। কিছুক্ষণ থেকে কান সরিয়ে নেয়। মাথাটা ঝামটে আবার দরজার ফাঁকে কান রাখে। বুবুর হাঁটুতে ব্যথা ক্রমশঃ বাড়ছে। যন্ত্রণা চাপতে চাপতে তোলার মুখের দিকে উৎকর্ণ হয়ে তাকায়। তোলার মুখের রং বদলাচ্ছে। ফিস্‌ফিস্ করে তোলা ডাকে, বুবু, শোন, নিঃশ্বাসের আওয়াজ হচ্ছে। তাহলে জ্ঞান ফিরছে। বুবু হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করে। একবার, দু'বার, তিনবার। ঘাড় নাড়ে, তোলা'দা, শুনতে পাচ্ছি না তো। তোলা গম্ভীরভাবে বলে, ভালো করে শোন, একটা আওয়াজ উঠছে না? খুব চাপা, চাপা?

ওদিকে, ছেলেরা ফিরছে না দেখে স্কুলে টেলিফোন করবেন বলে মা উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এসেছেন ওবাড়ী থেকে। চাবি খুলে তেতলায় উঠে তোলা-বুবুকে ঐ অবস্থায় দেখে তো অবাক! চেঁচিয়ে ওঠেন, ও কি রে?

বুবু পায়ের ব্যথা নিয়েই লাফিয়ে উঠে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে ফেলে। তোলা বলে ওঠে, মাসী, দোতলার ঘরে আটক ছিলে? অজ্ঞান করে রেখে গিয়েছিল? তোমার চোখমুখ ফোলাফোলা। ইস্, বসে পড়ো। বেরিও না। আমি পুলিশ ডাকি। তালাতে আঙুলের ছাপ দেখে ঠিক ওদের ধরা যাবে।

মাসী ধমকে ওঠেন, কী বলছিস্ যা-তা? কাদের ধরবি?

আহা, শোনই না! তোলা ভরসা দেয়।

মাসী রাগ করেন, যত সব ডেঁপোমি। কী কাণ্ড করেছিস্ বল্ তো! এখানে চাবি বন্ধ দেখলি তো ও-বাড়ী গেলি না কেন? মা বক্‌তে শুরু করেন, কী করে ঢুকলি? অ্যাঁ, যদি পড়ে যেতিস্?

ততক্ষণ বল্টুমামাও উঠে এসেছে। সব শুনে তোলার কান ধরে টেনে বলে, বাঁদর! যত আজগুবি গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে মাথায় রহস্য ঘুরছে। চল্, ঘোরাচ্ছি!

তোলা কাঁদে না। ভাবে, কিন্তু মাসী যদি ও-বাড়ীই গেল, দুটো তালা দিল কেন? কান মোলা ও বকুনি খেয়েও তোলা এ-রহস্যটা মন থেকে তাড়াতে পারে না।

অবশ্য সেদিনই বিকেলে ব্যাপারটা খোলসা হলো। ও-বাড়ীর দীনু পালিয়েছে। আগের দিন মাসী তাকে দরজার চাবি দিয়ে এ-বাড়ী থেকে কী একটা জিনিস নিয়ে যেতে বলেছিল। মাসী

তখন ও-বাড়ীতে। জিনিসটা পেয়েছিল, তবে চাবিটা আর ফেরত নেওয়া হয়নি। আর রাত থেকেই দীনু নিখোঁজ। সেজন্যই এই দ্বিতীর তালার সতর্কতা।

তোলার মাসী অর্থাৎ. বুবুর মা 'তোলা-বুবুকে ঐ অবস্থায় দেখে তো অবাক্! চেঁচিয়ে ওঠেন, ও কি রে!'—পৃঃ ৫০

তোলার মনে একটা খট্‌কা কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়, তা একটা তালা, নতুন তালাটাই তো যথেষ্ট ছিল।

তোলাকে এ কথাটা কেউ আর বুঝিয়েও দেয় না যে, দুটো তালার ব্যাপারটা নিছক অভ্যাসগত। যে তালাটার জন্য সতর্কতা, সেটা না লাগালে সত্যিই কিছু ক্ষতি হতো না।
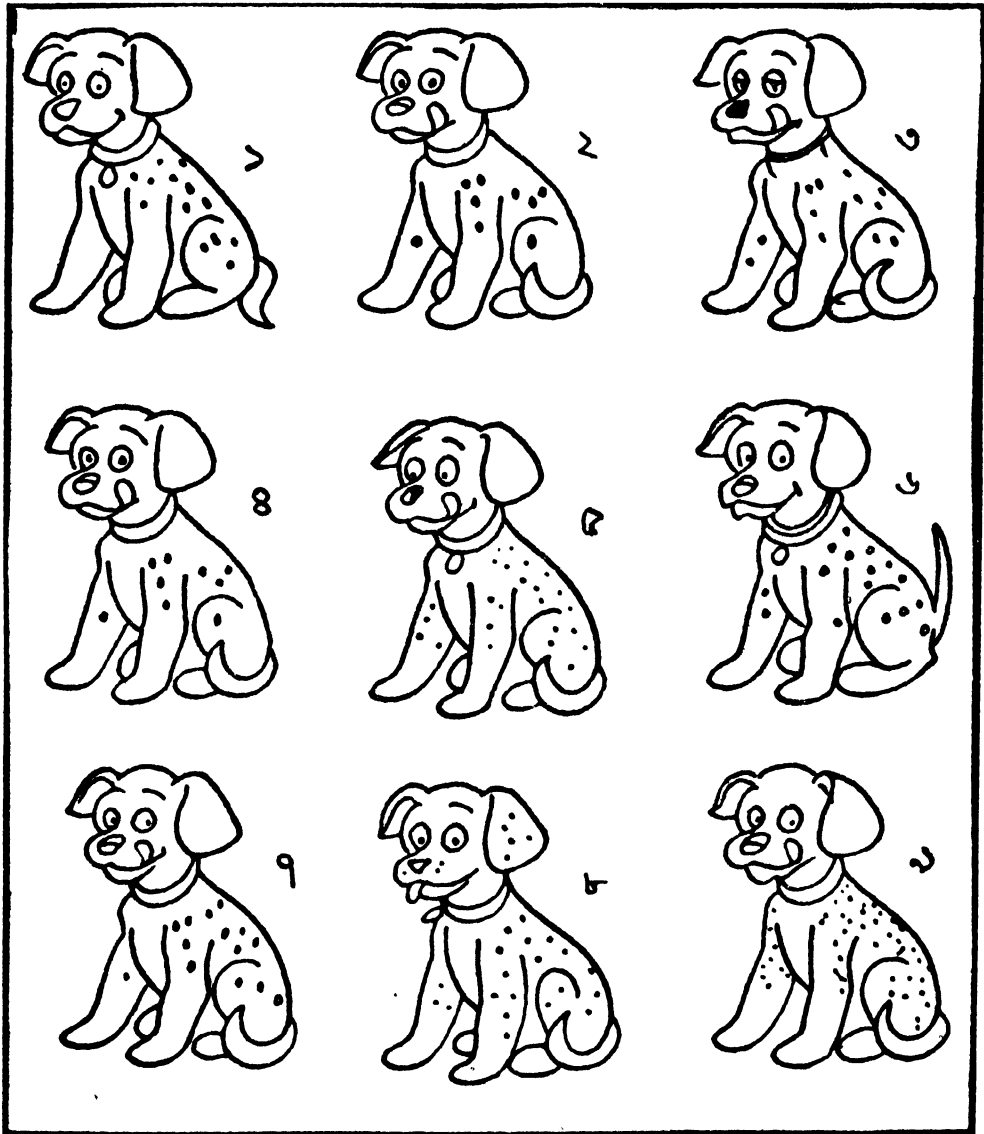
কোন্ দুটি এক রকম

ছবিতে ন'টি বাচ্চা কুকুর দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আপাতদৃষ্টিতে ন'টি একই রকম দেখতে হলেও, সত্যি করে ন'টি

তরঙ্গ তরণী দুই তরুণ

*

শ্রীরাণা বসু

আন্দামানের তীরবর্তী অঞ্চলে পিনাকী ও ডিউক।

জয় হল। শেষ পর্যন্ত দুস্তর দুর্জয় সমুদ্র দুই অসীম সাহসী ভারতীয় তরুণের কণ্ঠে পরিয়ে দিল জয়ের মালা।

সমুদ্র-জয়ী হয়েছেন সমস্ত ভারতবাসীর গর্বের দুই সন্তান, পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও জর্জ আলবার্ট ডিউক। সহস্র বাধা-বিপত্তি ও মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে এই দুই তরুণ বিপৎসংকুল বঙ্গোপসাগরের এক তীর থেকে আরেক তীর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পৌছেছেন একখানা ছোট নৌকায় অবিশ্রাম দাঁড় টেনে। এ বিজয়-সংবাদ কম আনন্দের নয়। প্রত্যেকটি ভারতীয় এ আনন্দ-সংবাদে গর্বিত।

পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও জর্জ আলবার্ট ডিউক দুই ভারতীয় তরুণের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রযাত্রা সুরু হয়েছিল কলকাতার হুগলী নদীর বুক থেকে। দুরন্ত বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে প্রায় সাড়ে আটশ মাইল পথ শুধুমাত্র দাঁড় টেনে এঁদের তরণী স্পর্শ করে দ্বীপপুঞ্জের মাটি। এই নৌ-অভিযানের উদ্যোক্তা ছিলেন এক্সপ্লোরারস ক্লাব অব ইণ্ডিয়া।

পিনাকী ও ডিউক যে ছোট্ট তরী নিয়ে সাগর-পথে সুদূর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তার নাম 'কানোজি আংরে'। অপরাজেয় বীর কানোজি আংরের নামানুসারে এই তরণীর নামকরণ করা হয়।

মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজীর দুর্ধর্ষ নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন টুকোজি আংরে। টুকোজি আংরের পুত্রের নাম ছিল কানোজি আংরে। সাহসী বীর পিতার মৃত্যুর পর কানোজি

ঘোড়ার পিঠে পিনাকী (মধ্যে) ডাইনে বোন শুক্লা ও বাঁয়ে ভৃত্যের কোলে পিনাকীর ছোট ভাই পার্থ।

অভিযানের আগে ডিউক পিনাকীর বাড়ি বহুবার আসেন। সাগরে তরী ভাসাবার আগে দুই অভিযাত্রী বঙ্গোপসাগরে বেশ কিছুদিন অনুশীলন করেন। তাঁরা দু'জনে নেভিগেশন, ওয়ারলেস সেট ব্যবহার, নৌকো মেরামত, প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদি শিক্ষা ও বিশেষ ধরনের খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করেন। অভিযানকালে বাতাস ও ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অভিযাত্রীদ্বয় উইণ্ডপ্রুফ সার্ট, জ্যাকেট ও স্লিপিং ব্যাগ ব্যবহার করেছিলেন। নৌকার গতিপথ ঠিক রাখার জন্যে তাঁরা মেকানিক্যাল ও অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল নেভিগেশন বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করেন।

১ ফেব্রুআরি ১৯৬৯ ছোট্ট নৌকো কানোজি আংরে দুই অভিযাত্রী পিনাকী ও ডিউককে বহন করে কলকাতার আউটরাম ঘাটের অনতিদূরে ম্যান-ও-ওয়ার জেটি থেকে আন্দামানের পথে জলযাত্রা শুরু করে। অভিযানের প্রাক্কালে ভারত সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন দুই তরুণের মাথায় হাত রেখে নিরাপদ জয়যাত্রা কামনা করে নৌকো খুলে দেন এবং এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরকে পিস্তল ছুড়ে যাত্রা শুরুর নির্দেশ ঘোষণা করেন।

১ থেকে ৬ ফেব্রুআরি পর্যন্ত অভিযাত্রীদ্বয়ের দিনগুলো ভালোই কাটে। ৭ই ফেব্রুআরি থেকে পিনাকী-ডিউকের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। সারা দেশের মানুষ তাঁদের

নিরাপদ সংবাদের আশায় উৎকণ্ঠায় কাল কাটাতে থাকেন। বিমানে অনুসন্ধান চালানোর পর ১৪ ফেব্রুআরি বেলা দুটোর সময় ফেয়ার চাইল্ড প্যাকেজ বিমানের পাইলট এবং নেভিগেটর অভিযাত্রীসহ কানোজি আংরেকে দেখতে পান। অভিযাত্রীদ্বয় ও অনুসন্ধানকারী বিমানের দুই আরোহী পরস্পরকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান। এই খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

অভিযাত্রীদ্বয় দিনে দু'ঘণ্টা করে দাঁড় টেনে প্রতিদিন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল অগ্রসর হতেন, কিন্তু রাত্তিরে স্রোতের টানে কুড়ি থেকে পঁচিশ মাইল পিছিয়ে আসতেন। এর ফলে প্রথম দিকে অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ তাঁদের অভিযান সম্পূর্ণ করতে পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট দিন সময় লাগবে বলে এক্সপ্লোরারস ক্লাবের কর্তৃপক্ষ ধরে ছিলেন। এজন্যে ষাট দিনের খাদ্য ও পানীয় জল তাঁদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু এত মন্থরগতিতে চললে তাঁদের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে চিন্তা করে এক্সপ্লোরারস ক্লাবের কর্তৃপক্ষ হাল ধরার জন্যে একজনকে মনোনীত করেন এবং তাঁকে কানোজি আংরেতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা যায় কানোজি আংরে উত্তর-পূর্ব স্রোতের টানে বেশ ভালোভাবেই অগ্রসর হচ্ছে, সুতরাং মনোনীত ব্যক্তিকে পাঠাবার আর দরকার হয় না।

উপস্থিত হয় সেই পরম শুভদিন ৫ মার্চ ১৯৬৯। এই দিন বিকেলে অভিযাত্রীদ্বয় আন্দামানের ল্যাণ্ডফল দ্বীপে উপস্থিত হন এবং ভারতের জাতীয় পতাকা ও এক্সপ্লোরারস ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন। হাজারো আন্দামানবাসী তাঁদের সংবর্ধনা জানান। সন্ধ্যায় এ খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয় আনন্দ ও গর্বে ভরে ওঠে। মনে পড়ছে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেরই এক অংশে ব্রিটিশ চীফ কমিশনার্সের বাসভবনে ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে ছিলের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে আবার দুই ভারতীয় সাহসী তরুণ সেই দ্বীপেই ওড়ালেন তারুণ্যশক্তির বিজয় কেতন সাগরের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে।

একদিন পূর্ণ বিশ্রামের পর অভিযাত্রীদ্বয় একশ কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত পোর্ট ব্লেয়ার অভিমুখে আবার যাত্রা শুরু করেন। ৮ মার্চ ১৯৬৯ পিনাকী ও ডিউকের তরণী পোর্ট ব্লেয়ারের জাহাজ ঘাটে পৌঁছলে বন্দেমাতরম ও দুই দুঃসাহসী তরুণ অভিযাত্রীর জয়ধ্বনিতে পোর্ট ব্লেয়ার মুখর হয়ে ওঠে। ছত্রিশ দিন আগে কলকাতার আউটরাম ঘাটের অনতিদূরে ম্যান-ও-ওয়ার জেটি থেকে তাঁরা যে জলযাত্রা শুরু করেছিলেন তা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে। পোর্ট ব্লেয়ারবাসীর হৃদয়ের অভিনন্দন গ্রহণের পর, পিনাকী ও ডিউক উড়োজাহাজে আন্দামান থেকে দমদমে ফিরে আসেন ১১ মার্চ ১৯৬৯।

পূর্ববর্তী অন্যান্য নৌকোযোগে সমুদ্র অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনীর মধ্যে ডিউক-পিনাকীর কাহিনী খুবই নগণ্য। তবু সদ্য সমাপ্ত সাগর-পাড়ি অভিযানের মধ্যে যে সাহসের দীপ্তি আছে, তারুণ্যের তেজ আছে, জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করার যে মনোবল আছে, তা দেখে বাঙলা তথা ভারতের তরুণ সমাজ মানসিক দিক থেকে আরো বলীয়ান হবে এ আশা আমরা করতে পারি।

বীরের তীর্থ আন্দামান

সত্যবান

"আন্দামান সে দূর কালাপানি পার
ছোট নৌকায় কে যাবে—সাধ্য কার?—"
অভিযাত্রিক সংঘের থেকে
মিহির শুধান যুবজনে ডেকে।
ডিউক পিনাকী ছুটে এলো শুনে ডাক—
দুরভিযানের উৎসাহে দিয়ে হাঁক ॥

ছোট্ট নৌকা, কানোজী আংরে, যার
নাই পাল, নাই মাস্তুল, নাই আর
কোন বা যন্ত্র দিতে দ্রুতগতি;
শুধু দুটি দাঁড় নিয়ে সংগতি
পিনাকী ডিউক ভাসল সে নৌকায়
পার হয়ে যেতে দুর্গম দরিয়ায় ॥

তীরের মানুষ সংশয়ে উৎগ্রীব—
"নৌকা সহায়ে কেমনে ও-দু'টি জীব
চাহিছে সাগর পার হয়ে যেতে?
যেথা উত্তাল তরঙ্গ মেতে
উঠিছে নিত্য মেলে দুরন্ত গ্রাস—
হাঙর কুমীর ঘুরে ফিরে চারি পাশ ॥"

ডিউক পিনাকী নাহি গণে' কোন ভয়
দাঁড় বেয়ে চলে অভিযানে দুর্জয়।
তরঙ্গ সাথে অবিরত যুঝে
পাড়ি দেয় তারা দিশা বুঝে বুঝে—
তারা ভারতের দু'টি সার্থক প্রাণ।
কানোজী আংরে সার্থক-নামা যান ॥

সহসা কি হলো! খবর না আসে আর!
"কোথা গেল তারা?"জিজ্ঞাসা সবাকার।
তীরে রোল ওঠে—"ফিরাও দোঁহারে!
নৌকায় কভু কেহ যেতে পারে
পার হয়ে ওই সাগর ভয়ংকর?
ফিরাও মায়ের বাছাদের নিজঘর ॥"

অভ্র-আঁধার ভেদ ক'রে পুনরায়
সূর্য যেমন উদার আলোকে চায়—
তেমনি সুখের সংবাদ আসে
পিনাকী ডিউক নৌকায় হাসে,
দাঁড় বেয়ে চলে আনন্দে গেয়ে গান—
দূর নয় আর নয় রে আন্দামান ॥

আন্দামান তো নয় সামান্য ঠাঁই—
এই ভারতের বহু বীর গিয়ে তাই
মুখর করেছে ও আন্দামানে
দেশ-জননীর বন্দনা-গানে
দিয়েছে জীবন দেশহিতে বলিদান
ভারত-গর্ব তীর্থ—আন্দামান ॥

ডিউক পিনাকী সে তীর্থে গিয়ে তাই
পরম পুণ্য লভিল রে ভুল নাই।
তাই তো সাগর দিল পথ ক'রে,
বাতাস চামর দুলাল আদারে,
মেঘ ছায়া দিয়ে জুড়াল তাদের ক্লেশ,
অভিনন্দন পাঠাল সকল দেশ ॥

নৌকায় গিয়ে বিমানে ফিরেছে ঘর।
ভেঙে পড়ে দেশ দিতে দোঁহে সমাদর।
বীর দুটি ছেলে বীরত্ব শেষে
আমাদেরি মাঝে পৌঁছেছে এসে
গৌরবে তার তাই সবায়ের বুক।
হলো, উজ্জ্বল হলো মিহিরের মুখ ॥

ধন্য পিনাকী! ধন্য ডিউক! ভাই!
নাই তোমাদের সাহসে তুলনা নাই!
জয়ী হয়ে এই মহা অভিযানে
রাখিলে না শুধু স্বদেশের মানে—
স্থাপিলে জগতে আদর্শ মহীয়ান;
জানালে, "বীরের তীর্থ আন্দামান!"

শিল্পী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

অন্ধকার রাত্রিতে পথ ধরে ওরা চলেছে। মেয়েদের মাথায় ছোট ছোট এক-একটি পুঁটলি, পুরুষের কোলে ছেলে। সাত-আট বছরের ছেলেরা মায়ের আঁচল ধরে হাঁটছে। এক সারি মানুষ, গোড়ার দিকে নজর চলে না, শেষ দিকটা স্পষ্ট। তাদের সবার শেষে রবি।

কাঁধের একটা ঝোলায় জামা-কাপড় আর একখানা গামছা। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের শেষ সম্বল। বাবা-মা নাম রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সরকারী আর্ট ইস্কুলের নামকরা ছাত্র, দু'বার চিত্র-প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেয়েছে। মহীশূর আর্ট গ্যালারিতে তাঁর খানতিনেক ছবিও আছে। সেই নাম, সেই খ্যাতি, সে বোধ হয় ভিন্ন মানুষের। আজকের এই রবি কি সে-ই? রবি নিজেকে ভালভাবে ভেবে নেবার জন্য চেষ্টা করে।

একটা ছোট ছেলে কাঁদছে,—আমি আর চলতে পারছি না, ঘুম পাচ্ছে···

—পাকিস্তান থেকে চলে এলাম, ভাবলাম, নিশ্চিন্ত হলাম, তা এখানেও শান্তি পেলাম না, আমাদের দুর্ভাগ্য—একজনের গলা শোনা গেল।

—এখানকার বাসিন্দারা তো কিছু করেনি, বাইরে থেকে তো গুণ্ডারা এসে এই সব করলে—আরেকজন বললে।

—যেই করুক, আমাদের তো সব গেল!

সত্যি! যেই করুক, যার গেল তার সবই গেল, প্রতিদিনের যা কিছু প্রয়োজন, জীবনের যা কিছু সঞ্চয়। কয়েকটা লোকের গুণ্ডামি কত মানুষের সম্বলকে অগ্নিসাৎ করে দিল। বাঙাল খেদা, বাঙালীকে খেদিয়ে তাড়াতে হবে। একই দেশের মানুষ হলেও ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, সেইজন্য সুস্থভাবে শান্তিতে তাকে থাকতে দেওয়া হবে না। শিল্পী ছবি আঁকে, ফুল, চাঁদ, সৌন্দর্যের, দুর্ভিক্ষের ছবিও কিছু আঁকা হয়েছিল, কিন্তু নিঃস্ব সর্বহারা পথযাত্রীর ছবি তো আঁকা হয়নি। কে আঁকবে? শুধু এই ছবি, একখানার পর একখানা। যেমন মানুষের মিছিল, তেমনি ছবির মিছিল। কিন্তু কোথায় বসে আঁকবে, রাস্তায়? কাগজ তুলি রং? অনেক দাম, সে টাকা কোথায়? দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জুটবে কোত্থেকে? অন্ধকার রাত, অন্ধকার জীবন, শিল্পী রবি সেনের চারিপাশ অন্ধকার।

সব কিছুই যখন পাকিস্তানে গেল, তখনও বাবা আসামের এই পাহাড়ের নেশা ছাড়তে পারলেন না, নাহলে তখনই তো বাংলাদেশে চলে গেলেই হতো। কিন্তু বাবা বোধ হয় এতখানি ভাবতে পারেন নি। একই দেশ একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এ যে অবিশ্বাস্য। কিন্তু ভারতে অনেক অবিশ্বাস্য ব্যাপার সত্যে দেখা যায়।

শিল্পী চলেছে। কতটা পথ এসেছে, কে জানে। কতক্ষণ হাঁটা হলো তাই বা কে বলবে? রাত এখন কটা? ব্রহ্মপুত্র আর কতদূর?

মানুষ সারি দিয়ে চলেছে, কারও কোন সাড়া নেই। একটু আগেও দু'একটা কথা শোনা যাচ্ছিল, এখন একেবারে চুপচাপ। শুধু একটা লম্বা লাইন। ওরা চলছে? সত্যি চলছে? হাঁ, পাশের গাছগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে। তারা সত্যি চলছে, সারা রাত কি এই ভাবে চলতে হবে? পথের শেষ কোথায়? আর শেষ হবে তো নদীর ঘাটে, তারপর?

যে ছেলেটা এতক্ষণ চলতে পারব না বলে কাঁদছিল, সে বোধ হয় বাপের কাঁধে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভাঙলেই আবার কাঁদবে, কাঁদবে খাবার জন্য, বাপ-মা তখন তাকে কি দেবে খেতে?

ভোরের আগেই এরা নদীর কিনারায় পৌছে যাবে। সবাই বসবে, মুখে সর্বহারার বেদনা। প্রভাতী সূর্যের আলোয় সে মুখগুলো বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে। বাচ্চারা কাঁদবে। খিদেয় চোখের জলের উপর রোদ চকমক করবে, তখনকার একখানা ছবি এঁকে নিতে পারলে হতো। ঝোলাটার মধ্যে কাগজ আর পেনসিল আছে কি?

নদী দেখা গেছে!—কথাটা দলের গোড়া থেকে শেষ অবধি শোনা যায়, নদী দেখা গেছে। ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে এসে ওরা পৌছেছে। যাত্রা শেষ।

লাইনটা বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সবাই তাড়াতাড়ি এগোয়। শিল্পী তাড়াতাড়ি এগোয় না। গিয়ে পৌছালেই তো চলার শেষ, কি হবে তাড়াতাড়ি করে? সকলের আগে তো নদী পার হওয়া যাবে না।

আবার ট্রেনে কি মোটরে সেই গুণ্ডার দল এসে পড়বে না তো?' যদি হুকুম জারি করে নদী পার হতে দোব না বলে, তাহলে? তাদেরকে এড়িয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লে কি সাঁতরে এই নদী পার হতে পারবে?

না হলে সেই গুণ্ডাদের হাতে হয়তো খুন হতে হবে। খুন তো ওরা করেছে বলে শোনা যায়। স্বাধীন দেশের গুণ্ডারাও তো স্বাধীন! যা খুশি তাই করতে পারে, না হলে পুলিশ থাকে না কেন? প্রতিকার হ'ল না কেন?

হঠাৎ আকাশে চাঁদ দেখা গেল।

সামনেই নদীর জল চিকৃমিক করছে। দু'পাশের গাছের উপর স্নিগ্ধ আলোর আভাস। পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে কালো দৈত্যের মতো। টুকরো টুকরো মেঘের উপর পেঁজা তুলোর রূপালী আভাস। চারিপাশের রূপ যেন বদলে গেল। অন্ধকার থেকে যেন সহসা আলোর ইশারা জেগেছে। অদ্ভুত দৃশ্য!

পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে শিল্পী একা বসে থাকে—

শিল্পী এসে বসলো একখানি পাথরে হেলান দিয়ে। চোখ মেলে তাকাতে ভাল লাগে। পাথরখানার পাশে ছোট একটা চারা গাছ, পাতাগুলো জ্যোৎস্নায় টলটল করছে। বড় গাছগুলোর পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোর ঝিকিমিকি। বাতাসের ঝাপটায় একটা শিরশির মর্মর শব্দ।

সামনের জলে চাঁদ নাচছে, ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। নদীর জলে আর গাছের পাতায় প্রকৃতির সংগীত। এই সংগীত শিল্পীর পরিচিত, জীবনে অনেকবার নদীর তীরে বসে এ গান সে শুনেছে। এ গান চিরদিন এক সুরে ধ্বনিত হয়,—এমন অগ্নিকাণ্ড, লুঠতরাজের পরেও এ গানের সুর বদলায় নি। এতোগুলো অত্যাচারিত সর্বহারা মানুষকেও স্নিগ্ধ মাধুর্য দিয়ে ঘুম পাড়াতে চায়!

শিল্পীর চোখে ঘুম নেই। আর সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লো। পাথরের গায় হেলান দিয়ে সে একা বসে থাকে নদীর পানে তাকিয়ে। পা দু'খানা বোধ হয় কনকন করছে, খিদেও পেয়েছে, —থাক গে! ঘুমিয়ে পড়লে কোনটাই আর বুঝতে পারা যাবে না। একটু ঘুমালেই ভাল।

শিল্পী চোখ বুঁজলো।

ঘুম ভাঙলো ষ্টীমারের বাঁশি শুনে। ওপারে ষ্টীমার ছাড়ছে। সবে সূর্য উঠেছে, আকাশে এখনও লাল আভাস।

যারা ঘুমুচ্ছিল সবাই উঠে বসেছে। ছেলেমেয়েগুলো তাকিয়ে আছে ওপারে। ষ্টীমার আসছে। চোঙের ধোঁয়া উড়ছে।

সর্বহারা মানুষগুলোর চোখে ঔৎসুক্য। ওরা ওপারে যাবে। পালিয়ে যাবে এপার থেকে। এই অনাচার-অত্যাচার থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবে। বাঙাল খেদার সাড়া এই নদ পার হয়ে ওপারে পৌছাবে না। ওদের মুখগুলোর মধ্যে একটা আশার দীপ্তি, বিষণ্ণতার মধ্যেও ঔজ্জ্বল্য।

ষ্টীমার ঘাটে এসে লাগে। যাত্রীরা নামে। এদের দেখে থমকে যায়, বলে—এ কি?

—আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, লুঠ করেছে, ঘরে আগুন দিয়েছে।

—সে কি! কারা?

—এখানকার মানুষেরা।

—কেন?

—আমরা আসামী ভাষায় কথা বলি না তাই?

—তার জন্য কি? এ দেশের সবাই তো এক ভাষায় কথা বলবে এমন কোন কথা নেই!

—অন্য ভাষায় কথা বললে দোষ নেই, কিন্তু বাংলা ভাষায় বলবে না।

—এ তো অত্যাচার! গুণ্ডামি!

—গুণ্ডামি নয়, এই হোল সভ্যতা!—স্বাধীনতা!

কয়েকজন লোক এক সাঙ্গ বলে ওঠে, তোমরা কেন যাবে? ফিরে চল, আমরা লড়বো।

—আবার ফিরবো?

—হ্যাঁ, ফিরবে!

শিল্পী অলস চোখে তাকায় সবার মুখের পানে। একদল তাড়িয়ে দেবে একদল আবার ফিরিয়ে আনবে! এ যেন রাখালের গরু চরানো। মানুষও তো জানোয়ার—চিন্তাশীল যুক্তিবাদী জানোয়ার। চিন্তা ও যুক্তি বাদ দিলেই সে সাধারণ জানোয়ার!

ওরা আবার ফেরার জন্য তৈরী হয়।

শিল্পী অলস চোখে তাকায়। আবার ওরা ফিরে যাচ্ছে। এবার ওরা যাচ্ছে স্টেশনের দিকে। স্টেশনের পাশ দিয়েই মোটরের রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের উপর। মায়ের মন্দির উপরে। কার মা?

একজন যুবক এদিকে এসে বললো—আপনি যাবেন না ?

শিল্পী হাসলো, বললো—না। আমি গরু, এ মাঠের ঘাস খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, গোয়াল ঘর আগুনে ছাই হয়েছে। আমি এবার অন্য মাঠে চরতে যাবো।

যুবক অবাক হয়ে তাকায়, মানুষটা পাগল নাকি ?

শিল্পী তার মুখের পানে তাকিয়ে বলে—না, আমি পাগল নই ? এখানকার গুণ্ডারা আমায় বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়েছে, আমি এখন স্বাধীন। কারও কথা আমি আর শুনবো না, কারও কথামত চলবো না। আমি এখন আমার মতো !

যুবক চলে গেল। শিল্পী উঠে দাঁড়ালো। নদীতে হাত-মুখ ধুয়ে গেল স্টীমার ঘাটে। টিকিট ঘরের সামনে গিয়ে বললো—ওপারে যাবার ভাড়া কত ?

টিকিট নিয়ে স্টীমারে গিয়ে উঠলো। ডেকের এক ধারে গিয়ে বসলো। স্টেশন দেখা যায়। মানুষগুলো ট্রেনে উঠছে। পাশের পাহাড়ী পথ দিয়ে একখানা বাস নেমে আসছে। পাহাড়ের গায় সবুজের সমারোহ। এক পাশে ঘাটের কোলে রোদ লেগে এক রাশ হলুদ ফুল জলজল করছে।

শিল্পী ঝোলার মধ্যে হাত ভরলো। স্কেচ বই ও পেনসিল ঠিক আছে। গুণ্ডারা বাড়ীখানাই পুড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু সৃষ্টির উপকরণটাকে নষ্ট করতে পারেনি।

খাতার উপর শিল্পী স্কেচ করতে সুরু করলো।

কোন এক সময় চেকার এসে পাশে দাঁড়ালো, বললো—আপনি ছবি আঁকেন, আর্টিষ্ট ?

মুখ না তুলেই শিল্পী জবাব দিলে—হ্যাঁ, জীবনের সুখ-দুঃখের ছবি ধরে রাখার চেষ্টা করি। যা দেখে মানুষ ইতিহাস লিখবে।

শিল্পীর চোখে তখন সৃষ্টির তন্ময়তা।

নববর্ষে

শ্রীবণু গঙ্গোপাধ্যায়

নব বরষের নূতন সূর্য নম।
ঘুচাও, মুছাও, যা কিছু তমসা-তম।
আশায় ভরাও যত মুষড়ানো মন।
কেন রবে তারা আতুর, অকিঞ্চন।
কর্ম হউক বর্ম চলার পথে।
না থাক বিভেদ শ্রমিক, ধনিক মতে।
প্রীতি-রাখী হোক বাঁধা সবাকার হাতে।

সম্ভাবনার আশ্বাস থাক সাথে।
সত্য ন্যায়ের বর্তিকা হাতে ধরি
জনগণ পথে চলুক অগ্রসরি।
ছিয়াত্তরের ছয়লাপে দাও সাড়া।
আগুয়ান হও পিছে আছ পড়ে যারা।
এক সাথে নাও মানুষ গড়ার পণ।
দল নয়, দেশ বড় জেনো অনুখণ।

একটি গ্রাহিকার আশ্চর্যসুন্দর চিঠি

'মৌচাক' পঞ্চাশ বছরে পা-বাড়াতে চলেছে। যে কোন পত্র-পত্রিকার পক্ষে এ সৌভাগ্য সত্যিই গর্ব করার মত। মৌচাকের সমস্ত পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে আমিও সে গর্বের অংশ নিচ্ছি।

কিন্তু আমার কাছে মৌচাক শুধু একটি পত্রিকাই নয়। মৌচাক আমার দীর্ঘদিনের এক প্রিয়-সহচর। তার জন্মদিন আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়জনের জন্মদিনের মতই আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। তার উদ্দেশে তাই জানাই আমার প্রীতি, কামনা করি তার আরও অনেক শুভ-জন্মদিনের।

মনে পড়ে আজ থেকে প্রায় ৩৫।৩৬ বছর আগে এক সন্ধ্যায় একটি ছোট মেয়ের কথা। বাবার সঙ্গে সে গিয়েছিল কলেজ স্কোয়ারে, 'শিশুসাথী'র দপ্তরে। একই সঙ্গে 'মৌচাক' ও 'শিশুসাথী'র গ্রাহিকা হয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে বাড়ী ফিরিছিল সে। তারপর যখন তাঁর নামে পত্রিকা দু'টি আসতে আরম্ভ করল—প্রতিমাসের সে দিনগুলি কি রোমাঞ্চ আর আনন্দের!

বিশেষ করে মৌচাকের সেই আশ্চর্যসুন্দর গল্প-উপন্যাসগুলি! হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'আবার যখের ধন', 'অমাবস্যার রাত', প্রভৃতি আরও কত অপূর্ব কাহিনী! বিমল কুমার, রামহরি, বাঘার সঙ্গে কত দুর্গম দেশেই না মেয়েটি গিয়েছে—অমাবস্যা রাতে বাঘের গর্জন, আর একটি মেয়ের মৃত্যু—তার রহস্য উদ্ধারে মেয়েটিও ছিল সেদিন; জয়ন্ত, মাণিক, সুন্দরবাবুর সঙ্গে সঙ্গে কত রোমাঞ্চ, কত রহস্যের মর্মোদ্ধার! সুন্দরবাবু যখন ডিমের ওমলেট্ সিঙাড়া প্লেটের পর প্লেট শেষ করেছেন, বা রামহরি হাজির করেছে নতুন কোন খাবার, তার স্বাদ মেয়েটিও যেন গ্রহণ করেছে সমান আগ্রহে। মোহনলাল. শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র আরও কত সাহিত্যিকদের সেই অপূর্ব গল্প-উপন্যাসগুলির কথা ভাবলে আজও কি আনন্দই না সে অনুভব করে! মনে পড়ে মৌচাকের রজত-জয়ন্তী সংখ্যা—কি সুন্দর বইটি! মনে পড়ে কত নির্জন মধ্যাহ্ন, কত সন্ধ্যার স্মৃতি-জড়ানো শৈশব-কৈশোরের আশ্চর্য স্বপ্নভরা সেই দিনগুলি—তাদের সকলের মাঝে মৌচাক একটি স্থির চিহ্ন, ভালবাসায় ভরা।

. ক্রমে কালের অনিবার্য নিয়মে পরিবর্তন হয়েছে মেয়েটির, কৌশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছে সে, অধ্যাপিকা হয়েছে, পেয়েছে স্বামী, সংসার, সম্মান, ভালোবাসা। তার জীবনের ক্রম-বর্ধমান গণ্ডি মৌচাককে দূরে সরিয়ে রাখেনি। আজও তার লাইব্রেরীতে নানান দেশের দর্শন, সাহিত্য ও কাব্য-সংগ্রহের সঙ্গে রয়েছে এই দীর্ঘদিনের মৌচাকগুলি—বাঁধানো; কিছু হয়তো পোকাতে কেটেছে, তবু মৌচাক মৌচাকই! ঘরে ঢুকে অনেকে জানতে চেয়েছে—তোমার এখানে আবার মৌচাক পড়ে কে?

—বল কি, 'তুমি? কেউ মুচ্‌কি হেসেছে, কেউ জোরে; কেউ ঠাট্টা করেছে, কেউ ব্যঙ্গ।

কখনও সে ভেবেছে, আর না, এবছর শেষ হলেই আর রাখব না মৌচাক। কিন্তু পারেনি। মৌচাক যে তার জীবনের সব ক'টি অধ্যায়ের এক অভিন্ন সহচর—তাকে কি ছাড়া যায়?

—না, যায় না! তাকে ছাড়তে আমি তাই পারিনি। আজ কর্মস্থল থেকে সুদীর্ঘ অবকাশ নিয়ে এসেছি রাজধানীতে—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পর্যায়ের কাজ নিয়ে আর পাঁচজনের মত বয়ে চলেছে আমার জীবনও তার শেষ পরিণতির দিকে। এই দীর্ঘ দিনে যাকে ছাড়তে পারিনি, পারবনাও কোনদিন, সে আমার মৌচাক! আজ তার মধ্যে সেই শৈশবের সরল আনন্দ পাই কিনা জানি না, সে মনও আর নেই, তবু মৌচাক আমার জীবনের পাতাগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে—ছাড়া তাকে যায় না!

যেদিন আমি থাকব না, কামনা করি সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার প্রিয় সাথী মৌচাক ঠিক আজকের মতই আনন্দের উপচার নিয়ে তার সব বন্ধুদের প্রাণ মন মধুময় করে তুলবে। অনির্বাণ হোক তার জীবন-দীপ শিখা! তার জন্মদিনে এই আমার একান্ত কামনা।*

(গ্রাঃ নং ৬১৮৫)

* আমাদের একজন অতি পুরাতন গ্রাহিকার লিখিত এই আশ্চর্যসুন্দর চিঠিখানি সুবর্ণ-জয়ন্তী বর্ষের প্রথমেই আমরা প্রকাশ করলাম। কিন্তু লেখিকা তাঁর নাম বা ঠিকানা প্রকাশ করতে চাননি বলে, কেবলমাত্র তাঁর গ্রাহিকা নম্বর ছাড়া এখানে আর কিছু আমরা প্রকাশ করতে পারলাম না।—মৌ.স.

'মৌচাকের প্রত্নকথা'র শেষাংশ (১২ পৃষ্ঠার পর)

...ফিরে এলাম ১৩২৭ সালের ভারতীর সেই আড্ডায়। প্রথম পাতায় আঁকা ছবি 'কনেবউ'। সেখান থেকে পাতা উলটে উলটে দেখছে সবাই নতুন মৌচাকের রূপ। সবার হাতে মৌচাক—সবার মুখে হাসি, সবার মুখে খুসীর টুকরো টুকরো কথা, আশা-ভরসার কথা—হবে হবে সবই হবে। দিন তো পড়েই আছে, পরে হবে। দিন থামে না—দিন গেলো, মাস গেলো, বছরের পর বছর গেলো, শৈশব কাটিয়ে কৈশোর—যৌবন কাটিয়ে পঞ্চাশে পা-দিয়ে প্রৌঢ় হল শিশু মৌচাক। আজ তার অভিষেক সিংহাসনে বসেছে সে। মাথায় পরেছে মুকুট, জয়ন্তীর টীকা—'দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা'। এই মহিমা, এই সৌভাগ্য হয়নি তো আর কোন ছোটদের পত্রিকার। ছিল তো আরো অনেক! কি ভাগ্য মৌচাকের, কি ভাগ্য আমার, জন্ম দেখলাম, অভিষেক দেখলাম। চক্ষু সার্থক হলো।...

বন্ধু, হয় তো তুমিও মানসচক্ষে দেখেছিলে মৌচাকের এই গৌরব-রূপ—স্বর্ণ-জয়ন্তীর অভিষেক। মানুষের চোখ দিয়ে দেখে গেলে না। এ ব্যাথার সান্ত্বনা কোথায়? এই লেখা লিখতে বসে বার বার তোমার ছবি ভেসে ভেসে গেছে লেখার ওপর দিয়ে,—কত কথা বলেছিলাম, কত চলা চলেছিলাম আমরা সবাই। তুমি নিশ্চল, আজ শূন্যের আড়ালে; আর মনে হয়েছে প্রেমাঙ্কুর ও হেমেন্দ্রর কথা। তুমি থাকতেই বিদায় নিয়ে গেছে তারা; আমাদের বাঁশির তিন ফুটোয় সুর ওঠে না আর। বেঁচে থাকলে নিজের হাতে এঁকে দিতাম তোমার কপালে আমাদের যৌবন-জীবনের প্রতীক সবুজ পাতার টীকা। তুমি নেই, তাই কল্প-কপালে পরালাম কল্প-টীকা, আর আশীর্বাদ করলাম তোমার মৌচাককে, শতায়ু হোক মৌচাক—স্বস্তি।

সবজান্তা

১। ইংরেজীতে 'লামা' শব্দটি দুটি আলাদা বানানে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি 'Lama', অপরটি 'Llama'। এই দু'টির অর্থ আলাদা। কোনটি কোন্ অর্থে ব্যবহার হয় বলতে পারো ?

২। নাইলন-এর (Nylon) জামার এখন তো খুবই প্রচলন এবং তোমরা অনেকে তা গায়েও দিয়ে থাক। কিন্তু এই নামটি কি করে হ'ল তা জান কি ?

৩। কুস্তি বলতে আমাদের দেশের মল্লযুদ্ধের মানে আমরা বুঝি, কিন্তু জাপান থেকে এক ধরনের কুস্তি সারা বিশ্বে প্রচলিত হয়। সে কুস্তির নাম কি ?

৪। হল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় বন্দর কোন্‌টি, যেটি জাহাজ তৈরির জন্য বিখ্যাত

৫। সবচেয়ে পুরাতন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ?

৬। 'রোডেশিয়া' নামটি কি ভাবে হয়েছে, জান ?

৭। বর্তমান রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা দ্বিতীয় বড় শহর, পূর্বে যার নাম ছিল সেণ্ট্ পিটার্সবার্গ, এখন তার নাম কি হয়েছে বলতে পার ?

॥ উত্তর ॥

১। প্রথম (Lama) বলা হয় তিব্বতের বৌদ্ধ-পুরোহিতদের, আর দ্বিতীয় (Llama) লামা বলা হয় সাউথ আমেরিকার উট বংশীয় এক প্রকার প্রাণী। ২। নিউ ইয়র্ক এবং লণ্ডনে প্রায় একই সময়ে এই জাতীয় কাপড় তৈরি হয় বলে, New York-এর 'Ny' এবং London-এর 'Lon' এই দুয়ের মিলনে ঐ কাপড়ের নাম হয়েছে (Nylon) নাইলন। ৩। জুজুৎসু, অথবা জুডো ৪। রটারডাম ৫। হাইডেলবার্গ। ৬। সিসেল রোডাস্-এর নামে। এই দেশের উন্নতির জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন। ৭। লেলিনগার্ড।

মেঠুড়ে

সাঁতার

সিংহলের তালাইমানার থেকে ভারতের ধনুষ্কোটি পর্যন্ত তেইশ মাইল পক-প্রণালী সাঁতারে রেলওয়ের বৈদ্যনাথ আবার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

সকাল ৪টে ১৬ মিনিটে তালাইমানারের উরুমুনাই আলোকস্তম্ভের কাছ থেকে ভারতীয় সুইমিং ফেডারেশন পরিচালিত পক-প্রণালী সাঁতার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতায় ভারতের সাতজন এবং সিংহলের সাতজন মোট চোদ্দজন সাঁতারু যোগ দেন। সূর্য অস্ত যায়। ধীরে ধীরে সমুদ্রের বুকে অন্ধকার নেমে আসে। রাত ৭টা ১৮ মিনিটে বৈদ্যনাথ সাঁতার শেষ করে ধনুষ্কোটির তীর পৌঁছন। আইন অনুযায়ী তিনি হেঁটে তটভূমিতে ওঠেন। বিপুল দর্শক বৈদ্যনাথকে মালা পরিয়ে ও ফুল ছড়িয়ে অভিনন্দন জানান। গতবারের চেয়ে এবার বৈদ্যনাথের তের মিনিট বেশী সময় লেগেছে।

শুরুতে লক্ষ্মীকান্ত ভৌমিক বৈদ্যনাথ নাথের থেকে এগিয়ে ছিলেন। সাঁতার শুরুর দু' ঘণ্টার পর লক্ষ্মী ভৌমিককে বৈদ্যনাথ ধরে ফেলেন। আবার লক্ষ্মীকান্ত ভৌমিক এগিয়ে যান। কিন্তু দুপুরের পর বৈদ্যনাথ লক্ষ্মীকে পেছনে ফেলে এগোতে থাকেন এবং শেষে পর্যন্ত প্রায় দু' মাইলের ব্যবধানে জয়ী হন। বৈদ্যনাথের মোট সময় লাগে ১৫ ঘণ্টা ২২ মিনিট। পক-প্রণালী সাঁতারে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী লক্ষ্মীকান্ত ভৌমিক এবং তৃতীয় স্থান আধকারী আর. পি. মার্চেণ্ট সাঁতার শেষ করে বিপথে চলে যাওয়ায় এবং প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী সাঁতার শেষ করায় ত্রিপুরার রতিরঞ্জন ধরকে দ্বিতীয় এবং সিংহলের মানায়াকারাকে সরকারীভাবে তৃতীয় স্থানাধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়।

সাঁতারের আগেই দীর্ঘপথ অনুসন্ধান করে কোথাও সাপ বা হাঙর দেখতে পাওয়া যায়নি। সুতরাং সাঁতারুদের কোনরকম ভয় পাবার কারণ ছিল না। বাতাস ও আবহাওয়া খুবই ভালো ছিল।

হকি

কোচিনে আয়োজিত জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত তিন বছরের বিজয়ী ভারতীয় রেলওয়ে দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়ে পাঞ্জাব আবার জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রেল ও পাঞ্জাবের মধ্যে প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় পাঞ্জাব ১-০ গোলে জয়ী হয়। মোট চৌত্রিশ বারের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ভেতর পাঞ্জাব এবার নিয়ে চোদ্দ বার ফাইনালে উঠল এবং দশবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করল।

ফাইনালিস্ট ভারতীয় রেল দল শুধু পর পর তিন বছরের বিজয়ীই নয়, সাম্প্রতিক কালের হকিতে তাদের কৃতিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। ১৯৫৭ সাল থেকে আরম্ভ করে এই বছর পর্যন্ত তের বছরের মধ্যে তারা দশবার ফাইনাল খেলেছে, বিজয়ী (দু'বার যুগ্মভাবে জয়ী) হয়েছে আট বার। ফাইনালে উঠে এই সর্বপ্রথম রেল দলকে হার স্বীকার করতে হল।

কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত বাংলা দল ভালোই খেলে। কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম দিন মহীশূরের সঙ্গে ২-২ গোলে খেলা শেষ করে দ্বিতীয় দিনে বিজয়ী হয় ১-০ গোলে। সেমি-ফাইনালে বাংলা দল রেলওয়ে দলের কাছে হার স্বীকার করে।

ক্রিকেট

করাচীতে ইংলণ্ড ও পাকিস্থানের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের খেলা মাঝ-পথে পরিত্যক্ত হওয়ায় এম সি. সি. দল পাকিস্থান সফর বাতিল করে দেশে ফিরে যায়।

পাকিস্থানে ইংলণ্ডের চারদিনব্যাপী তিনটি টেষ্ট ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা ছিল। লাহোর ও ঢাকা টেষ্টের ফলাফল অমীমাংসিত থাকায়, ফলাফল ও রাবারের নিষ্পত্তির আশায় করাচীর শেষ টেষ্ট ম্যাচ পাঁচদিন ধরে চলবে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু দর্শকদের হামলায় খেলা মাঝ-পথে বন্ধ হয়ে যায়। পাকিস্তানে রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য খেলার আকর্ষণ খুব উচ্চগ্রামে ওঠেনি। তবু আপাতদৃষ্টিতে ইংলণ্ড দল ভালোই খেলে। সেঞ্চুরি করছেন তাঁদের চারজন ব্যাটসম্যান—কলিন কাউড্রে, বেসিল ডলিভেরা, কলিন মিলবার্ণ ও টম গ্রেভনি। পাকিস্তানের কোনো খেলোয়াড় সেঞ্চুরি করতে পারেন নি।

অকল্যাণ্ডে ২৭ ফেব্রুআরি থেকে ৩ মর্চ পর্যন্ত প্রথম টেষ্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নিউজিল্যাণ্ডকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে দেয়। ওয়েলিংটনের দ্বিতীয় টেষ্টে নিউজিলাণ্ড পাল্টা জবাব দেয় ছ' উইকেটে জিতে। শেষ টেষ্ট আরম্ভ হয়েছিল ১৩ মার্চ। সেমুর নার্স ২৫৮ রানের এক অসাধারণ ইনিংস উপহার দেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪১৭ রানের বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড প্রথম দফায় ২১৭ রান করে ২০০ রানে পিছিয়ে থেকে ফলো অনের গ্লানি নিয়ে বিনা উইকেটে ১১৫ রান করে। পরে ৬ উইকেটে তাদের ৩৬৭ রান ওঠে। হেষ্টিংস ১১৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। খেলার ফলাফল হয় অমীমাংসিত।

ধুরন্ধর

১। পুরো শব্দটি বার করো

নীচে যে পাঁচটি শব্দের দু'পাশে যে কটি করে তারকা চিহ্ন দেওয়া আছে, সেই ক'টি করে অক্ষর বসিয়ে শব্দটিকে পূরণ করো। শব্দটিকে অর্থপূর্ণ করার জন্য অক্ষরের সঙ্গে প্রয়োজন মত আকার, ইকার, একার, উকার সবই বসানো যাবে।

* রিশ্র **
* কমিলা *
* লতারা *
** কাত *
* বিমৃশ্য **

২। নাম বার করো

বাঁ দিকের ছবিটিতে ছ'টি বিদেশী ছেলে-মেয়ের ছবি আছে। ইংরেজীতে 'A' শব্দটি ছবিতে আঁকা যে জায়গায় আছে, সেই জায়গায় রেখে, বাকী পাঁচটি অক্ষর বসিয়ে ছ'টি ছেলেমেয়ের নাম তোমরা বার করতে পার কিনা দেখ।

৩। অক্ষরের ছবি
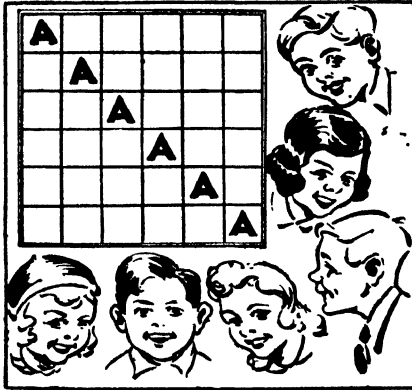
ডান দিকের ছবিটিতে আর্মি ও নেভির দু'জন নামকরা সৈনিকের চেহারা দেওয়া আছে ইংরেজী অক্ষরে। এই ছবি দুটি দেখে তোমরা দু'জনের নাম ঠিক ঠিক বার করতে পার কিনা দেখ।

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। ৭৮৯ × ৯৮৭ = ৭৭৮৭৪৩ ২। সর্ব-সমেত ১৪৪ পরপর বাক্সগুলিতে ছিল ৪২, ৫৪, ৪৮ ৩। মধু ২৪, যদু ১৫
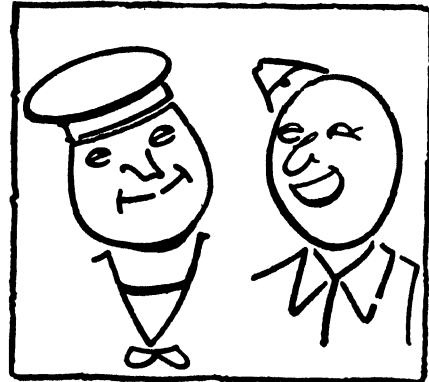
মাইথন ড্যাম

দূর দূর যদ্দুর দৃষ্টি চলে—
নীল নীল ঝিলমিল আকাশতলে,
কলকল উচ্ছল
চঞ্চল ঘোলা জল
করছে খেলা, খোলা দিগাঞ্চলে !
দূর দূর যদ্দুর দৃষ্টি চলে।

শুয়ে আছে বরাকর নদের 'পরে,
পাহাড়িয়া অজগর কি কলেবরে !
ঘরে ঘরে আলো জ্বলে
কারখানা কল চলে
মানুষের সভ্যতা মাথায় ধরে—
মাইথন ড্যাম দেখি নদীর 'পরে।

শ্রীচন্দ্রশেখর গোস্বামী

ফেরিওয়ালা

একটি ছোট গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের একটি কুঁড়েঘরে একজন ফেরিওয়ালা বাস করত। সে খুব গরীব ছিল। তার কেউ ছিল না, সে একাই বাস করত।

গ্রামটি ছিল খুব সুন্দর। বাড়িগুলি সারি বেঁধে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। বাড়িগুলির পিছনে একটি ছোট নদী এঁকেবেঁকে চলেছে। মাঝিরা নৌকা নিয়ে যাচ্ছে। নদীটি কুল কুল শব্দ করে বয়ে চলেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল একটি তাল গাছ সমস্ত গাছগুলিকে ছাড়িয়ে গ্রামটিকে পাহারা দিচ্ছে। কলাগাছের ফাঁকে দোয়েল পাখী শিস্ দিচ্ছে। সেই দুপুর বেলায় ফেরিওয়ালাটি ঝুড়ি মাথায় করে পুতুল বিক্রি করতে বেরিয়েছে পাড়ায়-পাড়ায়, আর হাঁক দিচ্ছে : পুতুল চাই—পুতুল চাই, ভাল—পুতুল।

শ্রীঅতিনেন্দু দেব রায়

একটুখানি হাসো

একদিন হঠাৎ এক শিক্ষক ক্লাসে ঢুকেই এক ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন, বল তো, পাখী কোন্ পদ ?

ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, কেন, পাখী দ্বি-পদ স্যার !

শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, বল তো, গত বছরে আমাদের বাঙলা দেশে কোন্ সময় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ?

উত্তরে ছাত্র বলল, বড় অসময়ে স্যার।

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য
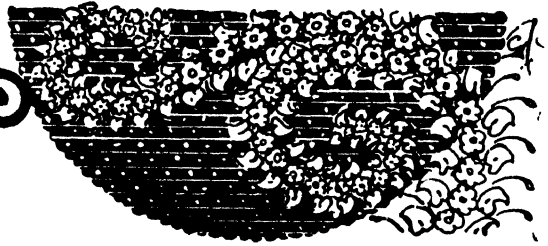
নতুন বছর।

১৩৭৫ শেষ হয়ে সুরু হলো ১৩৭৬ সাল। এইভাবেই দীর্ঘকাল ধরে বছরের পর বছর দিন-গুণতির পথে আমরা ক্রমশঃ এগিয়ে চলছি। আরো কতকাল এগিয়ে চলবো আমরা—পুরোনো থেকে আরো পুরোনো হবে আমাদের এই পৃথিবী—তবু বছরের পর বছর পুরোনো এই পৃথিবী আহ্বান জানাবে নতুন বছরকে।

সাল গণনা কবে থেকে আরম্ভ হয়েছিল? বাংলা সালের বয়স খুব বেশী নয়। সাল গণনার প্রথা অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। তবে সব সময় এই পদ্ধতিতে সাল গণনা হতো না। দেশের রাজশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় নতুন সাল প্রবর্তন করা হতো। এই কারণে আমাদের দেশে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সালের প্রচলন হয়েছিল। তাছাড়া গোটা দেশ জুড়ে সকলেই একটি পদ্ধতি অনুসারে দিন যে গণনা করতো তাও নয়। বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যে সব সন প্রচলিত ছিল, তার কতকগুলোর নাম তোমরা জেনে থাকবে। যেমন—লৌকিক সংবৎ, যুধিষ্ঠিরাজ, মালববিক্রম সংবৎ, শকাব্দ, কলচুরি সংবৎ, গুপ্ত সংবৎ, বলভী সংবৎ, শ্রীহর্ষ সংবৎ, লক্ষ্মণ সেন সংবৎ ইত্যাদি। বাংলা সন প্রবর্তিত হওয়ার আগে এই সংবৎগুলোর মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি বাংলা দেশে বিভিন্ন যুগে প্রচলিত ছিল যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সন কথাটি মুসলমানী। সন বলতে সাধারণতঃ হিজরী সন বোঝা যায়। হজরত মহম্মদ যে দিনটিতে মক্কা পরিত্যাগ করে মদিনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, অর্থাৎ ১৬ই জুলাই ৬২২ খৃষ্টাব্দ—সেদিন থেকেই হিজরী গণনা আরম্ভ হয়। বাংলা দেশে মুসলমান শাসন শুরু হবার পর পুরোনো দিন গণনার পদ্ধতির পরিবর্তে হিজরী সন অনুসারে নতুন দিন-গুণ্‌তির প্রথা প্রচলিত হয়। হিজরী সন থেকেই বাংলা দেশে বাংলা সনের প্রবর্তন হয়েছিল। মুসলমানী পঞ্জিকাকার দের মতে হজরী সন থেকে দশ বছর বাদ দিয়ে, সম্রাট আকবর এই বাংলা সন প্রচলন করেছিলেন। হিজরী সন গণনা করা হতো চান্দ্রমাস অনুযায়ী। এতে ফসলের সময় স্থির করা ব্যাপারে আর জ্যোতির্বিদদের গণনার অনেক অসুবিধা হতো, তাই আকবর বাদশাহ চান্দ্র-গণনার পবিবর্তে সৌর-গণনা প্রবর্তন করেছিলেন।

আকবর বাদশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইংরেজী ১৫৫৬ সাল আর বাংলা ৯৬৩ সাল। আকবরই বাংলা সনের প্রবর্তক এই মত মেনে নিলে ৯৬৩ সনের আগে বাংলা সনের অস্তিত্ব ছিল না বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু প্রাচীন পুঁথিপত্রে ৯৪৫ বংলা সনের হস্তলিপি পাওয়া গিয়েছে। এই হস্তলিপি যদি প্রমাণ্য হয়, তাহলে মেনে নিতে হবে যে, আকবর বাদশাহের সিংহাসন লাভের আগে থেকেই বাংলা সালের প্রচলন ছিল। হিজরী সন গণনা করা হতো চান্দ্রমতে, আর বাংলা সাল সৌরমতে। গণনার হিসেবে চান্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষ অপেক্ষা কোন বৎসরে দশদিন, কোন বৎসরে এগার দিন কম হয়ে থাকে। এই দশ থেকে এগার দিনের পার্থক্য মনে রেখে হিসাব করলে দেখা যাবে হিজরী ৯০৩।৪ সালে বাংলা সালের প্রবর্তন হয়েছিল। তাহলে আকবর বাদশাহ হবার আগেই বাংলাদেশে বাংলা সালের প্রবর্তন হয়েছিল। এ দেশে প্রবাদও আছে যে, গৌড়ের বাদশাহ সুলতানা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এই দেশে প্রচলিত সৌর মাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য চান্দ্র হিজরী সালকে বাংলা সনে প্রবর্তিত করেছিলেন। এই প্রবাদের মূলে যদি ঐতিহাসিক সত্য থাকে, তাহলে আকবর বাদশাহের আগে থেকেই বাংলা দেশে বাংলা সালের প্রবর্তন হয়েছিল—স্বীকার করতেই হবে।

ডিউক ও পিনাকীর নাম ও অসীম সাহসিক যাত্রার কাহিনীর সঙ্গে তোমরা ইতিমধ্যেই গভীর ভাবে পরিচিত হতে পেরেছ। সীমাহীন সমুদ্রে খোলার মত ছোট্ট নৌকা কানোজী আংরেকে নিয়ে তাদের দুঃসাহসিক অভিযান সাফল্য হয়েছে এ আমাদের গর্বের কথা। একটি একটি অন্ধকার রাত সমুদ্রের বুকে দুটি প্রাণী খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে, অসীম সাহস বুকে নিয়েও শঙ্কাকুল ভাবে কাটিয়েছে। বাড়ীর আরাম, প্রিয়জন পরিবেশ, সব কিছু ছেড়ে এগিয়ে চলেছে, ভুলপথে কতবার জলযান এগিয়ে গেছে, মাঝে মাঝে বিরাট হাঁ-করে হাঙ্গর এসে পড়েছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা অগ্রাহ্য করতে হয়েছে—কোন ভয়-ভীতি গ্রাহ্য না করে, তারা বিপদসঙ্কুল পথের মধ্যে দিয়ে অবশেষে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌছেছিলো। এরা যেমন আমাদের গর্বের বস্তু, তেমনি তরুণদের আদর্শস্থল। ডিউক ও পিনাকীর জয়যাত্রা তাই আমাদের জয়। আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলি : ভবিষ্যতে তার আরো দুর্গম অভিযানের প্রচেষ্টায় জয়যুক্ত হোক।

তোমাদের সকলের জন্য রইল আন্তরিক প্রার্থনা—নতুন বছরের শুভ-কামনা—সুস্থ দেহ, মন ও পরিবেশের।

তোমদের—মধুদি'

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০'৬০ পয়সা

পরলোকে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৫০শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭৬ [২য় সং

কেমন ভুল

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

দর্শনের অধ্যাপক শিব পাকড়াশী,
মায়ের অসুখ শুনি ছুটেছেন কাশী।
বিদায় জানাতে তাঁরে এসেছেন শীল,
আর এসেছেন বোস,—উভয়ে ডি, ফিল্।

শোনেন ষ্টেশনে আসি, গাড়ী আজ লেট্,
বিতর্ক লইয়া তাঁরা পার হন গেট।
বসিলেন তিনজনে ওয়েটিং রুমে,
নেই জ্ঞান সময়ের বিতর্কের ধূমে!
কেন লোকে ভুল করে এই আলোচনা
ছাত্রগণ পদে পদে কেন অন্যমনা।
দর্শনের কূট তর্কে কাটে বুঝি রাত্র,
পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্র!

ট্রেনগাড়ী ছুটে আসে করি হুস্ হুস্,
পণ্ডিতেরা তর্ক করে হইয়া বেহুঁশ !
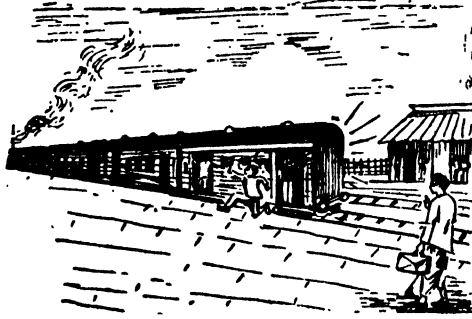
গাড়ী ছাড়িবার বাঁশী আসে বুঝি কানে,
বিতর্ক ছাড়িয়া সবে ছোটে গাড়ী পানে।
পড়ি-মরি ছোটে তারা গাড়ী ধরা চাই—
শীল আর বোস ধরে হ্যান্‌ডেলটাই !

কেউ বলে, গেল গেল। কেউ খোলে দোর,
আর সবে বলে, খুব কপালের জোর !

ভুল করি বোস-শীল ট্রেনে চেপে যায়,
পাকড়াশী প'ড়ে থেকে বিদায় জানায় !

স্বাধীনতার সুখ

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

সোনার দাঁড়ে খাঁচার পাখী চেঁচিয়ে খালি বলছে ঃ
"শিকল টুটি দাও হে ছুটি বন্দী হৃদয় জ্বলছে !"
সোহাগ ভরে পালক তখন আদর করে পাখীকে।
বিহগ বলে, "ধরেছি তোমার বন্দী করার ফাঁকিকে !
চাইছ তুমি পোষ মানিয়ে মুক্তি আমার খণ্ডিতে,—
স্বাধীনতার সুখ আছে কি দাসত্বের এ গণ্ডীতে ?"

মোটর গাড়ির আদিকথা

শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ

আদিকাল থেকে মানুষ পশুকে বশ করে যাতায়াতের কাজে লাগিয়েছে, অবোধ জীবের সামর্থ্য ও মেজাজের ওপর নির্ভর করে বেশ কয়েক হাজার বছর কাটিয়েছে, কিন্তু মানুষ হতে চায় আত্মনির্ভর। এমন একটি বাহন চাই যা তার আয়ত্তে থাকবে ষোলআনা, যা সহজে চালনা করা যাবে কোন পশুর ওপর নির্ভর না করে এবং যার শক্তি তার প্রয়োজন মেটাতে পারবে। মানুষ এই আকাঙ্ক্ষার সার্থক রূপায়ণ পেয়েছে মোটর গাড়িতে। এই মোটর গাড়ি কিন্তু কোন একজনের আবিষ্কার নয়। বিভিন্ন সময়ে নানান দেশের বহু মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবিষ্কার বা উন্নতির ফলশ্রুতি হিসাবে অবশেষে মানুষের হাতে এসেছে বর্তমান সভ্যতার অপরিহার্য ও সর্বাধিক ব্যবহৃত এই বাহনটি।

ইতিহাসে পশুহীন বাহন আবিষ্কারের সূত্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির (১৪৫২—১৫১৯) গবেষণায়। তার পরের নজীর হ'ল ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সরকারের কাছে একটি দরখাস্ত। দরখাস্তকারী র‍্যামসে এবং ওয়াইল্ডগুজ 'অশ্বহীন গাড়ি' চালাবার অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু কতদূর কি করতে পেরেছিলেন তা জানা যায় না। এর পরের নজীর আজো প্যারিসে সংরক্ষিত আছে—এটি হ'ল ফরাসী সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়র নিকলস কুনো-র তৈরি বাষ্প-চালিত একটি তিন-চাকার বাহন। এই গাড়িটা তিনি তৈরি করেছিলেন ভারী কামান টেনে নিয়ে যাবার জন্যে। এটি ঘণ্টায় আড়াই মাইল বেগে চলতে পারত, কিন্তু প্রতি ১০০ গজ অন্তর এটিকে থামিয়ে নতুন বাষ্প তৈরি করে নিতে হ'ত।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে আমেরিকার ইভান্‌স্ নামে একজন 'স্বয়ংচালিত গাড়ি' চালাবার প্রথম পেটেণ্ট পান। এঁর বাহনটি ছিল চ্যাপ্টা নৌকা ও বাষ্পচালিত মালগাড়ির সমন্বয়—জলে ও স্থলে চলতে পারে এমন বাহন পৃথিবীতে এই প্রথম।

গত শতকের গোড়ার দিকে কাজের উপযোগী বাষ্পচালিত একটি গাড়ি তৈরি করার জন্যে অনেকে গবেষণা শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ইংলণ্ডের রিচার্ড ট্রিভিথিক-এর। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাষ্পচালিত একটি গাড়ি রাস্তায় চালান। কাঠের তৈরি কাঠামোয় মালগাড়ি ধরনের গাড়ি এটি। সাত-আট জন আরোহী বহন করতে পারত। এক মাইল অন্তর নতুন করে বাষ্প তৈরি করে নিতে হ'ত। ট্রিভিথিক-এর পরে এঁদের নাম করতে হয়; ডেভিড গর্ডন (১৮২৪); সুমায় ও ওগ্‌ল (১৮৩১); ওয়াল্টার হানকক্ (১৮২৪-৩৬); চার্চ (১৮৩২); ফ্রান্সি মাকিবনি ও স্কুইরস (১৮৩৪)। এঁদের গবেষণার ফলে কিছু কিছু উন্নতিসাধন করে, ইংলণ্ডের রাস্তায় কিছু কোম্পানি বাষ্পচালিত গাড়ি চালাতে লাগল।

এদের প্রসার ক্রমে এত বেড়ে গেল যে ১৮৩১ সন থেকে পার্লামেণ্টে বিভিন্ন
র দ্বারা এর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হতে লাগল। একটি আইনে বলা হ'ল যে, অশ্বহীন
সামনে একজনকে দিনে লাল পতাকা এবং রাতে লাল ল্যাণ্টার্ন হাতে নিয়ে আগে আগে
হবে। 'অশ্বহীন গাড়ি'র জন্যে রাস্তা শুল্ক, সেতু শুল্ক প্রভৃতি অনেক বাড়ান হ'ল।
ন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল অশ্বচালিত গাড়ির মালিকদের স্বার্থে বটে, কিন্তু আরো কারণ
বাষ্পচালিত গাড়িগুলো খুব ভারী হ'ত এবং চাকাগুলো হ'ত লোহার। ইংলণ্ডে তখন
পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে, বাষ্পচালিত গাড়িগুলো সে সব রাস্তার খুব ক্ষতি করছিল।
প্রতিবন্ধকতার জন্য শিল্পে অগ্রসর দেশ হয়েও ইংলণ্ডে স্বয়ংচালিত গাড়ির আর বিশেষ
হ'ল না। আইনগুলি তুলে নেওয়া হয় দীর্ঘদিন পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে।

বাষ্পচালিত গাড়ির উন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল—বাষ্প তৈরি করার ইঞ্জিনটাই; এটি
খুব ভারী তাই আয়ত্ত করাও ছিল কঠিন।

ইতিমধ্যে ইঞ্জিন তৈরি করার একটি নতুন পথের ইঙ্গিত পাওয়া গেল—আবিষ্কৃত হ'ল
ন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিন। ১৮৫১ সনে ডব্লু এম স্টর্ম ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিনের
পেটেণ্ট করেন। আলো জ্বালাবার গ্যাসকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন
কিন্তু বিশেষ সফল হননি। খানিকটা সফল হলেন জিন জোসেফ এতিনে লেনোয়া১৮৬২
ইঞ্জিনটা মোটামুটি কাজের উপযোগী হয়েছিল। তিনি পাঁচ বছরের মধ্যে চারশ ইঞ্জিন
করেছিলেন। ইউরোপের বহু দেশে এই ইঞ্জিন-বসান গাড়ির বেশ চলন হয়েছিল।

ফরাসী বিজ্ঞানী আলফোঁ বু দ্য রোকাস ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিন নিয়ে গবেষণা করে
াপ ইঞ্জিনের প্রস্তাব করেন, লেনোয়ার ইঞ্জিন ছিল দু-ধাপের। রোকাস প্রতিষ্ঠিত নীতির
ভিত্তি করে আধুনিক কালের মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের এত উন্নতি হয়েছে—এই হিসাবে
মোটর গাড়ির জনকও বলা যেতে পারে। রোকাস হাতে-কলমে ইঞ্জিনটা তৈরি করেন
কিভাবে এই ইঞ্জিনটা তৈরি হয়েছিল তা গল্প করে বলার মত।

নিকলাস অগাস্ট অটো জাতিতে জার্মান, পেশায় কেরানী, বয়স তখন তার আটাশ
২)। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাও তাঁর নেই, বিজ্ঞানীও তিনি নন। কিন্তু একটি গুণ ছিল, যে
অধিকারীরা জগতের অনেক রূপান্তর ঘটিয়েছেন। সে গুণটি হ'ল স্বপ্ন দেখা এবং সে স্বপ্ন
ণে অদম্য উদ্যম। অটোর সঙ্গে পরিচয় ঘটল ইউজেন ল্যাঙ্গেন-এর। ইনিও জার্মান,
দার এবং কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যেও তাঁর ছিল। এঁরা দুজনে একত্রে কাজ করে ১৮৬৬
একটি ইঞ্জিন তৈরি করলেন। ইঞ্জিনটা লেনোয়ার ইঞ্জিনের ধরনের, দেখতে কিছু বিদ্‌কুটে,
খুব হ'ত কিন্তু জ্বালানি হিসাবে গ্যাস পুড়ত খুব কম। এটি পেটেণ্ট করান হয়।

এবার এঁরা দুজনে একটি কোম্পানি খুললেন। ভাগ্য ভাল, কোম্পানিতে এমন একজনকে পেলেন যাঁর মূল্য অপরিসীম। এঁর নাম গটলিব ডেমলার। ইনি শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং কারখানা পরিচালনায় পাকা ওস্তাদ। ইনি রোকাসের প্রবর্তিত চার-ধাপ ইঞ্জিন তৈরির পক্ষপাতি ছিলেন। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় চার-ধাপ ইঞ্জিন প্রথম তৈরি হ'ল ১৮৭২ সনে, তবে এর জ্বালানি ছিল গ্যাস। ইঞ্জিনের আরো উন্নতি করে বাজারে ছাড়তে শুরু করলেন এঁরা। দিনে ২৫টা করে ইঞ্জিন তৈরি হতে লাগল। ১৮৭৫ সনে দিনে ৯০টা করে ইঞ্জিন তৈরি হতে লাগল। ইউরোপে খুব চাহিদা হ'ল। দু'হাজারের মত ইঞ্জিন এত দিনে বিক্রি হয়ে গেছে। ১৮৭৬ সনে এঁদের ৬টি ইঞ্জিন আমেরিকায় প্রথম রপ্তানি করা হ'ল। এই ইঞ্জিনের আশাতীত চাহিদা হ'ল আমেরিকার বাজারে। লোকেরা এই ধরনের ছোট ইঞ্জিনের উপযোগিতা বুঝতে আরম্ভ করল। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বয়লারের মত আগুন রাখার দরকার নেই। গাড়ি ইচ্ছে মত চালান বা থামান যায়। যখন গাড়ি চলেছে না, তখন তদারকীর দরকার নেই। আকারেও গাড়িটা অনেক ছোট। এর পর অটো ও ল্যাঙ্গডেন-এর ইঞ্জিন নকল করে আমেরিকাতে ইঞ্জিন তৈরি হতে লাগল।

১৮৮০ সন নাগাদ অটো ও ল্যাঙ্গডেন-এর কোম্পানি ছেড়ে ডেমলার জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে নিজে কারখানা খুলে ইঞ্জিনের উন্নতির কাজে মন দিলেন। ইঞ্জিনকে আরো হালকা করতে হবে, বেগ আরও বাড়াতে হবে। জ্বালানি হিসাবে গ্যাসের বদলে তরল তৈল ব্যবহার করে একটা বেশ উন্নত ইঞ্জিন তৈরি করলেন তিনি। ইঞ্জিনটা গাড়িতে বসিয়ে চালালেই হয়।

একই সময়ে জার্মানির আর একটি শহর ম্যানহিম-এ আর একজন ইঞ্জিনিয়ার কার্ল বেঞ্জ একই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের পরস্পরে কোন যোগাযোগ ছিল না। বেঞ্জ ও ডেমলার দু'জনেই অটোর ধরনের ইঞ্জিনের আরো উন্নতি করে ও তরল জ্বালালি ব্যবহার করে আলাদাভাবে রাস্তায় গাড়ি বের করলেন ১৮৮৫ সনে। ডেমলার ইঞ্জিনটা বসালেন দু'চাকার সাইকেলে। একই বছরে অর্থাৎ ১৮৮৫-এ দুজনেই পেটেণ্ট করান। পরের বছর দুজনেই চার চাকার গাড়িতে ইঞ্জিন বসিয়ে বাজারে ছাড়তে লাগলেন।

বেঞ্জের ইঞ্জিন ছিল তুলনায় বেশি উন্নত। তিনি সোজা ব্যবসায় নেমে গেলেন এবং কারখানায় গাড়ি তৈরি করে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তা বাজারে ছাড়তে লাগলেন। ডেমলার নজর দিলেন ইঞ্জিনের উন্নতির দিকে। ফলে তাঁর গাড়ির চাহিদা হ'ল বেশি। ডেমলার-এর কাছ থেকে পেটেণ্ট অধিকার নিয়ে কয়েকটা কোম্পানি গাড়ি তৈরি করতে লাগল। এই রকম একটা ফরাসী কোম্পানির নাম প্যানহার্ড ও লেভাসর। এরা গাড়ির গঠনের উন্নতিতে মনোযোগ দিল। ১৮৯২ সনে গাড়ির কাঠের চাকার ওপর নিরেট

রবারের টায়ার বসান হ'ল, কিন্তু সামনের চাকার চেয়ে পেছনের চাকা বড় থেকে গেল, ঘোড়াটানা গাড়ির মত। এতদিন গাড়ির গঠনে নতুন ইঞ্জিনের উপযুক্ত গাড়ির গঠনের প্রয়োজনের কথা কেউ ভাবেনি। ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়ার বদলে ইঞ্জিন বসানর কথাই ভাবছিলেন বেশি। এরাই মৌলিকতার পরিচয় দিল গাড়ির গঠনের চিন্তায়।

অবশেষে মানুষের হাতে এল একটি নতুন সামগ্রী শক্তির নতুন উৎস। কাজেই এর নামকরণ করা চাই। ফ্রেঞ্চ একাডেমি এই সমস্যার সমাধান করে দিল। এই গাড়ির বৈশিষ্ট্য হ'ল—এ নিজেই চলে, অর্থাৎ স্বয়ং চলক্ষম। গ্রীক ভাষা থেকে নেওয়া হ'ল 'অটস' (autos)—অর্থ স্বয়ং এবং ল্যাটিন থেকে 'মোবিলিস' (mobilis)—অর্থ চলক্ষম। এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে একটি নতুন শব্দ সৃষ্টি হ'ল 'অটোমোবাইল'। ১৮৯৫ সনে ফ্রেঞ্চ একাডেমি শব্দটির অনুমোদন দিল।

কিন্তু একটি প্রধান অন্তরায় তখনও দূর হয়নি। চাকার টায়ার তখনও লোহার। ফলে রাস্তার ক্ষতি তো হতই, তাছাড়া দারুণ শব্দ, মন্থর গতি এবং বিরক্তিকর ঝাঁকানিও ছিল। এ সমস্যার সমাধান করলেন অয়র্ল্যাণ্ডের জন্ বয়েড ডানলপ। ছেলেকে একদিন লোহার টায়ারের সাইকেলে চড়তে দেখে আশঙ্কিত হলেন। মাথায় বুদ্ধি এল—আচ্ছা, রবার দিয়ে মুড়ে দিলে কেমন হয়। ফল এত ভাল হ'ল যে, তিনি শেষ পর্যন্ত হাওয়া ভর্তি রবারের টায়ার আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন।

সাইকেলের জন্য রবারের টায়ার ১৮৮৯ সনে আমদানি হওয়াতে আমেরিকায় সাইকেলের যুগের সূচনা হ'ল। পরে হাওয়া-ভর্তি রবারের টায়ার মোটর গাড়ির চাকায় ব্যবহৃত হলে, মোটর গাড়ির কর্মদক্ষতা অনেক বাড়ল এবং গাড়ির জনপ্রিয়তা দারুণ বেড়ে গেল। বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়ীরা, কারিগররা এই গাড়ির উৎপাদনে এগিয়ে এলেন; উৎপাদনের পরিমাণ প্রভূত বাড়িয়ে ফেললেন। যে সব দেশ উৎপাদন করতে পারল না, তারা আমদানি করতে লাগল।

ভারতের বোম্বাই শহরে প্রথম মোটর গাড়ি আমদাদি হ'ল ১৮৯৩ সনে আমেরিকা থেকে এবং আমেরিকারও এইটা প্রথম রপ্তানি। প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের গবেষকরা অনবরত গাড়িতে উন্নতি সংযোজিত করে গাড়িকে একটি আদর্শ বাহনে রূপান্তরিত করতে লাগলেন। মোটর গাড়ির আদিপর্ব এইখানেই শেষ হ'ল।

কুয়োতে ভূত

শ্রীআরতি সেন

দিল্লীর ইতিহাস লেখার অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষের রাজধানী মাত্র ৫০ বর্গ মাইলের মত জায়গায় সাতবার সাতটি স্থানে গড়া হয়েছে। বর্তমান দিল্লী নাকি অষ্টম রাজধানী, তাই দিল্লীর চারপাশে শুধু ভগ্নাবশেষে ভরা। পুরোনো দিনের রাজত্ব আর রাজা-রাজড়াদের কীর্তি-কলাপের চিহ্নগুলো এখানে ছড়িয়ে আছে।

লোককথায় দিল্লী সম্বন্ধে দারুণ এক মজার গল্প আছে। অনঙ্গপাল তখন দিল্লীর রাজা, এক সময় তাঁকে এক ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, নাগরাজ বাসুকী তার নিজের মাথায় ধরে আছেন রাজধানী, এই নগরীকে। রাজা অনঙ্গপালের কৌতূহল হ'ল কথাটা সত্য কিনা প্রমাণ করে দেখবার। কি করে দেখবেন? রাজা অনঙ্গপাল তখন বাসুকী নাগের সন্ধান মেলে কিনা দেখার জন্য ভূমি খনন করার আদেশ দিলেন। কোদাল, শাবল নিয়ে জমি খোঁড়া আরম্ভ হয়ে গেল। হঠাৎ দেখা গেল নাগরাজের রক্তে মাটি হয়ে উঠেছে লাল, রাজা অনঙ্গপাল ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, থামো থামো। কিন্তু ততক্ষণে মাটি নাগরাজের রক্তে ভিজে উঠেছে। ভালো করে মাটি চাপাচুপি দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু রাজার পাপের বোঝায় মাটি আর শক্ত হ'ল না। তাই তার নাম হ'ল ঢিলি অথবা ঢিলে। শহরের মাটি হ'ল ঢিলি, রাজা অনঙ্গপালের নাম লেখা লৌহস্তম্ভ হ'ল ঢিলি। ঢিলি-শিথিল-আলগা মাটির নাম থেকে শহরের নাম হ'ল ঢিলি, তাই থেকে দিল্লী। ঢিলে মাটি দিয়ে গড়া রাজধানী তাই আশেপাশে নড়ে যায়। ইতিহাসে-জানা দিনগুলোতেই এদিক-ওদিক কত শহর উঠেছে আর হারিয়ে গেছে। কিলোখেরী, সিরি, তুগলকাবাদ, ফিরোজাবাদ, দিনপন্থা, সেরগড়, শাজাহানাবাদের শেষে আজকের দিল্লী; তাও ইংরেজ আমলেই এদিক থেকে ওদিকে সরেছে। শাহজাহানের এমন লালকেল্লা তাও আজ পুরোনো শহর। পুরোনো শহরের কবরে, কুয়োতে, অলিতে-গলিতে বিদ্বান লোক খুঁজে বেড়ায় সেকালের খবর। কিন্তু সাধারণ লোক গল্প বলে অনেক অশরীরীর সন্ধানের।

এ রকম গল্প বলার একটি মানুষ হলেন নবাব আলী সাহেব। লালকেল্লার ভেতরেও নাকি অশরীরীর অন্ত নেই। চৌকিদাররা কত দেখেছে সে যুগের পালোয়ান কেমন ক'রে চাঁদনী রাতে ডন-বৈঠক করছে। সুন্দরীদের দেখা যায় না বটে, কিন্তু দিওয়ান-ই-খাসের পাশে তাদের নূপুরের আওয়াজ শোনা যায়—ঝম্ ঝম্ ঝম্। কবে নাকি এক চৌকিদার বেসামাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, নর্তকীর পদাঘাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। কোথাও বা শিশুর কান্না, মধ্যরাত্রের নিস্তব্ধতায় গুমরে গুমরে ওঠে। কি জানি এ শিশুরা হয়তো রাজা-বাদশার ঘরের কোন চক্রান্তে মরা শিশু। নবাব আলী সাহেবের গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগতো, কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আমি মুগ্ধ হয়ে ভৌতিক কাহিনীর রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি।

নবাব আলীর গল্প একদিন করেছিলাম ওয়ার্ডিংটন সাহেবের কাছে। ওয়ার্ডিংটন সাহেব অদ্ভুত মানুষ। স্বাধীনতা লাভের পর যে সব ইংরেজ নিজের নেশায় ভারতবর্ষের ভালোবাসা ভুলতে পারেনি, ওয়ার্ডিংটন সাহেব ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। উনি ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বড় অফিসার। এরকম অফিসার সরকারী দপ্তরে আরো দু'চারজন ছিলেন। পার্সি ল্যাঙ্কাষ্টার যার বাবা আলীপুরের হর্টিকালচারের বাগানটি তৈরি করেছেন, তিনিও ছিলেন এরকমই একজন পাগলা সাহেব। ভারতবর্ষের গাছপালা ফুল ভালোবাসতেন, তাই ইংরেজ চলে গেলেও ভারত ছাড়তে তিনি পারেন নি। ওয়ার্ডিংটন সাহেবের নেশা ছিল দিল্লী আর দিল্লীর কাছে যত অজানা ভগ্নাবশেষ আছে তার মাঝে ঘুরে বেড়ানো। যে ভাঙা মসজিদের ইতিহাস পাওয়া যায় না, সেইখানেই বসে দিন কাটাতে পারলে তিনি আর কিছুই চাইতেন না। কোন্ গ্রামে পুরানো কুয়ো আছে, তার ইঁটের বয়স কত, সেই সব অঙ্ক ক'ষে কাল কাটানো ছিল তাঁর মস্ত আনন্দ।

ওয়ার্ডিংটন সাহেব কিন্তু বলতেন, গ্রামের লোকেরা ভগ্নস্তূপ দেখলেই তাতে একটি ভূতের অস্তিত্ব দেখতে পায়। এই রকম একটি ভূতের গল্প একবার ওয়ার্ডিংটন সাহেব শুনলেন। দিল্লী থেকে ২।৪ মাইল তফাতে একটি গ্রামে আছে, তার নামটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তবে সেখানে ছোট ছোট মাটির ঘরে খুব কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি করে লোকেরা বাস করতো। দারুণ জলকষ্ট, সামান্য একটু তফাতে মস্ত বড় খাড়ি বাউলি, মানে সোজা নেমে যাওয়া কুয়ো মাঠের মাঝখানে। ধ্বংসাবশেষের গায়ে এমন একটি কুয়ো অথচ জলের কষ্ট কেন? গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই সেই কুয়োর ত্রিসীমানায় আসতো না। কুয়োর ভেতরে নাকি অনেকেই দেখেছে জলজ্বল করছে একজোড়া ভূতের চোখ। দিনে-রাতে সব সময় চোখ দুটো সকলের চোখে পড়ে। গ্রামবাসীরা দলবেঁধে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে পূজোর আয়োজন করে থাকে। তারপর যখন বহু চেষ্টা ক'রেও চোখের অধিকারী মহাশয়কে সরানো গেলো না, তখন প্রতি অমাবস্যায় গাছের তলায় তেল-সিঁদুর মেখে ধূপ-ধুনো জ্বেলে সাধু-সন্ন্যাসীদের একত্র করানো হ'ল, চেলার দলও জুটলো অনেক, কিন্তু তা সত্ত্বেও জোড়া চোখ অচল! একবার ওয়ার্ডিংটন সাহেবের কাছে খবর আনলো তার খাস-বেয়ারা ধনীরাম। তার কোন আত্মীয়কে নাকি এই ভূতে পেয়েছে। সে চেঁচামেচি করছে আর কুয়োর ভূতের কথা আওড়াচ্ছে। ওয়ার্ডিংটন সাহেব ধনীরামকে খুব ভালোবাসতেন। ভাবলেন, পুরোনো ভগ্নাবশেষও দেখা হবে আর ধনীরামেরও একটা উপকার করা হবে, এই ভেবে তিনি তার গাঁয়ে একবার গেলেন। সঙ্গে নিলেন একটি জোরালো বড় টর্চ আর শক্ত খানিকটা দড়ি। কি জানি যদি কুয়োর ভেতরে নামতে হয়। যখন গ্রামে পৌছলেন তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গ্রামের কোন লোকই তার সঙ্গে কুয়োর কাছে যেতে হ'ল না। তারা সাহেবকে অনেক করে বোঝালো, কেন সাধ করে ভূতের খপ্পরে যাবে

সাহেব! আমরা গ্রামসুদ্ধ লোক এই ভূতকে দেখেছি, সাধু-সন্ন্যাসীরা ধূপ-ধুনো দিয়ে মন্ত্র পড়ে কত রকমের চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি, আর তুমি বিদেশী মানুষ বেঘোরে প্রাণটা কেন দেবে?

ওয়ার্ডিংটন সাহেব পড়লেন মহা বিপদে। সঙ্গে একটি লোক হলে সুবিধে হ'ত, তবু কেউ যখন যেতে রাজী হচ্ছে না, তখন একাই তিনি রওনা হলেন। কুয়োর কাছে পৌঁছে দেখলেন, কুয়োর কিছু দূরে ফুল, ফল আর পূজোর অবশিষ্ট স্তূপাকৃত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু ঠিক কুয়োর কাছে কিছু নেই। ইদানীং অতদূর পর্যন্ত কেউ যেতে সাহস করতো না। সাহেব আস্তে আস্তে কুয়োর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালেন—সেই সেকালের খানদানী কুয়ো, বিরাট তার পরিধি, এককালে হয়তো কোন রাজা-বাদশার তৈরি পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। আজ আগাছা-জঙ্গলে ভরা, কুয়োর তলায় সামান্য জল চিক্‌চিক্ করছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী চক্‌চক্ করছে যা তা' হ'ল একজোড়া চোখ! ওয়ার্ডিংটন সাহেব সাহসী মানুষ, কিন্তু চোখ দুটো যেন তাকেও কেমন ভয় পাইয়ে দিল। কেমন করে এই শূন্য মাঠের পরিত্যক্ত কুয়োর ভেতর এরকম জ্বলজ্বলে দুটি চোখ এলো? কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ওয়ার্ডিংটন সাহেব একটি গাছের সঙ্গে মোটা দড়ি শক্ত ক'রে বেঁধে, দড়ির অন্য দিকটা কুয়োর ভেতর নামিয়ে দিলেন। নিজে খুব সাবধানে একটু একটু করে কুয়োর গা-বেয়ে নামতে লাগলেন। দড়িটা কাছে রইলো হঠাৎ
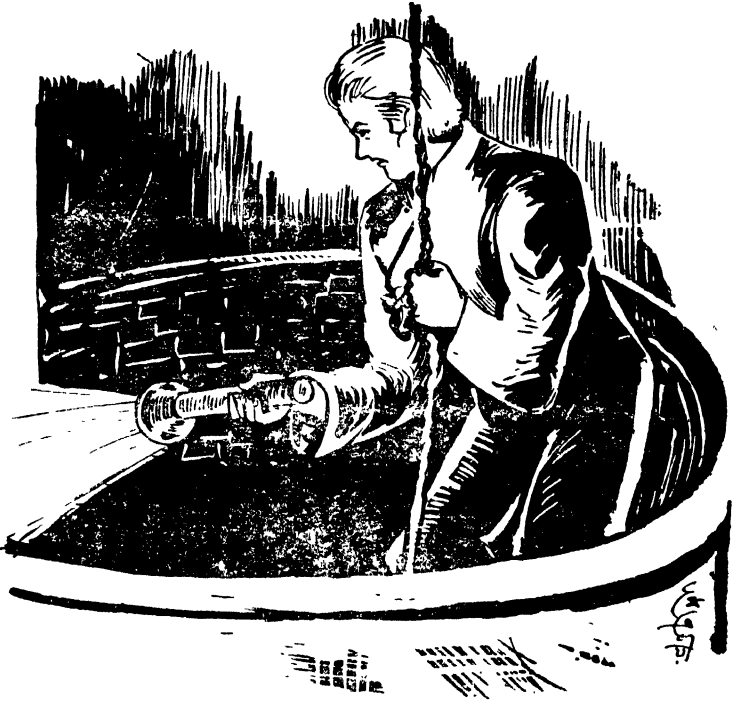
'সাহেব টর্চ ফেলে কুয়োর মধ্যে লক্ষ্য করলেন'—

দরকারের জন্য। কিছু দূর নেমে টর্চ জেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখটি দেখার চেষ্টা করলেন। চোখ দুটি ঠিক তেমনি আছে, ঝকঝক করছে। এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি, স্থির দৃষ্টিতে ওয়ার্ডিংটন সাহেবকে দেখছে। মিঃ ওয়ার্ডিংটন আর একটু নামলেন, চোখ দুটো আরো কাছে এলো। আরো একটু নামলেন, চোখ আরও কাছে দেখে গেল। ওয়ার্ডিংটন সাহেব হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, কুয়োর এদিক-ওদিক জুড়ে সজারুর কাঁটার মতন ছেয়ে আছে কি যেন! এবার পরিষ্কার হয়ে উঠল চোখের খবর। চোখ দুটো একটি সজারুর। সজারুটি হয়তো কোন কালে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল কুয়োর মধ্যে। সেখান থেকে সে উদ্ধার পায়নি, শুধু পোকামাকড় আর জল খেয়ে জীবনধারণ করে এসেছে। নড়াচড়ার অভাবে মোটা হয়ে গিয়েছে। কুয়োতে ডুবে মরার ভয়ে কাঁটা দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে কুয়োর গা। দড়ি ধরে ধীরে ধীরে উঠে এলেন ওয়ার্ডিংটন সাহেব। পরে গ্রামের লোকদের ভূতের কথা বললেন। তবু কি গ্রামের লোক বিশ্বাস করে! তারা সবাই একমত, সাহেব নিশ্চয়ই পাগল, কিংবা ভূত দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পরদিন, দিনের বেলায় সাহেব তার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কুয়োর পাড়ে গিয়ে অতি কষ্টে সজারুকে উদ্ধার করলেন। চোখের মালিক নতুন জীবন পেল। সাহেব এবার গাঁয়ের মোড়ল মশাইকে কুয়োর পাড়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, এবার চোখ দুটো কোথায়? তার পরেও নাকি বহুদিন পর্যন্ত গ্রামবাসীদের মনের ভয় ভালো করে কাটেনি।

পরে অবশ্য ওয়ার্ডিংটন সাহেব গিয়ে দেখেছেন কুয়োটা বেশ পরিষ্কার করে গ্রামবাসীরা নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। আমাদের ভূতের ভয়ের অনেকটাই বোধ হয় এই রকমেই সুরু। ওয়ার্ডিটন সাহেবের কথা শোনার পর মনে হতো, হয়তো বা নবাব আলী সাহেব আর চৌকিদাররা এই রকম ভাবেই এক একদিন ভূত দেখেছে।

রাজা কোথা?

শ্রীতমাল চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষক মহাশয়
সদাশিব অতিশয়
ক্লাসে ঢুকে হেসে ডেকে
ভোঁদাকে শুধায়—

বল দেখি গুড্ বয়
বুদ্ধিত কম নয়
ছোট করে ঠিক মত
দু'চার কথায়!

ভূভারতে আসে কত
রাজা ছিল মন মত
আজ তারা কোথা গেল
দেশে কেন নাই?

ভোঁদা উঠে ঘাড় তুলে
ক'টি বার হেলে দুলে
ভাবে মনে একি হ'ল
আপদ বালাই!

নাম তার ভোঁদা বটে
ঘিলু তবু ছিল ঘটে।
ভেবে নিয়ে ছোট করে
বলে তাই শেষে—

রাজাগুলো ছিল ভাল
ইতিহাসে চলে গেল
সাজা-রাজা আছে শুধু
হতভাগা দেশে।

কর্পূরের মতো

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ।। উপন্যাস ।।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাতুলদা বললেন—মাধু সিং পথ হারাবে কি ? তাছাড়া বড়ধেমো যেতে গেলেও তো তাকে তিলুড়ি আর লুন্টি হয়ে যেতে হবে।

দারোগা বললেন—না, মাঠঘাট দিয়েও যে যাওয়া না যায় তা নয়, তবে গাড়ী নিয়ে যাওয়া চলে না। তিলুড়ি-হ্রদের উল্টো দিকে যে ভুম্‌লির জংগল আছে—ওখান দিয়ে পায়ে হেঁটে দেহাতীরা কখনো কখনো যায় বটে। মোটর গাড়ী নিয়ে ও-পথে কেউ যাবে বলে মনে হয় না। আর তা যাবে কেন—মোটিভ্‌ কি ? মোটিভ্‌ ছাড়া কেউ কোন কাজ করে না।

আমি বললাম—এমনও হতে পারে রোটাংভিতে আপনার হাতে চিঠি দিয়ে মাধু সিং রোটাংভিতেই ফিরে গেছে—ওখানে কোনো ব্যাপারে আট্‌কা পড়েছে—

রাতুলদা বললেন—কাল শনিবার, আজ হয়তো সিনেমা হলে ওদের জন্যে স্পেশাল কোনো ছবিটবি দেখানো হচ্ছে ; গত বছর ক'দিন তো এরকম হয়েও ছিল—

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—গত বছর যখন হয়েছিল তখন তার আগে গার্জেনদের জানানো হয়েছে, যাদের বাড়ীতে টেলিফোন আছে—জানানো হয়েছিল। আমি আজ স্কুলে গিয়েছিলুম, সেরকম কোন প্রোগ্রাম নেই—

তা'হলে ?

তা'হলে স্টেশন ওয়াগন কোথায় গেল ? রোটাংডি ছেড়েছে চারটে বেজে পনেরো মিনিটে, তিলুড়ি আসার কথা তার আঠারো মিনিট পরে—অথচ তিলুড়ির এদিকে গাড়ী দেখা যায়নি, তা'হলে কোথায় গেল গাড়ীটা ? দারোগা সাহেব নিজে দেখেছেন—রোটাংডি থেকে তিলুড়ির দিকে গাড়ী ছেড়ে গেল, মাধু সিং যথারীতি গাড়ী নিয়ে গেল, ছেলেরাও ভেতরে বসে গল্পগুজব করছে—রোজ যেমন করে। আবার তিলুড়িতে কৃষ্ণমূর্তি সওয়া চারটে থেকে অপেক্ষা করছেন, বীরুয়া-ও চেয়ে আছে মাধু সিং কখন আসবে, সেনবাবুদের জন্যে রাখা তরিতরকারীগুলো মাধু সিং-এর হাতে করে পাঠাতে হবে রূপজামে—অথচ মাধু সিং গাড়ী নিয়ে এল না—গেল কোথায় গাড়ীটা ? খোঁজাও তো কম হলো না!

রাতুলদা বললেন—চলুন একবার রোটাংডিতে মাধু সিং-এর বাড়ীতে খবর নেওয়া যাক।

কৃষ্ণমূর্তি করুণ কণ্ঠে বললেন—বাচ্চাদের না জানি কত খিদে পেয়েছে,—হয়তো কান্নাকাটি করছে—

এ কথায় সকলেরই মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

দারোগা বাবু বললেন—আপনারা এগোতে পারেন ; আমাকে এখানে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমি ধানবাদে ফোন করে রাজ্য-গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য চেয়েছি, এখুনি সেখান থেকে কয়েকজন আসবেন, তিলুড়ি পাম্পিং স্টেশনে আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

গোয়েন্দা পুলিশ ?

চুরি-ডাকাতির কোনো ব্যাপার আছে নাকি ?

কি জানি, কিছু তো বুঝে উঠতে পারিনি ; তাই বড় কর্তাদের ফোন করেছিলাম ; তাঁদের নির্দেশেই গোয়েন্দা পুলিশকে খবর করতে হয়েছে। তিলুড়ি-রোটাংডি-রূপজামকে কেন্দ্র করে অন্ততঃ খান-পঞ্চাশেক গ্রামের ভেতর খোঁজ করার নির্দেশ এসেছে, সেজন্যে এখনই বিস্তর পুলিশ এসে পৌছবে।—দারোগা সাহেব এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন।

আমি চুপ করে শুধু শুনে গেলাম। ব্যাপারটা যে খুব গুরুতর ধরণের—তা বুঝতে দেরি হয়নি। রাতুলদা'র ছেলেটা রয়েছে—সেজন্যে মনে আদৌ শান্তি পাচ্ছিলাম না। তাছাড়া এতগুলো ছোট বাচ্চা—সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছে বাড়ী থেকে, এতক্ষণ মা-বাবা ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে রয়েছে, কি যে হাল হয়েছে তাদের—ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়, বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে।

তখনই খান তিনেক গাড়ী ছুটলো রোটাংডির দিকে, একটা গাড়ীতে আমি আর রাতুলদা-ও গেলাম।

মাধু সিং-এর বাড়ী খুঁজে পেতে একটুও দেরি হলো না। রোটাংডিতে যাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, সকলেই ছোট্ট বাড়ীটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে।

মাধু সিং-এর বাবা তিন্নু সিং, বুড়ো হয়ে পড়েছে। অবশ্য বয়সের তুলনায় চেহারাটা এখনো কিছু শক্ত-সমর্থ আছে। মাধু সিং-এর বউ হলো লছমী, দু'বছর আর চার বছরের দুটো ছেলে—এই নিয়ে সংসার। মাধু সিং মোটর-মেকানিকের কাজ করে আর স্কুলের গাড়ী চালিয়ে যা রোজগার করে—তা দিয়ে মোটামুটি সচ্ছলভাবেই সংসার চলে যায়। বাড়ীর লাগোয়া কাঠা-খানেক চৌকো ধরণের ঘেরা জমিতে তরিতরকারী লাগায় লছমী, পূজোর পর থেকে চোত মাস পর্যন্ত বেশ ফসল হয়, নিজেরা খেয়ে হাটে বেসাতি করেও দু'চার টাকা থাকে। ছোট্ট সংসার—সুখেই দিন কাটে।

তিন্নু সিং ছোট বয়েস থেকে সার্কাস পার্টিতে কাজ করতো, এটা-সেটা খেলা দেখাতো, দড়ির খেলা, তারের খেলা; তারপর সাজতো ক্লাউন। ক্লাউন হিসেবেই ট্র্যাপিজের খেলায় তার খুব নামডাক হয়। কত মেডেল, কত ইনাম সে নিয়ে এসেছে—তার হিসেব নেই। সত্তরটা তালিমারা ক্লাউনের সাতরঙা জামা পরে, মেডেলের মালা গলায় দিয়ে, এক-একদিন বুড়ো তিন্নু সিং নাতি দুটোকে চমকে দেয়, লছমীও মজা পায় খুব, এমনকি মাধু সিং-ও। তিন্নু সিং-এর মুখে সার্কাস জীবনের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। যে যে-কোন বিষয়েই আলাপ করুক না কেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিন্নু সিং ঠিক সার্কাসের কথায় এনে ফেলবে।

তিন্নু সিং-এর এই চরিত্রটা সকলেরই জানা ছিল। তাই তিন্নু সিং-এর বাড়ী গিয়েই প্রথমে আমরা মাধু সিং-এর খোঁজ করলুম। মাধুর বউ লছমী বললে—এখনো বাড়ী ফেরে নাই বাবু।

রোজ ফেরে কখন?

ফেরে সন্ধ্যার পর। এক-একদিন স্কুলের গাড়ী রেখে কারখানায় কাজ করতে যায়, ফিরতে রাত হয়।

আজ কখন ফিরেছে?

এমন সময় তিন্নু সিং-এর গলা পাওয়া গেল,—কার সাথে বাত করছিস রে লছমী-মা?

আমরা এসেছি মাধু সিং-এর খোঁজে—রাতুলদা বললেন।

তিন্নু সিং এসে হাজির হলো। বুড়ো, কিন্তু চেহারায় তবু স্বাস্থ্যের একটা জলুস আছে। ছোট ছোট কাঁচাপাকা চুল মাথায়, দাড়ি গোঁফ কামানো মুখ। কপালে কিছু কুঞ্চিত রেখা। এককালে চেহারা বেশ লম্বাচওড়া ছিল। তিন্নু সিং এসেই লছমীকে হুকুম দিলে—বাবুদের বসার ব্যবস্থা করো আগে, চা তৈরী করো, বিস্কুট বোলাও; তারপর বাতচিত হবে।

লছমী ইতস্ততঃ করছে দেখে তিন্নু সিং ফের বললে—বাবুদের বসতে তো দাও আগে। ঘরের টুল এনে দাও, ওদিকে রোয়াকে কাঠের যে বাক্স আছে—সেটা লাও। মোড়া মাড়িয়ে আনো।

বসার জন্যে অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই, বিশেষ একটা কাজে আমরা এসেছি এখানে।

তা কি আর আমি বুঝিনি? আমার কাছে, আমার বেটার কাছে কোনো মানুষ কখনো কাজ ছাড়া কি এসেছে? কাজের কথা তো হবেই, আগে বসুন, চা পান করুন, তবে কাজ হবে। আমাদের সার্কেস জগতের এই হালচাল। আগে চা, পরে কাম। সার্কেসে যদি চা দেয়, আর সেই চা যদি না খান, তবে কোনো কাম আপনার সেখানে হবে না, কেউ কোনো কথাই শুনবে না আপনার।

এরই মধ্যে লছমী একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, দুটো ছোটো ছোটো টুল আর গোটা কয়েক মোড়া এনে দিলে, পরে বললে—চা বানিয়ে আনছি, বিস্কুট ভি আনছি।

কৃষ্ণমূর্তি জিজ্ঞাসা করলেন—মাধু সিং স্কুলের ছেলেদের নিয়ে এখনো পর্যন্ত কি করছে—বলুন তো? সেই সকালে ছেলেরা বেরিয়েছে—

তিন্নু সিং কৃষ্ণমূর্তির মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে—সার্কেসে একবার ম্যানেজার আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তোমার মাকে গালি দেওয়া এখন বন্ধ করেছো? আমি ফস করে বলে ফেলেছিলুম—হ্যাঁ। ব্যাস্, ম্যানেজার সেই থেকে আমাকে তিরস্কার করতো, তুমি তো মাকে গালমন্দ করতে, এখন না হয় গালাগালিটা বন্ধ করেছো। আমি পরে ম্যানেজারের এই প্রশ্নের মজাটা বুঝেছিলুম।

আমরা বিশেষ একটা জরুরী ব্যাপারে এখানে এসেছি,—আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা আছে, খুব তাড়াতাড়ি তার জবাব দিতে হবে, কথা বাড়ালে চলবে না। রাতুলদা বললেন।

জবাব তো দেবই বাবু, কিন্তু প্রশ্ন ভি সোজাসুজি করবেন। তিন্নু সিং গম্ভীর হয়ে গেল।

আমি বললাম—মাধু সিং এখনো কেন বাচ্চাদের আটকে রেখেছে—তাই আমরা জানতে এসেছি।

তিন্নু সিং একটু হেসে ফেললে—একই কথা তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন বাবু। মাধু তো ছেলেদের পৌছে দিতে নিয়ে গেছে। তার বেশী আর আমরা কি করে জানবো, বাবুরা। মাধু যদি আটকে রাখে বাচ্চাদের—তবে মাধুই তা জানবে।

মাধু সিং রোটাংডি থেকে ঠিক সময় গাড়ী নিয়ে বের হয়, চারটে পনেরো মিনিটের সময় থানার দারোগাবাবুকে একটা চিঠি দিয়ে সে গাড়ী নিয়ে চলে যায় তিলুড়ির দিকে, কিন্তু তিলুড়িতে আর তাকে দেখা যায়নি। কোথায় গেল সে—তাই আমরা জানতে এসেছি।

যাবে আবার কোথায় বাবু। তিলুড়ি হয়ে রূপজামেই গেছে মাধু। রূপজামের পোলাদের পৌছে দিতে যায় রোজ। তিনু সিং বললে।

সে তো আমরা জানি; আজ সে যায়নি, তাই আমরা তার খোঁজে এসেছি। মাধু সিং এখন কোথায় আছে– তা এখনই জানার দরকার।

এ কথা শুনে তিনু সিং-ও যেন একটু চিন্তিত হলো বলে মনে হলো। মাধু সিং রূপজামে যায়নি—এর মানে কি হতে পারে?

রোটাংডি থানা আর তিলুড়ির মধ্যে থেকে মাধু সিং-এর গাড়ী আর স্কুলের ছেলেরা—মানে যে ক'জন ছেলে ঐ গাড়ীতে ছিল—এদের কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। মাধু সিং কি তোমায় কিছু বলে-টলে গেছে—রাতুলদা জিজ্ঞাসা করলেন।

না, তো—যেমন রোজ যায়, বেটা আজও তেমনি গেছে, কিছু বলে নাই।

লছমী মাটির ভাঁড়ে করে চা দিয়ে গেল, একটা প্লেটে কিছু বিস্কুটও।

তিনু সিং জিজ্ঞাসা করলে—লছমী রে, বেটা তোকে কিছু বলেছে নাকি, সাঁঝে কোথাও যাবার বাতচিত আছে?

মাধু সিং যে হারিয়ে গেছে—আমাদের কথাবার্তা থেকে লছমী তেমন একটা কিছু আন্দাজ করে থাকবে। সে কিছু জানে না বলে ব্যাকুলভাবে চলে গেল।

তিনু সিং বললে—বেটা হারিয়ে গেল? জোয়ান মরদ হারাবে কেন, বাবু?

রাতুলদা বললেন—হারাবে কেন—সেই তো আমাদের কথা। কোথায় আছে জানো?

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—বাচ্চারা সেই কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছে, টিফিনে কি একটুখানি কিছু খেয়েছে কি না খেয়েছে—এখন রাত হয়ে গেল, তাদের খাওয়াদাওয়া হয়নি। তাদের মায়েরা কাঁদছে, তারাও হয়তো কাঁদছে—

আমি বললুম—যদি জানো তো বলে ফেলো দয়া করে। ছেলেদের মা-বাবা বড় কষ্ট পাচ্ছেন!

করুণ দৃষ্টি মেলে তিনু সিং একবার আমার দিকে তাকালো, পরে মাটির দিকে চোখ রেখে বললে—বাবুরা, আপনাদের ছেলেরা হারিয়েছে বলে আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন, মাধু কি আমার বেটা নয়, আমি কি কষ্ট পাচ্ছি না এই বাত শুনে?　　　　(ক্রমশঃ)

দীঘল ঠ্যাঙ্গিয়া

(অসমীয়া উপকথা)

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

এক ছিল বুড়ী ; সংসারে সে একা। সহায়-সম্বল বলতে তার ছিল কতকগুলো গরু। সেই গরুর দুধ বিক্রি করে যা পেত, তাই দিয়ে অতি কষ্টে চলত তার খাওয়া পরা। তার শোবার ঘরটা ভেঙে পড়ছিল একটু একটু করে। কিন্তু সারাবার সঙ্গতি ছিল না তার। ঘরের চালাটা নতুন করে ছাওয়া দরকার, কিন্তু তার উপায় নেই। বাঁশের বেড়াগুলো নড়বড়ে ; চালে অগুন্তি ফুটো। বাদলার দিনে অবিরাম জল পড়ে ঘরের মেঝে ভেসে যায়। এমনি শোচনীয় অবস্থা।

সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই মুষলধারায় বৃষ্টি ঝরা শুরু হ'ল। খাওয়াদাওয়ার পর ভাঙা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে জোর গলায় প্রার্থনা শুরু করলে—"হে দেওতা, দীঘল ঠ্যাঙ্গিয়া (লম্বা পা-ওয়ালা) যেন রাতে আমার ঘরে এসে চড়াও না করে।" প্রার্থনা শেষ করে শুতে গেল বুড়ী।

এদিকে হয়েছে কি, এক চোর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বুড়ীর গোয়াল ঘরে উঁকিঝুঁকি মারছিল, আর একটা বাঘও ওত পেতে ছিল দরজার কাছেই। দু'টিরই উদ্দেশ্য মহৎ—বুড়ো বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই গোয়াল ঘরে ঢুকে একটা গরু নিয়ে পালাবে। দু'টিতেই শুনল বুড়ির প্রার্থনা, কিন্তু 'দীঘল ঠ্যাঙ্গিয়া' যে আবার কি চিজ কেউই তা বুঝতে পারল না।

ঘুমে সবে চোখ দুটি বুঁজে এসেছে বুড়ীর এমন সময়ে চোরটা হাতড়ে হাতড়ে দরজাটা ঠেলে ঢুকল গিয়ে গোয়াল ঘরে। সে ভাবতে লাগল, কোন গরুটা ভল, আর কোনটা খারাপ— এই ঘুটঘুটে আঁধারে তা বুঝবে কেমন করে? অনেক ভেবেচিন্তে সে ঠিক করল যে, এটা পরখ করার সবচেয়ে ভাল উপায়, গরুগুলোর লেজে হাত দেওয়া। হাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেটা লাফিয়ে উঠবে তিড়িংবিড়িং করে, বুঝতে হবে সেটাই সবচেয়ে চটপটে আর পালের সেরা। বেশ একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়, কাজেই মনে মনে সে খুব খুশী হয়ে উঠল। তারপর আন্দাজের উপর ঠাওরে ঠাওরে এক-একটার লেজে হাত দিতে লাগল। কিন্তু একটারও যেন কোনও সাড় নেই। অন্ধকারের মধ্যে চোখে যেন তার ধাঁধা লেগে গেছে। তারপর কখন যে দরজার বাইরে একপাশে ওত পেতে থাকা বাঘটার একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে তা টেরও পায়নি চোর। অজান্তে যেই না তার লেজে হাত দিয়েছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটা লাফিয়ে উঠল তড়াক্ করে। চোরের তখন মনে হ'ল যে, লাফানো গরুটাই হচ্ছে সেরা গরু, কাজেই ওটাকেই নিয়ে যাবে সে। তাড়না করে বাড়ী নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে চোরটা তখন

বাঘটার লেজ মলতে লাগল। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, বাঘ তো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তার লেজ মলে এত সাহস কার! তবে কি এই সেই দীঘল ঠ্যাঙ্গিয়া, যার নাম বিড় বিড় করে বুড়ী বারবার উচ্চারণ করেছিল তার প্রার্থনার সময়। ভড়কে গিয়ে বাঘ দিলে আর একটা প্রচণ্ড লাফ। চোর তখন ভাবলে গরুট শুধু তেজীই নয়, পাজীও বটে। কাজেই জানোয়ারটার উপর সাওয়ার হয়ে না বসলে কিছুতেই ওকে বাগ

'তাকে পিঠে নিয়েই বাঘ ছুট দিল পড়ি-কি-মরি করে।'

মানানো যাবে না। এই না ভেবে সেও মরিয়া হয়ে এক লাফ মেরে বাঘের পিঠে গ্যাঁট হয়ে বসল। ভয়ে বাঘ তখন কেঁচোটি হয়ে গেছে, তার মনে আর অণুমাত্রও সংশয় রইল না যে, এ-ব্যাটা আর কেউ নয়, এ হচ্ছে সেই দীঘল ঠ্যাঙ্গিয়া। কিন্তু ব্যাটা যে নিতান্তই কাবু করে ফেলেছে তাকে। এর হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় কি তা ঠিক করতে না পেরে তাকে পিঠে নিয়েই বাঘ ছুট দিল পড়ি-তো-মরি করে। ওদিকে চোরের তো প্রায় ডিগবাজি খাওয়ার অবস্থা। তার মনে খটকা লাগল যে, এই জানোয়ারটা গরু হতেই পারে না। কেননা গরুর চোদ্দপুরুষে কেউ কোনদিন অমন পবনের বেগে ছুটতে পেরেছে! এটা তা'হলে সেই দীঘল ঠ্যাঙ্গিয়া যার নাম আউড়ে ছিল বুড়ী।

এখন চোর আর বাঘা উভয়েই একে অপরকে মনে করছে দীঘল ঠ্যাঙ্গিয়া বলে, আর আতঙ্কে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। এখন চোরকে পিঠে নিয়ে বাঘ তো এসে ঢুকল জঙ্গলে। অন্ধকারে কিছু দেখতে

না পেলেও চোরটা বুঝতে পারল যে, পথ ছেড়ে এবার বিপথে ছুটে চলেছে দীঘল ঠাঙ্গিয়া। মাঝে মাঝে ডালপালার আঘাত লাগছিল তার মাথায়, গায়ের চামড়া ছড়ে যাচ্ছিল বুনো গাছের কাঁটায়। বাঘের গতি ফেরাবার জন্য অগত্যা সে তার ঘাড়টা মুচড়ে দিল। ব্যাঘ্রাচার্যের তখন মনে হ'ল, না এ ব্যাটা তো দীঘল ঠ্যাঙ্গিয়া নয়, এ নিশ্চয়ই ঘাড়-মোচড়ানেওয়ালা। যে আরও সাংঘাতিক জীব! তখন সে মরিয়া হয়ে আরও জোরে ছুটতে লাগলো। চোর দেখল বেগতিক, ঘাড় মোচড়ালে কি হবে ব্যাটার গতিবেগ যে একটুও কমছে না তখন সে করলে কি, মুঠো শক্ত করে তার লম্বা লেজটা সামনের দিকে এনে সজোরে আঁকড়ে ধরল। লেজে হাত পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘের মেজাজ একেবারে বিগড়ে গিয়েছিল, কিন্তু বুঝতে পারল যে শক্ত পাল্লায় পড়েছে, তাই মোটেই তেজ দেখালো না, একটু থমকে দাঁড়িয়ে থেকে তার পরে যা ছুট দিল তার আর তুলনা হয় না। এদিকে তার পিঠের উপর টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো চোরের পক্ষে। হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে সে নীচে পড়ে গেল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে এমন জোরে আঁকড়ে ধরল বাঘের লেজটা যে শব্দ হতে লাগল—পট, পট, পট। সঙ্গে সঙ্গেই ইয়া বড় লম্বা লেজটা বাঘের শরীর থেকে খুলে গিয়ে চলে এলো তার হাতের মুঠোয়। ল্যাজ হাতে নিয়ে চোর পড়ে রইল ঝোপের মধ্যে, আর জঙ্গলের একেবারে গহন গভীরে গিয়ে সেঁধুলো বাঘটা। একটা গাছতলায় বসে হাঁপাতে লাগল। কার পাল্লায় সে পড়েছিল, কিছুক্ষণ তা নিয়ে ভাবল, তারপর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো যে, না এ ব্যাটা তা'হলে ঘাড়-মোচড়ানেওয়ালা নয়, এ হ'ল লেজ-মলনেওয়ালা। লেজ ছিনতাই করাই হ'ল ওর কাজ। ওদিকে চোর তখন লেজটা লাঠির মত হাতে বাগিয়ে ধরে অন্ধকারে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। খানিক দূর গিয়ে দেখে জঙ্গল তত গভীর নয়। পাতলা গাছপালার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আবছা চাঁদের আলো এসে পড়েছে আশেপাশে। হাতের বস্তুটার দিকে তাকিয়ে সে তো প্রায় মূর্ছা যায় আর কি! ওরে বাব্বা, এ যে বাঘের লেজ! যা বাহার লেজটার তাতে মনে হয় এই লেজের মালিক তো দীঘল ঠ্যাঙ্গিয়ার বাবা! আর সে কিনা গরুর পিঠে চড়েছে ভেবে দিব্যি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে এই অজগর বনে এসে ঢুকেছে! তখনো রাত পোহাবার অনেক দেরি, তার মনে হ'ল যে, এখন ভয়টাকে দমিয়ে রাখাই তার আসল কাজ; নইলে নির্ঘাত মারা যাবে সে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন তার মনে এল অদম্য সাহস। আর খানিক দূর এগিয়ে প্রকাণ্ড একটা গাছ বেয়ে তার ডালের উপর চড়ে বসল আর মনে মনে দুর্গানাম জপতে লাগল।

এখন নিজের বাসায় গিয়ে বাঘ তক্ষুনি তার সাত ভায়েদের কাছে তার লেজ-খোয়ানোর কাহিনী বলল সখেদে। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মোড়ল এক সভা ডাকল। আর সেই রাতের অন্ধকারেই ছোট-বড়-মাঝারি সব সাইজের বাঘেরাই এক জায়গায় জড়ো হ'ল। তাদের মধ্যে

মাতব্বর গোছের যারা তারা ছি ছি করতে লাগল। কি লজ্জার কথা যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল। ঠিক হ'ল যে, তক্ষুনি দল বেঁধে অভিযানে বেরুবে তারা লেজ-মুলনেওয়ালার সন্ধানে।

দলটি নেহাত ছোট হ'ল না, অভিযানের সামিল হ'ল সবসুদ্ধ দু'কুড়ি বাঘ। সার বেধে এগিয়ে চলল তারা। জঙ্গলের উপরে নিচে সব দিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোথায় সে? বাহারে লেজটা উপড়ে নিয়ে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে, কোন পাত্তাই যে পাওয়া যাচ্ছে না তার। রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পাতলা হয়ে এসেছে রাতের অন্ধকার। হঠাৎ যে বাঘটা সকলের আগে আগে থেকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল গোটা দলটাকে, সে থমকে দাড়িয়ে পড়ল। উপর দিকে তাকিয়ে দেখে গাছের একেবারে মগডলে পাতার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে কে যেন বসে আছে; হাতে তার বাঘের লেজ। 'ঐ তো ব্যাটা ওখানে দিব্যি আরাম করে বসে আছে', বলে চেঁচিয়ে উঠল বাঘটা। তখন সবগুলোতে মিলে এমন সোরগোল শুরু করলে আর ভাবগতিক তাদের এমনি হল যে, যদি হাতে-কাছে পায় তবে এক মুহূর্ত দেরি না করে সব ক'টাতে মিলে নখ আর দাঁত দিয়ে তাঁকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলবে। কিন্তু চোরের বাঁচোয়া এই যে, সে অনেক উঁচুতে আছে। সেখানে গিয়ে তার নাগাল পাবার সাধ্যি কোন বাঘের পোর-ই নেই। বাঘেরা দেখলে তাইতো মহা মুশকিল; কি করা যায় এখন। শেষে সকলে মিলে অনেক মাথা খাটিয়ে ফন্দি বার করলে একটা। প্রথমে একটা বাঘ দাঁড়ালো স্থির হয়ে, তার গা-বেয়ে তার পিঠের উপরে উঠে দাঁড়ালো আর একটা। এমনি ভাবে চল্লিশটা বাঘ একই ভাবে দাঁড়ালে পর দেখা গেল যে, সবার উপরে যে বাঘটা দাঁড়িয়েছে, তার প্রায় নাগালের মধ্যে এসে গেছে চোরটা। বাঘ এবার থাবাটা উপরের দিকে বাড়ালেই পাকা ফলটির মত পেড়ে ফেলবে তাকে, তারপর গড়াতে গড়াতে চোর পড়বে গিয়ে একেবারে নিচে। তখন···একথা ভাবতেই আপনা থেকেই চোরের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল নিচে এই ব্যাঘ্র স্তম্ভের মূল খুঁটির মত যে বাঘটা দাঁড়িয়েছিল তার উপরে। আর সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে যেন এলো তার একটা মারাত্মক বেপরোয়া ভাব। আচমকা বনবাদাড় কাঁপিয়ে ভয়-জাগানো গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল: 'এই লেজ-খোয়ানো নিলাজ বাঘ, তাকা তাকা, একবার তাকা এদিকে!' বলেই বন বন করে লেঙ্গটা ঘোরাতে লাগালো লাঠির মত। তার চিৎকার শুনে ও লেজের চরকিবাজি দেখে লেজ-খোয়ানো বাঘটার বুদ্ধিসুদ্ধি কেমন যেন গুলিয়ে গেল। ব্যাটা তা'হলে ঠিক চিনতে পেরেছে তাকে, নজর রেখেছে তার উপর। কাজেই 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' একথা ভেবে মরিয়া হয়ে সে দিলে বনের ভেতর চোঁচা দৌড়। হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা আদৌ ভাবতে পারেনি অন্যান্য বাঘেরা। চকিতে যেন একটা সাংঘাতিক রকমের ওলট-

পালট হয়ে গেল। একটার গায়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে আর একটা হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল মাটিতে। মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে একবার তারা তাকাল উপরের দিকে। লেজটা তখনো অবিরাম ঘুরে চলেছে। বাঘেরা তখন ভাবল যে, আসল লেজ-উপড়ানেওয়ালার পাল্লায় পড়েছে তারা সবাই। তখন একজন মাতব্বর গোছের বাঘ বললে, ব্যাটা শুধু লেজ-উপড়ানে-ওয়ালাই নয়, দীঘল ঠ্যাঙ্গিয়াও বটে। দীঘল ঠ্যাঙ্গিয়া না হলে অত উঁচুতে উঠল কি করে? সবাই তার কথাটা যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিল। আর ভাববার অবকাশ নেই, তাই হঠাৎ গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে সবাই যে যেদিকে পারল ছুট দিল জান আর লেজ দুটোই বাঁচাবার তাগিদে।

সেই গাছের মগডালে অনেকক্ষণ বসে রইল চোর। তারপর যখন বুঝতে পারল যে বাঘেরা এ তল্লাটে আর নেই, তখন সুড়সুড় করে নিচে নেমে এসে পথ চলতে লাগল। বাড়ি পৌছে মনে মনে সে শপথ করল যে, আঁধার রাতে আর কখনো চুরি করতে বেরোবে না।

গণনা

শ্রীননীলাল দে

তিলক-ধারী জ্যোতিষ মশাই পথের ধারে বসে,
ভবিষ্যৎ ও রাশি গ্রহ বলেন অংক ক'ষে।
পথের যত যাত্রী সবাই, গণনা সব দেখে,
চতুর্দিকে ভিড় জমিয়ে দাঁড়ায় একে একে।
পোষাক পরা বেয়ারা এক শুধায় কৌতূহলে,
আমার রাশি কোনটা হবে, দিন্ না বারেক বলে।
জ্যোতিষ ঠাকুর আড়চোখেতে দিয়ে ফাঁকা কাশি,
বলেন—হবেই, সন্দেহ নেই দেখছি চাপরাশি।
পাশের সবাই অবাক মানে, গণকঠাকুর বটে,
প্রশ্নকর্তায় তাকিয়ে দেখে হো হো করে ওঠে।

ফুটবলের কথা

শ্রীঅভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুটবল আজ আমাদের সবার পরিচিত, সমস্ত বিশ্বের এক চিত্তাকর্ষক খেলা। মাঝে মাঝে এই খেলার সেকালের কথা ভাবতে আমাদের বেশ ভালই লাগে, যখন জানতে পারি আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগেকার নীল নদের তীরে ফুটবল খেলায় মিশরীয়রা কি ভাবে মাততেন, কি ভাবে এরা হাতে-পায়ে ফুটবল খেলে কোন রকমে শত্রুকে জয় করে, পায়ে খেলার বল বলে 'ফুটবলের' অর্থপ্রকাশ করতেন,—আজ তাঁদের থেকেই আমাদের সম্মান।

বস্তুতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রাণী এলিজাবেথ কর্তৃক ইংলণ্ডে ফুটবল খেলা বন্ধ করবার জন্য আইন করে দিয়েই এই খেলার আগ্রহকে বৃদ্ধি করা হয়। পূর্বে শূয়রের পিত্তির থলিকে ব্লাডার রূপে পরিণত করে, তাকে চামড়া দিয়ে তৈরী খোলের মধ্যে পুরে 'ফুটবল' তৈরী হ'ত। তারপরই সুরু হয় ফুটবল খেলার মাধ্যমে শক্তির পরীক্ষা। ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত বা দলগত বিবাদের মীমাংসা করার জন্য ইংলণ্ডেই সর্বপ্রথম এই খেলা আবার প্রচলিত হয়।

এরপর আসে ইংলণ্ডের ফুটবল ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা—ডার্বির প্রতিযোগিতা। এই খেলা বা প্রতিযোগিতা ডার্বি শহরের দুটো দলের মধ্যে এক মঙ্গলবার দিন হয়েছিল। সেই খেলাকে বর্তমানে হাতাহাতি যুদ্ধ বললেও ভুল বলা হবে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের চু-কিত-কিত বা ভেল-ডিগ্-ডিগ্ খেলার কথা মনে পড়ে যায়। খেলার শেষ খেলোয়াড় 'চুরে আপ' দিয়ে অপর পক্ষের যে কোন একজন খেলোয়াড়কে 'মোড়' করে খাল-বিল কাঁটা জঙ্গল ভেঙে, নিজের কোটে ফিরে আসে। তখনকার ফুটবল খেলোয়াড়রাও গ্রামে গ্রামে প্রতিযোগিতার সময় একটা নিয়ম (৮০ গজ) থাকতেও, তাকে থোড়াই কেয়ার করে, খানা-খন্দ বাগান-বেড় টপকিয়ে, পাহাড় উপত্যকা চ'ষে, বল নিয়ে দৌড় দিত।

আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফুটবল খেলা সম্মান পায়। বৃটেনের সম্ভ্রান্ত-বংশীয়রা একে জাতীয় খেলায় পরিণত করেন। অবশ্য এর পেছনে ছিল স্কটল্যাণ্ডের ক্যাটেনহ স্থানের ভেল অফ্ ক্যারো এবং সেলকার্ক নামে দুটো গ্রামের প্রতিযোগিতার অবদান। এই সময়ে হাতে-পায়ে খেলার নাম দেওয়া হয় 'রাগ্বি'। ক্রমে রাগবি খেলার আইনকানুন প্রস্তুত হতে থাকে।

এই ভাবে সময় গড়াতে গড়াতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম ফুটবল এসোসিয়েশানের প্রতিষ্ঠা হয়। লণ্ডন শহরের লাভগেট হিল পল্লীর এক গৃহের ছোট্ট ঘরে এই এসোসিয়েশানের প্রথম অধিবেশন বসে এবং খেলার আইনকানুন জোরদার করা হয়।

ফুটবলের হাওয়া এবার এগিয়ে আসে বাংলা দেশে। এ দেশে প্রকৃত খেলা স্থরু হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। কারণ ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে কলকাতার গড়ের মাঠে প্রথম য়ুরোপীয় এসোসিয়েশান খেলা আরম্ভ করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দেই সর্বসাধারণের মধ্যে প্রথম কাপ প্রতিযোগিতা 'ট্রেডস কাপে'র খেলা স্থরু হয়। প্রথম ট্রেডস কাপ ঘরে তোলেন ডালহাউসি ক্লাব। আর তারপর থেকেই স্থরু হয় বাংলা দেশে ফুটবল খেলার ব্যাপক প্রচলন। শোভাবাজার ক্লাব, কালীঘাটের ন্যাশানাল এসোসিয়েশান, মোহনবাগান ইত্যাদি ক্লাবের মাধ্যমে ফুটবল খেলার নেশা এগিয়ে চলে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশানের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর প্রচার সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

গৌরব জগতের

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগে যুগে মানুষের চলে নানা অভিযান—
ধৈর্যের শক্তির সাহসের জয়গান।
অজানাকে জানবার, অজেয়কে জেতবার,
রহস্য ভেদ কোরে দেখে শুনে শেখবার,
ভয় আর বিস্ময়ে কোরে ফেলে খান্ খান্
দুস্তরে দুর্গমে হয় লোকে আগুয়ান।
কানোজি আংরে নাম ছোট্ট সে নৌকার,
নেই হাল, নেই পাল, নেই ছাউনিও তার।
ডিউক পিনাকী শুধু দুই অভিযাত্রী;
দিন কাটে দাড় টেনে ভাসে সারারাত্রি।

চারদিকে খল জল নিষ্ঠুর নির্দয়
তরুণের অভিযানে বিস্ময়ে চেয়ে রয়—
মৃত্যুর ভয় নেই, কারা এই দুইজন!
ভুলে যায় ঢেউ তোলা, তর্জন গর্জন।
মোটর বোটেতে চোড়ে, জাহাজ আর বিমানে
যে কেউ তো চোলে যেতে পারে আন্দামানে।
কেউ তো দেয়নি পাড়ি দাঁড় বেয়ে নৌকায়,
পিনাকী ডিউক মিলে দেখিয়েই দিলো তায়!
ইতিহাস—মানুষের জ্ঞান খুঁজে বেড়াবার,
জয়টিকা দিল এঁকে ললাটেতে দু'জনার।

শুধু বাংলার নয়, নয় শুধু ভারতের
পিনাকী-ডিউক আজ গৌরব জগতের।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ নাম রেখেছি ল্যাম্পো ॥

পরদিন ক্যাম্পিগ্‌লিয়ার ট্রেন ধরবার জন্য বাড়ি থেকে বেরুবার আগে যখন মেয়েকে 'গুড্‌বাই' জানাচ্ছি, মেয়ে চুপি চুপি বল্লে, 'বাপি, কুকুরটা যদি ওর দেখাশুনোর জন্য একটি ছোট্ট কর্ত্রী পায় তো কেমন হয় ?'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' আমি উত্তর দিই।

আপিসে এসে দেখি কুকুরটা তখনও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমচ্ছে। যখন বুঝতে পারল আমি এসেছি, উঠে এমন সংবর্ধনার ঘটা যে ওকে শান্ত করা আমার একটা রীতিমত কাজ হয়ে পড়ল। ওকে তখনও ষ্টেশনে দেখে আমি আশ্চর্যই হয়েছিলাম। পরে আমার সহকর্মীদের কাছে জেনেছিলাম যে, ওকে কেউ তাড়াতে পারেনি।

সেদিন থেকে আমি যেখানে যেতাম কুকুরটা সব সময় আমার পেছনে পেছনে ঘুরত। আমি যখন ক্যান্টিনে খেতে যেতাম, তখনও আমাকে ছাড়ত না। ওর জন্য আমি একটা ঘন মত স্যুপের বরাদ্দ করে দিলাম। ও সেটা বেশ খুশী হয়ে গোগ্রাসে গিলে নিয়ে চোয়ালের দু'পাশ চেটে এমন ভাবে তাকাত, যেন স্পষ্ট বলত : অনেক ধন্যবাদ—অনেক, অনেক ধন্যবাদ।

এরপর ষ্টেশনই হ'ল ওর ঘরবাড়ি। আর রেল বিভাগের লোকদের সঙ্গে, বিশেষ করে

যারা ওকে আদর করত, তাদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব জমিয়ে ফেলল ও।

আমরা ঠিক করলাম ওর একটা নাম দেওয়া দরকার। ও আমাদের কাছে প্রথমে এসেছিল এক-ঝলক বিদ্যুতের আলোর মত—আচ্‌মকা। তাই আমরা ওর নাম দিলাম 'ল্যাম্পো' —মানে বিদ্যুতের আলো! নামটা পেয়ে ও যে খুশী হয়েছে তা বোঝাই গেল, কারণ ঐ নামে ওকে ডাকলেই লেজ নেড়ে ছুটে আসত।

ও যে শুধু ওর নামেই খুশী হয়েছিল তা' নয়, এই ষ্টেশনটিও ওর খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই এখানেই পাকাপাকিভাবে বাস করতে মনস্থ করেছিল। ষ্টেশনের সমস্ত আনাচকানাচ হ'ল ওর একেবারে নখদর্পণে। শুধু যে ষ্টেশনের লোকেদের সঙ্গেই ওর ভাব হ'ল তাই নয়—যত যাত্রী আসে তাদের সঙ্গেও ও বেশ জমিয়ে নিল। অল্পদিনের মধ্যেই দেখলাম তারা ওকে পছন্দ করে।

ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে ল্যাম্পো বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগল। সারাদিন মালগাড়ির মাল নামানো ও তোলা দেখত। যারা এইসব কাজ করে, এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে, তাদের অনুসরণ করে বেড়াত। কখনও সুইচ-পয়েন্টের লোক, কখনও ডাবোর কর্মচারী, কখনও রেলওয়ে পুলিশ (ষ্টেশনের বা মালগুদামের) বা গার্ড্‌রা যখন গাড়ি ছাড়বার বাঁশী বাজাত, এদের সঙ্গে বেড়িয়ে আমোদ পেত। সমস্ত আপিসগুলোতে সকলের সঙ্গে দেখা করত আর তার বদলে তাদের কাছ থেকে পেত আদর। তারপর যখন ইচ্ছে কুঁকড়ে শুয়ে নাক ডাকানো শুরু করত। দুপুরে যথা নিয়মে ক্যান্টিনে যাওয়া শিখে গেল। সেখানে জনে-জনে প্রত্যেকের কাছে ওর কিছু খাবার প্রাপ্য ছিল।

সুন্দর আলো-ঝলমল দিনগুলোতে ষ্টেশনের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে রোদ পোয়াত ল্যাম্পো আর যাত্রীদের ব্যস্ত-সমস্ত আনাগোনা লক্ষ্য করত। আর যখন ইচ্ছে ছুটে গিয়ে সামনের খোলা মাঠে ঘাসের ওপরে খানিকটা গড়াগড়ি খেয়ে নিত।

এরই মধ্যে দেখতুম আমার আপিস, মানে টিকিট-ঘরটাই ওর সবচেয়ে বেশী পছন্দ। এই খানেই ওর বেশীরভাগ সময় কাটত। এখানে ও প্রায় ঘুমিয়েই কাটাত—দিনেই হোক আর রাত্রেই হোক। যে কোন কারণেই হোক, আমার সঙ্গ অন্যদের চেয়ে বেশী পছন্দ করত ল্যাম্পো। বোধ হয় আমি ওকে বেশী আদর করতাম বলে। হয়ত বা কোন কোন মানুষের প্রতি জন্তুদের একটু বেশী পক্ষপাতিত্ব থাকে। ওর এই পক্ষপাতিত্বের জন্য আমি খুশী ছিলাম, আর ওর সঙ্গ-লাভে আনন্দ পেতাম।

এরপর ল্যাম্পো নিজের পছন্দমত দুটো জায়গা বেছে নিল। একটা গ্রীষ্মকালের জন্য; অন্যটা শীতকালের। গরমকালে, ঠিক ঢোকবার দরজার কাছে, যেখানে হাওয়া পাওয়া যেত আর শীতকালে ঠিক তার উল্টো দিক। যেখানে ঘর গরমের রেডিয়েটর থাকত, তার নীচে মাথা ও থাবা দুই পাইপের ফাঁক জায়গাটায় ঢুকিয়ে দিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঘুমোত সে।

পুরো আপিসের লোকের বিশ্বাসভাজন এবং একনিষ্ঠ পাহারাদার ছিল ল্যাম্পো। ও যেন বুঝত সিন্দুকগুলোর ভেতরে কত টাকা, দরকারী কাগজ, টিকিটের গাদা ও ছাপা ফর্ম রাখা আছে। ওর চৌকিদারীটা খুবই ভরসাজনক ছিল—বিশেষতঃ রাত্রে। কিন্তু আপিস ঘরে যখন কোন যাত্রী আসত, তখন ওকে আটকানো এক বিষম জ্বালা ছিল।

ল্যাম্পোর আসল ফটো-চিত্র

ল্যাম্পোর ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে ঘর-বাঁধবার প্রধান কারণ ছিল এই যে, একটা কুকুরের পক্ষে যা কিছু কাম্য, তার সবই সে এখানে পেয়েছিল। ঘুমোবার জায়গা, ক্যান্টিনে পেট ভরে খাওয়া ও অনেক আমোদের জিনিস। এখানকার লোকেরাও বড় ভালো—সবাই ওকে ভালবাসে।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরলেই মেয়ে আমার কোলে চেপে বসে প্রতিদিন ল্যাম্পোর খবর নেবে। যখন শোনে যে ল্যাম্পো শারীরিক কুশলে আছে আর আনন্দে দিন কাটাচ্ছে, তখন ও ভারী খুশী হয়।

এরপরেই ও শুরু করল ল্যাম্পোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। আমি এ আবদারের সম্ভাবনা আগেই আঁচ করেছিলাম। কথা দিলাম আমি ওকে একদিন ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে নিয়ে যাবো এবং ল্যাম্পোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। যদিও সে জন্ম, গোত্র, কুলশীলহীন কুকুর, কিন্তু তাই বলে এখন আর সে বেওয়ারিস রাস্তার কুকুর নয়।

॥ আমার পরিবার ও টাইগারের সঙ্গে পরিচয় ॥

কাজের শেষে ইলেকট্রিক ট্রেনে করে পিওম্বিনোতে ফেরবার আগে আমার নিয়মিত কাজ দাঁড়ালো ল্যাম্পোকে আমার সঙ্গে আসতে বাধা দেওয়া। শেষকালে যখন হাওয়া-চাপা দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং ট্রেন চলতে শুরু করে, তখন ল্যাম্পো বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ায়। যখন বুঝত ওর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ, তখন হতাশ হয়ে ফিরে যেত।

আমার খুবই ইচ্ছে হোত একটা টিকিট করে ওকে আমার মেয়ের কাছে নিয়ে আসতে। কিন্তু এরকম একটা দায়িত্ব নিতেও আবার সাহস হোত না। কুকুরটা কিন্তু সমস্ত লাল ফিতের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে নিজেই সব ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত করে নিল। একদিন আমি যখন ট্রেনে বসে বসে সিগারেট টানছি আর শরতের গোধূলির আলো উপভোগ করছি, এমন সময় বুঝতে পারলাম কুকুরটা আমার পায়ের কাছে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। পৃথিবীতে আমার পায়ের নীচেটা বোধহয় সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের ও সহজ জায়গা। মাথা তুলে একবার খুশী খুশী মুখে আমার দিকে তাকাল সে। ভাবখানা, 'কেমন বোকা বানিয়েছে তোমাকে ?'

'ওরে হতভাগা তুই এখানে কী করে এলি ?' একটু রাগের সুরেই ওকে প্রশ্ন করলাম। করিডরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম টিকিট-কালেকটর আসছে না তো ? যাই হোক ঘাড় ধরে ওকে সীটের নীচে ঢুকিয়ে দিলাম।—'ব্যস্‌! নড়াচড়া কোরো না।' যদিও কর্কশভাবে বল্লাম, কিন্তু চাপা-স্বরে। তারপর পা দুটো এমনভাবে রাখলাম যাতে ও তার পেছনে লুকোন থাকে। এবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলাম, যেন কিছুই ঘটেনি।

অল্পক্ষণের পথ, তাই ভাগ্যক্রমে কোন টিকিট-কালেকটর জানতে পারেনি যে ল্যাম্পো ওখানে ছিল। পিওম্বিনো ষ্টেশনে নেমে ও চল্ল আমার পেছনে পেছনে বাড়ি পর্যন্ত—ষ্টেশন থেকে বাড়ি খুবই কাছে।

আমি বাড়িতে ঢুকতেই যেই মেয়ে এসে আমাকে চুমু খাচ্ছে, ওমনি কুকুরটা সামনে এসে দাঁড়াল।

—'ওমা, এই বুঝি ল্যাম্পিনো ?' মেয়ে আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠল। তারপরেই তাকে জড়িয়ে ধরে আদরের ধুম্‌।

এই ভাবে আমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে ল্যাম্পোর হ'ল প্রথম পরিচয়।

রাত্রে খাবার টেবিলে সেদিন আমাদের প্রধান অতিথি ছিল ল্যাম্পো। খুবই খাতির-যত্ন হয়েছিল তার। যতবার তার দিকে কিছু দেওয়া হচ্ছিল, ততবারই সে খুব লেজ নাড়ছিল। আর বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল—ভাবখানা, এত হাঙ্গামা করে আসাটা সার্থক হয়েছে।

সুখের পথ একেবারে নিষ্কণ্টক নয়। সেদিনকার সন্ধ্যেটা ল্যাম্পোর পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছিল না। ল্যাম্পোর খাতির-যত্নের ব্যাপারে আমরা এত বেশী উৎসাহিত হয়ে ঘটা করছিলাম, যে ভুলেই গিয়েছিলাম আমাদের বাড়িতে আর একজন আছেন—তিনি 'টাইগার'; আমাদের অ্যালসেশিয়ান। ও ঠিক গন্ধ পেয়েছিল এ বাড়িতে আর একটি কুকুর এসেছে। হঠাৎ একটা ঘূর্ণি হাওয়ার মত ছুটে এসেই ও ল্যাম্পোর ঘাড়ে পড়ল। আচমকা আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে ল্যাম্পো প্রাণপণে চেষ্টা করছিল আত্মরক্ষা করতে। একটা প্রলয় ঘটে গেল। করুণ আর্তনাদ, ক্রুদ্ধ গর্জন, কামড়, ডিগবাজির মধ্যে টেবিল উল্টে হৈ-হুল্লোড় ব্যাপার!

রীতিমত পরিশ্রম করে দু'জনকে ছাড়ানো গেল। ল্যাম্পোরই বেইজ্জত হয়েছিল বেশী। কারণ শক্তি ও আকার দুয়েতেই টাইগার বড়। বেচারা ল্যাম্পো কেঁদে কেঁদে ভয়ার্ত, মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগল। যেন জানতে চাইছিল, 'এ কে বটে? কোথা হতে আগমন?'

আমরা টাইগারকে আবার বাগানে রেখে এলাম। ল্যাম্পো একটু একটু করে সামলে উঠতে লাগল। মিনা ওকে শান্ত করবার জন্য সান্ত্বনা দিতে লাগল যে ল্যাম্পো চলে গেছে। কিন্তু ল্যাম্পো তার নিজের কান দুটি খাড়া করে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরে যেমন দরজাটা খোলা পেয়েছে, বিদ্যুৎ বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, দেওয়ালের উপরে উঠে রাত্রের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওকে আবার দেখলাম পরদিন সকালে ক্যাম্পিগ্লিয়াতে। বুঝলাম, টিকিট ধারী প্যাসেঞ্জারের মত ও শান্ত ধীরভাবে ঠিক ট্রেনে চড়ে ফিরে এসেছে।

(ক্রমশঃ)

"মনের জন্য যেমন, শরীরের জন্যও তেমনি সংযমের প্রয়োজন। শরীরকে যোগ্য শ্রমে নিয়োজিত রাখিবে। যতটা সম্ভব খোলা জায়গাতেই শ্রম করা ভাল। দ্রুত হাঁটা ইহার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বসিয়া থাকিতে বা চলিতে শরীর সোজা রাখা চাই।"

—মহাত্মা গান্ধী

অরিন্দমের গল্প

শ্রীনির্মল সরকার

অরিন্দম অলসভাবে চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বসল। তার ভাবভঙ্গী দেখে নরেনবাবু খুশী হতে পারলেন না। বললেন—কি হ'ল, তুমি অমন ঢিলে মেরে গেলে কেন? খবর পেয়েছ কিছু?

পেয়েছি, আবার পাইনিও। অরিন্দম মিটমিট করে হাসতে লাগল।

তার মানে? তুমি কি সব ব্যাপারেই এরকম রহস্যের সৃষ্টি করবে; কিন্তু এটা যে একটা সিরিয়াস ব্যাপার, সেটা নিশ্চয় তোমায় বলে দিতে হবে না? নরেনবাবু দস্তুরমত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

তা হবে না, তবে কি জানেন, পুলিশের সব ব্যাপারই তো সিরিয়াস। ধীরে ধীরে বলল অরিন্দম।

কথাটা শুনে বোমার মতো ফেটে পড়লেন নরেনবাবু।—আজ বাদে কাল ছেলেটার হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা, হঠাৎ সে নিখোঁজ হ'ল কেন তার জবাব দেবে?

ওর মামা গণপতিবাবু কি বলেন? নরেনবাবুকে থামাতে চেষ্টা করল অরিন্দম।

তিনি তো কোন কারণই বলতে পারছেন না। পরীক্ষার পরে নিখোঁজ হলে অন্য ভয় বা ভাবনা হ'ত, কিন্তু পরীক্ষার আগেই ছেলেটা গেল কোথায়?

হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা কবে থেকে শুরু হচ্ছে? জিজ্ঞাসা করল অরিন্দম।

জান না, কাল থেকে। খিঁচিয়ে উঠলেন নরেনবাবু।

তা'হলে তো আর দেরি করা উচিত নয়। কথাটা বলে উঠে পড়ল অরিন্দম। তারপর কয়েক-পা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল—ওর মামাকে এখন পাওয়া যাবে?

গণপতিবাবুর যা বক্তব্য ছিল তা সবই তো তোমায় শুনিয়েছি, আবার তাঁর কাছে কেন?

যাই একটু সান্ত্বনা দিয়ে অসি। কথাটা বলে থানার বাইরে চলে গেল অরিন্দম।

নরেনবাবু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

বাড়ীর কাছে এসে অরিন্দম পরেশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল—কি রে, তুই বাইরে দাঁড়িয়ে কি করছিস?

কি আর করব—বাড়ীর ভেতরে গেলেই কাকাতুয়ার চীৎকার আর গালাগাল শুনতে হয়, তাই বাইরে দাঁড়িয়ে একটু নিঃশ্বাস নিচ্ছি।

কাকাতুয়া মিঠু আর পরেশক নিয়েই অরিন্দমের সংসার।

তা বেশ করেছ, এখন ভেতরে চল; এখুনি আমায় বেরোতে হবে। পরেশকে কথাগুলো বলেই ভেতরে ঢুকল অরিন্দম।

সে কি, এই তো ফিরলেন, আবার বেরোতে হবে! বিরক্ত হ'ল পরেশ।

কি করব বল—পুলিশের চাকুরী এমনিই হয়; তোমার মতো খেয়েদেয়ে মজা করে ঘুমোবার সময় কোথায়?

দিনের বেলায় আমি ঘুমোই? প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলল পরেশ। কাকাতুয়ার চীৎকার শুনে কেউ ঘুমোতে পারে?

কেন, আমি তো অসুখের সময় খুব ঘুমোতুম।

তা বুঝি জানেন না! দুপুরবেলা আমি ঘরে থাকলে মিঠু একেবারে ভদ্দরলোক; কিন্তু ওটা এক নম্বরের শয়তান!

স্নান সেরে অরিন্দম খেয়ে নিল। তারপর চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগল কেসটা সম্বন্ধে। বিজন তার মামা গণপতিবাবুর বাড়ীতে মানুষ। গণপতি বাবুরও একটি ছেলে আছে, তার নাম চিত্ত। দু'জনেই এবার ওরা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিচ্ছে। চিত্ত আর বিজন কিন্তু আলাদা স্কুলে পড়ে। এ্যাডমিট কার্ড নেবার সময় চিত্ত বিজনদের স্কুলে খবর নিয়ে জেনেছিল যে, বিজন অনেক আগেই স্কুল থেকে এ্যাডমিট কার্ড নিয়ে চলে গেছে। বিজন কিন্তু আর বাড়ী ফেরেনি। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল, আজও তার কোন পাত্তা নেই। ঘটনাটা মোটামুটি এইরকম। থানা অফিসার হিসেবে নরেনবাবু, বিজনের মামা গণপতি বাবুর কাছ থেকে এইরকমই শুনেছেন। গণপতিবাবুর উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। মা-বাপ মরা ভাগনেকে তিনি মানুষ করেছেন। এই অবস্থায় পরীক্ষার দু'দিন আগে তার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে তিনি বিচলিত হয়ে পুলিশে খবর দিয়েছেন।

অরিন্দম বেরিয়ে প্রথমে গেল বিজনদের স্কুলে। হেডমাস্টার মশায়ের কাছ থেকে কতগুলো সংবাদ সে পেল। বিজন লেখাপড়ায় খুব ভাল, তবে ইদানীং সর্বদাই সে বিমর্ষ হয়ে থাকত। ভাল ছাত্র হিসেবে সে হাফ-ফ্রীতে পড়ত। তবে তাও বেশ কিছু বাকী পড়েছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বিজন শুধু ভালছেলেই নয়—হেডমাস্টার মশায় আশা করেন, ছেলেটা হয়ত স্ট্যাণ্ডও করতে পারে। এই অবস্থায় সে যদি পরীক্ষা না দেয়, তা'হলে স্কুলের পক্ষেও ক্ষতিকর। কোন হদিশ করতে পারল না অরিন্দম। একজন নামজাদা ছাত্র কি কারণে পরীক্ষার আগে নিখোঁজ হ'ল? পরীক্ষার ভয়ে? নাকি কোন মানসিক ব্যাধির ফলে?..

স্কুল থেকে অরিন্দম রওনা হোল গণপতিবাবুর বাড়ীর দিকে। উত্তর কলিকাতার একটা গলিতে গণপতিবাবুর বাড়ী। কড়া নাড়তে রুক্ষ স্ত্রী-কণ্ঠে উত্তর এল, কে রে—? দরজাটা যে একেবারে ভেঙ্গে ফেললি!

অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরিন্দম। একটু পরেই সদর দরজা খুলে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

কাকে চান? জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

গণপতিবাবুকে। আমি পুলিশ থেকে আসছি। অরিন্দম গম্ভীর গলায় বলল।

আসুন, আমিই গণপতি সোম। বিজনের কোন খবর পেয়েছেন?

না। অরিন্দম ঘরের ভেতরে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল।

তা'হলে? গণপতিবাবু একটা হতাশার ভাব দেখালেন।

বিজনের সঙ্গে আপনাদের কোন মনোমালিন্য হয়েছিল?

কি যে বলেন! একটা মাত্র সন্তান রেখে আমার বোন মারা গেছে, ওকে তো আমিই মানুষ করেছি।

ওর বাবা?

তিনি আগেই গেছেন।—কি নিমকহারাম ভাবুন! এত খরচ করে লেখাপড়া শেখালুম আর পরীক্ষা না দিয়েই পালিয়ে গেল!

কার কাছে যেতে পারে? কাছাকাছি আত্মীয় স্বজন আছে আপনাদের?

তা কি করে জানব বলুন! হাতটা ওল্টালেন গণপতিবাবু—আর আত্মীয় স্বজন তেমন কেউ নেই বলেই তো জানি। তবে কি জানেন, আজকাল বন্ধুবান্ধব আত্মীয়ের চেয়ে বড়—গণপতিবাবু আরও ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু গেল কোথায় ছেলেটা? অন্যমনস্ক ভাবে কথাটা বলল অরিন্দম।

বোধহয় সিনেমা করতে বম্বে পালিয়েছে। বললেন গপপতিবাবু।

হেডমাস্টার মশায়ের কিন্তু ওর ওপর ধারণা খুব ভাল। বলল অরিন্দম।

আমার ধারণাও খারাপ ছিল না; কিন্তু পরীক্ষার ঠিক আগে-ভেগে উধাও হয়ে গিয়ে আমার ধারণা একেবারে পাল্টে দিয়েছে। হতভাগাটা মরে গেল কিনা কে জানে?

আত্মহত্যা করার কোন কারণ ছিল নাকি? প্রশ্ন করল অরিন্দম।

তা কি করে বলব বলুন? কার মনে কি আছে কে বলতে পারে! আজকাল তো প্রায়ই এধরণের ঘটনা শুনতে পাচ্ছি। আর তাছাড়া এ্যাকসিডেণ্টও তো হতে পারে।

সে রকম কোন রিপোর্ট আমরা পাইনি।

কিন্তু কলকাতার বাইরে যদি এ্যাকসিডেণ্ট হয় তা'হলে? জেরার ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলেন গণপতিবাবু।

কলকাতার বাইরে! আশ্চর্য হয়ে তাকাল অরিন্দম।

হ্যাঁ, ধরুন ট্রেন থেকে পড়ে যদি মারা যায়—তা'হলে ?

বিজনের কি কলকাতার বাইরে যাবার কথা ছিল ?

না না, তা বলছি না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন গণপতিবাবু—আমি বলছি, আজকাল ছেলেদের মতিগতি বোঝা তো মুস্কিল, কখন কি খেয়াল হয়।

আপনার ছেলেও পরীক্ষা দিচ্ছে, তাই না ? অন্য প্রশ্ন করল অরিন্দম।

হ্যাঁ, চিত্তও পরীক্ষা দিচ্ছে এবার।

তাকে একবার ডাকবেন ?

কেন, তাকে কি দরকার ? বিরক্তভাবে বললেন গণপতিবাবু।

আছে, তাকে ডাকুন।

একটু পরে চিত্ত ঘরে ঢুকল। হায়ার সেকেণ্ডারী পরিক্ষার্থী হিসেবে তার বয়স বেশী বলেই মনে হ'ল অরিন্দমের। পরনে দামী টেরিলিনের সার্ট আর চোঙা প্যাণ্ট। মুখে তার একটা ধূর্ত্ততার ছাপ রয়েছে স্পষ্ট।

বিজন কোথায় গেছে তুমি কিছু জান ? সরাসরি জিজ্ঞেস করিল অরিন্দম।

আম কি করে জানব ? আমার সঙ্গে তো কথাই কয় না, তার আড্ডা যত সব লোফারের সঙ্গে। চিত্তর গলার স্বরটা ঠিক ভদ্র নয়।

গণপতিবাবু গর্বের সঙ্গে একবার তাকালেন চিত্তর দিকে।

হঠাৎ ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে পড়লেন একজন মহিলা। যেমন উগ্রচণ্ডী চেহারা, তেমনি কর্কশ গলার স্বর।

আপনি কার খোঁজ করছেন, সেই হতচ্ছাড়া ছেলেটার ? সে মুখপোড়া মরেছে, আমাদেরও হাড় জুড়িয়েছে। কথাটা বলে যেমন এসেছিলেন, তেমনই চলে গেলেন তিনি।

গণপতিবাবু অপ্রস্তুত হয়ে জানালেন, উনিই তাঁর স্ত্রী।

এই বিরুদ্ধ পরিবেশে বিজন এতদিন কিভাবে কাটিয়েছে তাই চিন্তা করে আশ্চর্য হ'ল অরিন্দম।

বিজন কোথায় বসে পড়াশোনা করে ? জিজ্ঞেস করল সে।

ছাদের চিলে কোঠায়। উত্তর দিলেন গণপতিবাবু।

বেশ, চলুন একবার সেখানে।

গণপতিবাবু আপত্তি করলেন না।

ছাদের চিলেকোঠার ঘরে কোন মতে একটা মানুষ শুতে বা বসতে পারে। মেঝেতে একটা শতছিন্ন ময়লা শতরঞ্জি আর একটা বালিশ রয়েছে। একধারে কতকগুলি বই আর খাতা

পরিপাটি ভাবে সাজান। এইগুলো এবার অরিন্দম একের পর এক উল্‌টে দেখতে শুরু করল—ইতিহাস, ইংরেজী, বাংলা, টেস্টপেপার—। হঠাৎ একটা কাগজ মেঝেতে পড়ে গেল টেস্টপেপারটা খুলতে গিয়ে। সেটা খুলে অরিন্দম দেখল, একটা সাধারণ বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা আছেঃ 'পরীক্ষায় অব্যর্থ পাশ। এই কবচ ধারণ করিলে যে-কোন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বিফলে মূল্য ফেরত। মূল্য—মাত্র দশ টাকা—শ্রীচণ্ডীচরণ জ্যোতিষার্ণব, মহেশ-

'সেটা খুলে অরিন্দম দেখল একটা সাধারণ বিজ্ঞাপন।

বাজার, মনকুণ্ডু।' কাগজটা গণপতিবাবুর অলক্ষ্যে অরিন্দম পকেটে পুরল। কিন্তু একটা জিনিস অরিন্দমের খট্‌কা লাগল। হেডমাস্টার মশায় বিজনের যেভাবে প্রশংসা করেছেন, তাতে একথা মনে হয় না যে, অত ভাল ছাত্র হয়েও সে মাদুলী-তাবিজের ভরসায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করবে। আবার হতেও পারে। মানুষের দুর্বলতা কখন যে কিভাবে আসে তার হিসেব কে রাখে?

অরিন্দম নিচে নেমে এসে গণপতিবাবুকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিল। তখনও গণপতিবাবুর গৃহিণীর তর্জন-গর্জন শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। অরিন্দম সামনা-সামনি লড়তে পারে, দুর্ধর্ষ গুণ্ডা বদমাইশকে শায়েস্তা করতে ভালবাসে, কিন্তু এধরণের কাজ তার

মনোমত নয়। তবে বিজনের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে সে মনে জোর পেল। যেমন করেই হোক বিজনকে খুঁজে বার করতেই হবে।

অরিন্দম সামনের একটা দোকান থেকে থানায় নরেনবাবুকে ফোন করল।

হ্যালো, নরেনবাবু, আমি অরিন্দম কথা বলছি।

খবর পেয়েছো ছেলেটার? ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নরেনবাবু।

এখনও পাইনি, তবে একটা ক্লু পেয়েছি।

কি রকম?

পরীক্ষা পাশ করার অব্যর্থ কবচের বিজ্ঞাপন বিজনের বইয়ের মধ্যে পেয়েছি।

তাতে কি হয়েছে? ছেলেদের বইয়ের মধ্যে ওরকম অনেক কিছু পাওয়া যায়।

না, বিজন খুব ঠাণ্ডা মাথার ছেলে; সে হয় এতে বিশ্বাস করত কিংবা অন্য কারুর জরুরী তলবে সেটা সযত্নে রেখে দিয়েছিল।

বেশ তো, তা'হলে গুলু ওস্তাগর লেনে খোঁজ নাও, ওখানেই তো ওসব বিজ্ঞাপনের ফল পাওয়া যায়। বললেন নরেনবাবু।

না, এটাতে মানকুণ্ডুর ঠিকানা আছে। আস্তে করে বলল অরিন্দম।

মানকুণ্ডু না আমার মুণ্ডু! ও তুমি যা হয় কর—। রেগে নরেনবাবু ফোনটা ঝনাৎ করে কেটে দিলেন।

নরেনবাবুর কাণ্ড দেখে একটু হাসল অরিন্দম। তারপর রাস্তা ধরে সোজা হাঁটতে লাগল। সামনেই একটা চায়ের দোকান। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এখনও তার চা খাওয়া হয়নি। সেখানে ঢুকে পড়ল সে। এক কাপ চা আর ওমলেটের অর্ডার দিয়ে সে বিজনের কথা চিন্তা করতে লাগল। বিজন যদি মানকুণ্ডুতেই গিয়ে থাকে, তা'হলে এ সময়ের অনেক আগেই তার ফিরে আসা উচিত ছিল। হঠাৎ গণপতিবাবুর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার—'ট্রেন থেকে পড়ে যদি মারা যায়।' মানকুণ্ডু ট্রেনেই যেতে হয় আর গণপতিবাবুর মুখ থেকে 'ট্রেন' এই কথাটা বের হ'ল কেন!

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে অরিন্দম গণপতিবাবুর বাড়ীর দিকে আবার চলতে শুরু করল। সেখানে পৌঁছে, বাড়ীর বন্ধ দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ভেতর থেকে স্ত্রী-কণ্ঠের একটা একটানা চাপা কান্না শুনতে পেল সে। কে কাঁদছে? গণপতিবাবুর স্ত্রী? একটু পরেই তার সন্দেহের নিরসন হ'ল।

এই ঠিকানা কেন লেখা হয়েছে? গণপতিবাবুর চড়া গলা।

একটু পরেই চিত্তর গলা শোনা গেল।

আমি তখনই সন্দেহ করেছি, মা প্রায়ই চুপি চুপি বিজনকে কি যেন বলতো! পুলিশের

লোকটা চিলেকোঠা সার্চ করে যাবার পর ওর ছাড়া জামার মধ্যে এই ঠিকানা লেখা কাগজটা পেয়েছি।

একটা খুট্ করে আওয়াজ হতেই অরিন্দম তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। রাস্তায় চলতে চলতে অরিন্দম সব জিনিসটা ভাবতে লাগল। বিজনের পকেট থেকে একটা ঠিকানা লেখা কাগজ পাওয়া গেছে। গণপতিবাবু প্রশ্ন করেছিলেন, এই ঠিকানা লেখা হয়েছে কেন? এ থেকে দুটো জিনিস বোঝা যাচ্ছে—প্রথমতঃ, ঠিকানাটা গণপতিবাবুর স্ত্রীর লেখা আর দ্বিতীয়তঃ, এ ঠিকানা গণপতিবাবু আর চিত্তর অজান্তে ও মতের বিরুদ্ধে বিজনকে দেওয়া হয়েছে। মানকুণ্ডুর জ্যোতিষার্ণবের ঠিকানা নিশ্চয় নয়—তা'হলে কার? আর এ ঠিকানা দেওয়াতে সপুত্র গণপতিবাবুই বা এত আপত্তি করছেন কেন? গণপতিবাবুর স্ত্রীর ব্যবহার এবং উক্তিতে বিজনের ওপর তাঁর যে কিরকম মনোভাব তা বুঝতে অরিন্দমের দেরি হয়নি। তা'হলে তিনিই বা সকলকে লুকিয়ে ঠিকানাটা বিজনকে দিলেন কেন? অনেকগুলো 'কেন' এসে ভিড় করল অরিন্দমের মগজে। রহস্য যেন ঘনীভূত হয়ে এসেছে বলে মনে হ'ল তার। একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেল সে। জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থাতেই বিজনকে খুঁজে পেতে হবে। গণপতিবাবুর কাছ থেকে বিজনের একটা ফটো নিয়েছিল অরিন্দম। রাস্তার আলোতে সেটা একবার ভাল করে নিরীক্ষণ করল সে। খুব সাধারণ চেহারা। বয়স পনের-ষোল, চিত্তর চেয়ে অন্ততঃ বছর পাঁচেকের ছোট হবে সে। বড় বড় বিষাদ-মাখা চোখ। ছবিটা দেখে হঠাৎ অরিন্দমের মনে হ'ল খুব পরিশ্রম বা অনাহারের ফলে হয়ত বিজনের তীব্র মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেসন এসেছিল। আর এরকম ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তা'হলে পরীক্ষার এ্যাডমিট কার্ডই বা নিল কেন সে। সেই সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন জাগল তার মনে—যে আত্মহত্যা করতে চলেছে, তার ওদিকে লক্ষ্য রাথার মতো মনের অবস্থা থাকার তো কথা নয়। তখন মানুষ বিচারবুদ্ধি হারিয়ে উন্মাদের মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে বলেই জানে অরিন্দম।

বিজনের রোল নাম্বারটা আগেই সংগ্রহ করেছিল অরিন্দম। এণ্টালীর একটা স্কুলে বিজনের সিট পড়েছে। আজ পরীক্ষার প্রথম দিন। জায়গাটায় বেশ ভিড় হয়ে রয়েছে। অরিন্দম দূর থেকে নজর রেখেছে। পরীক্ষা শুরু হতে আর কয়েক মিনিট বাকী। এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে তাড়াতাড়ি একটা ছেলে ছুটে চলে গেল হলের ভেতর। ট্যাক্সিটা সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। ওইটুকু সময়ের মধ্যে অরিন্দম তিনটে জিনিস লক্ষ্য করে নিল। ট্যাক্সির নাম্বার, ভেতরে বসা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর বিজনের মতোই দেখতে ঐ পরীক্ষার্থীকে। অবশ্য ছেলেটি এত তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল যে, তাকে ভাল করে দেখার মতো অবসর পায়নি সে। এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'ল অরিন্দম।

দুপুর কাটিয়ে পরীক্ষা শেষ হবার কিছুক্ষণ আগে এসে দাঁড়িয়ে রইল আবার সেখানে অরিন্দম। তীক্ষ্ণ স্বরে ঘণ্টা বেজে উঠল হলের ভেতর। গুঞ্জনধ্বনি তুলে ছেলের দল বেরিয়ে এল বাইরে। একটু দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, তাতে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে সাগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন স্কুলের গেটের দিকে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে বিজন। এবার আর চিনতে অসুবিধে হ'ল না অরিন্দমের। বিজন ট্যাক্সিতে উঠতেই অরিন্দম কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি বিজন?

অরিন্দমের দিকে অবাক হয়ে তাকাল বিজন।

আপনি কে? গাড়ীতে বসা ভদ্রলোক যেন তেড়ে উঠলেন।

আমি পুলিশের লোক, বিজনকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।

গাড়ীতে উঠুন। কটমট করে তাকিয়ে বললেন ভদ্রলোক। বোঝা গেল পুলিশের লোককে তিনি ভাল চোখে দেখেন না।

ট্যাক্সি চলতে সুরু করল।

তুমি কোথায় ছিলে বিজন? জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

শিবপুরে, মামীমার বোনের বাড়ী।

বাড়ী থেকে কবে বেরিয়েছিলে, পরশু?

হ্যাঁ।

সোজা শিবপুরে গিয়েছিলে?

না। ব্যাপারটা তা'হলে গোড়া থেকেই বলি: পরীক্ষা যতই কাছে আসতে লাগল, চিত্তদা আমার ওপর ততই অত্যাচার শুরু করল।

কেন? অরিন্দম তাকাল বিজনের দিকে।

চিত্তদা একদম পড়ে না, নামে স্কুলে যায়। দুটো টিচার রেখেছেন মামা; তাতেও তার লেখাপড়ার দিকে মন যায়নি। পাড়ায় আর স্কুলে আমার সুখ্যাতি সকলে করে—এটা চিত্তদা মোটেই সহ্য করতে পারছিল না। তাই নানাভাবে আমায় বিপদে ফেলার চেষ্টা করছিল সে।

তুমি গণপতিবাবুকে বলে দাওনি কেন?

মামাও ঐ দলে। একটু ম্লান হাসল বিজন। তারপর আবার বিজন বলতে লাগল: পরশু সকালে চিত্তদা আমায় এসে জানাল যে, টোকাটুকি করার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা সে করেছে, তাতে তাকে ফেল করাবার সাধ্য কারুর নেই। তাছাড়া একটা কবচের সন্ধানও সে পেয়েছে। একেবারে অব্যর্থ। মানকুণ্ডু থেকে সেটা আনবার জন্যে সে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। প্রথমে আমি রাজী হইনি। তাতে সে আমায় মারবার ভয় দেখাতে লাগল এবং যাতে আমি পরীক্ষা দিতে না পারি তার ব্যবস্থাও করবে বলে শাসাল। অগত্যা আমি রাজী হলুম। চিত্তদা আমাকে কবচের টাকা আর একটা রেলের টিকিট কিনে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। ট্রেনটা তখন সবে ছাড়ছে। গাড়ীতে উঠেই আমি জানতে পারলুম যে ট্রেনটা মানকুণ্ডু কেন, বর্ধমানেও দাঁড়াবে না। তার প্রথম স্টপেজ হ'ল আসানসোল। কথাটা শুনে আমি কোনরকমে প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে লাফিয়ে পড়লাম। চোট লাগল, কেটেকুটেও গেল; কিন্তু তখন আমি মরীয়া! আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে, চিত্তদা আমায় পরীক্ষায় বসতে না দেবার

জন্য এই সমস্ত ফন্দি করেছিল। তারপর কোনরকমে শিবপুরে গিয়ে পৌছলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিজনের।

শিবপুরের ঠিকানা তুমি জানতে? প্রশ্ন করল অরিন্দম।

না। কিছুদিন আগে যখন চিত্তদা'র অত্যাচারের মাত্রা বাড়ছিল তখন মামীমা একটা কাগজে ঠিকানা লিখে আমায় দিয়ে বলেছিলেন, যদি দরকার হয় তা'হলে যেন আমি এইখানে আশ্রয় নিই। পরীক্ষা আমায় দিতেই হবে, তাই শিবপুরেই গিয়ে উঠতে হয়েছিল আমাকে।

এতক্ষণে অরিন্দম, গণপতিবাবু আর চিত্তর ভদ্রমহিলার ওপরে রাগের কারণটা বুঝতে পারল।

কিন্তু, তোমার মামীমা তো আমার সামনেই তোমায় যাচ্ছেতাই গালাগাল দিলেন। বলল অরিন্দম।

একটু হাসল বিজন। বলল, ওটা একটা আচরণ; ওঁর মনটা খুব ভাল। আমায় খুবই ভালবাসেন। আমার জন্য উনি অনেক সহ্য করেছেন।

কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল অরিন্দম। মনে পড়ে গেল, সেই কর্কশভাষিণী, উগ্রচণ্ডী মহিলার কথা। বিচিত্র মানুষের মন, ভাবল অরিন্দম।

গ্রাম্য হাটের দৃশ্য

শিল্পী: শ্রীসুনীলকুমার মণ্ডল

মেঠুড়ে

ফুটবল

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা দলকে এবার হার স্বীকার করতে হয়েছে এবং আবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে মহীশূর দল। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল মহীশূর দল যতবার জাতীয় ফুটবলের ফাইনালে উঠেছে, ততবারই বাংলা দলের সঙ্গে তাদের খেলতে হয়েছে। ১৯৪৬ সাল থেকে দুই রাজ্যের ভেতর সন্তোষ ট্রফির সাতবারের ফাইনালে মহীশূরের জয় চারবার, বাংলার তিনবার।

১৯৪১ সালে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ১৯৪১ থেকে ১৯৬৯ এই ক-বছরের মধ্যে তিনবার খেলা হয়নি। পঁচিশ বারের অনুষ্ঠানের মধ্যে বাংলা এগার বার বিজয়ী এবং আটবার রানার্সের সম্মান লাভ করে। এবার ডবল লীগের খেলায় প্রথম দিনের খেলা গোলশূন্য এবং দ্বিতীয় দিন ১—১ গোলে খেলা শেষ হবার পর টসে বিজয়ী হয়ে বাংলা দল ফাইনালে ওঠে। ফাইনালে মহীশূর দলের সঙ্গে প্রথম দিনের খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হবার পর, দ্বিতীয় দিন বাংলা দল মহীশূরের কাছে ১—০ গোলে হেরে যায়। হেরে গেলেও বাংলা দল জাতীয় ফুটবলের ফাইনালে খুবই ভালো খেলে।

হকি

১৯৬২ সালে শেষ লীগ জয়ের পর মোহনবাগান এবার প্রথম ডিভিসন হকি লীগে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। অপরাজিত থেকে এর আগে মোহনবাগান পাঁচবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে, এবার নিয়ে ছ-বার। কোনো ম্যাচে একটা পয়েন্টও না হারিয়ে লীগ জয় মোহনবাগানের নতুন নজির নয়—নতুন নজির হ'ল কোনো পয়েন্ট না হারানোর সঙ্গে একটাও গোল না খাওয়া। উনিশটা খেলার মধ্যে মোহনবাগান চুয়াল্লিশটা গোল করেছে, তাদের বিরুদ্ধে একটা গোলও হয়নি। আর ড্র ও পরাজয়ের ঘরও শূন্য। উনিশটা জয়, অর্থাৎ আটত্রিশ পয়েন্ট। সত্যিই এক স্মরণীয় সাফল্য।

এই গৌরবময় নজিরের জন্যে মোহনবাগানের গোলরক্ষকের কৃতিত্ব তো বটেই, সমগ্র রক্ষণভাগই কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। বিশেষ করে ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের যুগ্ম অধিনায়ক গুরুবক্স সিং। প্রতিটি খেলায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো তিনি রক্ষণব্যূহ আগলেছেন। গোলকিপারের গায়ে আক্রমণের আঁচ লাগতে দেননি। গুরুবক্সের মতো আর একজন রক্ষণ-ভাগে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, তিনি হাফব্যাক ওয়াহিদ। এ ছাড়া মোহনবাগানের সাফল্যের মূলে দলের বাকী খেলোয়াড়দের যে কৃতিত্ব ছিল তা বলাই বাহুল্য।

* * *

গতবারের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এবার প্রথম ডিভিসন হকি লীগে রানার্সের সম্মান লাভ করেছে। সতেরটা খেলা পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মতোই একটা খেলাতেও ড্র করেনি, হারেনি, বিপক্ষের কাছে একটা গোলও খায়নি—শুধু একটানা জয়। লীগের অষ্টাদশ খেলা প্রদর্শনী খেলা হিসেবে আয়োজিত দুই প্রধানের (মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল) পারস্পরিক খেলায় ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় স্থানে নেমে যায়। আর শেষ খেলায় বি. এন. আর. দল ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে মাঠে নামেনি।

পাঁচবার লীগে জয়ের মধ্যে তিনবারের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল রানার্সের সম্মানের মধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় আছে। ইস্টবেঙ্গল কোনো খেলায় ড্র করেনি, কেবল মোহনবাগানের কাছেই একটা খেলায় পরাজিত হয়েছে এবং এবারের সারা মরসুমে এই মোহনবাগানের সঙ্গে খেলাতেই একটা গোল খেয়েছে।

টেবল টেনিস

টেবল টেনিসের শীর্ষদেশ জাপানের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের মিউনিকের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পরাজয় খুবই বিস্ময়ের। শুধু ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় নয়, দলগত প্রতিযোগিতার কর্বিলন কাপে অর্থাৎ মহিলা বিভাগের ফাইনালের আগেই জাপানকে পরাজয় স্বীকার করতে হয় রুমানিয়ার কাছে। রুমানিয়াকে হারিয়ে রাশিয়া সর্বপ্রথম মহিলা বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়েছে। পুরুষ বিভাগে অবশ্য জাপানের খেলোয়াড়রা আবার সোয়েদলিং কাপ জয় করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় হেরে গেছেন জাপানের দুই বিভাগের দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। স্টকহোম বিশ্ব আসরের মহিলা চ্যাম্পিয়ন সাচিকো নরিসাওয়া প্রথম রাউণ্ডেই হেরেছেন ইংলণ্ডের পলিন পিডকের কাছে। স্টকহোমের পুরুষ চ্যাম্পিয়ন নোম্বুহিকো হাসেগাওয়াকে চতুর্থ রাউণ্ডে হার স্বীকার করতে হয় বুখারেস্টের অ্যাণ্টো স্টিপানসিকের কাছে।

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সব খেলা এখনো শেষ হয়নি। মৌচাক-এর আগামী সংখ্যায় বাকী ফলাফল তোমাদের জানাব।
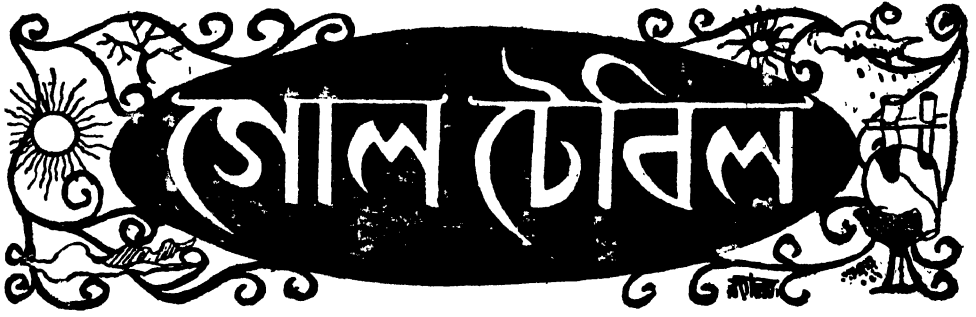
স্পোর্টস কুইজ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

(১) পৃথিবীর প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা স্থরু—কোন দুই দেশের মধ্যে, কোথায় এবং কবে ?

(২) পৃথিবীর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় কোন খেলোয়াড় প্রথম সেঞ্চুরী করেন ?

(৩) ভারতবর্ষ তার প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামে কোন দেশের বিপক্ষে, কোথায় এবং কবে ?

(৪) ভারতবর্ষ স্বদেশের মাটিতে কোন দেশের বিপক্ষে, কবে এবং কোথায় তার প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামে ?

(৫) সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী কে করেন ?

(৬) সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ভারতবর্ষের প্রথম 'রাবার' জয় কোন দেশের বিপক্ষে ?

(৭) বিদেশের মাটিতে সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে ভারতবর্ষের প্রথম 'রাবার' জয় কোনটি ?

(৮) সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান এবং এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান কত এবং তা কারা করেছেন ?

(৯) সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে বিশ্বরেকর্ড কি ?

(১০) আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে কোন খেলোয়াড় সর্বাপেক্ষা কম টেস্ট ম্যাচ খেলে 'ডাবল' সম্মান (১০০০ রান ও ১০০ উইকেট পূর্ণ করার কৃতিত্ব) লাভ করেছেন ?

॥ উত্তর ॥

১। খেলা—অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যাণ্ড, স্থান—মেলবোর্ন (অষ্ট্রেলিয়া), ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ।

(২) অষ্ট্রেলিয়ার চার্লস ব্যানারম্যান (১৬৫ রান করে আহত অবস্থায় অবসর গ্রহণ), ইংলণ্ডের বিপক্ষে, মেলবোর্ন, ১৮৭৭ সাল।

(৩) ১৯৩২ সালের ২৫শে জুন, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লর্ডস মাঠে।

(৪) ১৯৩৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে বোম্বাইয়ে।

(৫) ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করেন—লালা অমরনাথ (১১৮ রান), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড ১ম টেস্ট, (বোম্বাই), ১৯৩৩। ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করেন ইংল্যাণ্ডের বি. এইচ. ভ্যালেনটাইন (১৩৬ রান), ১ম টেস্ট (বোম্বাই), ১৯৩৩।

(৬) পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫২-৫৩ সালের টেস্ট সিরিজে। ভারতবর্ষ ২-১ খেলায় (ড্র ২) 'রাবার' জয়ী হয়।

(৭) নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজ।

(৮) সর্বাধিক মোট রান করেছেন পলি উমরীগড়—৩৬৩১ রান (৫৯টি টেস্ট)।

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান করেছেন ভিনু মানকাদ—২৩১ রান (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬)।

(৯) ১ম উইকেট জুটির ৪১৩ রান (ভিনু মানকাদ এবং পঙ্কজ রায়, বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬)।

(১০) ভারতবর্ষের ভিনু মানকাদ। ১৯৫২ সালে মানকাদ তাঁর ২৩ তম খেলায় এই 'ডাবল' সম্মান লাভ করেন।

॥ কবি নজরুল ইসলাম স্মরণে ॥

শ্রীগোপাল সাঁতরা

হে কবি চির বিদ্রোহী তুমি
দেশ ও দশের কবি
তোমার সৃষ্ট লেখনীর মাঝে
সর্বহারার ছবি।

তুমি এনেছিলে নব-জাগরণ
গেয়ে সাম্যের গান
অমর তোমার অগ্নিগর্ভ
লেখনী দীপ্তমান।

তুমি নহ কবি হিন্দু কিংবা
মুসলমানের কবি
তুমি ভারতের জনতার কবি
অমর শিল্পী, নবী।

বড় ব্যথা আজ এই বুকে হায়
নীরব কণ্ঠ তোমার,
অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রদ্ধা
প্রণতি জানাই আমার।

মৌচাক

মজার এই 'মৌচাকে'
মধু'র মতই থাকে,
গল্প, ছড়া, কবিতা,
কত কি যে আছে বাঁধা
উপন্যাস আর ধাঁধা,
হেথা থাকে সবই তা।
হাসি-খুশী, গান,
ভ'রে তোলে প্রাণ—
মধুর এই 'মৌচাক' দিয়ে,
'মৌচাক' আসে,
প্রতি মাসে মাসে,
খুশীর খবর নিয়ে।

সৈয়দ আহসান জমিল

এক মিনিটের গল্প

এখন দুপুরবেলা। কোথাও কোনো জনমানবের নাম নেই। বৈশাখ মাস। সেইজন্য রাস্তা-ঘাটে লোক চলাচল থেমে গেছে। সূর্যের তাপ প্রখর হয়ে উঠেছে। চারিদিক একেবারে শ্মশানের মত নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কাকের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তালগাছের পাতা হাওয়ায় দুলছে, আর সর সর আওয়াজ হচ্ছে। একটা ফেরিওয়ালা ডাক দিতে দিতে আসছে, "চাই-ই চুড়ি, আঙটি, মালা।" কতগুলো গরু এদিকে-ওদিকে ঘুরে-বেড়াচ্ছে। নিলুদের কুকুরটা বাড়ীর দাওয়ায় বসে ধুঁকছে। গ্রামের বাইরের নদীটাও যেন থেমে গেছে। দূরে কতগুলো শালিক ঝগড়া করছে।

ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে আসে। ঘরের ছোট ছেলেরা বেরিয়ে পড়ে খেলতে। শুরু হয়ে যায় কর্মব্যস্ততা। স্কুলের ছেলেরা স্কুলের ছুটির পর বাড়ী যাচ্ছে। দূরে কোথায় যেন শিশুদের কচি গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, "ছুয়ো, ধরতে পারলে না!"

শ্রীআশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সস্তার বাজার

পাটনাতে পাট সস্তা,
নাগপুরেতে নাগ।
কালীঘাটে কালি সস্তা,
বাগমারীতে বাঘ।
হলদিয়ায় হলুদ সস্তা,
ধানবাদেতে ধান।
পুরীতে পুরী সস্তা,
পাড়াগাঁয়ে মান।
খেজুরীতে খেজুর সস্তা,
চারগাঁয়ে আচার।
সব থেকে সস্তা বেশী
বাবার গালি মার।

শ্রীঅনাথবান্ধব সাউ

১। অমিল কোথায় ?

নীচে প্রথম ছবিটির অনুরূপ করে দ্বিতীয় ছবিটি করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে ঠিক একই রকম হয়নি। কোন্ কোন্ জায়গায় মিল হয়নি বলতে পার ?

বাজিকর
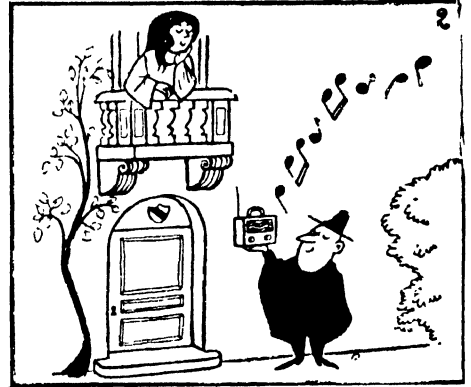
২। ধর্মগ্রন্থের নাম বার করো

এমন একটি ধর্মগ্রন্থের নাম বার করো, যার প্রথম দুই অক্ষর বাদ দিলে একটি বিখ্যাত দেশের নাম হয় এবং প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম অক্ষর বাদ দিলে, একটি অলঙ্কারকে বোঝায়।

শ্রীমনোতোষ রায় (রাঁচী)

৩। খাদ্য আর বাদ্য

বাংলাতে খাদ্য, ইংরেজীতে বাদ্য
থাকে যদি সাধ্য, বলো তার নাম।

শ্রীকরুণাকেতন বসু (পুরুলিয়া)

৪। জিনিসটা কি ?

তিন অক্ষরে এমন একটি জিনিসের নাম বলো, যার মাঝের অক্ষর বাদ দিলে, অপরাধীর শাস্তিতে ব্যবহৃত হয়। আর শেষ দু' অক্ষর বাদ দিলে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুরু পদবাচ্য হয়।

শ্রীকরুণা পালিত (কলিকাতা)
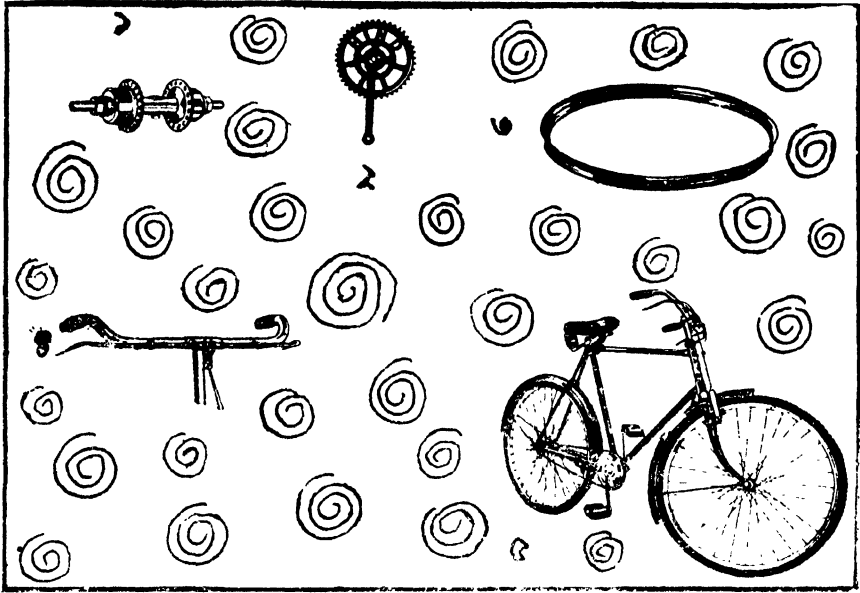
৫। নাম বল

চারটি বিশেষ অংশ দিয়ে তৈরী হয়েছে সাইকেল। ছবি দেখে ঐ চারটি বিশেষ অংশের কি কি নাম বলতে পার ?
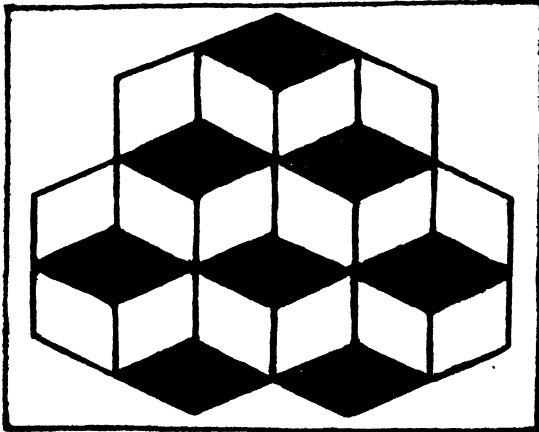
৬। পাশে ক'টা চৌকা আছে ?

কতকগুলি কাঠের চৌকা বা ব্লক আছে ছবিতে। বলতে পার মোট ক'টি ব্লক আছে ? দুটি ছেলের কাছ থেকে কিন্তু দু'রকম উত্তর পাওয়া যাচ্ছে ! দু'জনেই কি ঠিক বলছে ? ঠিক বললে কেমন করে তা সম্ভব ?

—

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। পারিশ্রমিক, চকমিলান, আলতা-রাফ, আলকাতরা, অবিমৃশ্যকারী।

২। Arthur, Martha, Claude, Hilary, Thomas, Pamela. ৩। Lord Beatty, Lord Allenby.
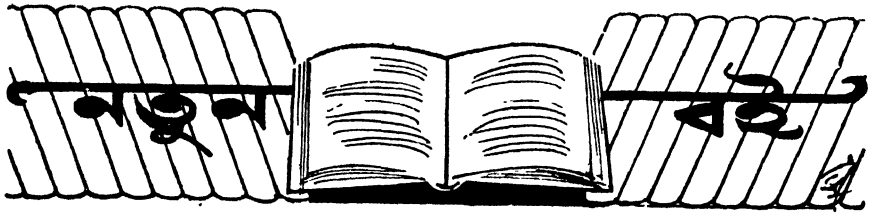
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

পাপুর বই—সুব্রত সরকার। শিশু-সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫০০।

এ এক অমূল্য গ্রন্থ, মর্মান্তিক গ্রন্থ—ক্ষণজন্মা স্মৃতিধর ৮ বছর ৯ মাস বয়সের গ্রন্থকারের গ্রন্থ। এই গ্রন্থকার সুব্রত সরকার ওরফে 'পাপু' আজ আর ইহজগতে নেই! সে তার মা-বাপ, ছোট্ট একটি বোন ও পাতানো জ্যেঠুকে (প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়) চোখের জলে ভাসিয়ে হঠাৎ একদিন চলে যায় একটি মোটরগাড়ির তলায় পড়ে। কিন্তু ক্ষণজন্মা এই ছেলে, এইটুকু বয়সের মধ্যেই যে অভাবনীয়, অবিনশ্বর কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছে ছড়ায়-ছবিতে এই বইখানির মধ্যে, তা সকল বয়সের পাঠককেই অভিভূত করবে, বিস্মিত করবে। চোখের জলের সঙ্গে সকলেরই বার বার ওলটাতে হবে এ বই,—দেখতে হবে এর অগুনতি রেখাচিত্র আর পাপুর মিষ্টি ছবিটি। পাতানো জ্যেঠু হলেও, শৈলজানন্দ তাঁর ভালবাসার এই ছিন্ন-কুসুমটিকে বেদনার সঙ্গে পরিপূর্ণ করে ধরে দিয়েছেন সকলের কাছে—অবিনশ্বর করে রেখে দিয়েছেন তাঁর পরিচিতিটির মধ্যে। তোমরা সকলে এই বইখানি দেখলে এবং এই লেখাটি পড়লে চোখের জল কিছুতেই রোধ করতে পারবে না—আমরাও পারিনি। পড়ার ক'দিন পরেও বার বার আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে পাপুর ছবিটি আর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

আমরা তাকে স্মৃতিধর বলেছি এই জন্যে যে, পূর্বজন্মের সংস্কার ছড়া এত অল্পবয়সে এমন অসাধারণ গুণের অধিকারী কেউ হতে পারে না।

আরব্য রজনী (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীতারাপদ রাহা। রূপা এণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীডি মেহরা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ৫·০০

আরব্য রজনীর গল্প সর্বকালের এবং সকল মানুষের উপভোগ্য। পৃথিবীর নানা ভাষায় এ কাহিনী অনূদিত হয়েছে এবং পড়ে ছেলে-বুড়ো সকলেই আনন্দিত হয়েছেন। 'কত মরু-প্রান্তর, কত সরিৎসাগর পর্বত, কত দৈত্যদানবপুরী, রাক্ষস, কত ধনরত্ন, হীরে

জহরৎ, কত রকম পাখী আর তিমিঙ্গিল, কত দুঃসাহসিক অভিযান, কত কুটিল চক্রান্ত' এসেছে এই গল্পের মধ্যে। এই বই দু'খানির ১ম খণ্ডের মধ্যে আছে ৯টি এবং ২য় খণ্ডের মধ্যে আছে ৭টি বিচিত্র রসের আকর্ষণীয় গল্প। এই গল্পগুলি ঘটনার বা কাহিনীর গুণেই শুধু নয়, লেখকের সহজ ও সাবলীল রচনার গুণেও হয়েছে অত্যন্ত সুখপাঠ্য। তোমরা আশ্চর্যসুন্দর এই গল্পগুলি পড়লে খুবই যে আনন্দ পাবে তাতে আর ভুল নেই। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ উৎকৃষ্ট এবং রঙদার প্রচ্ছদপটটি চমৎকার।

ইটু-পাটুর কাহিনী—শ্রীমনোজিৎ বসু। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, এ:৩২।:৩৩ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীগীতা দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩'৫০

গ্রন্থকার শ্রীমনোজিৎ বসু ছোটদের গল্প, কবিতা ও ছড়া লিখে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। ছোটদের রাজ্যে তাঁর এই বইখানি একটি অপূর্ব অবদান। একটানা এই কাহিনীটি পড়লে তোমরা সকলেই খুশি হবে। আরও খুশি হবে কাহিনীর সঙ্গে ছবিগুলি দেখে। ভারী সুন্দর এর ভিতরের ছবিগুলি ও প্রচ্ছদপটটি। ছবিগুলি এঁকেছেন শিল্পী শ্রীবিমল দাস। উপন্যাসের চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে রেখার টানে। বইখানি হাতে নিয়েও যেমন আনন্দ, পড়েও তেমনি।

ফোয়ারা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীসুনীলকুমার দেবনাথ কর্তৃক সোদপুর, নাটাগড়, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩·৫০

নানা বিচিত্র ধরনের সাতাশটি গল্পের সমষ্টি 'ফোয়ারা'। গল্পগুলির মধ্যে মজার হাসির কাহিনীও যেমন আছে, তেমনি আছে আশ্চর্য হবার, বিস্মিত হবার ও শেখবার অনেক বিষয়বস্তু। প্রধানতঃ কিশোরদের জন্য গল্পগুলি লেখা হলেও, পরিণত বয়স্করাও এই বই থেকে আনন্দ আহরণ করতে পারবেন। গল্পগুলি ইতিপূর্বে আমাদের এই 'মৌচাক' কাগজে এবং 'শিশুসাথী' ও 'সন্দেশ' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকারের গল্প বলার ভঙ্গীর মধ্যে নূতনত্ব আছে এবং ভাষাটি বেশ ঝরঝরে। তোমরা সকলে বইখানি পড়লে আনন্দ পাবে। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভাল এবং উপরের কভার-টিও বেশ মনোরম।

প্রতিদিন সকাল হয়, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা, অবশেষে রাত। এই জীবনযাত্রা আমাদের মুখস্থ, কাজের ছকও বাঁধা। সেদিনও সকাল হলো, মানুষের কর্মচঞ্চল জীবনযাত্রার সুরু হলো, চললো একের পর এক কাজের গতি···হঠাৎ মধ্যাহ্নের সূর্য যখন প্রায় মাথার উপরে তখন বজ্রনিনাদে ঘোষিত হলো—আমাদের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন আর নেই···! দিনটা ৩রা মে, শনিবার।

সকলের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো, কারণ মানুষটি তিনি ছিলেন ভিতরে বাহিরে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, শান্ত-সৌম্য, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার মধ্যে যেন একটা স্নেহময় প্রশান্তি। মানুষের মনে গভীর দুঃখ এই জন্যই, এমন একটি মানুষের বিয়োগ-ব্যথায়।

১৮৯৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী হায়দ্রাবাদের এক বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লেখাপড়া শুরু হলো, তারপর এলেন এটোয়ায়—মেধাবী ছাত্র ছিলেন, আর ছিলেন ধীর-স্থির এবং ভদ্রোচিত ব্যবহার পুরোমাত্রায়। ছাত্রাবাসে থাকাকালীন—যখন খাবার ঘণ্টা পড়তো, আর সব ছেলেদের মত ছুটোছুটি, হইচই, হুড়োহুড়ি করে যেতেন না। শান্ত ভাবে, যথাসময়ে যেতেন। মানুষটি ছিলেন দেহে-মনে পরিচ্ছন্ন। বড় হলেন, হলেন জাতীয়তা-বাদী, নিষ্ঠাবান পণ্ডিত। ভেদাভেদ তার মধ্যে স্থান পেতো না। তাছাড়া দেশের সেবাই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। দেশে-বিদেশে সম্মান লাভ করে এলেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁর দান তো কম নয়! তিনি চাইতেন ছোটরা লেখাপড়া তো শিখবেই, আর হবে দেহে-মনে পরিচ্ছন্ন। তাদের বলিষ্ঠ মন ও শক্তি দেশের সেবায় উৎসর্গিত হবে। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শে তিনি দিল্লীর ওখলায় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ভালবাসতেন ফুল, রক্ত-গোলাপ বড় প্রিয় ছিল তাঁর—নিজের হাতে বাগান করতেন। সঙ্গীত-প্রিয়ও ছিলেন। কাব্যধর্মী মন, কত লেখাই না লিখে চলেছিল। গুরুগম্ভীর রচনার কথা ছেড়েই দিলুম, ছোটদের জন্যেই কতো লিখেছিলেন, ছোটদের ভালোবাসলে লিখতে তো হবেই! সুন্দর রচনা তাঁর—তোমরা পড়বে। তাঁর শ্বেতশুভ্র পোষাক তার মনের পরিচায়ক।

শিক্ষার সঙ্গেই ছিল তাঁর জীবনের যোগসূত্র—তাই পরে হলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

১৯৬২ সালে হলেন স্বাধীন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি আর ১৯৬৭ সালে ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধার বা রাষ্ট্রপতি। পেলেন পদ্মবিভূষণ ও ভারতরত্ন উপাধি।

তাঁর মুখের কথা—সমস্ত ভারত আমার গৃহ, তার জনগণ আমার পরিবার।

সেদিন যখন নাতি-নাতনীদের নিয়ে কথা বলছেন, এমন সময় এলেন ডাক্তার। নিয়মমাফিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষা হবে। আর এলেন ফটোগ্রাফার, নাগাভূমিতে তাঁর সফরের সময় যে সব ফটো তোলা হয়েছিল, সেগুলি নিয়ে এসেছেন দেখাতে। তাঁদের বসতে দিয়ে আসছি বলে গেলেন। সময় বয়ে যায়—কিন্তু তাঁর দেখা নেই! অবশেষে জানা গেল—তিনি আর নেই! এক মিনিট আগে পর্যন্ত কোনও ভাবে কেউ একথা কল্পনা করেননি, যে কিছুক্ষণের মধ্যে কি বিপর্যয় ঘটবে! নিঃশব্দে চলে গেলেন। দেশের মানুষের জন্য তার মরদেহ জাতীয় পতাকা ও পুষ্প সজ্জিত করে রাখা হলো, আর রাখা হলো অবারিত দ্বার। দেশের মানুষ, বিদেশের মানুষ ভেঙ্গে পড়লো, শেষ দেখা দেখতে এলো তাঁকে। তারপর যথা সময়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় একত্রিশটি তোপধ্বনির মাঝে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই জামিয়া মিলিয়ায়—যেখানে তিনি বারে বারে এসেছেন, তার আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই চত্বরে চিরদিনের মত তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হলো,—যে পথে অনেকবার এসেছেন, সে পথ দিয়ে আর কোনও দিন তিনি আসবেন না! জামিয়া মিলিয়ার সঙ্গে তিনি একান্ত হয়ে মিশে রইলেন।

রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালীন স্বাধীন ভারতের আর কোনো রাষ্ট্রপতির লোকান্তর হয়নি। তাঁর প্রতি আমরা গ ীর শ্রদ্ধা জানাই আর প্রার্থনা করি তাঁর চিরশান্তি!

পঁচিশে বৈশাখ ভোরে ঘুম ভাঙ্গলো—তখন আকাশ সবেমাত্র রক্তিমাভা ধারণ করেছে। একটি ছোট্ট মেয়ে বাগানে বসে গাইছে—'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।' কি মিষ্টি গান! বললাম, কে গো তুমি—কি গাইছ? মেয়েটি বললে, ওমা তুমি বুঝি জানো না, আজ আমরা গান গেয়ে কবি-বন্দনা করবো যে! আজ পঁচিশে বৈশাখ।

তাই তো, আজ পঁচিশে বৈশাখ! প্রণাম জানালাম, দিগন্তের প্রভাত-রশ্মিকে—বললাম, জানো কবিকে? তিনি তোমাদের মতই ছোট ছিলেন। কিন্তু কী যে ধরা-বাঁধা জীবন ছিল! তোমরা তো কত স্বাধীন, মা'র কাছ ঘেঁষে থাকো—কিন্তু তিনি তা মোটেই পেতেন না। চাকরবাকরের হেপাজতে থাকতে হতো। পোষাক যা ছিল তা তোমরা, আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা ধারণা করতে পারবে না! সৌখিনতার নামগন্ধ ছিল না। খাবার সময় যা পেতেন তাই খেতে হবে, একটু বেশী চাওয়া যাবে না। মা তো অন্দরমহলে; বেশীর ভাগ সময় পালঙ্কে শুয়ে বা অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে সময় কাটতো। মা'র কাছে গেলেই, মা'র কষ্ট

হবে মনে করে সকলে তাঁদের ভাইবোনদের ঘর থেকে নিয়ে আসতেন। মেয়েটি চোখ বড় করে বললেঃ ওমা সেকি! মা'র কাছে না শুলে ঘুম হতো কি করে?

তারপর আর একটু বড় হয়ে ছাদে যাবার অনুমতি মিললো। তখন সেই ছাদ থেকে দেখা—পথ, বাড়ীর লাগোয়া পুষ্করিণী, সেখানে যারা চান করতে আসতো তাদের। যে হাঁসগুলো বুক ডুবিয়ে খেলা করতে করতে নিজেদের ভাষায় কথা বলতো, আরো দৃষ্টি প্রসারিত করলে সেই যে গয়লানীর ঘর। যে রোজ বাড়ীতে দুধ দিয়ে যেতো, এসব দেখা অভ্যাস হয়ে গেল। কে কখন চান করতে আসবে, কে থালা ধুতে আসবে, গামছা নিংড়ে মাথা মুছতে মুছতে চলে যাবে, এসব তো চেনা। আর ঐ বটগাছটা? ওটাকে দেখে একদিন লিখেই ফেললেন—

'নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট
ছোট ছেলেকে পড়ে মনে ওগো প্রাচীন বট।'

রেলিংগুলো হলো ছাত্র, নিজে গুরুমশাই। এইসব খেলতে খেলতে, এইভাবে চলতে চলতে কোন্ ফাঁকে বড় হয়ে গেলেন। আরো অনেক বড় হয়ে সেই ছেলে ঘুরে এলেন গোটা পৃথিবী, তাও একবার নয়, অনেক বার। নিয়ে এলেন অজস্র প্রশংসা আর মানপত্রের ডালি। তাঁর কাব্য, তাঁর সঙ্গীত, তাঁর সবকিছু মানুষ গ্রহণ করলো অসীম শ্রদ্ধায়। তিনি হলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।

যারা তাঁকে চোখে দেখেনি—তাদের কথা জানি না, যারা দেখেছে তারা ধন্য। এত রূপ, এত সৌন্দর্য, এত ভুবনমোহন সৌম্যমূর্তি আর দ্বিতীয় চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। এক কথায় পরমসুন্দর তিনি।

গভীর বিস্ময়ে মেয়েটি (ওর নাম শ্রাবণী) কথাগুলি শুনছিল—কখন যেন ধীরে ধীরে গেয়ে উঠলো—

'আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে ঐ বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে…।'

সবার চিঠির উত্তর আগামীবার মিলবে ভাই, আজ বড় তাড়াতাড়ি তাই এখানেই ইতি টানলাম। রাগ-অভিমান করো না যেন কেউ।

তোমাদের—**মধুদি'**

সম্পাদকঃ শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্যঃ ০.৬০ পয়সা

পুরাতন কলিকাতার একটি দৃশ্য

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্র *

৫০শ বর্ষ] আষাঢ় ঃ ১৩৭৬ [৩য় সংখ্যা

পুরীর চিঠি

শ্রীআশীষকুমার গুপ্ত

স্নেহের মিমি সোনা,
অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল দেখব সে জল লোনা।

দেখবো ঢেউ-এর ফেনায় ফেনায় তরঙ্গ অস্থির
তরঙ্গেরই রঙ্গে-কাঁপা সমুদ্রেরই তীর।

শুনেছিলাম এই সাগরের তীব্র জলোচ্ছ্বাস,
আনন্দেরই ছন্দে শুধু দুল্‌ছে বারোমাস।

তাই তো সবাই যুক্তি ক'রে আমরা চারি বন্ধু,
হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে দেখতে এলাম সিন্ধু।

ট্রেনের মধ্যে নতুন গল্প নতুন পরিচয়—
সচরাচর বিদেশ গেলে নিত্য যেমন হয়।

অনেক হ'ল মাসী-পিসী হ'ল অনেক বন্ধু,
কেউ বা যাচ্ছে অন্য দেশে কেউ বা দেখতে সিন্ধু।

কত যে মাঠ, কত যে বন, কত নতুন দৃশ্য
জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম ছোট্ট একটা বিশ্ব।

দেখতে দেখতে রাত্রি হ'ল গহন অন্ধকার,
সকল দৃশ্য হারিয়ে গেল কোন্ সে সুদূর পার।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে এলাম, এলাম চলে পুরী,
হোটেল ছেড়ে ইচ্ছে করে—ঘুরি কেবল ঘুরি।

জগন্নাথের মাসীর বাড়ী, আঠেরোনালা নদী—
মন্দিরেরই ঠাকুর মোরা দেখি নিরবধি।

তরঙ্গেরই শব্দ মোরা শুনি কেবল শুনি,
রাত্রিবেলা খাওয়ার পরে ঢেউগুলি তার গুণি।

রঙের বাহার বলবো কি আর নীল-সবুজের খেলা,
রাশি রাশি সাদা সে জল ভাঙে সাগর-বেলা।

আরেক দিন সকাল বেলা বাসে দিলাম পাড়ি,
সাক্ষীগোপাল দেখতে চলে অনেক নর-নারী।

কোণারকের সূর্যমন্দির অতি চমৎকার,
তারপরেতে চললো মোদের খাওয়ার কি বাহার!

দুধকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড পড়লো পথে কত,
ভুবনেশ্বর মন্দিরময়—সংখ্যা অগণিত!

উদয়গিরি, খণ্ডগিরি পাহাড় দুটো বেশ,
নামা-ওঠায় মন ছুঁয়ে যায় আনন্দেরই রেশ।

ছোট্ট ছোট্ট অনেক গুহা, দৃশ্য রকমারি,
নাচতে নাচতে নামার কিন্তু মজা সেথায় ভারী।

ভ্রমণ শেষে আবার এলাম সাগর যেথায়, পুরী;
এখন শুধু সকাল-বিকাল ঘুরি কেবল ঘুরি।

পুরাতন কলিকাতার একটি দৃশ্য

ল্যাজ নেই কেন ?

(সাওরা উপকথা)

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ডারুইন যখন প্রমাণ করলেন, বানর এবং বনমানুষ মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল, তখন পৃথিবীর সর্বত্র খুব একটা প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিক্ষিত লোকেরা কথাটা মেনে নিয়েছেন, সত্যকে অস্বীকার করা যায়নি। মানুষের যে একদিন ল্যাজ ছিল, তার শেষ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমাদের মেরুদণ্ডের সব শেষে একটি বাঁকা হাড় আজও দেখতে পাওয়া যায়, যার এখন কোনও দরকার নেই। গাছে গাছে যারা লাফিয়ে বেড়াত, তারা যখন মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল, তখন আর তাদের ল্যাজের প্রয়োজন না থাকায় সেটি ধীরে ধীরে কমতে কমতে মিলিয়ে গেল। পণ্ডিতদের মতে এই ক্রমবিবর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছিল, কিন্তু উড়িষ্যার আদিবাসী সাওরাদের মতে একদিনেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ল্যাজ খসে গেছল। গল্পটি এই :

অনেক দিন আগে সৃষ্টির প্রথম দিকে প্রত্যেক মানুষেরই একটি করে লম্বা ল্যাজ ছিল। সেই ল্যাজ তাদের অনেক কাজে লাগত ; মশা মাছি তাড়াতে, ঘর ঝাঁট দিতে, চেয়ার বা টুলের বদলে পাকিয়ে বসতে, শত্রুকে গলায় ফাঁস দিয়ে ধরে আনতে, নানা রকমে তারা উপকার পেত তাদের ল্যাজের কাছে। শুধু নিজেদের ঘর-দোর নয়, গ্রামের রাস্তাঘাটও তারা সাফ করে রাখত চলতে-ফিরতে। বাজার করতে গিয়ে কেনা জিনিস দু'হাতে না ধরলে ল্যাজে ঝুলিয়েও আনা চলত। একটি ল্যাজ থাকার জন্য কেউ কেউ আপসোসও করত হয়তো। মোটের ওপর ভালোই চলছিল, কিন্তু মানুষের সংখ্যা ক্রমে

'পিছন থেকে তার ল্যাজ মাড়িয়ে ধরল।'—পৃঃ ১২৪

যতই বাড়তে লাগল, ততই ল্যাজের জন্য অনেকের অসুবিধা হতে লাগল। বিশেষ করে বিয়ে-বাড়ীতে বা শ্রাদ্ধের সভায় যখন অনেক মেয়ে-পুরুষ জড়ো হ'ত, রাজকার্যে ছুটোছুটি করত, তখন প্রায়ই এ-ওর ল্যাজ মাড়িয়ে ফেলত বা ল্যাজে জড়িয়ে আছাড় খেত। তা'তে কখনও শুধু হাসাহাসি হ'ত, কখনও বা গালাগালি হাতাহাতি ল্যাজালেজিতে ঠেকত, অর্থাৎ যার ল্যাজের জোর বেশী সে চাবুকের মতো সপাসপ ল্যাজের ঘা দিয়ে অন্যদের ঘায়েল করত। এ সব সত্ত্বেও ল্যাজের উপকারিতা মানুষ ভোলেনি, পাঁচজনের মুখ চেয়ে এটুকু অসুবিধা সহ্য করত সবাই।

সেকালে কিট্টুং ছিলেন দেবতাদের মধ্যে খুবই মান্যগণ্য ব্যক্তি। তাঁর তামাক খাওয়ার নেশা ছিল। স্বর্গে তামাক পাওয়া যায় না, তাই একদিন পৃথিবীতে এলেন তামাক কিনতে। বাজারে খুব ভিড়, কিট্টুং তারই মধ্যে সবচেয়ে ভালো তামাকের সন্ধানে দোকানে দোকানে ঘুরছেন, এমন সময় হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে তাঁর ল্যাজ মাড়িয়ে ধরলে। কিট্টুং এগোতে গিয়ে হঠাৎ বাধা পেলেন, আচমকা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সামনেই ছিল একটা পাথর, তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ায় কিট্টুং-এর সামনের দাঁত দুটো ভেঙে গেল। তাঁর এই অবস্থা দেখে বাজারসুদ্ধ লোক হো-হো করে হেসে উঠল। কিট্টুং-এর আর সহ্য হ'ল না, মানুষের মধ্যে অপদস্থ হয়ে রাগে জ্ঞানশূন্য হলেন তিনি; দাঁড়িয়ে উঠেই একটানে পটাং করে নিজের ল্যাজটা ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, আর অভিশাপ দিলেন সেটাকে। হাটের লোক তখন ভয়ে কাঠ, তিনি যে সাধারণ মানুষ নন, দেবতা কিট্টুং, তা বুঝতে পেরে কা'রও আর মুখে কথা নেই। তখন সত্যযুগ কিনা, মানুষদের ল্যাজগুলোরও জ্ঞানবুদ্ধি ছিল, দেবতার রাগ দেখে তারাও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল; কথা নেই, বার্তা নেই, যে-যার মানুষ মালিকের পিছন থেকে খ'সে প'ড়ে দুড়দাড় ক'রে ছুটে পালাল লোকালয়ের বাইরে। দেখতে দেখতে র'টে গেল কথাটা, শুধু সেই বাজারে নয়, পৃথিবীর সমস্ত হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে কোনো মানুষের আর ল্যাজ রইল না, সমস্ত ল্যাজ পটাপট খুলে পড়ল আর পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগল। যারা ল্যাজ নিয়ে বিব্রত হচ্ছিল তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, আর যারা ল্যাজের দৌলতে মশা মাছি তাড়িয়ে ঘর দোর ফিটফাট রেখে আনন্দে ছিল, তারা 'হায় হায়' করতে লাগল। কেউ কেউ "ওগো, আমায় ফেলে যেয়ো না গো" বলে তাড়া করে ছুটেও ছিল, কিন্তু ভারী শরীর নিয়ে হাল্কা ল্যাজের সঙ্গে দৌড়ে পারবে কেন? হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল শেষ পর্যন্ত নিজেদের বাড়ীতে। ল্যাজের শোকে ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠল।

দেবতা কিট্টুং-এর তখন দয়া হ'ল মানুষদের কষ্ট দেখে। তিনি তাদের কল্যাণের জন্য নিজের ল্যাজটিকে করে দিলেন সাগুর গাছ, আর অন্য যে সব ল্যাজ বনে পালিয়ে গেছল সেগুলোকে করে দিলেন লম্বা বুনো ঘাস। সেই ঘাসের ঝাঁটা তৈরি ক'রে মানুষেরা আজও ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রাখে।

কর্পূরের মতো

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ।। উপন্যাস ।।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এ কথার পর আর কিছু বলা যায় না। হোক বড়, হোক বুড়ো, মাধু তো তিন্নু সিং-এরই ছেলে! মাধু সিং হারিয়ে গেলে কি বাবার প্রাণ কাঁদবে না? লছমী কি কাঁদবে না? লছমীর ছেলে দুটো কি কাঁদবে না—যদি মাধু সিং-এর কিছু হয়?

মাধু আমার গাড়ী চালায়, ধাক্কাধুক্কি লাগায় না, বাচ্চাদের জ্যাদা ভালবাসে—কোথায় সে যাবে?—তিন্নু সিং ভাবতে বসলো। একটু থেমে সে বলতে স্বরু করলো—এ যে একেবারে সার্কেসে প্যাটের খেলার মতো দেখছি। জানেন, আমাদের সার্কেসে প্যাট ছিল খুব বড় খেলোয়াড়। খেলোয়াড় না বলে বরং তাকে ম্যাজিসিয়ান বলতে পারেন। মোটর বাইসিকেল-সমেত একটা মেয়েকে সে রোজ খেলার শেষ সময়ে অদৃশ্য করে দিত, আর বলতো—মেয়েটাকে অদৃশ্য করে দিলাম এই এরিনা থেকে, বাইরে টিকিট ঘরের সামনে সে দাঁড়িয়ে আপনাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে—আপনাদের আত্মীয় বন্ধুদের জন্যে টিকিট কিনতে গেলেই তাকে দেখতে পাবেন। প্যাটের খেলা যা জমতো…

এমন সময় দূরে সাইরেনের মতো আওয়াজ করা হর্ণ দিতে দিতে পুলিশের গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। বুঝলুম দারোগাবাবু গোয়েন্দা দল নিয়ে এদিকে আসছেন।

তিন্নু সিং ততক্ষণে প্যাটের আর একটা খেলার বর্ণনা স্বরু করে দিয়েছে,—এই যে ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া বলছেন—কত রকমে যে ভ্যানিশ করা যায় জানেন? একটা টেবিল টেনে আনা

হলো এরিনার মাঝখানে, ঠেবিলটা গাঢ় গোলাপী কাপড়ে চারদিকে ঢাকা—ঘাঘরা পরানো যেন। প্যাট এল তারপরে। প্যাট ছিল বেঁটে, কোলকাতার ওয়েলেস্‌লি পাড়ার লোক, য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান সে, সম্পূর্ণ নাম জানি না, তবে প্যাট্রিক দি ম্যাজিসিয়ান বললে হয়তে আপনারাও চিনতে পারবেন। সংক্ষেপে আমরা সবাই তাকে প্যাট বলতাম। ছোট্ট একটা ব্যাটন নিয়ে সেই বেঁটে প্যাট মেডেলের মালা ঝুলিয়ে এসে বললে—আপনারা বলুন—কার কোন্ জিনিসটা আমি ভ্যানিশ করে দেব। খুব ছোট্ট দেখতে একটা বেঁটে বামন ক্লাউন ছিল আমার পার্টনার, তাকেই আমি ভ্যানিশ করে দিতে বললাম। টেবিলের একপাশে বসিয়ে ওপরে একটা কালো চাদর মুড়ি দিতেই সে উবে গেল! সব দর্শক একেবারে থ' বনে গেল। এই টেবিলের ওপর হাঁস, মুর্গী, বই, খাতা, ঘটি, বাটি, লাঠি, ছাতা—যা কিছুই রাখা যায় চাদর মুড়ে—তাই লোপাট হয়ে যায়। প্যাটের খেলায় সবাই হাঁ হয়ে গেল। দর্শকরা সবচেয়ে বেশী অবাক হলো কখন? যখন টেবিলের তলা থেকে ক্লাউনটি মুর্গী হাঁস—সব হারানো জিনিস নিয়ে বেরিয়ে এল; টেবিলের মাঝখানটা কাটা! তাই বলি বাবু, কোনো জিনিসই হারায় না; হারানোর খেলা চলে মাত্র।

ইতিমধ্যে দারোগাবাবু আর তাঁর সঙ্গে জন চারেক গোয়েন্দা পুলিশ এসে গেছেন। গোয়েন্দাদের মধ্যে ত্রিলোচনবাবু আছেন, উনি এ অঞ্চলে বেশ নামকরা গোয়েন্দা। এঁরা এসে তিনু সিং-এর গল্পের শেষাংশ শুনলেন। দারোগাবাবু তিনু সিং-এর কথার খেই ধরেই জিজ্ঞাসা করলেন—কিছু হারায় না বলছো,—স্কুলের গাড়ীসহ তোমার ছেলেও তাহলে হারায় নি বলছো?

তিনু সিং জবাব দিলে—তেমন কথা বলতে পারি কই হুজুর; আমি বলছি সার্কেসের কথা, সার্কেসে কিছু হারায় না।

ত্রিলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—সার্কেসের বাইরে আর সব বুঝি হারায়?

তা দেখুন বাবু, যদি বাইরেটা আপনারা সার্কেস ভাবেন—তবে এখানকার হারানোটাও খেলা বৈকি! আমাদের সার্কেসের নারাণবাবু বলেন—জগৎটাই তো একটা মস্ত সার্কেস।

ত্রিলোচনবাবু ধমক দিয়ে বললেন—থামো, তোমার দার্শনিকতার কোনো দরকার নেই। মাধু সিং আজ বাড়ী থেকে বের হবার সময় কি বলে গেছে আপনাদের?

কি আবার বলবে? রোজ যেমন যায়—তার বাচ্চা দুটোকে আদর ক'রে, তেমনি আজো ছেলে দুটোকে আদর জানিয়ে চলে গেল।

ত্রিলোচনবাবু মাধু সিং-এর স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। লছমীকেও ওই একই প্রশ্ন করা হলো। লছমী প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললে—আজ সকালে বাচ্চা দুটো কমলালেবুর জন্যে

কান্না ধরেছিল, ওর বাবা দুপুরের খাওয়া সেরে বের হবার সময় খোকা দুটোকে আদর জানিয়ে বলে গেল তাদের জন্যে কমলালেবু নিয়ে ফিরবে। তিনটার সময় রোজ নাকি বাজার পানে কমলা ফেরী করে যায়। এক ডজন কমলা কেনবার জন্যে দুটো রুপেয়া ভি নিয়ে গেছে।

ত্রিলোচনবাবু এবার তিনু সিংকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা ইদানীং কি মাধু সিং-এর টাকার টানাটানি যাচ্ছে?

তিনু সিং এক চিলতে হাসির সঙ্গে বললে—বাবু এ আমাদের মজা আছে; আমরা পয়সা আওরতের কাছে রেখে দিই; দরকার যা হয়—চেয়ে নিই। আমি বরাবর মাধুর মার কাছে পয়সাকড়ি রাখতাম, আমার বেটাও তাই করে। টাকা পয়সার টানাটানি কেন যাবে বাবু!

দারোগাবাবুকে চোখের ইশারায় ত্রিলোচনবাবু কি যেন ইংগিত করলেন, তারপর বললেন—চলুন এখানের কাজ শেষ হয়েছে, মাধু সিং-এর কারখানাটা দেখে থানায় ফেরা যাক।

আমরাও সবাই উঠলাম। তিনু সিং বললে—বাবুরা, মাধু সিং আমার ছেলে, আপনাদের ছেলের জন্যে যেমন আপনাদের মনে কষ্ট হচ্ছে, মাধুর জন্যে আমার মন তেমনই পোড়াচ্ছে।

আমরা যখন চলে আসছিলাম, দরজার পাশ থেকে লছমীর চাপা সংযত কান্নার আওয়াজ আমার কানে এসে বাজলো।

এই কান্না রূপজামের ঘরে ঘরে, পুরুষেরা বেরিয়েছে খোঁজ-খবর নিতে, ঘরে বসে মেয়েরা কেঁদে ভাসাচ্ছে। মায়ের কোমল প্রাণে বাচ্চাদের কথা মনে হতে অশ্রু বাধা মানছে না নিশ্চয়ই।

বাইরে বেরিয়ে কৃষ্ণমূর্তি বললেন—আজ বড্ড শীত পড়েছে,—কি জানি বাচ্চারা যে কোথায় আছে!—বলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দেখলাম রাতুলদা'র চোখ দুটো ছলছল করছে! আমার মতো নিষ্ঠুর মানুষের বুকের ভেতরটা কষ্টে বেদনায় গুর্‌গুর্ করতে লাগলো।

দারোগাবাবু ত্রিলোচনবাবু প্রভৃতিদের নিয়ে মাধু সিং-এর কারখানার দিকে চলে গেলেন। রাতুলদা রোটাংভির এক ডাক্তারখানা থেকে রূপজামে বাড়ীতে টেলিফোন করে জানলেন—না, এখনো সেখানে কোনো খবর নেই। মাধু সিং-এর গাড়ীর জন্যে ছেলেদের মায়েরা বাড়ীর সদরে বসে বসে কাঁদছেন।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—চলুন, আমরাও থানায় গিয়ে জানি, পুলিশ এই ব্যাপারটাকে কি ভাবছে।

আমি বললাম—ত্রিলোচনবাবু তো তিনু সিংকে দুটো-একটা প্রশ্ন করেই উঠে এলেন, ব্যাপারটায় তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মনে হয় না।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—তিনু সিং কিছু জানে বলে মনে হলো; নইলে হারানোর কথায় অমন হেসে উঠবে কেন?

রাতুলদা বললেন—স্পষ্ট তো বলেই দিলে যে জগতে কিছুই হারায় না, হারানো-হারানো খেলা চলে মাত্র।

আমি বললাম—এটা এমনি কথার কথা; সার্কাসের ক্লাউন ছিল বকবক করার অভ্যেসটা এখনো আছে, সার্কাসের গল্প করতে ভালবাসে; প্যাটের হারানোর খেলা আর মাধু সিং-এর গাড়ী হারানো কখনোই এক নয়।

কৃষ্ণমূর্তি তবু একবার বললেন—ফাঁপা ঘেরাটোপ-ঢাকা টেবিলের গল্পটা শোনালো কেন আমাদের; মাধু সিং ওর ছেলে; ছেলে হারিয়েছে শুনে তো ওর দুঃখ হবে?—

আমি বললাম—দুঃখ খুবই হয়েছে, তবে কোনো দুঃখই বুড়োকে সার্কাসের গল্প বলা থেকে থামাতে পারে না, আর সার্কাসের কথাতেই বুড়ো পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে—তাই ওর দুঃখটা বাইরে থেকে চট্ করে বোঝা যায় না।

কৃষ্ণমূর্তিও রোটাংডির এক চেনা কোয়ার্টারে ঢুকে লুন্টিতে নিজের বাড়ীতে একটা ফোন করলেন—সেখানে তখন কান্নাকাটি চলছে।

রোটাংডি-লুন্টি-তিলুড়ি-রূপজাম—সর্বত্র বিষণ্ণতার একটা কালো চাদর চাপা পড়েছে যেন—মর্মন্তুদ কি করুণ চাপা-কান্নার একটা অশ্রুত আওয়াজে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারা যায় না, বেদনা বুকে চেপে বসে! আমারই যদি এই অবস্থা তা'হলে বাচ্চাগুলোর মা-বাবা কেমন করে প্রাণে বেঁচে আছে? রাতুলদা'র, কৃষ্ণমূর্তির না-জানি—কি কষ্ট হচ্ছে?

(ক্রমশঃ)

আম্রতত্ত্ব

শ্রীগোপাল ভৌমিক

রাণী পছন্দ, পেয়ারাফুলি,
বেগমফুলি আম
হায় রে কতই নাম!
ছুঁতে গেলেই চোখ কপালে
ভিরমি লাগায় দাম।
নাম শুনে আর খোকাখুকুর
বাড়বে কতই জ্ঞান—
জিভের স্বাদে পায় না নাগাল
নিছক কেবল ধ্যান।

আকাল কেবল চালেরই নয়
আমের আকাল শুনে
আসবে আবার সুদিন কবে
চলছে কেবল গুণে।
বড় হলে থকেবে কি আর
আমের এমন রস?
পড়বে কি আর জিভের ডগায়
জল এত টস্ টস্!

মানব-কল্যাণে জীবাণু সমাজ

শ্রীঅতসি সেন

কথাটা শুনে ভারী আশ্চর্য লাগছে তাই না, ভাবছ তাই আবার হয় নাকি! কিন্তু সত্যি বলিতে কি, জীবাণু সম্বন্ধে আমাদের ধারনাটা আংশিক পক্ষপাতদুষ্টই। শুধু যত রাজ্যের মারাত্মক সব রোগের সৃষ্টিকারী ভয়ংকর রোগজীবাণুদের ভয়েই আঁতকে উঠি। ভুলে যাই যে জীবাণু মাত্রেই রোগ পারিবাহক নয়। এমন অনেক আছে, যারা শুধু নিরীহই নয়, আমাদের জীবনে অপরিহার্যও বটে।

জীবজগতের ক্ষয়-বিনাশে জীবাণুদের ক্ষমতা অপরিসীম। ভেঙেপড়া গাছ আর জন্তুজানোয়ারের মৃতদেহ পাহাড় হয়ে উঠত আমাদের আশেপাশে, যদি না এক জাতের জীবাণু তাদের পচিয়ে ধ্বংস করে জঞ্জাল সাফ করত। কেবল তাই নয়, সেই ধ্বংসাবশেষই মাটির সঙ্গে মিশে ধরিত্রীকে উর্বরা করে আর বাতাসে ছড়ায় অঙ্গারাম্ল গ্যাস, এককথায় যা 'উদ্ভিদের প্রাণ'! সত্যেন দত্তের 'মেথর' কবিতাটা পড়েছ তো, সেই যে 'কে বলে তোমায় বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি'। জীবাণুদের ক্ষেত্রেও কথাটি সমান প্রযোজ্য।

দুধ থেকে যে দই পাতি তা কিন্তু সম্ভব হ'ত না এরা না থাকলে। ঘোলের গন্ধ আর অম্লতাও এদেরই দান। মাখনের গন্ধও ননীর জীবাণুদের ওপরই নির্ভরশীল। মদ, ভিনিগার প্রভৃতি যে সব জিনিস গাঁজিয়ে তৈরী করতে হয়, সেগুলোর কোনটাই জীবাণুবিহীন করা সম্ভব নয়। 'ইষ্ট' বা এক জাতের ছত্রক জীবাণু তো পাঁউরুটি প্রস্তুত প্রণালীর সার অঙ্গ। দুধ থেকে যে পনির হয়, তারও সৃষ্টিকর্তা এরাই। বিভিন্ন রঙ আর বিশেষ বিশেষ গন্ধগুলি তাদেরই আত্মীয়-পরিজনদের দান।

পেটের মধ্যে খাদ্য-পরিপাক যন্ত্রেও এরা কাজ করে। চর্বিজাত খাদ্যগুলিকে ভেঙে দেয় বলেই শরীর তা গ্রহণ করতে পারে। নবজাত শিশুর অন্ত্রে যারা মাতৃ-দুগ্ধ হজম করায়, আর প্রাপ্ত বয়স্কদের অন্ত্রে যারা গো-দুগ্ধ হজম করে, তারা উভয়েই জীবাণু হলেও কিন্তু এক জাতের নয়। এছাড়া কেউ কেউ আবার বৃহদান্ত্রের সিংহদ্বারে প্রহরীর কাজও করে, যাতে ক্ষতিকারক রোগ-জীবাণুরা বেরিয়ে না পড়ে। শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে রক্ত পড়তে পড়তে যে শেষে রক্ত জমে ক্ষতমুখ বন্ধ হয়, তাও এদেরই কাজ।

জীবাণুসমাজের অন্যতম প্রয়োজনীয়তা আমাদের কৃষিশিল্পে। উদ্ভিজ্জজগতের সকলেরই যবক্ষারজানের বিশেষ প্রয়োজন। অথচ বাতাস থেকে তা সংগ্রহ করার ক্ষমতা তাদের মোটেই নেই। এর জন্যেও এক জাতের জীবাণুগোষ্ঠীর ওপর তারা একান্ত নির্ভরশীল। এরাই তা এদের সংগ্রহ করে দেয়। মটর, কলাই প্রভৃতি গাছগুলোর শিকড়ে যে ছোট ছোট আব দেখা

যায়, তার মধ্যেই এরা বাস করে। বাতাস থেকে যবক্ষারজান গ্রহণ করে এরা নিজেদের দেহে প্রোটীন সৃষ্টি করে, আর গাছগুলো পুষ্টিসাধন করে এদের হজম করে। এছাড়া এক জাতের জীবাণু জীবজন্তুর মলমূত্রের অ্যামোনিয়াকে নাইট্রাস অ্যাসিডে আর অপর এক গোষ্ঠী সেটিকে নাইট্রেট-এ পরিণত করে বলে গাছপালা তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

জীবদেহের পচন ও বিনাশসাধন করে জীবাণুরা 'হাইড্রোজেন সালফাইড' গ্যাস উৎপন্ন করে। আর অন্যেরা তাই দিয়ে সৃষ্টি করে সালফিউরিক অ্যাসিড আর সালফেট। এই অ্যাসিড মাটিতে থাকে বলেই অপকারী জীবাণুরা, যারা শস্য নষ্ট করে, তারা বাঁচতে পারে না।

এছাড়া কিছু কিছু জীবাণু আবার নানান রকমের রঙও তৈরী করে। লাক্ষার বার্ণিশ প্রস্তুতের বিশেষ সুরাসারটি আর নোখ-রাঙানোর রাসায়নিক পদার্থটিও ভুট্টা আলুজাত জীবাণু-উদ্ভূত। আলেয়া-ভূতের গল্প তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। সেটিও এদের সৃষ্ট উদ্ভিদের পচন-জনিত গ্যাস।

অনেক ধরনের শিল্পেই আমরা এদের কাজে লাগাই। চামড়া 'ট্যানিং' কার্যে তো এরা অত্যাবশ্যক। অসংস্কৃত চামড়াগুলিকে এক বিশেষ জাতের গাছের ছালের জলে ভিজিয়ে রাখলে, জীবাণুগুলি অপ্রয়োজনীয় লোম আর ছালটুকু খেয়ে চামড়াটিকে নরম ব্যবহারোপযোগী করে তোলে। তিসি গাছের আঁশ যা দিয়ে এক জাতের বস্ত্র শিল্প চলে, সেগুলিকেও জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়, যাতে জীবাণুগুলি তন্তু সমষ্টির দৃঢ়সংবদ্ধ ছোবড়াগুলিকে পচিয়ে সুতোগুলির উদ্ধারকার্য সহজসাধ্য করে তোলে—এই উপায়েই শন ও পাট থেকে দড়ি, টোয়াইন ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।

তামাক, নীল প্রভৃতি বহু বাণিজ্যই এদের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। আসল তামাকপাতা দিয়ে বিড়ি বানানো চললেও দামী সিগারেটের রঙ আর গন্ধ জীবাণুদেরই দান। টাটকা কফির যে গন্ধে মন মাতোয়ারা হয়, তাও তাদেরই সৃষ্টি। তারা না থাকলে অমন যে চকোলেট তারও স্বাদ ভুলতে হ'ত তোমাদের। কারণ কোকোর বিচি আসলে সাদা রঙের, আর খেতেও তা তেতো, মিষ্টি নয় মোটেই।

আস্তাকুঁড়ের জঞ্জালে, অন্ধকার জায়গায় অনেক সময়েই চিংড়ী মাছের খোলার ওপরে একটা স্নিগ্ধ নীলাভ আলো দেখা যায়। এক জাতের জীবাণুরাই এই আলোক বিচ্ছুরিত করে। সমুদ্রের অতলে যেখানে সূর্যালোক প্রবেশাধিকার পায় না, সেখানকার মাছেদের গায়ে এই রকম জীবাণুরা বাস করে, যারা আলো জেলে মাছেদের পথ দেখায়।

রোগ-জীবাণুরা যেমন রোগ ছড়ায়, নানান জাতের উপকারী জীবাণুরা আবার তেমনি এসব রোগের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। রোগ সারায়ও বটে। বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু

কথাটা সত্যি ! কিছু কিছু জীবাণুবন্ধুরা সত্যি-সত্যিই রোগ-জীবাণু ধ্বংসকারী রস সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিস্ময়-ওষধি 'পেনিসিলিন'ই তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এর আবিষ্কর্তা হলেও, আমাদের জ্বালা-যন্ত্রণা দেখে কাতর হয়ে ইনি নিজে এসেই দেখা দিয়েছিলেন বলা চলে। এরপর আবিষ্কৃত হ'ল 'স্ট্রেপটোমাইসিন'। এদের কথা আবিষ্কারকের মাথায় এল কি করে জান ? তিনি ভাবলেন, মাটির মধ্যে যখন বহু বিভিন্ন জাতের জীবাণুই একত্রে বসবাস করে, তখন কিছু সংখ্যক নিশ্চয়ই অন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এই ভেবেই মানব-কল্যাণী জীবাণুদের সন্ধানে দশ হাজার মাটির নমুনা বিশ্লেষণ করার পর বন্ধুটিকে খুঁজে বার করেন। ব্যাসিট্রাইসিন, পলিমাইসিন ইত্যাদি ওষুধপত্রও জীবাণুসঞ্জাত। অরিওমাইসিন, ক্লোরো-মাইসিন, টেরামাইসিনরাও এই বংশেরই।

টিকা দেওয়া বা 'ভ্যাকসিনেশন'কেও এদের পরোক্ষোপকার বলা চলে। ওদের দেহাবশেষ দেহে প্রবেশ করিয়েই এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়। 'অ্যান্টিটক্সিন বা জীবাণুধ্বংসকারী ইনজেকসনগুলিও এই জাতের।

'ভিটামিন বি ১২-এর মতন ওষুধের জনকও জীবাণুরাই। এছাড়া 'প্রোটিয়েজ' বলে এক জাতের রসও তারা সৃষ্টি করে, যেগুলি পোড়া, কাটা ঘায়ে লাগালে, তারা ক্ষয়প্রাপ্ত পেশীগুলিকে খেয়ে ক্ষতটি সরিয়ে তোলে।

রোগ-জীবাণুরা এইসব উপকারী জীবাণুদেরই যে সঙ্গী-সাথী একথা মিথ্যে নয়। তাদের আক্রমণে আমাদের ক্ষতির পরিমাণও অনেক। কিন্তু তবু কতকগুলি দোষীর দুর্ব্যবহারে যেমন দলনির্বিশেষে নির্দোষীদের শাস্তিবিধান করা অন্যায়, তেমনি মানব-কল্যাণব্রতী এই সব পরোপকারী জীবাণুদের অক্লান্ত পরিশ্রমের উপযুক্ত সম্মান না দিলে যে অকৃতজ্ঞতা হবে তাতে ভুল নেই।

হাতের কুড়ি

শ্রীনরোত্তম হালদার

হাত-খালি তোর ; হাত-ছাড়া তাই, হাত-ধরাদের দল,
হাত-পাতাতে হাত-ওঠে না ? করবি কি তাই বল।
হাত-ঘড়িটা করলে চুরি, ধরবে হাতে-নাতে—
হাতকড়িতে হাত-টান দোষ ঘুচবে হাতে-হাতে।
মনিবকে হাত করতে হলে, হাত-চালালো চাই ;
হাত-তোলাদের হাততালিতে হাতযশ তো নাই !
হাতের কাজে হাত-লাগালে হাত-খরচা পাবে—
হাতগুটিয়ে থাকলে ব'সে, হাতের-পাঁচও যাবে !

এপ্রিল (FOOL) ফুল

শ্রীশৈলেশ ভড়

'এপ্রিল (fool) ফুল' কথাটার মানে কী বলো তো ?

হ্যাঁ, কারোর কোনো ক্ষতি না-করে বোকা বানানো। তবে যখন-তখন নয়—বছরে একবার এবং তাও ১লা এপ্রিল।

আমাদের দেশে এই নামটা খুবই প্রচলিত, কিন্তু এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখা যায় না বেশী।

কিন্তু হল্যাণ্ডবাসীরা এ বিষয়ে খুব উৎসাহী। কাগজ, বেতার এমন কি টেলিভিসনের মাধ্যমে যা সব কাণ্ড করা হয় তা শুনলে তোমরা খুব মজা পাবে।

কয়েকটি ঘটনার কথা বলি শোনো—

কয়েক বছর আগে একদিন সকালে ওদেশের একটি বহু প্রচলিত সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় একটি খবর ছাপা হলো। খবরটি হচ্ছে এই যে—ছাপার কালিতে ভালো গন্ধ না থাকায় ওরা টিউলিপ্ ফুলের রস দিয়ে একটি সুগন্ধি কালি বার করেছে এবং এই সংবাদপত্রটি সেই কালি দিয়ে প্রথম ছাপা হয়েছে।

ঘুম থেকে উঠে খবরটি পড়েই সবাই কাগজটিকে নাকের কাছে তুলে ধরলো।

তারপর ? তারপর কী হলো বলো তো ?

কেউ গলা ছেড়ে হেসে উঠলো, আবার কেউ গম্ভীর হয়ে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে দেখলো—সেদিন ১লা এপ্রিল।

তোমরা শুনলে অবাক হবে, অনেক বুদ্ধিমান লোকও জেনেশুনে বোকা বেনে যায়—এমনি তাদের বলার বা লেখার কায়দা।

১৯৫০ সালের এক সন্ধ্যায় এম্স্টারডাম বেতারে ঘোষণা করা হলো যে, 'ছবি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য যে রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়, তাতে হঠাৎ এমন একটি দোষ পাওয়া গেছে যার ফলে বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী রেমব্রাণ্ডস্-এর আঁকা 'দি নাইট ওয়াচ' ছবিখানির রং দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

বেতার মারফৎ খবরটা প্রচার হওয়া মাত্রই কি কাণ্ড যে ঘটলো তা বোধহয় বুঝতে পারছো ?

তখন আবার দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে।

সেই বৃষ্টির মধ্যেই দলে দলে লোক ছুটলো রিজক্স্ মিউজিয়ামের দিকে। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ সাইকেলে আবার কেউ গাড়ীতে।

বিখ্যাত ছবিটি অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে একবার শেষ দেখা দেখতে চায় তারা।

তারপর ?

তারপর আসল ঘটনাটা যখন জানা গেলো, তখন সবাই বোকা বেনে গেছে। হ্যাঁ, বুদ্ধিমান লোকেরাও। যদিও তারা জানতো তারিখটা ১লা এপ্রিল। মিথ্যে খবরটাকে এমনভাবে সত্য বলে প্রচার করা হয়েছিল যে, কেউ সন্দেহ করতে পারেনি।

'এপ্রিল (fool) ফুল'-এর স্থযোগ নিয়ে এমস্টারডামের একটি অপ্রচলিত পত্রিকা কেমন করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলো সেই খবরটাই এবার বলি :

ঐ কাগজটিতে একটি খবর বেরোলো যে, 'গ্লাসোরে সোনেটার' যন্ত্রের সাহায্যে স্থানীয় চিড়িয়াখানায় একটি বাঁদরকে কথা বলানো হচ্ছে। যন্ত্রটি পশুটির গায়ে এমনভাবে লাগানো আছে যে, তার মনের সব কথা উক্ত যন্ত্রটির সাহায্যে উচ্চারিত হবে।

এর ফল হলো কি জানো ?

পত্রিকাটির চাহিদা খুব বেড়ে গেলো।

এমন কি অন্য একটি পত্রিকার সম্পাদক চিড়িয়াখানার পরিচালককে ফোনে ডেকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে বললেন, 'খবরটি আপনি আমাদের আগে না-জানিয়ে অন্যকে জানাতে গেলেন কেন ? আমরা তো খবরের জন্যে টাকা দিয়ে থাকি।'

পরিচালক একেবারে থ।

হবেই তো।

খবরটা যে সম্পূর্ণ ভুল।

এই রকম ভুল খবর ছাপিয়ে 'এপ্রিল (fool) ফুল' করার জন্য প্রত্যেক কাগজ প্রতি বছরেই কিছু গ্রাহকের আস্থা হারায়। কিন্তু সংখ্যায় তারা এত অল্প যে কর্তৃপক্ষ তার জন্যে পরোয়া করেন না।

আবার বোকা বানাবার নতুন নতুন উপায় বাতলে দিতে পারলে অনেক পত্রিকা উপহারও দিয়ে থাকেন গ্রাহকদের।

কি, তোমরা একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি ? কিন্তু মনে রেখো—কারোর কোনো রকম ক্ষতি বা অসম্মান না করে বোকা বানাতে হবে। পারবে তো ?

সীমান্ত পাহারা

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কত বড় বড় বীর যে শিখ্‌দের মধ্যে থেকে দেখা দিয়েছেন! বল্‌তে গেলে, শিখ্‌ ইতিহাস আগাগোড়া বীরত্বেরই বৃত্তান্ত।

তার কারণ বোঝাও শক্ত নয়। অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে নিজেদের আর স্বদেশকে বাঁচাবার জন্যেই তো শিখগুরুর আবির্ভাব। পাঞ্জাবের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণে আত্মরক্ষার জন্যেই শিখধর্মের জন্ম। শিখধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা কিছু নয়। হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা শিখধর্ম। শিখরা প্রকৃতপক্ষে তো আর অহিন্দু নন।

পাঞ্জাবের এক মহা দুর্দিনে আত্মরক্ষার জন্যে শিখধর্মের বিস্তার হয়েছিল। তাই শিখরা গোড়া থেকেই বীরত্বের পূজারী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বন্দীবীর' কবিতায় কি সুন্দরভাবে শিখদের সেই জাগরণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন:

"পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে 'গুরুজীর জয়'
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ।"...

তেমনি একজন শিখ বীরের এই গল্প। গল্প নয়, ইতিহাসের সত্য কাহিনী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ওই কবিতাটিতে শিখদের প্রথম যুগের স্বদেশী উন্মাদনার কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ ঘটনা তার অনেক পরের কথা। তখন শিখদের বীর রাজা রণজিৎ সিংহের আমল। তবে শিখদের বীরত্বের গাথা তখনো আগেকার মতন অম্লান আছে। শিখ দেশ-প্রেমীদের মনে তেমনি জাতীয়তার উদ্দীপনা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির ভাষা তখনো শিখ বীরদের বিষয়ে প্রয়োগ করা যায়:

"অলখ নিরঞ্জন—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয় ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝন্‌ঝন্।
পাঞ্জাব আজি গরজি উঠিল,
'অলখ নিরঞ্জন'।
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদীর ঘিরি দশ তীর
এসেছে সে একদিন।"···

মহারাজা রণজিৎ সিংহ তখন পাঞ্জাব কেশরী। আর তার এক উপযুক্ত সেনাপতি হরি সিং নাল্‌ওয়া। মোগল প্রভুত্ব এখানে তার অনেক আগেই শেষ হয়েছে। না হলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখন বলা যেত :

"দিল্লী প্রাসাদ কূটে
হোথা বার বার বাদশাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।"···

সেনাপতি হরি সিং নাল্‌ওয়ার ওপর মহারাজা রণজিৎ সিংহের খুবই আস্থা। কারণ হরি সিং শুধু বীর যোদ্ধা ন'ন, তিনি অতি দূরদর্শী ও বিচক্ষণ সেনানায়ক। তিনি ভাল-ভাবেই জানেন, যুদ্ধ জয় শুধু রণক্ষেত্রেই হয় না, সেজন্যে আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা আগে থেকেই দরকার। রাজ্যকে সুরক্ষিত করতে সীমান্ত রক্ষার প্রথমেই প্রয়োজন।

মহারাজা রণজিৎ সিংহের তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিশাল রাজ্য গড়ে উঠেছে। তার নিরাপত্তার জন্যে সীমান্ত রক্ষার গুরুত্ব খুবই বেশি। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খাইবার গিরিপথ।

খাইবার পর্বতমালার পথ ধরে যুগে যুগে বিদেশী দস্যুদল সোনার ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করতে এসেছে। খাইবার গিরিপথ রক্ষা না করার জন্যে ভারতকে অশেষ লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ সইতে হয়েছে শতাব্দের পর শতাব্দ ধরে। এই পাহাড়ী পথে যখনই বিদেশের অত্যাচারীর দল

হানা দিতে এসেছে, এ অঞ্চলের পাহাড়ে পাহাড়ে যে সব দস্যুদলের বাস তারাও সেই সব লুঠতরাজে তখন ভাগ বসায়। বাইরের হানদাররা দল ভারী করে স্থানীয় ডাকাতদের নিয়ে। কারণ তাতেই তাদের সুবিধা—এখানকার পথ-ঘাটের সব হদিস এদের ভাল রকম জানা।...

মহারাজা রণজিৎ সিং যখন বিরাট শিখ্ সাম্রাজ্য পত্তন করলেন, তখন তাঁর সামনেও খাইবার গিরিপথের সমস্যা দেখা দিলে। উত্তর-পশ্চিমের এই সীমান্ত রক্ষার জরুরী দরকার। এই পথ ধরে যেন বিদেশী দস্যুর দল আর না প্রবেশ করতে পারে।

রণজিৎ সিং সেনাপতিদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন। একজন বললেন, 'পাঞ্জাবের সীমানা হ'ল সিন্ধু নদী। সুতরাং সিন্ধুর তীর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল অধিকার করে নেওয়া উচিত।'

প্রস্তাবটা মহারাজার বেশ পছন্দ হ'ল।

কিন্তু হরি সিং বললেন, 'না, তাতে স্থায়ী ফল হবে না। বিদেশী আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে খাইবার গিরিপথকে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। আর সেই সঙ্গে এ অঞ্চলে আরো যত পার্বত্য-পথ আছে বাইরে থেকে ভারতে প্রবেশ করবার। সেজন্যে এখানকার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে গিরি-দুর্গ তৈরী করতে হবে।'

রণজিৎ সিং বুঝতে পারলেন হরি সিংহের যুক্তিই ঠিক। তিনি তাঁকে সমর্থন করলেন এবং সেই মতন ব্যবস্থা করতে বললেন।

সীমান্ত পাহারার কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করলেন হরি সিং। এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাঁরই।

খাইবার গিরিপথের কাছে জাম্রুদ পাহাড়ে তিনি প্রকাণ্ড কেল্লা গড়ে তুললেন। অন্যান্য পাহাড়েও স্থাপন করলেন ছোট ছোট দুর্গ। এই সব গড় রক্ষার ভার দিলেন হিন্দু যোদ্ধাদের ওপর। তাঁর এই দূরদর্শিতার জন্যে অনেক পরের যুগেও এখানকার উপজাতিয় লোকেরা তাঁকে স্মরণ করে।...

হরি সিংহের বাড়ি ছিল পাঞ্জাবের গুজরান্ওয়ালায়। উপ্পল ক্ষত্রিয় জাতির লোক তিনি। আর ছেলেবেলা থেকেই নানরকম পুরুষোচিত খেলাধূলায় তিনি পারদর্শী।

মহারাজা রণজিৎ সিংহও খেলাধূলা যেমন ভালবাসতেন, তেমনি নিজেও একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। প্রতি বছর বসন্ত পঞ্চমীর দিন মহারাজা খেলাধূলার বিস্তর আয়োজন করতেন। পাঞ্জাবের নানা স্থান থেকে তরুণ খেলোয়াড়রা যোগ দিতেন সেই অনুষ্ঠানে। এমনি এক খেলার আসরে হরি সিং মহারাজার চোখে পড়েন। সেদিন থেকেই গুজরান্ওয়ালার এই নবীন খেলোয়াড়টিকে রণজিৎ সিং ভর্তি করে নিলেন তাঁর কাজে, সৈন্যদলে।

তারপর থেকে মহারাজ অনেক সময় হরি সিংকে নিজের কাছে-কাছেই রাখতেন। একদিন হরি সিংকে তিনি নিয়ে বেরিয়েছেন শিকারে। জঙ্গলের মধ্যে এক সময় হরি সিংয়ের কাছে

থেকে একটু দূরে গিয়ে পড়েছেন। এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্যে থেকে বাঘ লাফ দিয়ে পড়ল হরির সামনে।

রণজিৎ সিং দূর থেকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বললেন, 'এখনি আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। মনে সাহস রাখো।'

হরি সিং উত্তর দিলেন, 'আপনি ভাববে না, মহারাজা। ওটাকে আমি শেষ করে ফেলেছি।'

রণজিৎ সিং ছুটে এসে দেখলেন, সত্যিই বাঘের পেটের মধ্যে ঢুকে রয়েছে হরি সিংয়ের তলোয়ার। বাঘের প্রাণহীন দেহের সামনে হরি সিং দাঁড়িয়ে।

সেদিন মহারাজা আরো ভাল করে বুঝতে পারলেন—হরি সিং কত সাহসী আর কেমন বীর শিকারী।...

মহা সাহসিক হরি সিং সেনাবাহিনীর কাজে ক্রমেই উন্নতি করতে লাগলেন। অবশেষে মহারাজার সৈন্যদলের একজন সেনাপতি হলেন তিনি। তাঁর ওপর এবার মহারাজা এক-একটি অভিযানের দায়িত্ব দিতে লাগলেন।

হরি সিং উত্তর-পশ্চিমের হাজারা জেলা জয় করলেন, আর তাঁর নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত হ'ল হরিপুর হাজারা নগর। দেওয়ান মোতিরাম তারপর অধিকার করলেন কাশ্মীর। কিন্তু সেখানে তাঁর নীতি কৌশল ঠিক হ'ল না। তাই মহারাজা হরি সিংকে পাঠালেন মোতিরামের স্থানে। তিনি পাঞ্জাব থেকে অনেকগুলি পরিবারকে কাশ্মীরে আনিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

কাশ্মীরে একটি অদ্ভুত অবস্থা লক্ষ্য করলেন হরি সিং। এখানকার প্রায় সব হিন্দু তীর্থস্থান মুসলমানদের অধিকারে চলে গেছে। তিনি তখন কাশ্মীরী মুসলমান ও পণ্ডিতদের এক প্রতিনিধি-সভা আহ্বান করলেন ব্যাপারটি আলোচনার জন্যে। সভায় তিনি মুসলমান প্রতিনিধিদের বুঝিয়ে বললেন, 'হিন্দুদের এইসব পবিত্র তীর্থ দখল করে রাখলে মুসলমানদের ঘৃণা করবে হিন্দুরা। সেটা কি দেশের পক্ষে মঙ্গলের?'

মুসলমানরা হরি সিংহের কথায় রাজি হলেন এবং তীর্থক্ষেত্রগুলি ফিরিয়ে দিলেন হিন্দুদের।

তারপর একদিন হরি সিং শুনলেন, অনেক হিন্দুকে জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানো হয়েছে। শুনে তিনি ঢেঁড়া পিটে ঘোষণা করলেন যে, যাঁদের বলপ্রয়োগ করে নিজেদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাঁরা যেন উপস্থিত হন তাঁর দরবারে।

এমনিভাবে তিনি প্রায় বারো হাজার হিন্দুকে আবার হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনেন।

এইসব ঘটনার ফলে অনেক গোঁড়া মুসলমানের দারুণ আক্রোশ জাগল হরি সিংহের ওপর।

একদিন তিনি কাশ্মীর থেকে ফিরছিলেন। হাজারার পাঠানরা এক জায়গায় জমায়েৎ

হ'ল তাঁকে দেখে। তারপর তাঁকে সদলে এমনভাবে ঘিরে ফেললে যেন তিনি আর এগিয়ে যেতে না পারেন। কিন্তু তারা তখন জানত না যে হরি সিংয়ের সঙ্গে আছে প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য। তাঁর নেতৃত্বে সেই হিন্দু সেনাদল এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ করলে যে, বেশির ভাগ পাঠানই প্রাণ নিয়ে পালাল। আর কিছু পড়ে রইল হতাহত হয়ে।

কিন্তু তাতেও শত্রুদের শিক্ষা হ'ল না। তারা মাঝে-মাঝেই দল বেঁধে হরি সিংহকে আক্রমণ করতে আসত আর প্রতিবারই মারা পড়ত পাঠানরা। তখন তিনি তাদের শত্রুতা জব্দ করবার এক উপায় স্থির করলেন।

তাঁর আদেশে সৈন্যরা মুসলমানদের মৃতদেহের ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল। আর মুসলমানদের বিশ্বাস যে, যার মৃতদেহ পোড়ানো হয় সে নরকে যায় নিশ্চিত। তাই তারা এমন ভয় পেয়ে গেল যে, তাঁর ধারে-কাছে আর ঘেঁষত না তার পর থেকে।

আগে ঝিলম্ জেলার প্রত্যেক হিন্দুকে 'জিজিয়া' কর দিতে হ'ত। শুধু হিন্দু হওয়ার জন্যেই ধনী-দরিদ্র সকলেরই মাথা পিছু 'জিজিয়া' লাগত এক টাকা করে। হার সিং এ অঞ্চল জয় করেই এই অন্যায় কর উঠিয়ে দিলেন। আর শঠে শাঠ্যং ব্যবস্থা করলেন এ অভিযানের খরচ বহন করবার জন্যে—তাঁর আদেশে প্রতি মুসলমান পরিবারকে খাজনা বাবদ পাঁচ টাকা করে সরকারকে দিতে হ'ল।

হিন্দুধর্মে পরম বিশ্বাসী ছিলেন হরি সিং। একবার তিনি কাশ্মীরে তীর্থ করতে গেছেন। এমন সময় একজন পাঞ্জাবী মহিলা তাকে এসে জানালেন, 'আমার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মণিকরণ ঘাটের পাণ্ডা এক টাকা না পেলে আমায় সৎকার করতে দিচ্ছেন না। আমি নিতান্ত গরীব, আমার টাকাকড়ি কিছু নেই।'

সব শুনে হরি সিং মহিলাটির সঙ্গে মণিকরণ ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন এবং এসে বললেন, 'আমি এই ঘাট কিনতে চাই।'

ঘাটের পাণ্ডা তাঁকে চিনত না। সে বললে, 'এর দাম অনেক। এখানে আগাগোড়া যদি রুপোর টাকা ছড়িয়ে দিতে পারেন, তাহলে মণিকরণ ঘাট আপনার হবে।'

হরি সিং তাই করলেন। আর তারপর থেকে কোন পাঞ্জাবীকে সেখানে সৎকারের জন্যে অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি।···

স্বধর্ম আর স্বদেশের সেবায় এমনি নানাভাবে উৎসর্গ করা ছিল তাঁর জীবন। আর দেশের মঙ্গলের জন্যেই প্রাণ পর্যন্ত তিনি বিসর্জন দিয়ে যান। রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার যে দায়িত্ব তিনি আজীবন বোধ করতেন সেই কর্তব্য পালন করতেই মৃত্যু বরণ করেন অবশেষে। এখন সেই কাহিনী বলি :

'শত্রুপক্ষের বন্দুকের গুলি এসে বিঁধল হরি সিংহের গায়ে।'

তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। জ্বরে শয্যাশায়ী অবস্থা। এমন সময় সংবাদ এল, কাবুল সর্দার দোস্ত মহম্মদ সসৈন্যে এসে জাম্‌রুদ্ দুর্গ অবরোধ করেছে। বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে কেল্লায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা।

দুর্গ-পতি মাহান সিং সে রাত্রে হরি সিং শলোয়ার কাছে খবর পাঠালেন যে, পরের দিন সকালেই সাহায্য প্রয়োজন; নচেৎ জাম্‌রুদ দুর্গ বাঁচাবার আর আশা থাকবে না।

শুনে নিজের অসুস্থতা অগ্রাহ্য করে পেশোয়ার যাত্রা করলেন হরি সিং।

শত্রু শিবিরে একথা পৌছবামাত্র দোস্ত মহম্মদ দলবল নিয়ে পালিয়ে গেল। হরি সিং সসৈন্যে তাদের তাড়া করে চললেন খাইবার গিরিপথের অভ্যন্তরে। দোস্ত্ মহম্মদের দলের বিস্তর ক্ষতি হ'ল।

কিন্তু হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে শত্রুপক্ষের বন্দুকের গুলি এসে বিঁধল হরি সিংহের গায়ে। আর তিনি ঘোড়ার ওপরেই ঢলে পড়লেন। তাঁর পরম অনুগত ঘোড়াটি সেই অবস্থাতেই প্রভুকে নিয়ে ছুটে এল জাম্‌রুদ দুর্গে। এখানেই হরি সিং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তার অনেক আগে পেশোয়ার থেকেই তিনি মহারাজা রণজিৎ সিংকে পত্র দিয়েছিলেন একটি সৈন্যদল পাঠিয়ে সাহায্য করবার জন্যে, কিন্তু মহারাজা তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অকস্মাৎ দূত-মুখে হরি সিং নালোয়ার মৃত্যু সংবাদ শুনে শুম্ভিত হয়ে গেলেন শোকে ও দুঃখে।···

সীমান্তের বীর প্রহরী উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত পাহারা কালেই জীবন দান করলেন।

জলের তলায় আর এক শহর

শ্রীকরুণাময় বসু

১৯৬৮ সালের অক্টোবর চার তারিখের আগে কে মনে করেছিল জলপাইগুড়ি শহর জলের তলায় চলে যাবে। মানুষ, পশু, সরীসৃপ একসঙ্গে ভেসে চলে যাবে সর্বনাশা বন্যায় শুকনো কুটোর মতো। উন্মত্ত স্রোতের মুখে অসহায় মানুষ প্রকৃতির ভয়ংকর খেয়াল-খুশির একমুষ্টি ক্রীড়নক হয়ে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবে শুধু বাঁচার তাগিদে। তবু ক'দিন পরে জলের তলা থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল জলপাইগুড়ি শহর, পলির তরল কর্দমে একেবারে মাথামাথি হয়ে।

কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা, আর এক শহর ক'মিনিটের মধ্যে জলের তলায় মিলিয়ে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ঘর-বাড়ী, বাগান-পার্ক, দোকান-পশরা শহরের বাসিন্দে সবসুদ্ধ। শুধু কেঁপে ওঠা নীল জলের তলায় সাজানো ঘর-বাড়ী ভৌতিক ছবির মতো অনেক কাল পর্যন্ত ঝিলমিল করে উঠতো কৌতূহলী মানুষের চোখের সামনে।

ক্যারিবিয়ান উপসাগরের কল্লোলিত নীল জলে জামাইকা একটা সুন্দর সাজানো দ্বীপ। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এই ছোট্ট দ্বীপ ছবির মতো কাঁচ-নীল জলে দোল খায় সারা দিন রাত: তীরভূমির মেহগনি বন, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, বাতাসের ঢেউয়ে মর্মর করে ওঠে; বিকেলের আলোছায়া-মাখা আকাশে লাল রঙের মেঘ হঠাৎ ধূসর হয়ে এলে সাঁ সাঁ করে ঝড় ওঠে, তখন দ্বীপের কম্পমান নারিকেল কুঞ্জের সারি, ফার্ন লতাপাতার ঝোপঝাপ আছড়ে প'ড়ে কেবলি হুহু স্বরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। প্রজাপতির ঝাঁক আর ঘরে-ফেরা পাখিরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। যারা ডিঙি করে দূর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, তাদের জন্য দ্বীপের লোকেদের দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না—কেউ ফেরে, কেউ চিরকালের মতো হারিয়ে যায় জলের তলায়।

ইতিহাসের পাতায় জামাইকা বিচিত্র রঙের তুলিতে আঁকা সরু এক-চিলতে রহস্য-ঘেরা দ্বীপ। এখানকার সব চেয়ে বড়ো বন্দর ও রাজধানী কিংস্টন শহর। তার অল্প দূরে ফোর্ট চার্লস, যেখানে অপরাজেয় দুর্ধর্ষ নৌযোদ্ধা হোরেসিও নেলসন যৌবনে অনেককাল কাটিয়েছেন। যিনি ছেলেবেলায় মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হোয়াট ইজ ফিয়ার মামি?' অর্থাৎ ভয় নামক বস্তুটি কি মা? এই দ্বীপের একটা ঐতিহাসিক নৌবন্দর ছিল পোর্ট রয়্যাল, সাতারো শতকের শেষ দশক পর্যন্ত; তারপর সে শহর হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল ক্যারিবিয়ান সাগরের জলের তলায় এক মুঠো ধুলার মতো।

এই শহর গড়ে উঠেছিল বোম্বেটেদের ডাকাতির পয়সায়। তারা জাহাজ লুট করতো মাঝ দরিয়ায়, আর সোনা, মুক্তো, অঢেল পয়সা ছড়িয়ে দিতো পোর্ট রয়্যালের পানশালায়,

জুয়োর আড্ডায়। কথায় কথায় তারা মনুষ খুন করতো। মানুষের রক্তে, মদের ফেনায়, ঐশ্বর্যের উচ্ছ্বাসে হোটেলের মেঝে, কাফেগুলো বিষয়ে উঠতো রাতের পর রাত।

কিন্তু একদিন এই সোনার নরক পোর্ট রয়্যাল শহর কেঁপে উঠলো ভয়ংকর ভূমিকম্পে। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের সাতই জুন মধুর আলস্য-ভরা দিন, লোকজন কর্মব্যস্ত। দূরের জলপাই বন, আঙুরের ক্ষেত থেকে একটা সতেজ সুগন্ধ মন্থর হাওয়ায় ভেসে আসছে। আপিস, দোকান-পশরা, হাট, মাঠ, ক্ষেত, সবুজ পাহাড়ের ঝোপঝাপ, জঙ্গল, সোনার রৌদ্রে দোল খাচ্ছে আতপ্ত রক্তিম আপেলের মতো। হঠাৎ কি যে হয়ে গেল: একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পের দোলায় কেঁপে উঠলো সমস্ত শহর। শহরের সমস্ত গীর্জা, বাড়ী-ঘর দোকানপাট, চিনির কারখানা, কমলালেবুর বন, দ্রাক্ষাক্ষেত, বন্দরের প্রায় বারো আনা, লোকজন সমেত উদ্ধত উত্তাল সমুদ্রের উন্মুক্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শহর চলে গেল সাগরের জলের তলায়!

বন্দর কাউন্সিলের খাতায়-পত্রে এর বিচিত্র বর্ণনা আছে। এই ঘটনার প্রায় একশো বছর পরে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এ্যাডমিরাল স্যার চার্লস হ্যামিলটন জাহাজ থেকে দেখেছেন এই নিমজ্জিত ভুতুড়ে শহরের বাড়ী-ঘর, স্তম্ভ, গির্জার চূড়ো জলছবির মতো ক্যারিবিয়ান উপসাগরের নীল জলে ঝিকমিক করছে।

আষাঢ়ে বাদল নামে

শ্রীশান্তি বসু

দলে দলে মেঘ এলো
কোথা হতে ভেসে
নাচিছে যে, প্রাণ মন
আজিকে হরষে।
আকাশে মাদল বাজে
ওই গুরু গুরু,
বরষার নব-ধারা
হ'ল বুঝি সুরু।

খাল বিল মাঠগুলি
জলে গেছে ভরে,
বনভূমি সেজেছে যে
কদম্ব-কেশরে।
ছুটিয়া চলেছে নদী
ধারা খরতর,
আষাঢ়ে বাদল নামে
আজি ঝরঝর।

'ওকে মারবেন না! ও আমার ভাই'...

হরিয়ল তোতা পরিয়ল তোতা

(হিন্দী অনুবাদ)

শ্রীদীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন এক জঙ্গলে ছিল মস্তবড় একটি বটগাছ। সেই গাছে ছিল হরেক-রকম পাখীর বাসা। ওই পাখীদের মধ্যে দুটি তোতাও ছিল। একটির নাম ছিল—'হরিয়ল' আর দ্বিতীয়টির নাম 'পরিয়ল'। এই পাখী দুটি ছিল সহোদর ভাই। সারাদিন এরা খুব খেলে বেড়াত; স্বাধীনভাবে উড়ত আর গান গাইত। কারও সঙ্গে লড়াই বা ঝগড়া কিছুই ছিল না। সবার সঙ্গেই মিলেমিশে থাকত এরা।

বটগাছে থাকতে যখন এদের বিতৃষ্ণা লাগত, তখন এরা উড়ে যেত দূরের কোন মাঠে

কিংবা সবুজ সবুজ পাতায় আর ফুলে-ভরা কোন বাগানে। এই ভাবে খুব আরামে এদের দিন কাটত আর সব পাখীদের সঙ্গে।

একদিন কোথা হতে এক শিকারী এল ঐ জঙ্গলে। বটগাছে নানান পাখীদের বাসা দেখে শিকারী তার জাল বিছিয়ে দিল। হরিয়ল আর পরিয়ল ঐ সময়ে জঙ্গলে ছিল না; বাসায় ফেরার পথে তারা আটকে গেল ঐ শিকারীর জালে। কিছুক্ষণ পর শিকারী এসে পাখী ছুটোকে ধরে নিয়ে চলল বাজারে, বিক্রি করার জন্যে। বাজারে গিয়ে তোতা ছুটোর দাম ফেরি করে বিক্রি শুরু করল। তখন এক সাধু এল সেখানে। তার ছিল তোতা পোষার খুব সখ। সাধু একটি তোতা কিনে নিল। সাধুর কাছে বিক্রি হ'ল হরিয়ল।

হরিয়ল তোতা বিক্রি হয়ে যাবার তিনদিন পরেও পরিয়লের কোন গ্রাহকই এল না। এর মধ্যে পরিয়লের পেটে কোন দানাপানিও পড়ল না এবং হরিয়লের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ছুঃখে ও আরও মুসড়ে পড়ল।

পরিয়লের এই অবস্থা দেখে শিকারীর খুব চিন্তা হ'ল। এইভাবে থাকলে হয়তো পরিয়ল মরেও যেতে পারে। এই রকম ভেবে শিকারী খুব সস্তা দামে একজন অভদ্র লোকের কাছে বিক্রি করে দিল পরিয়লকে।

সাধু হরিয়লকে রোজ ভোরে 'রাম রাম' বলা শেখাত। নানা রকম শ্লোক আর খুব ভাল ভাল কথা বলাত। হরিয়লের সুখ-সুবিধার দিকে ওর পূর্ণ দৃষ্টি থাকত।

কিন্তু পরিয়লের মালিক তাকে প্রায়ই অভুক্ত রাখত। সে সারাদিন নিজের ঘরে অশ্লীল গালাগালি করত। এই অসৎ লোকটার স্বভাবের ছোঁয়া লাগল পরিয়লের উপর। তাই পরিয়লও ওই অশ্লীল গালিগালাজ শিখে ফেলল।

একদিন সাধু হরিয়লকে জিজ্ঞাসা করল যে—তার এখানে থাকার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা? এর উত্তরে হরিয়ল বললো যে, তার সেই বটগাছ আর ভাইকে কেবল মনে পড়ছে। হরিয়লের এই কথা শুনে সাধুর মনে দয়া হলো এবং সে হরিয়লকে ছেড়ে দিল।

খাঁচা থেকে মুক্তি পাবার পর হরিয়ল সাধুকে ধন্যবাদ দিয়ে সেই বটগাছের দিকে উড়ে চলে গেল।

ওদিকে পরিয়ল নিজের মালিকের কাছে থাকতে থাকতে খুবই বিরক্ত হচ্ছিল। সে প্রতিদিন খাঁচা থেকে মুক্তি পাবার উপায় চিন্তা করত। একদিন পরিয়লের মালিকের এক ছেলে ঐ খাঁচার কাছে খেলতে এলো। তাকে দেখে পরিয়ল প্রথম থেকেই তার বন্ধ খাঁচার মধ্যে মড়ার মতন পড়ে রইল। ছেলেটি তাই দেখে ওকে একটু খোঁচা দিল। কিন্তু তোতা একটুও নড়ল না, আর কোন বুলিও বলল না। এই দেখে ছেলেটি খুব আশ্চর্য বোধ

করল। ছেলেটি ভাবল যে, হয়তো তোতার কোন অসুখ করেছে। এই ভেবে সে খাঁচাটা খুলে দিল। উপযুক্ত সময় বুঝে তোতা ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে গেল।

আবার দু'টি তোতা এসে একসঙ্গে মিলল। কিন্তু এবার দু'জনের চরিত্রে আকাশ-পাতাল তফাত দেখা গেল। কথায় কথায় পরিয়ল হরিয়লের সঙ্গে ঝগড়া করে। এমনকি বটগাছের অন্যান্য পাখীদেরও গালি দিতে ছাড়ে না। হরিয়ল কিন্তু ওর বিপরীত। সবার সঙ্গে মিলে-মিশে সে থাকত এবং রোজ ভোরে ভজন গেয়ে আর নানা স্তব স্তোত্র শুনিয়ে সকলের মন খুশি করত।

কয়েক দিনের মধ্যেই পরিয়লের ঝগড়া এতো বেড়ে গেলো যে, বটগাছে থাকাই ওর পছন্দ হলো না।

এরপর আবার একদিন সেই শিকারী এল জঙ্গলে। হরিয়ল শিকারীকে দেখা মাত্রই বটগাছের অনান্য পাখীদের বিপদের আশংকা জানিয়ে সাবধান করে দিল। হরিয়লকে এই-ভাবে বলতে দেখে শিকারী খুব আশ্চর্য হ'ল। আবার তার মনে পড়ে গেল সেই কয়েক দিন আগের দু'টি তোতা ধরার কথা। শিকারী হরিয়লকে তার ভাইয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। হরিয়ল বললো যে, তার ভাই ওই সামনে অশত্থ গাছটায় থাকে।

শিকারী খুব চালাক ছিল। সে ভাবল যে, এই তোতা দু'টি তার হাতে আসতে পারে, যদি তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়া যায় এবং যখন লড়াই করতে করতে দু'জনে ক্লান্ত হয়ে যাবে, তখন দু'টোকে সহজেই ধরা যেতে পারে।

শিকারী ঠিক সেই মতই কাজ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটিতে লড়াই করতে করতে খুব জোরে নিচে পড়ল। শিকারী তখনই খুব তাড়াতাড়ি ওদের দু'জনকে ধরে ফেলল।

আবার দুই তোতাকে নিয়ে শিকারী চলল বাজারে। বাজারে গিয়ে ও হরিয়লের দাম বলল একশো টাকা এবং পরিয়লের দাম এক টাকা। এই সঙ্গে এক সর্তও রাখল যে, ক্রেতাকে একসঙ্গে দুটি পাখীই কিনতে হবে।

শিকারী বাজারে সমান ভাবে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় ওখানে একজন ধনীলোক এল। সে পাখীদের এমন আকাশ-পাতাল দামের প্রভেদের কারণ জিজ্ঞাসা করল।

শিকারী তখন উত্তর দিল—'আমি এর কতটা আর আপনাকে বলব? যদি আপনি এ দুটিকে কিনে নেন তাহলেই বুঝতে পাববেন।'

ধনী লোকটি দুটি তোতাকেই কিনে নিল। রাত্তিরে শোবার সময় ভদ্রলোক হরিয়লের খাঁচাটি নিজের বিছানার কাছে রেখে দিল, আর পরিয়লকে একটি খাঁচায় আলাদা ভাবে দূরে অন্য একটি জায়গায় রাখল।

ভোর হতেই হরিয়ল প্রতিদিনের মত 'রাম-রাম' বলতে শুরু করল। তাই শুনে ভদ্রলোক

খুব খুশি হলেন। পরের দিন তিনি পরিয়লের খাঁচা নিজেই বিছানার কাছে এনে রেখে দিলেন। সেদিন ভোর হতেই পরিয়ল তার অভ্যাস মত গালি-গালাজ করতে শুরু করল। ভোরবেলায় এই গালমন্দ শুনে ভদ্রলোকের মেজাজ গেল বিগড়ে। তিনি পরিয়লকে মারার জন্য ঘরে ছুরি খুঁজতে লাগলেন।

তাই দেখে হরিয়ল বাইরে থেকে চিৎকার করে উঠল: ওকে মারবেন না! ও আমার ভাই!...প্রথমে আমায় একজন সাধুলোক কিনেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে আমি খুব ভাল ভাল কথা শিখে নিই। আর পরিয়লকে একজন নোংরা লোক কিনেছিল, যার জন্য ও নোংরা কথা শিখেছে। এতে ওর কোন দোষ নেই; এটা সঙ্গদোষের ফল মাত্র।

হরিয়লের কথা শুনে ধনী ব্যক্তি পরিয়লকে ক্ষমা করলেন। পরিয়লও সেদিন থেকে বুঝে নিল যে—পৃথিবীতে মিষ্টি কথা ছাড়া আর ভাল কোন জিনিসই নেই।

সেই জিনিসটি

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

এক এক সময় এই বয়েসেও ইচ্ছে করে খেতে,
মধুর চেয়ে আরো মধুর সে জিনিসটি পেতে।
আবার যদি পেতাম, খেয়ে নিতাম মউজ করে
ভুলে যেতাম রুক্ষ এ রাজপথকে চিরতরে।
খেতে খেতে কি অপূর্ব শান্তি চোখের মাঝে,
একটু একটু নেমে আসতো, আলতো ঘুমের সাজে।
সন্দেশ বা রসগোল্লা লাগে না তার কাছে,
বিকোয় না ও হাট-বাজারে, নাই ফলে বা গাছে,
খেয়েছিলাম আশ মিটিয়ে—এখন স্মৃতি সার,
আহা, যদি সেই দিনটি পাই ফিরে আর বার!
এই বয়েসেও মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছে হয়,
তাই বলে তা ফুচকা কিংবা হিংকচুরি নয়।
নাম জান তার যা খেতে সাধ রসগোল্লা ফেলে?
সেই জেনেছে, মায়ের হাতে সুড়সুড়ি যে খেলে!
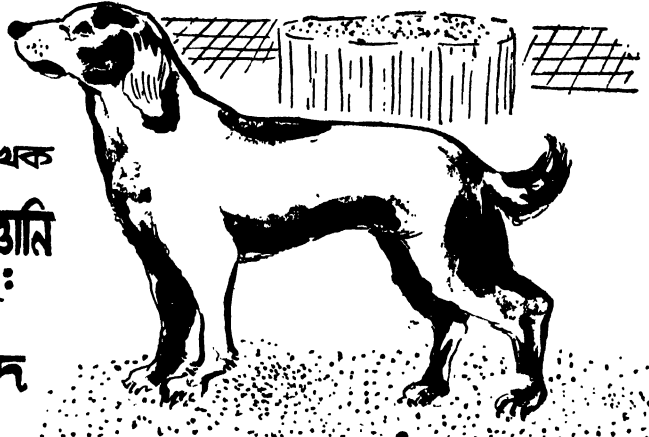
পূর্ব-প্রকাশিতের পর

॥ ল্যাম্পোর পিওম্বিনো প্রীতি ॥

টাইগারের ভয় সত্ত্বেও ল্যাম্পোর আমার বাড়ীতে আসবার ইচ্ছে বেজায়। তাই আবার একবার ও ঠিক করল পিওম্বিনোতে আসবে। এবারে ও এমন প্রকাশ্যভাবে ট্রেনে চড়ল, যেন রীতিমত টিকিট-ধারী পাকা যাত্রী।

একদিন রাত্রে যখন আমি সপরিবারে খাবার টেবিলে বসে খাচ্ছি, বাইরে একটানা কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম। তক্ষুনি সন্দেহ হ'ল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে সামনের দরজা খুললাম। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল ল্যাম্পো।

'ভেতরে এস চাঁদ। না হলে দরজাটি তো ভেঙে ফেলতে পারো তুমি।'

রকেটের গতিতে ভেতরে ঢুকে পড়ে আহ্লাদে লেজ নাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নিচু করে চারিদিকে বেশ কিছু যেন দেখতে চেষ্টা করছিল। আমরা বুঝতে পারলাম, টাইগার কোথায় আছে বোঝবার চেষ্টা করছে। এবারে অতর্কিত আক্রমণ ওর ওপরে চলবে না।

দরজা বন্ধ করে বল্লাম, 'ঘাবড়াস নি! টাইগার বাগানে বাঁধা আছে।' আশ্বস্ত হয়ে ল্যাম্পো ওপরে চলে গেল আমার মেয়ে মির্ণার সঙ্গে দেখা করতে। মির্ণা ওর এমন অপ্রত্যাশিত আগমনে খুশী হয়ে আনন্দে চেঁচাতে লাগল। অতএব ল্যাম্পোর নৈশভোজন

আমাদের সঙ্গেই হ'ল। তারপর মির্ণার সঙ্গে খেলা। রাত্রে শোবার সময় ঠিক করলাম ওকে আমাদের বাড়ীর মধ্যেই রাত্রে শুতে দেব।

আমরা যখন ওর রাত কাটাবার জন্য একটা জায়গার ব্যবস্থা করছি, ল্যাম্পো ওর নাক দিয়ে ঠেলে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। তারপর সোজা নিচে নেমে গেল। সদর দরজার সামনে গিয়ে সামনের পা তুলে নখ দিয়ে ভীমবেগে দরজা আঁচড়াতে শুরু করে দিল। আমি ওর পেছনে পেছনে নিচে নেমে এসেছিলাম। কী করে দেখবার কৌতুহলে দরজা খুলে দিলাম। ল্যাম্পো তীব্রগতিতে বেরিয়ে, এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে স্টেশনের পথ ধরল। আমি ওর পেছনে দৌড়লাম। দেখলাম, লেভেল ক্রসিং পার হয়ে, ষ্টেশনে ঢুকে, একেবারে একটা ইলেকট্রিক ট্রেনের ভেতরে ঢুকে বসে পড়ল। গাড়ীটা ক্যাম্পিগ্‌লিয়া যাবে, ছাড়বার সময় হয়েছে। আমিও গাড়ীতে উঠে পড়লাম। একটা সীটের নিচে ও লুকিয়ে বসেছিল। একটু ঘাবড়ে গেলাম। নেমে আসবার জন্য কত খোশামুদ করলাম। আমার কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করল না—এক ইঞ্চি নড়লও না। বুঝলাম বৃথা চেষ্টা। ও ক্যাম্পিগলিয়াতে ফিরে যেতে চায়। সেখানে আমার আপিস ঘরের কোণে নির্দিষ্ট জায়গাতে গিয়ে ঘুমোবে।

অল্পদিনের মধ্যেই ল্যাম্পো বুঝে গেল রাত্রি ৯টার সময় আমার বিকেলের ডিউটি শেষ হয় এবং সেই সময় আমি পিওম্বিনোর ট্রেন ধরে বাড়ী ফিরি। প্রতিদিন ঠিক চার নম্বর প্লাটফরমে ও আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

যেই আমাকে দেখতে পায় অমনি লেজ নাড়তে স্বরু করে এবং ওর কালো কালো ডাগর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জানায়, 'হে দাদাঠাকুর, আমি তব হবে সাথী।' আর একটি বিষয়েও যথেষ্ট সেয়ানা। খেয়াল রাখে কন্‌ডক্‌টর ওকে যেন দেখতে না পায়। ভেতর ঢুকেই চট্ করে একটা সীটের নিচে লুকিয়ে পড়ে এবং ট্রেন আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছলে তখন বেরিয়ে আসে। রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে ষ্টেশনে চলে যায়। রাত্রি ১০-৪০ 'মিঃ গাড়ীতে বসে ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে ফিরে যাবে। ঐটাই ক্যাম্পিগলিয়া যাবার শেষ গাড়ী।

ওর অন্তর্দৃষ্টি (intuition) ওকে কখনও বিপদে ফেলেনি। ঠিক যেন একটা সুনিয়ন্ত্রিত ঘড়ি। ওর সময়ের বোধ এমন সঠিক ছিল যে, আমি একাধিকবার ওকে গোলমালে ভুলিয়ে ওর ট্রেন 'মিস্' করিয়ে দিতে চেষ্টা করে দেখেছি, সে সম্ভব নয়। ল্যাম্পো শুধু দিনান্তে একটিবার আমার বাড়ীতে এসে সন্তুষ্ট থাকত না। সকাল হোক, সন্ধ্যে হোক, যখন যতবার হোক, ইচ্ছে মত পিওম্বিনোতে এসে আমার স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে কখনও বাজারে বেড়াতে যেতো, তারপর হৃষ্টচিত্তে ক্যাম্পিগলিয়াতে ফিরে এসে আমার আপিসে ঢুকে লেজ নেড়ে জানিয়ে দিত—জানো কী, তোমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে দেখা করে এলাম।

কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজারে যাওয়া এবং মির্ণার সঙ্গে কিনাডার-গার্টেন স্কুলে যাওয়া ল্যাম্পোর এক ক্লান্তিহীন নৈমিত্তিক কর্তব্যে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন সকালে ঠিক ৭-২০র গাড়ীতে ও ক্যাম্পিগলিয়া থেকে চড়ত, তারপর পিওম্বিনোতে আটটায় পৌছে মির্ণার সঙ্গে কিনডারগার্টেনে যেতো। কর্তব্যকর্ম সেরে আবার ক্যাম্পিগলিয়ায় ফিরে যেতো; আবার ১১-৩মিঃ গাড়ীতে পিওম্বিনো যেতো। সোজা কিনডারগার্টেনের ফটকের কাছে গিয়ে মির্ণার জন্য অপেক্ষা করত। ঐসময় মির্ণার ছুটি হলে তার সঙ্গে বাড়ী ফিরত। তারপর হৃষ্টচিত্তে ক্যাম্পিগলিয়ায় ফিরে আসত। ঝানু ট্রেনযাত্রীর মত পিওম্বিনোর দিকে এবং পিওম্বিনো থেকে সমস্ত গাড়ীর টাইম-টেবল ওর ভালরকম জানা ছিল।

এখানে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ক্যাম্পিগলিয়া থেকে একটা ব্রাঞ্চ লাইন পিওম্বিনোর সঙ্গে যুক্ত। ক্যাম্পিগলিয়া আসলে মেন লাইনের জংশন। উত্তর-দক্ষিণ থেকে যত ট্রেন আসে, সব এখান দিয়ে 'পাস' করে এবং থামে।

ক্যাম্পিগলিয়াতে অনেকগুলো রেল লাইন আছে, যার উপর দিয়ে ফার্ষ্ট-লোকাল, এক্সপ্রেস, মালগাড়ী ইত্যাদি একটার পর একটা একেবারে বাঁধা নিয়মে আসে-যায়। যেমন বলা যায়, ক্যাম্পিগলিয়া থেকে পিওম্বিনোর গাড়ী চার নম্বর লাইনে যায়। তবে কোন বিশেষ কারণে হয়ত কখনও সে গাড়ী অন্য রেল লাইন দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

একবার হ'ল কী, এইরকম এক কারণে ল্যাম্পো ভুল গাড়ীতে গিয়ে বসে। গাড়ী যখন চলতে শুরু করেছে, তখন ও নিজের ভুল বুঝতে পারল এবং প্রথম ষ্টেশনেই নেমে পড়ল। সেটা ছিল স্যান্‌ভিন্‌সেন্‌জো ষ্টেশন। ও তক্ষুনি কেমন বুঝে নিলো যে, বিপরীত-মুখী পরের গাড়ীটা ওকে ক্যাম্পিগলিয়াতে পৌছে দেবে। কাজেই পরে যখন ওকে ফিরতে দেখলাম, তখন ওর বেকুফী নিয়ে আমরা ওকে খুব ঠাট্টা করলাম। ল্যাম্পো আলস্যভরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে যেন বলতে চেয়েছিলো, এতে এতো হাসির কী আছে! ভুল কে না করে? তোমরা কী ভুল করতে-করতেই আজ ভুল না করতে শেখনি?

সত্যি কথা বলতে কী, এরপর ল্যাম্পোর এমন ভুল আর কখনও হয়নি। ওর নিয়মিত পিওম্বিনোতে বেড়াতে আসায় আমরা এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, কোনদিন যদি ওর আসতে ক'ঘণ্টা দেরি হোত, তাহলে আমরা রীতিমত ভাবনায় পড়ে যেতাম। ক্যাম্পিগলিয়ায় এত বেশী ট্রাফিক ছিল যে, একটা কুকুর একটু আসাবধান হলে ট্রেন চাপা পড়া কিছু আশ্চর্য ছিল না। এই ষ্টেশনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এমন বহু কুকুর-বিড়ালের অদৃষ্টে এরকম অপমৃত্যু ঘটেছে।

আমি ও আমার পরিবারের পক্ষে ল্যাম্পোর আসাটা যদিও বেশ প্রীতিকর ছিল, কিন্তু

সব সময় নয়। ওর এমন একটা বদ্-অভ্যাস দাঁড়িয়েছিল যে, যেখানে আমরা যাবো, ও পিছু নেবে। ফলে যখন আমরা ওর থেকে একটু আলাদা হয়ে থাকতে চাইতাম, তার জন্য আমাদের হাজার রকমের ছল-চাতুরী ও কলা-কৌশলের আশ্রয় নিতে হোত এবং এ ব্যাপারে ক্বচিৎ কখনও সফল হয়েছি আমরা।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় সিনেমা যাবো বলে ঠিক করলাম। ল্যাম্পোকে বাড়ীতে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে বেরুলাম। যথেষ্ট দেরিতে 'শো' শেষ হ'লে বাইরে বেরিয়ে দেখি, বেরুবার দরজার কাছে কুঁক্ড়ে শুয়ে আছে ল্যাম্পো। সিনেমার এক কর্মচারী বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুকুরটা কী আপনার?'

তাঁকে এড়াবার জন্য বললুম 'না, ঠিক আমার নয়।' লোকটা বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'সে যাই হোক, অতিকষ্টে ওর ভেতরে ঢোকা আটকে রেখেছি।'…

এরপর আমরা বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করি।

সেদিনের সুন্দর সন্ধ্যাটিতে ল্যাম্পো চলল পেছনে স্ফূর্তিতে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে। আমরা ওকে বকলাম বটে, কিন্তু খুশীও হলাম, আমাদের প্রতি ওর টান দেখে। সেদিন রাত্রে ল্যাম্পো আমাদের বাড়ীতেই শুয়েছিল। ও জানত যে ক্যাম্পিগলিয়া যাবার শেষ ট্রেনটি অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে আজ।

(ক্রমশঃ)

খুকুর ব্যথা

শ্রীঅতীন বসু

কিনলো খুকু একটি পুতুল
নামটি দিলো মিষ্টি তুতুল।
সারাটি দিন একলা বোসেই
করছে খেলা আপন মনেই।
হঠাৎ কি যে ঘটলো সেদিন
বেগড়ালো তার মনের মেসিন!

ছোঁয় না খুকু কোনই খাবার
নাইকো ইচ্ছা কোথাও যাবার।
চুপটি কোরে ঘরের কোণে
বোসেই থাকে আপন মনে।
অনেক কোরে প্রশ্ন করায়
বল্‌লো খুকু ভিজে গলায়:

তাহার মনে ভীষণ ব্যথা
তুতুল কেন কয়না কথা।

কীট-পতঙ্গের চিড়িয়াখানা

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

—'গুবরে পোকা কাগজের বাক্সোয় এনে রাখে। খেতে দেয় গোবরের গুটি। কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাঁধে'—রবীন্দ্রনাথ (ছেলেটা)।

তোমরাও যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেটা'র মত গুবরে পোকা পুষতে চাও, তাহলে নিশ্চিত তোমাদের মায়েদের কাছ থেকে বকুনি খাবে। বড় জোর গাছের পাতা খাইয়ে তোমরা প্রজাপতির গুটি থেকে প্রজাপতি করবার খেলায় মাততে পার। কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে এত হরেকরকমের কীট-পতঙ্গ আছে যে, তা দিয়েও ইচ্ছে করলে একটা ছোটখাট চিড়িয়াখানা তৈরী করা যায়। এমনি এক চিড়িয়াখানার গল্প বলব তোমাদের।

মিঃ এডী বলে এক ভদ্রলোকের এমনি একটা কীট-পতঙ্গের চিড়িয়াখানা তৈরী করার সখ হয়েছিল। লোকে তো তার সখের কথা শুনে হেসেই অস্থির। দূর দূর, কার এত বাজে সময় আছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পোকামাকড় দেখে, যে পোকামাকড় দেখলে আমাদের গা ঘিন-ঘিন করে ওঠে, সে পোকামাকড় দেখবারই বা আছে কি? কিন্তু এ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। মিঃ এডী যখন একটা পাবলিক পার্কের এক কোণে একটা খালি ঘরে তাঁর চিড়িয়াখানাটি খুললেন, তখন সেই পোকামাকড়গুলোই দেখবার জন্য মানুষ-জন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগল।

কিন্তু চিড়িয়াখানা খোলবার আগে পরিশ্রমটা কম নয়। হাটে-বাটে-মাঠে না ঘুরে তো আর কীট-পতঙ্গ যোগাড় করা যায় না। তাই মিঃ এডী আর তাঁর স্ত্রী দু'জনে কীট-পতঙ্গ খুঁজে পাবার জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরতে লাগলেন। গাছে ওঠা, জলা স্যাঁতসেঁতে জমিতে ঘুরে বেড়ানো, তাঁদের প্রতিদিনের রুটীন হয়ে উঠল।

বাঘ, সিংহ, হাতী ধরার মত ঝুঁকি অবশ্য এতে নিতে হয় না, কিন্তু কীট-পতঙ্গ ধরতে হলেও বুদ্ধি খাটাতে হয় কত রকম! ওঁরা একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে একটা ছাতা খুলে উলটে রাখতেন, তারপর ঝোপ ধরে নাড়া দিলেই টুপ টুপ করে অজস্র পোকা পড়ত ছাতার মধ্যে। অনেক গাছের ডালে কীট-পতঙ্গ এসে বসে। তাদের ধরবার জন্য লক্ষ্মণের গণ্ডীর মত ওঁরা গাছের ডালে গোল গোল বৃত্ত আঁকতেন। উঁহু, মোটেই রঙ বা চকখড়ির আঁকা ওই বৃত্তগুলো নয়, সিরাপ আর তীব্র সুরা দিয়ে ওঁরা বৃত্ত আঁকতেন, আর সেই আকর্ষণে কীট-পতঙ্গ এসে আটকে পড়ে যেত সেখানে।

প্রথম যেদিন মিঃ এডীর চিড়িয়াখানার শুভ-উদ্বোধন হ'ল, তখন মিঃ এডীর চিড়িয়াখানায় দেশ-বিদেশের একশ পঁয়ষট্টি রকমের কীট-পতঙ্গের সংগ্রহ হয়ে গেছে। দর্শকেরা তো এ চিড়িয়াখানার অতিথিদের দেখে মুগ্ধ। গুটি থেকে যখন হঠাৎ প্রজাপতি বেরিয়ে উড়ে যায়,

তখন সেই রঙীন প্রজাপতি দেখে মুগ্ধ হয় না কে? আর মিঃ এডীর চিড়িয়াখানায় প্রজাপতির ঘরে যখন প্রজাপতিরা ঝলমল করে উড়ে বেড়ায়, তখন মানুষ চুপচাপ কি দাঁড়িয়ে দেখবে না এ মনোহর দৃশ্য!

পিঁপড়েদের জন্যে কাঁচের তৈরী বাসায় পিঁপড়েদের কাজকর্ম দেখে অবাক না হয়ে কেউ কি পারে?

মিঃ এডী দর্শকেরা যে কীট-পতঙ্গের নড়াচড়া দেখে বেশী খুশী হন তা ভাল করেই জানেন। যেমন চিড়িয়াখানায় তোমরা চুপচাপ বসে থাকা বাঘ সিংহ-র চাইতে বাঘ সিংহ যখন খাঁচা-জুড়ে পায়চারি করে বা কাঠের বল নিয়ে কিক্ করে তখন দেখে বেশী আনন্দ পাও, এও ঠিক তেমনি!

ধরা যাক গুবরে পোকার কথা। গুবরে পোকা ভিজে জিনিস খুব পছন্দ করে। তাই দর্শকদের খুশী করার জন্য মিঃ এডী একটা শুকনো ঘরে মাত্র একটা জলে ভেজা কাঠ রেখেছেন। গুবরে পোকাটি ঘরের আর কোথাও না থেকে, যে কাঠটির ওপর বসে থাকবে তা তো বুঝতেই পারছ। আর একদল গুবরে পোকা আছে, যাদের খেলাই হ'ল বালির ভেতর ছোট্ট মাটির তাল লুকিয়ে ফেলা। মিঃ এডী তাই ওদের ঘরের চারধারে কিছু কিছু বালি ছড়িয়ে রাখেন। গুবরে পোকাটা এক জায়গায় বালির তলায় মাটির বলটা লুকোতে না পারলে, অন্য বালির তলায় গিয়ে বলটা লুকোতে চেষ্টা করে।

তোমরা মাকড়সার জাল পেতে পতঙ্গ শিকার অনেকেই দেখেছ, কিন্তু পিঁপড়েদের রাজত্বে এক ধরণের সিংহ পিঁপড়ে আছে, যারা ফাঁদ পেতে পিঁপড়ে ধরে মুখে পোরে অপূর্ব কায়দায়। দর্শকেরাও মিঃ এডীর চিড়িয়াখানায় এই পিঁপড়ে শিকার গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখে।

কীট-পতঙ্গ বাঁচিয়ে রাখতে হলেও নানা রকমের খাবার দরকার হয়। যেমন পিঁপড়েরা খায় মরা শুকনো পাতায় তৈরী এক ধরণের শ্যাওলা, কোন কোন পোকা খায় গাঁট, মথ্ আর শুঁয়োপোকাদের খেতে দেওয়া হয় পশম আর চামড়া। তা ছাড়া মাকড়সারা যে কীট-পতঙ্গ খায়, তা তো জানই তোমরা।

কিছু কিছু কীট-পতঙ্গ আমাদের ক্ষতি করলেও, অনেকেই আমাদের উপকার করে। যেমন কিছু কিছু গুবরে পোকা আছে যারা গাছপালা নষ্ট করে এমন পোকামাকড় খায় বা ড্রাগন ফ্লাই (রঙীন ডাঁশ পোকা) মশা মেরে ফেলে।

মিঃ এডী তাঁর চিড়িয়াখানার কীট-পতঙ্গদের পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছেন, যে সমস্ত পোকামাকড় উড়তে পারে বা তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে, তারা মানুষের ভালোর জন্যে একটা না একটা ভালো কাজ করে। যারা চাষবাস করে, তাদের প্রত্যেকেরই তাই কোন্ পোকা কি ধরণের অনিষ্টকর জানা দরকার, তা না হলে তাদের ফলনের ক্ষতি হয়। কৃষি-দপ্তরেও তাই নানা ধরণের পোকা নিয়ে গবেষণা হয়ে থাকে।

মিঃ এডীর চিড়িয়াখানার মত চিড়িয়াখানা তৈরী করতে হলে বেশ পরিশ্রমের দরকার। কিন্তু পড়াশোনার অবসরে সঙ্গে যদি বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ নিয়ে তোমাদের দেখাশোনার কাজ চালাও, সেটাও হবে সুন্দর একটা মজার ও শিক্ষার খেলা, কি তাই না?

শিশু-প্রিয় জাকির হোসেন

সেখ আমানুল্লা

আমাদের ছোটদের হৃদয়ের একান্ত আপনজন ভারতের প্রেসিডেন্ট ডঃ জাকির হোসেন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। হঠাৎ এভাবে তিনি চলে যাবেন তা কেউ কোনদিন আমরা কল্পনা করতে পারেনি। ভালমানুষের মৃত্যু হয় বোধ হয় এই ভাবেই। তিনি ডাক্তারদের বসিয়ে রেখে বাথরুমে গেলেন আর ফিরলেন না। বাথরুমে মৃত্যু বোধ হয় তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ভাল মানুষ, হ্যাঁ সত্যিই তিনি খুব ভালমানুষ ছিলেন। তিনি শান্ত, সংযত, কর্মনিষ্ঠ, সহৃদয় তো ছিলেনই, তাছাড়া দেশকেও খুব ভালবাসতেন। পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব ও হৃদয়ের সরল্য ব্যক্তির এই ভালবাসার মধ্যে দিয়েই তাঁকে চিনিয়ে দেয়। যিনি এ তিনটি ভালবাসেন না, তিনি মনুষ্য পদবাচ্য নন। ডঃ জাকির হোসেন ছিলেন এদিক থেকে একজন আদর্শ মানুষ।

তিনি শিশুদের খুব ভালবাসতেন। তাঁর ছোট নাতি-নাতনীদের কাছে নিয়ে গল্পগুজব করতেন। তিনি নেহরুর মতই শিশু-প্রিয় ছিলেন। শিশুদের জন্য ছদ্মনামে তিনি অনেক বই লিখেছেন। তোমরা অনেকে নিশ্চয়ই তাঁর সেই খরগোস আর কাছিমের গল্পটা পড়েছ—খুব ভাল গল্প সেটি ?

ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যু-সংবাদ শুনে ছোটরাও কেঁদেছে—তাঁর মৃত্যুতে অশ্রুবর্ষণ না করে পারেনি। যে মানুষটির মধ্যে এক বিরাট দেশের নেতৃত্বের ইঙ্গিত ছিল, সে মানুষটিকে রাজ্য শাসনের সর্বোচ্চ আসনে টেনে এনে পণ্ডিতজী ভালই করেছিলেন। জাকির সাহেব স্বইচ্ছায় রাজনীতিতে না এলেও, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি যে কৃতিত্ব রেখে গেছেন, তা কোন দিনই ম্লান হবে না।

জাকির সাহেব জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী হায়দারাবাদের এক পাঠান পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আইনজীবী। পাঠশালাতে পড়তে যেতেন আর ঘরে বসে শিখতেন আদব-কায়দা। তারপর ধীরে ধীরে আলিগড় থেকে এম, এ, পাশ করেন। ক্লাসের মধ্যে তিনি ছিলেন সেরা ছাত্র। তারপর যান বার্লিনে। গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে জামিয়া মিলিয়া নামে একটি বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যামন্দিরের উপাচার্য ছিলেন। তারপর ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন। ১৯৫২ সালে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও, রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মোহ ছিল না। দেশ-বিদেশের ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত ডঃ হোসেনের দৃষ্টভঙ্গি ছিল অন্যরকম।

প্রকৃতপক্ষে ডঃ জাকির হোসেন ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ। তিনি বলতেন, শিক্ষাই জাতিকে জীবিত রাখবে, আদর্শ মানুষ গড়ে তুলবে। তাই তিনি শিক্ষক হয়েছিলেন। আরও

বলতেন, শিক্ষার বনিয়াদ খারাপ হলে শিক্ষায় কোন ফল হবে না। তাই তিনি পণ্ডিত হয়েও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। তিনি ছিলেন খুব সৌন্দর্য-প্রিয়, তাই যখন তাঁর শ্রেণীতে কোন একটি ছেলে নোংরা টুপি মাথায় দিয়ে আসত, তখন তিনি তা নিজের হাতে কেচে দিতেন। সৌন্দর্য-প্রিয়তার জন্যই বোধ হয় তিনি মানুষকে এত ভালবাসতে পারতেন।

দুঃখের বিষয় তাঁর কোন পুত্র-সন্তান নেই, তবুও তিনি সুখী ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী বেগম শাজাহান, কন্যাদ্বয় সৈয়দা খান ও সোফিয়া রহমান ও সাতটি নাতি-নাতনী রেখে গেছেন।

বিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ হোসেন শুধু এই রেখে গেলেন না, তিনি ভারতবাসীকেও বিশ্বের দরবারে প্রভূত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। সকল সময়েই তিনি বলতেন, 'ভারত আমার দেশ ও ভারতবাসীই আমার পরিবার।'

তাই এরূপ অসাম্প্রদায়িক, সংস্কৃতির প্রতীক, দেশ-প্রেমিকের মৃত্যুতে ধর্মনির্বিশেষে ছোট বড় সকল মানুষই অশ্রুবর্ষণ করেছেন। তিনি যে আসনটি শূন্য রেখে গেলেন, তা কোনদিন পূরণ হবে কিনা সন্দেহ।

ছাড়া

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

অভীক্ চাকরি ছেড়ে,
গলা ছেড়ে গায় গান ;
এতদিনে শনি ছাড়ে,
গোলামির অবসান।
ছাড়িল সে কোটপ্যাণ্ট,
পরে গেরি কৌপিন্।
বউ বলে ছেড়ে শ্বাস,
'শেষে হ'লে এত হীন ?
আমার হুকুম ছাড়া,
চলতে না এক পা-ও ;
ছাড়াছাড়ি হবে জেনো
মন্তোর যদি নাও !'

অভীক্ হাসিয়া বলে,
'গুরু ছাড়া ভুয়ো সব ;
হব আমি ঘর-ছাড়া,
বৃথা কর কলরব।'
বউ নয় হেন মেয়ে
ছেড়ে কথা কইবার ;
স্বামীটিকে ছেড়ে দিয়ে
একা জ্বালা সইবার।
খোলস ছাড়িল সাপ,
বউ পথ ছাড়লেন ;
অভীক্ চলিল ব্রজে,
শিস্ দিয়ে ছাড়ে ট্রেন।

কয়েকটি হাল্‌কা ছড়া

শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী

॥ দুইবোন ॥

কনের নাম পুতুল,
বোনের নাম তুতুল।
পুতুল যাবে বরের সাথে,
চক্ষু মোছে মা ;
তুতুল ডাকে—'ও দিদি গো
চিমটি খেয়ে যা।'

॥ ধরতে গিয়েই ॥

সোনার রোদে রাঙা বউ
ছিল দাঁড়িয়ে
সকালবেলায়,
হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে
গেল হারিয়ে
বকুলতলায়।

॥ কয় 'রাণ' ? ॥

এইবার কয় রাণ ?
এইবারে ছয় রাণ।
এইবার কয় রাণ ?
এইবারে নয় রাণ।
এইবার কয় রাণ ?
এইবারে হয়রান।

॥ এক যে ছিল ॥

'এক যে ছিল বাঘের মাসী—
বলব না আর, পাচ্ছে হাসি।'
'তারপরে কি বল্‌না রে ভাই
পায়ে পড়ি তোর বল্‌না রে ভাই।'
'তারপরে কি আর মনে নাই!'

॥ বাঁশের বনে ॥

বাঁশের বনে ঝিকিরমিকির
ঘোরে কারা চামড়া-চিকির,
উবো হাঁটু অন্ধকারে
চিকোয় বসে চামচিকারে,
হাসে কেবল ফিকির ফিকির
মাথায় ঘোরে ফন্দী-ফিকির,
উঠলে চাঁদ বনের মাথায়
গা-ঢাকা দেয় ডোবার কাদায়।

॥ এক যে ছিল ॥

এক যে ছিল ঘোড়া
আমায় দেখেই হ'ল খোঁড়া
লাগাম ধরি যেই
কান দুটো তার নেই,
বসলাম যেই চড়ে,
তারপরে যা বলব কাল ভোরে!

॥ সেদিন ভোরে ॥

সেদিন শীতের ভোরে
জানলা-পথে একটি চড়াই
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ওড়ে।
খোকনমণির মুখের হাসি
পাখীর পিছু ফেরে,
তাই না দেখে খোকার বাবার
অসুখ গেল সেরে!

সন্ধানী

অদ্ভুত বাচ্চা

পশ্চিম জার্মানীর হানোভার জু'তে সম্প্রতি ঘোড়া ও এক জাতীয় হরিণের সংমিশ্রণে একটি অদ্ভুত ধরণের বাচ্চা জন্মেছে। জু-গার্ডেনের ইতিহাসে ধরা অবস্থায় এ ধরণের বিচিত্র প্রাণীর জন্মগ্রহণ এই প্রথম। আফ্রিকা থেকে বছর আড়াই পূর্বে জার্মানীর উত্তরাঞ্চলে এদের বাপ-মাকে এনে রাখা হয়। এদের অদ্ভুত ধরণের চেহারার জন্যে তো বটেই, তাছাড়া এই বাচ্চাটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করে ও জু-গার্ডেনের দর্শকদের প্রধান আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এখানে মা ও তার বাচ্চাটিকে দেখা যাচ্ছে।

ফোটোগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা

ফোটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রকে আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-বিজ্ঞান, শিক্ষা, ফিল্ম, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, এমনকি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পর্যন্ত পেশাদারি ব্যবহারে লাগানো হচ্ছে। এসব ছবি তোলেন সাধারণ পেশাদার ফোটোগ্রাফাররা, কিন্তু শৌখিন ফোটোগ্রাফাররাও পিছিয়ে নেই। যেমন দাম

কমছে, কলাকৌশল উন্নত হচ্ছে, ক্যামেরার ব্যবহার সহজতর হয়ে উঠছে, তেমনি সাধারণ লোক আজকাল ছবি তোলার দিকে বেশি কোরে ঝুঁকছে।

ক্যামেরার বাজার সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মানীর স্থান তৃতীয়, মার্কিন দেশ ও গ্রেট বৃটেনের পরেই। এখানে ক্যামেরা যেমন বিক্রি হয়, তেমনি তৈরিও হয়। ১৯৪৫ থেকে পৃথিবীতে ১৭০ মিলিয়ন ক্যামেরা তৈরি হয়েছে আর তার মধ্যে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন তৈরি হয়েছে শুধু জার্মানীতেই, যার দাম ৫০০০ মিলিয়ন মার্কেরও বেশি।

ক্যামেরার উন্নতি না হলে জীবন আজকের মত সরল হ'ত না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথাই ধরো—কত সহজে আজ এক্সরে ছবি নিয়ে নির্ভুল চিকিৎসা করা যায়। ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামে কত সহজে হার্টের অসুখ ধরা পড়ে। অন্যত্র যেমন ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ চেকের ফোটো তুলতে, লাইব্রেরীতে লক্ষ লক্ষ পুস্তকের কপি রাখতে, ফোটোগ্রাফির অবদান অনস্বীকার্য। ফোটোগ্রাফির কল্যাণে আজকাল বই ছাপানো ২০০ গুণ দ্রুততর করা সম্ভব হয়েছে।

বড়োয়-ছোটয় ভালবাসা

বড়ো জন্তুদের অনেক সময় মুস্কিল হয় অত্যন্ত ছোট জন্তুদের নিয়ে। ফুড়ুক ফড়াক করে তারা এমনভাবে পালায় যে তাদের ধরাও যায় না, মারাও যায় না। তাছাড়া গায়েও উঠে পড়ে অনেকে। তখন তাদের নিয়ে অস্বস্তির আর শেষ থাকে না! পাখীদের নিয়ে অনেক সময় এমনি খুব অসুবিধায় পড়তে হয় বড়ো বড়ো জানোয়ারদের। এখানকার ছবি দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে, একটি সাদা ছোট ইঁদুর একটি হাতীর শুঁড়ে উঠে কি মজাটাই না করছে! কিন্তু হাতীদের এই শুঁড় অত্যন্ত স্পর্শকাতর হলেও এবং এই শুঁড় দিয়েই তারা তাদের প্রয়োজনীয় সব কাজকর্ম সমাধা করলেও, এই ধরণের ছোট জন্তুদের সহ্য করে নেওয়া ছাড়া তাদের উপায় থাকে না। জার্মানীর হামবুর্গ শহরের হেগেনবেক জু'তে 'শম্পা' নামের এই ভারতীয় হাতীটি নিরুপায় হয়ে ছোট্ট এই ইঁদুরটির সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে। ইঁদুরটি প্রত্যহ তার তিন হাজার পাউণ্ড ওজনের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং তার শুঁড়ে চড়ে খুশি মত ঘুরে বেড়ায় দেহের এদিক-সেদিকে। ছোট্ট বন্ধুটির ওজন কিন্তু ত্রিশ গ্রাম।

মেঠুড়ে

হকি

বেটন কাপ যুগ্ম-জয়ের সুবাদে অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান এবার 'হকি ডাবলস' পেয়েছে। 'হকি ডবলস' অবশ্য মোহনবাগানের নতুন সম্মান নয়, এর আগেও ১৯৫২ এবং ১৯৫৮ সালে মোহনবাগান হকি ডাবলস পেয়েছিল। তবুও ১৯৬৯ সালে লীগ ও বেটন জয়ে এই কথাই প্রমাণ হয়েছে, এবারের মরসুমে মোহনবাগানই কলকাতার সবসেরা হকি দল।

জলন্ধরের কোর অব সিগন্যালস এবং মোহনবাগানের মধ্যে বেটন কাপের ফাইন্যাল খেলায় দু'দিনেও জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। প্রথম দিনের খেলা গোলশূন্য থাকে। দ্বিতীয় দিনের ফাইন্যালের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো গোল না হওয়ায় দু'বার অতিরিক্ত সময় খেলানো হয়, কিন্তু তাতেও কোনো গোল না হওয়ায় দু'দলকে যুগ্ম-বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। এবার নিয়ে তিনবার যুগ্ম-জয়ের হিসেব সমেত মোহনবাগান সাতবার বেটন বিজয়ী হলেও যুগ্ম-জয়ের নজিরে কোর অব সিগন্যালের এই প্রথম বেটন লাভ। এর আগে ১৯৬৬ সালে তারা বেটন ফাইন্যালে খেলে পাঞ্জাব পুলিসের কাছে হার স্বীকার করে।

* * *

বোম্বাইতে গোল্ড কাপের ফাইন্যালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী টাটা স্পোর্টস এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের মধ্যে তিনদিন খেলা এবং তৃতীয় দিন অতিরিক্ত পঞ্চাশ মিনিট খেলা হওয়া সত্ত্বেও জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়ায় দু'দলকেই গোল্ড কাপের যুগ্ম-বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

সেমি ফাইন্যালের ডাবল লেগের মতো ফাইন্যালেও ডাবল লেগের ব্যবস্থা এই প্রথম। প্রথম দিনের ফাইন্যালে টাটা স্পোর্টস ১-০ গোলে বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় দিনের ফাইন্যালে বর্ডার সিকিউরিটি জেতে একই ফলাফলে। তৃতীয় দিন নির্ধারিত সময়ের খেলা গোলশূন্য থাকলে ফলাফল না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলবে বলে ঠিক হয়, কিন্তু তৃতীয় দিনও খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। কাজেই কর্তৃপক্ষ দু'দলকে যুগ্ম-বিজয়ী বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

টেবল টেনিস

এবার বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাগুলো হয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর মিউনিক শহরে এ খবর তোমরা জ্যৈষ্ঠের মৌচাকে পড়েছো। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ছাপান্নটা দেশের চারশ পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি। ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে রেলদলের জগন্নাথের উন্নত ক্রীড়া নৈপুণ্য অতি সহজে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পৃথিবীর অন্যতম রক্ষণমূলক খেলোয়াড় হিসেবে স্খোলারের খ্যাতি। বিগত দুটো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্যোলার বিশ্বের সেরা পাঁচজনের মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এবার ফাইন্যালে স্যোলারকে হার স্বীকার করতে হয় জাপানের সিগো ইটোর কাছে। পঞ্চম সেটে ইটোর মারের প্রচণ্ডতা স্যোলারকে সারাক্ষণ কোণঠাসা করে রাখে। ইটোর ঝড়ের গতির কাছে স্যোলারকে মাথা নোয়াতে হয়। খেলার ফলাফল দাঁড়ায়: ১৯-২১; ১৪-২১; ২১-১৯; ২১-১৫; ২১-৯।

পুরুষদের ডাবলসে সুইডেনের জোহনসন-আলসার জুটি জাপানের হাসেগাবা-তাসাকাকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পরাজিত ক'রে আবার নিজেদের প্রাধান্যের পরিচয় দেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে জাপানের তসিকোর আক্রমণের দাপটে পূর্ব জার্মানীর গাবী গাইসলার শুরুতেই ভেঙে পড়েন। তাহলেও গাইসলার কোনো সময়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান নি। মহিলাদের ডাবলসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাশিয়া ও রুমানিয়া। রুশ জুটি রুডনোভা গ্রীনবার্গ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর আলেক্সজেণ্ডু মিহালককে পরাজিত করেন। মিক্স ডাবলস প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকে জাপানের মধ্যে। কন্নো হাসেগাবা অতি সহজেই হীরোটা কনোকে পরাজিত করেন।

ফুটবল

কলকাতার মাঠে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলা শুরু হয়েছে। প্রতি ক্লাবের সঙ্গে প্রতি ক্লাবের পারস্পরিক একক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর লীগ টেবলের ওপরের চারটে দলকে নিয়ে আবার লীগ প্রথার খেলায় চ্যাম্পিয়ানশিপের মীমাংসা গতবার থেকে প্রবর্তিত নিয়ম। নাম দেওয়া হয়েছিল সুপার লীগ। এবার নিয়ম একই আছে, তবে সুপার লীগে চারটের জায়গায় ওপরের পাঁচটা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা হয়েছে। যদিও গতবারের সুপার লীগের খেলা শেষ হয়নি, চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন রয়েছে অমীমাংসিত, তবু 'প্রমোশন রেলিগেশন' বিধান অনুসারে দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন পোর্ট কমিশনার্স এবং রানার্স পুলিশ দল এবার প্রথম ডিভিসনে খেলছে। সুতরাং দুটি দল আসায় এখন প্রথম ডিভিসনে পনেরটা দলের জায়গায় সতেরটা দল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

এবার নিয়ম হয়েছে, দুটো দল উঠবে, একটা দল নামবে। অর্থাৎ ১৯৭০ সালে প্রথম ডিভিসনে হবে আঠারটা দল। তারপর এই আঠারটা দলকে দুটো গ্রুপে ভাল করে লীগ পরিচালনার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের আছে।

লীগের তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং লীগ আসরে নেমে পড়ায় ময়দানে উৎসাহের বান ডেকেছে। গত ৩১শে মে পর্যন্ত মোহনবাগান যে পাঁচটা খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাদের মধ্যে হাওড়া ইউনিয়ন, ইস্টার্ন রেল, খিদিরপুর ও পুলিসকে পরপর হারাবার পর প্রথম খেলায় উয়াড়ির সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে একটা পয়েন্ট হারিয়েছে।

অন, এস. কর্মকার, কাজল মুখার্জি, দেবরাজ, কানন, সাদাতুল্লা, অশোক চ্যাটার্জি, সুভাষ ভৌমিক, নীলেশ সরকার প্রমুখ খেলোয়াড়দের যোগদানে ইস্টবেঙ্গল দলের শক্তি গত বছরের তুলনায় অনেক উন্নত হলেও, লীগের খেলাগুলোতে এখনো ইস্টবেঙ্গল উন্নতমানের পরিচয় দিতে পারেনি। স্পোর্টিং ইউনিয়ন, বালী প্রতিভা বা জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের দলগত শক্তির যে পার্থক্য, ওই দল তিনটির বিরুদ্ধে জয়লাভের মধ্যেও তা প্রকাশিত হয়নি। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল বিজয়ী হলেও, বি. এন. আর-এর সঙ্গে ড্র করায় ইস্টবেঙ্গল পাঁচটা খেলায় ৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

মহমেডান স্পোর্টিং এবার গতবারের তুলনায় কিছুটা হীনবল। ৩১ মে পর্যন্ত মহমেডান স্পোর্টিং যে পাঁচটা খেলা খেলেছে তার মধ্যে তারা একটাতে জয়ী, দুটো খেলায় ড্র এবং শেষ খেলা দুটো মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়।

এখনো সব খেলা হয়নি, কিন্তু খেলা যে ভাবে চলছে এবং বিভিন্ন দলের খেলার ফলাফল যে ভাবে ঘটছে তাতে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়া বাকী কোন্ তিনটি দল যে সুপার লীগের আওতায় আসবে বলা শক্ত।

॥ প্রশ্ন ও উত্তর ॥

সবজান্তা

১। বিলেতের লণ্ডন শহরে প্রধানতঃ তিনটি বাজার ফল, মাছ এবং মাংসের জন্য বিখ্যাত। সে বাজার তিনটির নাম কি কি? ২। বিলেতের ফ্লিট ষ্ট্রীটটি পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রের প্রধান কেন্দ্রস্থল বলা হয়ে থাকে। এই ফ্লিট ষ্ট্রীট নামের একটি বিশেষ অর্থ আছে; কি তা জান? ৩। বিলেতের দুটি বড় বড় স্কুলের হেড-মাষ্টারকে হাই-মাষ্টার (High-master) বলা হয়। স্কুল দুটির নাম বলতে পার কি?

॥ উত্তর ॥

১। কোভেণ্ট গার্ডেন (ফলের জন্য), বিলিঙ্গগেট (মাছের জন্য), স্মিথ ফিল্ড (মাংসের জন্য)। ২। ফ্লিট নদীর জন্য; শীর্ণা এই নদী শহরের নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে। ৩। ম্যানচেষ্টার গ্রামার স্কুল এবং সেন্ট

১। তিন অক্ষরে নাম মোর
থাকি একস্থানে,
আকারে ভীষণ আমি
চাও মোর পানে।
আত্মাক্ষর ছেড়ে দিলে
যাহা থাকে বাকী,
সেই বস্তু আমি ভাই
জীব দেহে থাকি।

শ্রীমালবিকা সোম (ডিব্রুগড়)

২। নীচের চতুর্দশপদী কবিতাটির প্রতি সারিতে দুটি করে শূন্য স্থান আছে। ছন্দ ও অর্থ বজায় রেখে প্রতি সারির শূন্যস্থানগুলি এক একটি দ্ব্যর্থক দিয়ে পূরণ করতে হবে। নীচের প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি নমুনা হিসাবে দেওয়া হ'ল ; এটি দেখে ব লাইনগুলি তোমরা পূরণ করতে পার কিনা দেখ

পলা তুই তেল এনো রেখে লাল **পলা**,
কলা খাও বসে বসে ছেড়ে ছলাকলা।

—মোরে এ বিপদে সহেনাক—, —খায় ঘটি বাটি, খুলেছে কে—?
—জোড়ে বলি ভাই মোরে রক্ষা—। —গিয়ে দোতলাতে খেয়ে ঝাল—।
—তোকে কেবা দেবে জিভে তোর—, —দেখে লেবু এনো করোনাক—,
—যে এনেছে ভাই কিবা নাম—? —না বাজিয়ে ভাই পুঁটুলিটা—।
—ছেলে বসে বসে দেখেছিল—, —চেপে এল কেবা কোথা তার—?
—তোলা নৌকা আর ছাগলের—। —নয় কারো সে যে নাম রঘু—।
—এল কোথা থেকে নিয়ে দুটো—? —দশ কলা দেব আছে এই—,
—থেকে বাঁশ এনে পাটিগুলো—। —দরে বাজারেতে বিকোয় না—

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে) **শ্রীবিনয় ব**

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। ১ম ছবির নীচের মানুষটির মাথার টুপি ২য় ছবিটির অপেক্ষা বেঁটে। ১ম পা দুটি ২য় টির অপেক্ষা বেশী লম্বা ও মোটা। ২য় ছবির গাছের গোড়া ১ম ছবির চেয়ে এবং পাতাগুলি পাতলা। ২য় ছবিতে মেয়েটির ডানদিকের কালো সরল রেখা তিনটি দাগটি বেশী দূরে হয়েছে। ২। মহাভারত ৩। বেল (bell) ৪। ফ্রি হুইল, গীয়া ব্রেক সহ হ্যাণ্ডেল ৬। দু'জনের উত্তরই ঠিক। খাড়া ভাবে দেখলে, ব্লকগুলি উপর ১+২+৩=৬টি দেখছে একজন ; অপরজন বাঁ-দিক থেকে দেখেছে, তাতে সে ব মাঝখানে ৩ এবং ডাইনে ২=মোট ৭টি দেখেছে। তোমরা কাগজের ছবিটি বাঁ-দিক ঘুরিয়ে দেখলে সাতটি ব্লকই দেখবে।
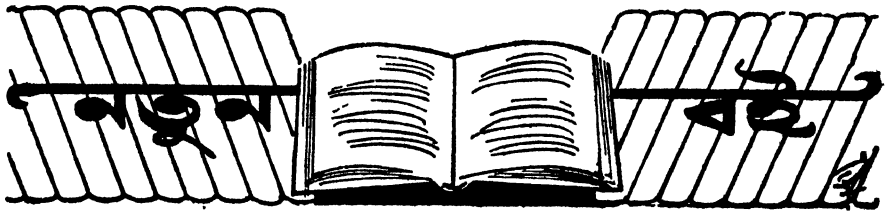
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

সোনার বাংলা—শ্রীনরোত্তম হালদার। শ্রীমতী নমিতা হালদার কর্তৃক কচি ও কাঁচা (ছোটদের আসর) মাণিকনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১·২৫

ছোটদের জন্য লেখা সচিত্র কবিতার বই। কবিতাগুলিকে কবি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম কয়েকটির মধ্যে বাংলার ঋতু-বৈচিত্র্য দেখান হয়েছে, দ্বিতীয় কয়েকটি লেখা শহীদদের নিয়ে এবং শেষের কয়েকটি কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনের উপর রচিত। কবিতাগুলির মিল, ভাষা ও ভাব খুবই সুন্দর। যাদের জন্যে লেখা তারা পড়ে সকলেই আনন্দ পাবে এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানলাভও করবে।

ছবি ছড়ার দেশে—শ্রীশৈলশেখর মিত্র সম্পাদিত। শ্রীগীতা দত্ত কর্তৃক এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এ : ১৩২-১৩৩ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৪·৫০

বড় সাইজের দু'রঙে ছাপা খ্যাতনামা বহু শিল্পীর ছবিতে ছবিতে ভরা ছড়ার, বই। কয়েক বৎসর পূর্বে বইখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তখন সম্পাদক ছিলেন অন্য ব্যক্তি। সেই সংস্করণটি নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলায় প্রচুর ছড়া লেখা হয়েছে। এই সংকলনটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী থেকে হালফিলের প্রায় শতাধিক লেখকের ছাড়া সংগৃহীত হয়েছে। কতকগুলিকে ছড়া না বলে কবিতা বলাই আমরা উচিত মনে করি।

গুপী গাইন বাঘা বাইন—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শ্রীগীতা দত্ত কর্তৃক এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এ : ১৩২-১৩৩ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩·০০

উপেন্দ্রকিশোরের "গুপী গাইন বাঘা বাইন" শিশু-সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। বর্তমানে তাঁর রচনাসমূহের কপিরাইট চলে যাওয়ায় এবং এই কাহিনীটি নিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্র বিখ্যাত শিল্পী ও সিনেমার ডিরেক্টার শ্রীসত্যজিৎ রায় সিনেমার ছবি তৈরী করায়, এই বইখানি বহু প্রকাশক নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য বইটিতে উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোটদের নামকরা গল্প মুদ্রিত হয়েছে। গল্পগুলির সঙ্গে পাতা-ভরা যে ছবিগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি ভারী সুন্দর। বইয়ের কভারটিও মজাদার।
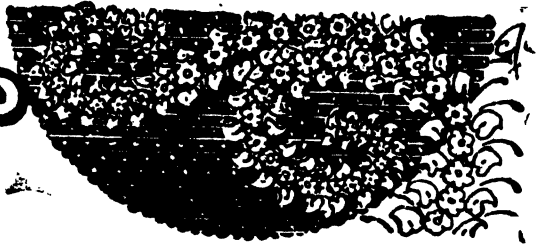
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত এমনি করেই ঋতু-পরিক্রমা চলে। শীতের সময় আমরা গরম জামা গায়ে পরি, লেপ কম্বল গায়ে চাপা দিই—যে সব জায়গা নিদারুণ ঠাণ্ডা, সেখানে তো ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাতে হয়—তবুও যেন শীত ভাঙতেই চায় না। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষরা একথা যেন ভাবতেই পারে না—কারণ, গ্রীষ্মকালে আইঢাই করতে করতে কেবল বলি 'কি গরম'! আর এই কথা বলতে বলতে বর্ষার জন্য আকুল হই। শুকনো মাঠ-ঘাট গাছপালা সব পূর্ণ হবে, সতেজ হবে, এই ভেবে।

তবে শীতকালে যেমন মাঠে দৌড়ে বা অন্যান্য ব্যায়াম করতে হয়, তেমনি গরমকালের ব্যায়ামও আছে, আর সেটা শিখিতেই হয়। কি বলতো? সাঁতার! সাঁতার শেখাটা খুব দরকার—এতে ব্যায়াম তো হয়ই আর হঠাৎ বিপদ থেকেও রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা যায়। জলে নেমেছ, হঠাৎ গঙ্গায় বান এলো, কিংবা বেশী জলে গিয়ে পড়লে, পায়ে মাটি পাচ্ছ না, এমন কতকি ঘটনা যে ঘটে তার ঠিক নেই! সেইজন্য সাঁতার শিখে রাখা খুব দরকার।

আজকাল খবরের কাগজ খুলে খেলাধূলার পাতাটায় চোখ বোলালে দেখা যাবে সাঁতারের খবর। ছেলেরা মেয়েরা কত নাম করেছে, করছে এই সাঁতার—বিদেশে গিয়ে শিক্ষা নিচ্ছে। কখনও কখনও মেয়েরা ছেলেদের পরাজিত করছে—তাও দেখা যাচ্ছে। তাই বলছি দেখাটাই শুধু উপভোগ্য নয়, শেখাটাও খুব দরকার। আর এই গ্রীষ্মকালই এর প্রশস্ত সময়। সে কথা তোমাদের বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছি।

কি ভাবছিলাম জানো? ভাবছিলাম দেখ এখনকার দিনে মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষায় কেমন কৃতী হয়ে উঠছে। স্কুল, কলেজ ছাড়িয়ে খেলাধূলা, নাচ গান অভিনয় এমন কি ডাক্তার, উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সব তাতেই তারা এগিয়ে যাচ্ছে গৌরবের সঙ্গে। কিন্তু এমন একদিন ছিল, মেয়েরা জীবনটা ভাল করে ফুটিয়ে তোলা দূরে থাকুক, ঘরের ভিতর থেকে জোরে হাসতেও পারতো না, দুর্নাম হবার ভয়ে লেখাপড়া শেখাও হতো না। আনন্দ নেই, শিক্ষা নেই, জীবন বিকাশের কোন পথ নেই। আজকের দিনে একথা ভাবা যায়? গান-বাজনা? লেখাপড়া? আঁত্‌কে উঠতেন অভিভাবকরা।

আজকের দিনে মেয়েদের এই অগ্রগতি তখনকার দিনে কল্পনাও করতে পারা যায়নি।

চিরদিন কেউ অন্ধকারে পড়ে থাকতে চায় না। সূর্যের আলো যে দেখেছে, সে কেন চাইবে অন্ধকারে পড়ে থাকতে? এই আলোর অন্বেষণে বেরোলেন যে মেয়ে, তিনি হলেন ঠাকুরবাড়ীর পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।

এই সব বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙে, অরুণ আলোর অঞ্জলি ভরে মেয়েদের জন্য নিয়ে আসার অভিযান শুরু করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে একজন ইনি। কত নিন্দা, অখ্যাতি, এঁদের সহ্য করতে হয়েছিল। জ্ঞানের জন্য, শিক্ষার জন্য, মেয়েদের এই যে অভিযান সে তো পৃথিবীর যে কোনো আবিষ্কারের চেয়ে রোমাঞ্চকর। কোলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী বাংলা দেশের সমস্ত অগ্রগতির, উন্নতির ও সভ্যতার একমাত্র প্রাণকেন্দ্র ছিল। এই ঠাকুরবাড়ীর ছেলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকে।

অক্ষরজ্ঞানহীনা অখ্যাত গ্রামের মেয়ে নানা পাশ্চাত্য ভাষায় পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

অজানাকে জানবার নেশা মানুষের চিরকালের। অক্ষর সাজিয়ে লেখাপড়া করতে না করতেই আট বছরের মেয়ে বিয়ে হয়ে এলেন জমিদার বাড়ীতে—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ছেলে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। বাইরের জগতে মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা বা সহজ ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথের ভাল লাগায়, জীবনে একটা আলোড়ন এনে দিল। এই সময় তিনি বিলাত চলে যান। স্বামীর সত্যিকারের সঙ্গিনী হবেন মনে করে জ্ঞানদানন্দিনী ইংরেজী শিখতে লাগলেন। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য, শিক্ষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য, এইটাই হচ্ছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যেখানে মেয়েদের প্রবেশ অধিকার ছিল না, সেই নিষিদ্ধ দেশে জ্ঞানের রাজ্যে পদার্পণ করার প্রথম উদ্যোগ ইংরেজী শেখা। জ্ঞানদানন্দিনীর জীবনে অভূতপূর্ব ঘটনা।

ঐকান্তিক আগ্রহে ও অনুরাগে শুধু ইংরেজী নয়, ফরাসীভাষাও তিনি শিখেছিলেন।

পর্দানশীন থেকে মেয়েরা প্রকাশ্যে বেরুবে এ যেন তখন কেউ ধারণা করতে পারতেন না। আর তিনি তিনটি শিশুসন্তান নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিলেত গেলেন। যে মেয়ে অন্দরমহলের অন্ধকারে ছিল, সে এলো সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে অন্য রাজ্যে। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা যে কত দরকার তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, দৃষ্টি সহজ ও নিরপেক্ষ হয়ে উঠেছিল।

আজ যখন মেয়েরা জীবনের সবক্ষেত্রে আলোর পতাকা বহন করছে, তখন মনে পড়ে তাঁর কথা, যিনি প্রদীপ হাতে পথ দেখিয়েছিলেন—নমস্যা সেই জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে॥

চিঠির উত্তর—

এমন চিঠি তোমরা লিখবে যার উত্তর চাও। কিন্তু কই তাতো পাচ্ছি না। তবুও যাদের চিঠি পেলাম—রুবি মুখোপধ্যায়, উত্তরপাড়া; মণ্টু ঘটক, কোলকাতা; শ্রীরাধা বসু, হীরক ও মোহর, কোলকাতা। উমা দাসগুপ্তা, বেথুয়াডহরী, নদীয়া, ছবিগুলি তুমি কালকালিতে একটু মোটা কাগজে এঁকে পাঠালেই চলবে। শুভকামনাসহ—

—তোমাদের মধুদি'

সুশীল ও নিরুবালা প্রতিযোগিতা

[আমাদের পত্রিকার অনুরাগী পাঠক ও মেধাবী ছাত্র শ্রীমান্ সুনির্মল রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবার এম. এস-সি পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে একটি পদক ও বই কেনার জন্য এক শত টাকা পুরস্কার পায়। ঐ টাকা থেকে সে তার পিতা-মাতার নামে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে! এই প্রতিযোগিতায় মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য ত্রিশ টাকার মধ্যে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে।]

॥ প্রতিযোগিতার বিষয় ॥

পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ ও তাঁদের আবিষ্কার

কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকদের নাম, তাঁদের দেশ ও কি আবিষ্কার করেছেন, তার নাম দিতে হবে। সর্বাপেক্ষা বেশী নাম ও সঠিক আবিষ্কারের বিষয় যারা দিতে পারবে, তারাই পুরস্কার পাবার অধিকারী হিসাবে বিবেচ্য হবে। উপযুক্তানুসারে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে প্রতিযোগীদের।

১ম পুরস্কার	২য় পুরস্কার	৩য় পুরস্কার
১৫'০০ (পনর টাকা)	১০'০০ (দশ টাকা)	৫'০০ (পাঁচ টাকা)

॥ কিভাবে লেখা পাঠাতে হবে ॥

* ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (দু'পৃষ্ঠায় নয়) পরিষ্কার করে ১, ২, ৩ ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে প্রথমে বৈজ্ঞানিকের নাম ও সেই লাইনেই তাঁদের দেশের নাম এবং তারপর আবিষ্কৃত বিষয়ের নাম দিতে হবে তিনটি কলমে।

* প্রতিটি লেখার সঙ্গে প্রতিযোগীদের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-গ্রাহিকা সংখ্যা থাকা চাই এবং খামের উপর 'প্রতিযোগিতা' কথাটি লিখে দিতে হবে।

* শ্রাবণ মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদের হাতে লেখাগুলি অবশ্যই পৌছান চাই। ভাদ্র মাসের মৌচাকে পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রতিযোগীদের নাম ঘোষণা করা হবে এবং তাদের ছবি পাওয়া সম্ভব হলে তা ছাপা হবে।

॥ প্রতিযোগিতা পাঠাবার ঠিকানা ॥

মৌচাক কার্যালয়, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০'৬০ পয়সা

সদ্যোজাত মৃগশিশু

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্র *

৫০শ বর্ষ]　　শ্রাবণ : ১৩৭৬　　[৪র্থ সংখ্যা

বর্ষা এল গাঁয়

সুখরঞ্জন রায়

ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ে,
　　আকাশ মেঘে ছায়,
পথ ঘাট সব একশা জলে,
　　বর্ষা এল গাঁয়।
সন্ সন্ সন্ বইছে বায়ু
　　দুল্‌ছে গাছের ডাল,
লাগ্‌ল নাচন কেয়ার বনে
　　কাঁপছে ঘরের চাল।
মক্ মক্ মক্ ডাকছে ভেক
　　খুশির সীমা নাই,
কিল্‌বিলিয়ে কেঁচোর দল
　　আস্‌ল ছেড়ে ঠাঁই।

কড়্ কড়্ কড়্ পড়্ছে বাজ
কাঁপিয়ে বুকের তল,
কাগ্জী-নাও ভাসায় জলে
দামাল ছেলের দল।
খক্ খক্ খক্ কাশ্ছে বুড়ো
হিমেল হাওয়া লেগে,
ছোট্ট খুকু খেল্ছে পুতুল
ঘরের কোণে জেগে।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ে
বর্ষা এল গাঁয়,
লাঙল কাঁধে কিষাণ সবে
মাঠের পানে ধায়।

মায়ের আঁচল

স্বর্গ হতে তারাসম খসিয়া ভূতলে
জনম লভিনু আসি জননীর কোলে ;
মার দেওয়া আঁখি দিয়া হেরি মার মুখ,
হরষে বিস্ময়ে মোর ভরি' উঠে বুক ;
সে দৃষ্টি পড়িল যবে পৃথিবী উপর
দেখিনু ধরণীখানি কত না সুন্দর !
তেমনি জননী ওগো কথা শুনি তোর
অস্ফট কাকলি ফুটে এই কণ্ঠে মোর।
মুখে ভাষা ভরে উঠে, ভরসায় বুক
ভুবনের সাথে লভি পরিচয়-সুখ।
দিনে দিনে বেড়ে উঠি, বাড়ে বিদ্যাবল,
মণিরত্ন খুঁজে ফিরি সারা ধরাতল।
কিন্তু যেখানেই যাই তুমি থাক মনে,
তোমার আঁচল মেলা দেখি গো ভুবনে ;
ঘরে ও বাহিরে আছি ঘেরা সে আঁচলে,
সাধ্য নাই বাহিরেতে যাই কোন ছলে।

বারাণসীদাহ

শ্রীশতদ্রুশোভন চক্রবর্তী

পৌণ্ড্রবংশীয় এক রাজা। যেমন তিনি তেমন তাঁর প্রজা। প্রজারা রাজাকে অবিরত বলত: আপনিই বাসুদেব—আপনিই বাসুদেব। মানুষের শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন মর্ত্যে।

ক্রমে এই রাজা বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। সবাই বলত, তিনিই বাসুদেব। রাজারও মনে হ'ল: আমিই বাসুদেব। প্রজারা যখন বলছে তখন অতি অবশ্যই তিনি বাসুদেব।

রাজা নিজেকে বাসুদেব বলে জানলেন। ক্রমে সমস্ত বিষ্ণুচিহ্ন তিনি ব্যবহার শুরু করলেন।

অবশেষে কৃষ্ণের কাছে একদা প্রেরিত হ'ল দূত।

রাজা বলে পাঠিয়েছেন: তুমি বাসুদেব নও। অথচ আমার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ কর। এটি ভাল নয়। অতএব ওসব পরিত্যাগ করবে। 'আমি বাসুদেব'—এ অভিমানও ভাল নয়, অতএব পরিত্যাগ করবে। যদি কল্যাণ চাও তাহলে আমার প্রতি প্রণত হও।

দূত এল। কৃষ্ণকে সব জ্ঞাপন করল। কৃষ্ণ হেসে বললেন: সত্বরই পরিত্যাগ করব আমার চিহ্ন এই চক্র। তোমার প্রভুকে এই কথাই শুনিয়ো। তাঁর পুরেই আমি যাব। সমস্ত চিহ্ন ধারণ করেই যাব। তাঁর আদেশও তাই। আমি যাব। দেরি নয়, কালই। এবং অতি অবশ্যই। যাব, চক্র ত্যাগ করব। মনে ভয়, তাকে টিকিয়ে রাখা নয়। অতএব তেমন-তেমন আচরণই করব। তাঁর থেকে আর ভয় থাকবে না, কোন।

দূত বিদায় হ'ল।

স্মরণেই এল গরুড়। কৃষ্ণ যাত্রা করলেন পৌণ্ড্রকপুরে।

দূতের মুখে পৌণ্ড্রক সব শুনেছেন। বহুতর সৈন্যে সজ্জিত হয়েছেন। সহায় কাশীরাজ। তাঁরও বিশাল বাহিনী। সুবিশাল বাহিনী কৃষ্ণকে প্রতিহত করতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল।

দূর থেকে কৃষ্ণ দেখলেন, রাজা আসছেন। হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। বাসুদেব দেখলেন, বাসুদেব আসছেন যুদ্ধে। সাজে ফাঁক নেই কোন। মাল্য, শার্ঙ্গ, শ্রীবৎসচিহ্ন—সবই আছে। ধ্বজে গরুড়ের মত পক্ষী, পরিধানে পীতবাস। রাজা পৌণ্ড্রক আসছেন, শিরে জ্বলছে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডলের চমক।

ভাবগম্ভীর হাসি, কৃষ্ণ হেসে উঠলেন।

পৌণ্ড্রকবাহিনী। পরম বলশালী। অগণিত অশ্ব, হস্তী। সজ্জিত বহুতর শস্ত্রে কারো হাতে নিস্ত্রিংশ, ঋষ্টি, কারো হাতে গদা, শূল, শক্তি, কার্মুক। বিশাল আয়োজন।

'কৃষ্ণ মুখোমুখি হলেন পৌণ্ড্রকের !'

কৃষ্ণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। শার্ঙ্গ থেকে নির্মুক্ত হ'ল শরনিকর। বিদীর্ণ হ'ল বিপক্ষের শরসমূহ। গদা নিক্ষেপিত হ'ল, চক্র ধাবিত হ'ল। পৌণ্ড্রকের সৈন্যবাহিনী মর্দিত করলেন জনার্দন। কাশীরাজের সেনাপুঞ্জ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'ল।

কৃষ্ণ মুখোমুখি হলেন পৌণ্ড্রকের! মূঢ় পৌণ্ড্রক। বাসুদেবাভিমানী পৌণ্ড্রক। কৃষ্ণ বল্লেন: দূতের মুখে আপনার কথা জেনেছি। আপনার আদেশ পালন করছি। এই চক্র পরিত্যাগ করলাম। এই গেল গদা। আপনার আদেশ। অতএব গরুড় উঠুক আপনার ধ্বজে।

চক্র ও গদায় পৌণ্ড্রক বিদারিত হলেন, প্রোথিত হলেন। গরুড় বিনাশ করল রথের ধ্বজা।

হাহাস্বরে বাতাস পরিপূরিত হ'ল। কাশীরাজ ধেয়ে এলেন। শার্ঙ্গ থেকে শর ছুটল। কাশীরাজের ছিন্নমুণ্ড কাশীপুরীতে এসে পতিত হ'ল। কাশীবাসী বিস্ময় মানল।

কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। মগ্ন তিনি লীলাবিলাসে।

কাশীর লোক বলাবলি করল: কেমন ভাবে হ'ল, কে করল?

রাজপুত্র জানলেন কৃষ্ণের কর্ম। পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। পুরোহিতে রাজপুত্রে মিলে চলল শঙ্করের উপাসনা।

অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে পরম সেবা। মহাদেব মহাতুষ্ট। তিনি প্রকটিত হলেন।

রাজপুত্র প্রার্থনা করলেন: আমার পিতাকে হত্যা করেছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের নাশ চাই। কৃত্যা উত্থান করুন।

মহাদেব বললেন: হবে, অনুরূপই হবে।

দক্ষিণাগ্নিতে যজ্ঞ সম্পন্ন হ'ল। মহাকৃত্যার উত্থান হ'ল সেই অগ্নি থেকে।

মহাকৃত্যা। কোপে ক্ষুব্ধ কৃত্যা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ধাবিত হ'ল দ্বারাবতীর দিকে। মুখে প্রচণ্ড বহ্নি। কেশে কেশে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা।

কৃত্যা ছুটছে। মানুষ বিচলিত হ'ল, ভয়ে বিহ্বল হ'ল। সবাই শরণ নিল কৃষ্ণের।

কৃষ্ণ তখন পাশাখেলায় মগ্ন। জানতে পারলেন মহাদেবের প্রসাদে পাওয়া এই কৃত্যা। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করলেন। আদেশ দিলেন: হনন কর এই কৃত্যাকে।

আগুনের মালায় জটিল সেই কৃত্যা। ধক্ ধক্ করে উদ্গীর্ণ হচ্ছে মহা অগ্নি। ভয়ংকর, অতি ভীষণ কৃত্যা। পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হ'ল সুদর্শনচক্র। কৃত্যা বিধ্বস্ত হ'ল। পলায়ন করল বেগে। সুদর্শনচক্রও ধাবিত হ'ল পশ্চাতে পশ্চাতে।

কৃত্যা প্রবেশ করল বারাণসীতে। কাশীরাজের সৈন্য এল, প্রমথ সৈন্য এল। কিন্তু দগ্ধ হ'ল। কৃত্যাও দগ্ধ হ'ল। বারাণসীপুরীও জ্বলল, জ্বলল এবং জ্বলল।

রাজা প্রজা, জন্তুজানোয়ার, প্রাসাদ, সৌধ, অট্টালিকা প্রাকার—সমস্ত কিছু জ্বলল, পুড়ল, ভস্ম হ'ল।

প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিল সুদর্শনচক্র। বারাণসীদাহ যেন তুচ্ছ। প্রস্তুত ছিল যেন আরো ভীষণ কিছুর জন্য। কৃষ্ণের হাতে ফিরে এল চক্র, কিন্তু তখনো সেই ভাব। তখনো সুদর্শনে ভীষণের স্পৃহা।*

*এই উপাখ্যান বিষ্ণুপুরাণ থেকে সংগৃহীত। পঞ্চমাংশ, চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

খোকনবাবুর অংক কষা

শ্রীননীলাল দে

খোকনবাবু অংক কষে, মজার অংক শেখা,
বইতে আছে আজগুবি সব দামের কথা লেখা।
একটি গরু কুড়ি টাকা, ভেড়ার দাম ছয়,
একটি মোষের দামটা যদি সাতাশ টাকা হয়!
ঘোড়ার আবার মূল্য হলো বাইশ টাকা গড়ে,
অংক কষে খোকনবাবু। আবার দেখে পরে,
ডালের কে, জি ষাট পয়সা। চালের মণ বার,
চার আনাতে চিনির কে, জি কিন্‌তে তুমি পার।
দামটা দেখে খোকন বলে—"কষব নাকো আর,
এই দামেতে কোথায় জিনিস, বলুন দেখি স্যার?"

কপূরের মতো

শত্রা

॥ উপন্যাস ॥

(পূব-প্রকাশিতের পর)

আমরা থানায় আসার আগেই দারোগা সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে পৌঁচেছেন কৃষ্ণমূর্তি জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপারটা কি বলুন তো ?

ত্রিলোচনবাবু বললেন—এটা এমন একটা ঘটনা যা চট করে ব্যাখ্যা করবার নয়। আপন মতো আমিও টর্চ জেলে তিলুড়ি হ্রদের ধারের রেলিং, লাইট-পোষ্ট, কংক্রীটের দেওয়াল পরী করে দেখেছি, ঘুরে অন্য কোনো দিক দিয়ে যদি গাড়ীটা তিলুড়ির জলে গিয়ে পড়ে—তবে হচ্ছে অন্য কথা,—আর সে সম্ভাবনা কম ; পথের পাশে যেখানে জল, সেখানে বেড়া রয়েছে জল যেখানে এক ফার্লং দূরে, সেখান থেকে অবশ্য বেড়া নেই, কিন্তু গাছপালা রয়েছে ; পাথু পথ—গাড়ী আদৌ চলতে পারে না, যদি চলেও, তবু জোর কমে যাবে।

দারোগাবাবু বললেন—তিলুড়ির জলে যদি না পড়ে তবে গড়ীটা উবে যাবার আর কো ব্যাখ্যাও তো দেওয়া যায় না !

ত্রিলোচনবাবু বলিলেন—আমি যখন প্রথম ফোন করেছিলেম—তখন কথায় ক একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—কোনো বদ মতলব এর পেছনে আছে কিনা আমাদের ভাব হবে। আমি প্রথমটা সেরকম ভেবেই এগোচ্ছিলাম—কিন্তু মাধু সিং সম্পর্কে য জানলাম—তাতে তার প্রতি সন্দেহ করা চলে না। রোটাংডির সকলেরই সে প্রিয়, সব

তাকে ভালবাসে, সে'ও সকলকে সমান ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। সুতরাং তার দ্বারা কি করে এমন একটা দুষ্কার্য করা সম্ভব হবে? দারোগাবাবুকে মাধু সিং-এর হয়ে সারাপথ আমার কাছে ওকালতি করেছেন।

ত্রিলোচনবাবুর কথা বলার ধরণ দেখে মনে হলো যেন কিছু চেপে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের কাছে সব কিছু প্রকাশ করিতে চান না।

একটুখানি অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে রইলাম; দারোগাবাবু বললেন—আজ আর আমাদের করবার কিছু নেই; যদি তিলুড়ির জলে ডুবে গিয়ে থাকে, তবে তো হয়েই গেল, নচেৎ কাল সকালে আবার যা হয় করা যাবে। আপনাদের আবার রূপজামে ফিরতে হবে—

অর্থাৎ আমাদের উঠতে বললেন ঘুরিয়ে। আমরা উঠে দাঁড়াতে ত্রিলোচনবাবুকে দেখিয়ে দারোগা সাহেব বললেন—স্যার যখন এসে পড়েছেন, তখন একটা কিছু বিহিত হবেই।

আমতা আমতা করে আমি বললাম—এই যে বললেন—তিলুড়ি হ্রদেই গাড়ীটা ডুবে যেতে পারে—তা হলে তো সমস্যার সমাধান হয়েই গেল।

কৃষ্ণমূর্তি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, রাতুলদা'র চোখেও জল।

ত্রিলোচনবাবু বললেন—মাধু সিং আপনাদের যত প্রিয়ই হোক, আমি তবু বলছি—ওর মনে কোনো দুরভিসন্ধি থাকলেও থাকতে পারে।

ত্রিলোচনবাবুর কথায় আবার আমাদের মনে চঞ্চলতা এল, কি এমন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে মাধু সিং-এর মনে? অথচ এত ভালো সে—

কৃষ্ণমূর্তি প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাচ্চাদের মেরে ফেলতে চায় নাকি সে?

না—ত্রিলোচনবাবু সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন—না, না, বরং ঠিক তার উল্টো! বাচ্চাদের সযত্নে সে বাঁচিয়েই রাখবে, যত্নের পরিমাণ বরং কিছু বেশীই হবে;—বাচ্চাদের মেরে ফেললে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

আপনার কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না—রাতুলদা বললেন।

ত্রিলোচনবাবু বললেন—ছেলেদের আটকে রেখে মাধু সিং কিছু টাকা আদায়ের ফন্দী আঁটতে পারে; কাল সকালেই আপনারা বেনামা চিঠি পেতে পারেন—টাকার বিনিময়ে আপনাদের ছেলেকে ফিরে পাবার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কোনো চিঠি—দেখুন না পান কিনা—

অবশেষে মাধু সিং—কৃষ্ণমূর্তি কথা শেষ করতে পারলো না।

ত্রিলোচনবাবু বললেন—না, আমি একেবারে নির্দিষ্ট করে এখনো বলতে পারি না যে মাধু সিং ছেলেগুলোকে কিড্‌ন্যাপ করেছে, আটকে রেখে টাকা আদায়ের ফন্দী আঁটছে। মাধু সিং নিজে

চিঠি দেবে না—একটা দল ওর থাকতে পারে, দলের কেউ হয়তো টাকার জন্যে আসতে পারে,—যাই হোক, সে কাল সকালে দেখা যাবে'খন।

ত্রিলোচনবাবুর কথার খেই ধরেই দারোগাবাবু বললেন—এমনও হতে পারে, হয়তো মাধু সিং সুদ্ধই অন্য কোনো দলের হাতে বন্দী হয়েছে ওরা—

আমি বললাম—কিন্তু কথা হচ্ছে, গাড়ীসুদ্ধ ছেলেরা আর ড্রাইভার গেল কোথায়—বন্দী করে যদি ছেলেদের লুকিয়ে রাখা হয় জঙ্গলে—গাড়ীটা তবে কোথায় গেল ?

দারোগাবাবু বললেন—কাল সকালে খোঁজা যাবে—কোথায় গেল গাড়ীটা। তিলুড়ির জলেও খোঁজ করা হবে, তোপচাঁচির জল-পুলিশকেও খবর করেছি, কাল সকালে তারা আসবে। যদি জলেই ডুবে যায়, তবে গাড়ীটা বা মৃতদেহ পাওয়া যাবে। আজ রাতে আর কিছু করবার নেই, আবার ভোর থেকেই কাজ সুরু হবে। দেখুন রাতের মধ্যে কোনো চিঠিপত্তর পান কিনা!

আমরা থানা থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা; পাহাড়ী জায়গায় রাত্রে এসময়টা খুব শীত পড়ে। চারিদিকে আবছা ধোঁয়ার পাতলা আস্তরণের মতো কুয়াশা নেমেছে; দূর থেকে মনে হয় প্রকৃতি যেন গলায় ফিকে ছাই রঙের একটা হাল্কা চাদর জড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। নিস্তব্ধ রাত্রি—আমাদের গাড়ী দুটো লম্বা আলো ফেলে খুব আস্তে আস্তে চলতে লাগলো, তখনো মনে আশা যদি পথের পাশে কোথাও বাচ্চাদের দেখা মেলে, যদি তাদের কারুর করুণ কান্নার শব্দ শোনা যায়—যদি স্টেশন-ওয়াগনের কোনো চিহ্ন দেখা যায়—

তিলুড়ির মোড় থেকে কৃষ্ণমূর্তি লুন্টির পথে বেঁকে গেলেন। রাতুলদা আর আমি গাড়ীতে কোনো কথা বলতে পারিনি। সারা পথ চুপ করে এলাম।

গল্পটা আমি আর বেশী বড় করতে চাই না—তারিণীদা আমাদের বললেন, তাই রূপজামে যখন আমরা ফিরলাম, সেখানকার মর্মভেদী কান্নার স্বর, করুণ বিষাদময় দৃশ্য প্রভৃতির বিস্তারিত বর্ণনা করবো না। শোক যে কতদূর গভীর হতে পারে, কেমন করে মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়,—সে রাতে রূপজামে থেকে তা আমার মালুম হলো। রূপজামের মানুষগুলো হাসিখুশিতে, গালগল্পে, গানবাজনায় একেবারে প্রাণবন্ত ছিল, কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকেই কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে, অসহায় কারুণ্যে মুহুর্মুহু শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলছে!

ঘড়ির কাঁটার টিক্‌টিক্‌ শব্দের সঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে অতি ধীরে ধীরে সেই শোকের রাতও শেষ হলো। পূর্ব দিকে—দূরে বড়ধেমো পাহাড়ের ওপাশের আকাশে রূপোলি আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী বাড়ী খবর চালাচালি করা হলো—রাত্রে কোনো চিঠি কেউ পেয়েছে

কিনা, শুধু চিঠি কেন—ছেলেদের বা মাধু সিং—কারুর কোনো সংবাদ পাওয়া গেছে কিনা!

না ভোরবেলা পর্যন্ত কোথাও কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি।

এই পর্যন্ত বলে তারিণীদা থামলেন, বললেন—আজ আমি উঠি, কাল-পর্শু যেদিন আসবো—গল্পের বাকীটা তোদের বলবো। আজ আসি।

তার মানে—বংকু গর্জে উঠলো, গল্পের এই রকম জায়গায় কখনো 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' হয়—ছেলেগুলোর কি হ'ল, মাধু সিং ফিরলো কিনা—সব তোমাকে এখুনই বলতে হবে।

গল্প শেষ না করে ওঠা চলবে না—আমরা সকলে তরণীদা'কে চেপে ধরলুম। গল্প শেষ করতেই হবে; আমাদের দাবী মানতে হবে।

তরণীদা একবার কেসে গলা পরিষ্কার করে বললেন—বেশ, গল্প আমি শেষ করছি, কিন্তু তার আগে এক কাপ চা-য়ের ব্যবস্থা করো।

সোৎসাহে ন্যাড়া বললে—চা কেন, আমি কফির ব্যবস্থা করছি। গল্পটা চলুক!

আগে আসুক কফি, ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নিই।

বঙ্কু বললে—হাফ-টাইম বলছেন!

তরণীদা বললে—না, না, হাফ-টাইম কি রে—আমি তো প্রায় গল্পটা শেষ করেই দিয়েছি—আর সামান্য বাকী আছে।

এই কথার পর সমবেত কণ্ঠে দাবী উঠলো—তাহলে বলে ফেলুন, বলে ফেলুন।

ন্যাড়া যথাক্রত কফি নিয়ে এল, বলা বাহুল্য আমাদের সকলের জন্যেই।

তারিণীদা ফের সুরু করার ছলে বললেন—তারপর ছেলেদের আর মাধু সিং-এর খোঁজ পাওয়া গেল, ছেলেরা সুস্থ ছিল, বাপ-মার কোলে ফিরে এল।

কি রে? কি রে?—আমরা লাফিয়ে উঠলুম, বিস্তৃতভাবে বলতে হবে,—আগের মতো করে, শুধু শেষ বা উপসংহার আমরা শুনতে চাই না। আমরা সবাই সমস্বরে আবার ঘোষণা করলুম—আমাদের দাবী মানতে হবে।

তারিণীদা বলতে লাগলেন:

ভোরবেলা পর্যন্ত কোথাও কোনো পাত্তা মিললো না। বেলা যখন সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট, তখন তোপচাঁচি থেকে পুলিশের আর একদল এসে হাজির হলো। জলে যদি গাড়ীটা ডুবে গিয়ে থাকে, তবে তাকে টেনে তোলার জন্যে ক্রেন বা ঐ জাতীয় আরো যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা হয়েছে। তিলুড়ির হ্রদে যাচ্ছে তারা।

ত্রিলোচনবাবুর ধারণা কি বাসসুদ্ধ ছেলেরা সলিল-সমাধী লাভ করেছে তিলুড়ির জলে? যদিও কোথায় কোনো চিহ্ন নেই—ভাবতে গেলেও দম আটকে যায়!

কাল রাতে তবু কিছু আশার কথা শুনিয়েছিলেন—ছেলেগুলোকে আটকে রেখে মাধু সিং—বা তার দল বা অন্য কেউ টাকা আদায়ের ফন্দী আঁটছে!

আর, আজ ভোরে এ কি কাণ্ড!

রোটাংডির কিছু লোক, রূপজামের প্রায় সকলে, লুন্টি তিলুড়ি—সব জায়গা থেকেই বেশ কিছু কৌতুহলী লোক তিলুড়ির জলের ধারে এসে জমায়েত হলো। জলে যদি গাড়ীটা ডুবেই থাকে—তবে তাকে ক্রেনের সাহায্যে টেনে তুললে কি দৃশ্য দেখা যাবে?

রূপজাম থেকে কিছু মহিলাও এসেছিলেন—মায়ের প্রাণ, মরা ছেলেকে দেখেও যদি একটু সান্ত্বনা মেলে! সারারাত কেঁদে কেঁদে তাদের চোখ মুখ ফুলে গেছে—

গভীর জলে যদি কিছু ডুবে যায়—জলের তলায় কি করে খোঁজ চালাতে হয়—তার সরঞ্জাম দেখলাম। কাঠের পাটাতন জুড়ে চ্যাপ্টা পান্সী নৌকার মতো করে—তীরের কাছে ক্রেন বসানো হলো। সেই ক্রেনের চেন ঘুরিয়ে নৌকোটার পাশ থেকে একটা যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে জলে ফেলা হলো। আমার বলতে হয়তো দু'মিমিট সময় লাগছে, কিন্তু ক্রেন ঠিক করতে কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা কি তার কিছু বেশী সময় লেগেছিল।

সেই দেড় ঘণ্টা পৌনে দু'ঘণ্টা সমস্ত মানুষ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে সাংঘাতিক ট্র্যাজেডীর শেষ দৃশ্য দেখবার জন্যে বোধ হয় বুক বেঁধে থাকবে। (ক্রমশঃ)

ফুলের কথা

শ্রীসুমিতচন্দ্র মজুমদার

ছোট্ট ফুল ছোট্ট ফুল, একটি শুধায় কথা—
সকাল বেলা জেগে উঠে
রাত্রিরেতে ঘুমিয়ে পড়
তোমার মনে লাগে নাকি কোনো রকম ব্যথা?
কোনো রকম দুখ?
মিষ্টি হেসে বললে ফুল, সেই তো আমার সুখ।

ছোট্ট ফুল ছোট্ট ফুল, বলতে হবেই আজ—
ফোটার পরেই তুমি যে গো
নিজেকে দাও বিলিয়ে ওগো
তবে কেন বলতে পার অত রঙীন সাজ?
করে নাকি লাজ?
বললে ফুল মিষ্টি সুরে, এই তো আমার কাজ।

নীল পাখী

শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম

ট্রেনের জানালা থেকে পাখীটাকে টেলিগ্রাফের তারে দোল খেতে দেখলো রাজু। গাঢ় নীল রঙের ল্যাজঝোলা পাখী। ট্রেনের দিকে তাকাতে তাকাতে পাখীটা বোধহয় একবার রাজুর দিকেও তাকালো। খুশীতে রাজুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

আর সেই সঙ্গে একটা মজার কাণ্ড ঘটলো। ট্রেন পাখীটাকে পেরিয়ে এলো বটে, কিন্তু রাজু স্পষ্টই পাখীটাকে দোল খেতে দেখলো সেই টেলিগ্রাফের তারে বসে। দোল খেতে খেতেই পাখীটা ট্রেনটাকে দেখছে। ঝক্‌ঝক্ করে চলে যাচ্ছে ট্রেন। দু'পাশে তেপান্তরের মতো ধান খেত। সেই ধান খেতের ওপর ইঞ্জিন থেকে উঠে আসা একরাশ কালো ধোঁয়া উড়তে উড়তে ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে।
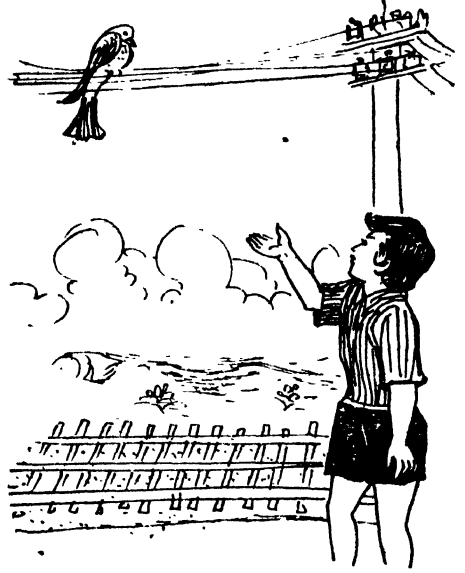
টেলিগ্রাফের তারে ল্যাজঝোলা নীল পাখী

ট্রেনটার চলে যাওয়া অনেকক্ষণ দেখলো সেই ল্যাজঝোলা নীল পাখীটা।

আর রাজু দেখলো নীল পাখীটাকে।

হঠাৎ নীল পাখীটার কথা শুনে চম্‌কে উঠলো রাজু।

'কি হে, দোল খাবে নাকি টেলিগ্রাফের তারে?'

অবাক হয়ে রাজু শুধালো, 'এ্যাঁ?'

নীল ল্যাজঝোলা পাখীটা ফের বললো, 'দোল খাবে নাকি টেলিগ্রাফের তারে?'

রাজু অবাক হয়ে পাখীটার কথাই শুনলো শুধু। কিছু বলতে ভুলে গেলো একেবারে।

পাখীটা বললো, 'ভারী মজার এই দোল খাওয়া। সারা দিনটাই তাই দোল খাই আমি।'

রাজু এবার বললো, 'আমি তো আর তোমার মতো পাখী নই। এমন কি আমার রঙও নীল নয়।'

পাখীটা খানিকটা অবাক হয়ে তাকালো রাজুর দিকে। বললো, 'তাই তো!'

একটু ভাবলো বুঝি পাখীটা। আকাশের দিকে তাকালো, রোদের দিকে তাকালো,

সুদূর তেপান্তরের দিকে তাকালো। দোল খেলো খানিক। তাকিয়ে দেখলো বোধহয় ট্রেনটা এক্কেবারে চলে গেছে কিনা। তারপর বললো, 'তোমার ট্রেন কিন্তু চলে গেছে।'

'যাক। ট্রেনে তো বাড়ি ফিরছিলাম। বাড়ি ফিরতে আমার ভালো লাগছিলো না।'

নীল পাখীটা হাসলো। খুশী হলো বোধহয়। একটু বেশী করে দোল খেলো।

'তুমি যদি পাখী হতে, তাহলে তোমার আরো ভালো লাগতো কিন্তু।' দোল খেতে খেতে বললো পাখীটা।

রাজু বললো, 'অন্ততঃ রেল লাইনের ধারে টেলিগ্রাফের তারে বসে দোল খেতে।'

পাখীটা গানের মতো করে হেসে উঠলো। তার হাসির সুরে মাঠ যেনো ভরে উঠলো! গায়ে কাঁটা দিলো রাজুর।

রাজু এবার লাইনের সোজা তাকালো। বহুদূরে বাঁকের কাছে একটা গাছে রেল লাইন আড়াল হয়ে গেছে। ট্রেনটাও আড়াল হয়ে গেছে ওখানেই। আকাশে এখনও কালো ধোঁয়ার চিহ্ন আছে। ট্রেনের মধ্যে মা বাবা রিঙ্কু এবং ছোটোকাকা আছে। ছোটকাকা অবশ্য তার চাইতে খুব বড়ো নয়। তারা তিনজনেই টেলিগ্রাফের তারের ওপর পাখীটাকে দেখছিলো অনেকক্ষণ থেকে।

টেলিগ্রাফের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো রাজু। পাখীটার দিকে তাকালো। রোদ্দুরে নীল রঙটা ঝল্‌কে উঠছে।

ছোটোকাকাই প্রথম দেখেছিলো ল্যাজঝোলানো পাখীটাকে। তারপর দেখেছিল রিঙ্কু। সব শেষে রাজু। অবশ্য এই পাখীটাকে নয়। অন্য অনেক ল্যাজঝোলা পাখীকে। লম্বা ল্যাজটাকে কেমন পাতার মতো ছড়িয়ে উড়ে এসে বসছিলো টেলিগ্রাফের তারের ওপর—একটার পর একটা নীল পাখী চোখে পড়ছিলো যেতে যেতে। টেলিগ্রাফের তারগুলোই যেনো ওদের সব চেয়ে প্রিয় জায়গা। এমন দোল খাবার জায়গা আর নেই।

রিঙ্কু পাখীগুলো গুণতে গুণতে আসছিলো। এই পাখীটা একষট্টি নম্বর পাখী। বাড়ি পর্যন্ত রিঙ্কু এই পাখী গুণতে গুণতে যাবে। কতোগুলো পাখী হবে কে জানে! নিশ্চয়ই একশো ছাড়িয়ে যাবে।

পাখীটা হঠাৎ একটু উড়ে ফের তারের ওপর বসলো। তবে খানিকটা সরে বসলো এবারে। রাজুর কাছাকাছি হলো যেনো। তারপর শুধালো, 'কী ভাবছো?'

রাজু বললো, 'রিঙ্কু আর ছোটোকাকার কথা ভাবছিলাম।'

পাখী বললো, 'রিঙ্কু তো আমার দিকে জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলো।'

রাজু বললো, 'রিঙ্কু তোমাদের গুণছিলো।'

অবাক হলো পাখীটা। বললো, 'গুণছিলো নাকি?'

'এখনও নিশ্চয়ই গুণে যাচ্ছে রিঙ্কু।' রাজু বললো।

পাখীটা বললো, 'আর কেউকে কিন্তু গুণতে দেখিনি।'

রাজু বললো, 'রিঙ্কুর অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল আছে মনের মধ্যে।'

পাখীটা বললো, 'রিঙ্কুর সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।'

রাজু বললো, 'গল্প করতে রিঙ্কু কিন্তু ওস্তাদ।'

'ওকেও নিয়ে এলে পারতে।' পাখীটা টেলিগ্রাফের তারের ওপর থেকে একটু ঝুঁকে বললো।

রাজু বললো, 'তুমি যে এমন গল্পটল্প ভালোবাসো তা কে জানতো।'

পাখীটা বললো, 'তা বটে। আমরা একা একা তারের ওপর দোল খাই বলে কথাটা ভাবা মিথ্যে নয়।'

রাজু স্পষ্টই বুঝলো পাখীটার খানিকটা দুঃখ হয়েছে।

রাজু বললো, 'এবার আমি ফিরে গিয়ে সবাইকে বলবো তোমাদের কথা।'

'বরং একদিন রিঙ্কুকে নিয়ে বেড়াতে এসো এখানে।' পাখীটা খানিকটা খুশী হয়ে বললো।

'রিঙ্কুর স্কুল, পরীক্ষা তো লেগেই আছে। আজকে আমার সঙ্গে তুমি না হয় চলো না।' রাজু বললো।

পাখীটা যেনো কী ভাবতে থাকলো।

রাজু বললো, 'আমাদের ওখানেও টেলিফোনের তার আছে। টেলিফোনের তার তো একেবারে বাড়ির কাছ দিয়ে গেছে। কাপড়-জামা শুকোবার তারও আছে। তুমি খুশী মতো দোল খেতে পারবে ওখানে।'

পাখীটা ঠিক তেমনি ভাবতে থাকলো।

রাজু ফের বললো, 'যদি চাও তো আমি আর ছোটোকাকা মিলে ঘরের মধ্যেই একটা তার টাঙিয়ে দেবো। ঘরের মধ্যেই না হয় দোল খাবে।'

পাখীটা এবার চারদিকে তাকালো। অন্যরকম দেখালো পাখীটাকে। বাতাসে ওর রৌদ্রে ঝলকে ওঠা ল্যাজটা দুলছে। আস্তে আস্তে পাখীটা বললো, 'এখান থেকে আমি যে যেতে পারবো না রাজু। এই মাঠ, রোদ্দুর, আকাশ ছেড়ে যেতে আমার খুব কান্না পাবে। রিঙ্কুকেই তুমি একবার নিয়ে এসো, সেইটেই ভালো হবে।'

বলেই টেলিগ্রাফের তারে পাখীটা দোল খেয়ে নিলো একবার।

রাজু বললো, 'নিশ্চয়ই আনবো। তোমার মতো একটা পাখী কাঁদুক তা আমি চাই না।'

রিঙ্কু ঝর্ ঝর্ করে হেসে ফেললো, রাজুর মুখে এসব কথা শুনে। বললো, 'একবারও তোমাকে নামতেই দেখিনি ট্রেন থেকে। মাঠের মধ্যে তো থামেও নি ট্রেন। আর নামলে উঠতে কি করে? এসব বানানো গল্প।

রাজু বললো, 'উহুঁ। বানানো গল্প নয়। সত্যি গল্প। মনের মধ্যে গল্পটা একেবারে সত্যি সত্যি।'

রিঙ্কু কিছু বললো না।

রাজুর নিজেরও কিন্তু মনে হচ্ছে, জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে এসব ভাবলেও এর সবটুকুই সত্যি॥

আম্বেদকর

চুনীলাল রায়

ডঃ বি. আর আম্বেদকরের তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছাপ যে-কোন যুগের যে স্থান সমাজের উপর গাভীর ছাপ রাখতে পারত। যখন সমস্ত দেশ জুড়ে সামাজিক এবং রাজনৈতিক আলোড়ন চলেছিল ঠিক তখনই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল।

তিনি অস্পৃশ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর হৃদয়কে করে তুলেছিল কোমল। তিনি এই সমাজের কথা ভাবতেন গভীরভাবে, আর ভারত যখন উপনিবেশ থেকে প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে চলল, তখন তিনিই তাঁদের কথা বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখেন।

বাবাসাহেব আম্বেদকর ১৮৯১ সনের ১৪ই এপ্রিল মহো-তে এক মাহার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাহার রেজিমেণ্টের একজন স্থবেদার ছিলেন। ছোটবেলায় তাঁকে খুব কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশোনা চালাতে হয়েছিল। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেবলমাত্র কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই তিনি তাঁর ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারেন। এ সম্বন্ধে পরবর্তী জীবনে তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমরা নিজেরাই আমাদের দুঃখ-কষ্টকে অন্য সবার চাইতে ভালভাবে দূর করতে পারি।'

মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর একটি বৃত্তি নিয়ে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখানে 'বৃটিশ ভারতে অন্তবর্তীকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা'র উপর থিসিস্ লিখে তিনি ডি. ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এভাবে উজ্জ্বল কৃতিত্বের সঙ্গে লেখাপড়া শেষ করেন। এরপর তিনি লণ্ডনে অর্থনীতি এবং আইন ব্যবস্থার উপর পড়াশোনা করতে যান। সেখানে তিনি গ্রে'স ইন থেকে ব্যারিষ্টারী ডিগ্রী লাভ করেন।

এভাবে বিদেশে সকল শিক্ষা সমাপনান্তে, ১৯২৩ সনে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

দেশে হরিজনরা যে সমস্ত সামাজিক অস্থবিধা ভোগ করত, তার বিরুদ্ধে এবার তিনি প্রচারকার্য শুরু করলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ভারতীয়দের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন এবং অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরাও যাতে উপযুক্ত স্থযোগ-স্থবিধা পায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে বলেন।

সমাজ সংস্কারের কাজেও তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, সমাজিক সমানাধিকার ছাড়া সমাজের কোনও উন্নতিই হতে পারে না।

অবশ্য যদিও মাঝে মাঝে তিনি খুব গভীরভাবে সমাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষ তাঁর স্বদেশ প্রেম এবং অগাধ পণ্ডিত্যকে যথাযোগ্য কাজে লাগিয়েছে।

আইনমন্ত্রী এবং প্রণয়ন বিভাগের সভাপতি হিসাবে তিনি ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন ভারতের সংবিধান রচনার প্রধান স্থপতি। রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, শিক্ষা এবং ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর প্রভাব ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁর মতামত ছিল অত্যন্ত প্রমাণিক।

ডঃ আম্বেদকর চিরকালই ভগবান বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা সমিতির কলেজগুলির নাম তাই তিনি রেখেছিলেন 'সিদ্ধার্থ কলেজ।' আর শেষ বয়সে তিনি নিজেও এই ধর্মগ্রহণ করেছিলেন।

এ ছাড়া জীবনের শেষ দিকে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরও বিশ্বাসী হয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনাও করেন।

১৯৫৬ সনের ৬ই ডিসেম্বর ভারতের এই কৃতী মহান্ সন্তান দেহত্যাগ করেন।

স্বাধীন ভারত তার মহান্ সন্তানের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে।

১৯৬৭ সনের ২রা এপ্রিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণান্ পার্লামেণ্ট ভবনের প্রাঙ্গণে আম্বেদকরের একটি প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এর উচ্চতা তাঁর প্রকৃত দৈহিক উচ্চতারও অনেক বেশী।

এই প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করে, আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'এই প্রতিমূর্তি স্থাপনে এমন একজনের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রেখে দেওয়া হ'ল, যিনি সমাজিক সমানাধিকারের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। এই মহান্ সন্তানের থেকে প্রতিদিন সমস্ত দেশবাসী সকলকে সমানাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে মহৎ শিক্ষালাভ করবেন।'

সেদিন হাজার হাজার হরিজন এবং নতুন মতাবলম্বী বৌদ্ধরা বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে, তাঁরা জয়ধ্বনি তুলেছিলেন, 'বাবাসাহেব জিন্দাবাদ, বাবাসাহেবের জয় হোক।'

এই বিরাট প্রতিমূর্তির বাম হাতে ধরা রয়েছে ভারতীয় সংবিধানের একখণ্ড প্রতিলিপি এবং ডান হাতের তর্জনী ভারতীয় লোকসভার দিকে নির্দেশ করে রয়েছে—যেখানে সংবিধান

এই প্রতিমূর্তি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় একলক্ষ টাকাই জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা হিসাবে তোলা হয়েছিল। বোম্বের ভাস্কর বি. ভি. ওয়াগ এই প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেছেন।

১৯৪৯ সনে আম্বেদকরের প্রদত্ত এক বক্তৃতার রূপ, শিল্পী এই প্রতিমূর্তির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বক্তৃতাতে তিনি বলেছিলেন, '১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী আমরা রাজনৈতিক ব্যপারে সমানাধিকার লাভ করব, লাভ করব অর্থনৈতিক সমানাধিকার। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্ত বৈষম্য দূর করতে হবে, কারণ তা' না হলে আজও যারা এই সমানাধিকার লাভে বঞ্চিত রয়েছেন, তারা এই কষ্টে গড়া প্রজাতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত হানবে।'

ডঃ আম্বেদকরকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে, তা এর আগে কেবলমাত্র দেওয়া হয়েছিল পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরুকে। কেবলমাত্র তাঁর প্রতিমূর্তিই এর আগে লোকসভা ভবনের প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়েছিল।

'জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হোক ভাল', এই কথা কয়টির সার্থক রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায় বাবাসাহেব অম্বেদকরের জীবনে। তিনি নিজের চেষ্টায় যে ভাবে বড় হয়েছিলেন, তা' অনেককেই অনুপ্রেরণা যোগাবে।

এসো, আমরা ভারতের এই মহান্ সন্তানের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

উপায় কি ছাড়া আর

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

আজকের দিনে ভাই
চাল চিঁড়ে মুড়ি নাই
নাই নাই, খাঁই খাঁই
চলে শুধু হাহাকার!
ও সব তুমি যা চাও
কোথা আজ বল পাও?
মিলবেনা কোনটাও—
বড় চড়া দাম তার!
ছাতু আটা যাহা মেলে,
সময়ে না নিয়ে খেলে
যা পাও তা নাহি পেলে,

খাঁক্তি ঘাঁট্তি করে
নিত্য নূতন তোড়ে,
ফন্দি-ফিকির গড়ে
চলে সব কারবার!
নিত্য অমিল সব,
নাই নাই তুলে রব;
কারচুপি অভিনব—
চলে দাম চড়াবার!
নাই নাই মুখে গাও,
যা চাইবে কিনে নাও
তাই সব কিনে যাও

অ্যাডভেঞ্চার

শ্রীবিকাশ বসু

একদিন সকালবেলায় ঘর-দোর ঝাড়-পোঁছ করবার সময় মিঠুনের মা বললেন, আমাদের র‍্যাশন ব্যাগে 'মণিবাবুর' নাম লেখা কেন রে?

মিঠুন যেন কিছুই জানে না এই ভাব নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অঙ্ক কষতে লাগলো। কিন্তু অঙ্কে তার আদৌ মন ছিল না। তার কান পড়েছিল এ বিষয়ে কী কথাবার্তা হয় তা শোনার জন্যে।

বাবা বললেন, মণিবাবুর থলি এখানে হাজির হয়নি তো!

মা বললেন, কখ্‌খনো না। এ থলি আমাদের, আমার নিজের হাতে চিহ্ন করা, এই দেখ।

সত্যিই দেখা গেল থলির ওপরের ডান দিকের কোণায় সবুজ পাড় দিয়ে তারকা চিহ্ন দেওয়া। নতুন থলি এলেই মিঠুনের মা তাতে তারকা চিহ্ন দিয়ে দেন।

বিবি দড়ি-লাফানো ফেলে ছুটে এসে বলল, কই দেখি দেখি। ওমা এ যে দেখছি মিঠুনের হাতের লেখা।

বাবা বললেন, মিঠুনের কি মাথা খারাপ হয়েছে, দুনিয়ায় এতো লোক থাকতে আমাদের র‍্যাশনের থলিতে কিপ্‌টে মণি মল্লিকের নামে লিখতে যাবে!

বিবি কিন্তু পুনশ্চ মাথা নেড়ে বিশেষজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল, হাঁ, এ ঠিক মিঠুনের হাতের লেখা। আমি 'মণি'র 'ি' লেখা দেখেই চিনেছি।

বিবির কথায় মিঠুনের বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছিল, কিন্তু সে কিছুতেই মুখের ওপর সে ভাব ফুটতে দিচ্ছিল না।

বাবা বললেন, হ্যাঁ রে মিঠুন, তুই লিখেছিস?

মিঠুন যেন আকাশ থেকে পড়ল—আমি? আমি কোন্ দুঃখে ঐ কিপ্‌টে বুড়োর নাম লিখতে যাবো?

বাবা এবার সামান্য কঠিন হয়ে বললেন, দুঃখে-টুঃখে জানি না, লিখেছিস কি না বল?

মিঠুন বলল, আমার হাতের লেখা কি অতো ভালো নাকি? এই দেখ না আমার হাতের লেখা।

মিঠুন সাদা কাগজে 'মণিবাবু', 'মণিবাবু' কয়েকবার লিখে দেখলো।

বিবি বলল, ও ইচ্ছে করে খারাপ করে লিখেছে।

বাবা হেসে বললেন, কতো আর খারাপ করে লিখবে? দেখি তো মিলিয়ে।

র‍্যাশনের থলি ও কাগজের ওপর লেখা পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে দেখা হ'ল।

বিবির অনুমানটা সত্যি। 'ি' লেখার মধ্যে প্রচণ্ড রকমের মিল। তাছাড়া 'ণ' ও একই রকমের। তফাতের মধ্যে—থলির ওপর ধরে ধরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'মণিবাবু'।

বাবা এবার সত্যিই কঠিন হয়ে বললেন, (কঠিন হলে তিনি মিঠুনকে তুমি বলে সম্বোধন করেন)—মিঠুন সত্যি কথা বলো, লিখেছ ?

মিঠুন অতি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করল—লিখেছি ?

বাবা হেঁকে বললেন, কেন লিখেছ ? কারণটা কি ?

মিঠুন অস্ফুটস্বরে বলল, এমনি।

এমনি লিখেছ এটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে। কী সেই রহস্য ? কিন্তু মিঠুন কিছুতেই ভাঙতে চায় না সেই রহস্য। মিঠুনের কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ! বলবে না কেন লিখেছে। কিছুতেই বলবে না।

বাবা রেগে-মেগে তার গালে এক চড় কষিয়ে বলে গেলেন—তাহলে থাকো এখানে কান ধরে দাঁড়িয়ে।

মিঠুনেরও তেমনি জেদ, কান দুটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল, তবু ভাঙল না ভেতরের কথাটা। সকলেই অবাক হ'ল মিঠুনের এই জেদ দেখে, ব্যাপারটা আরও রহস্যময় হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে ছোটকা বাইরে থেকে এলো। ছোটকা মিঠুনকে ঐ অপরূপ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান দেখে বললে, মিঠুনের এই কঠিন শাস্তির হেতুটা কি ?

বিবি বলল, জানো ছোটকা, মিঠুন আমাদের র‍্যাশন ব্যাগে 'মণিবাবু'র নাম লিখেছে। কিন্তু কেন লিখেছে কিছুতেই তা বলতে চাইছে না। বাবা এতো করে বলছে, তবুও।

ছোটকা বলল, মিঠুনকে বলতে হবে না, আমি জানি ও কেন আমাদের থলিতে মণিবাবুর নাম লিখেছে।

ছোটকা যেন গোয়েন্দা-কাহিনীর নায়ক ডিটেকটিভ—শেষ দৃশ্যে রহস্য উদ্ঘাটন করছে। সকলেই তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল।

মা বললেন, কী হয়েছে বলতো ঠাকুরপো।

ছোটকা বলল, বলছি। কিন্তু তার আগে বিবি, তুমি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি কি মিঠুনকে এই ক'দিনের মধ্যে বড় বড় বোমবাই আম খেতে দেখেছ ?

বিবি কিছু বলবার আগেই তিতির বলে উঠল, হাঁ গো ছোটকা। আমাকেও দিয়েছে, ইয়া বড় বড় আম, আর কী চনচনে মিষ্টি !

ছোটকা শুধু বলল, ব্যাস, আর কিছু দেখতে হবে না। রহস্য ভেদ।

ডিটেকটিভ বইয়ের মতই এবার সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল—কী ব্যাপার ? কী ব্যাপার ! আমরা কিছু বুঝতে পারলুম না।

'মিঠুনের এই কঠিন শাস্তির হেতুটা কি ?'—পৃঃ ১৮২

ছোটকা বিজয়ীর হাসি হেসে বলল, বুঝিয়ে বলছি। কিন্তু তার আগে মিঠুনের শাস্তি মকুব করে দেওয়া হোক। ও মণিবাবুকে যেভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে জব্দ করেছে এটা তার পুরস্কার।

মিঠুনের শাস্তি মকুর করে দেওয়া হ'ল। ও এসে ওর পড়ার টেবিলে বসল আবার।

ছোটকা বলল,- মিঠুন আমগুলো কি আছে, না সব শেষ ?

মিঠুন যেন এখনো ধরা পড়েনি এমনি ভাব করে বলল, —কোন্ আমগুলো ?

ছোটকা এবার হেঁকে উঠলেন—কোন্ আমগুলো আবার ! মণিবাবুর মাহিনগরের বাগানের বোমবাই আমগুলো।

মিঠুন নিচু গলায় বলল, কিছু আছে।

ছোটকা যেন ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ছোটকা কি হাত গুণতে জানে ? বিবির খুব ভালো লাগছিল। যেন সত্যি সত্যি ডিটেকটিভ বই পড়ছে সে।

ছোটকা—সেগুলো কোথায় আছে ? সন্দীপ না শ্যামলের কাছে ?

মিঠুন—শ্যামলের কাছে।

ছোটকা—যাও সেগুলো মণিবাবুকে ফেরত দিয়ে এসো। আর মণিবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে এসো।

মিঠুন সুড়সুড় করে উঠে চলে গেল ছোটকার আদেশ পালন করতে।

মা ও বাবা দু'জনেই বলে উঠলেন, ব্যাপার কী ?

ছোটকা এবার সত্যিই ডিটেকটিভের পোজ-এ বলল, ব্যাপার খুব সোজা। এইম দোকানের মোড় থেকে আসছি। সেখানে মণিবাবুর সঙ্গে দেখা।

মা ও বাবা বললেন—তারপর ?

তারপর আর কি। মণিকাকা আমায় ডেকে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। অ বললুম, আবার কী সর্বনাশ হ'ল কাকা! মণিকাকা বললেন, তিনজন ছোকরা আম মাহিনগরের বাগানের মালিকে ঠকিয়ে বোমবাই আমগুলো সব নিয়ে গেছে। আমি বলল এ আর নতুন কথা কি! তাতে উনি বললেন, না না, ঠকানোর কায়দাটা দেখ। আমি হ গিয়ে নিঃসন্তান মানুষ। আমার মালীকে গিয়ে বলে কিনা, আমরা মণিবাবুর নাতি, দ পাঠিয়ে দিলেন আম নিয়ে যেতে হবে। বাড়িতে জামাই এসেছে। শোনো কথা, আ হলুম গিয়ে নিঃসন্তান মানুষ, আমার আবার জামাই, আমার আবার নাতি। কী শয়তা বুদ্ধি রে বাবা!

আমি বললুম, তা আপনার মালী তো আচ্ছা বোকা। তাই শুনে অতোগুলো অ দিয়ে দিলে? মণিকাকা বলে উঠলেন—দেবে না মানে? সঙ্গে করে আবার র‍্যাশনের থ নিয়ে গেছে তাতে লেখা—'মণিবাবু'। বোঝো ব্যাপারটা! সবাই হেসে উঠল।

ছোটকা বলল, আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। হাসি চেপে চলে এলুম। এখন এখা এসে সমস্ত ব্যাপারটা ক্লীয়ার হয়ে গেল। সেই তিন কীর্তিমানের একজন হলেন আমা মিঠুন। আর দু'জন নিশ্চয়ই মিঠুনের প্রাণের বন্ধু শ্যামল এবং সন্দীপ।

এই সময় মিঠুন মণিবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এলো।

ছোটকা বলল, কী রে মণিকাকা কি বললে, রাগ করেনি তো ?

মিঠুন বলল, কিপ্‌টে বুড়ো আবার রাগ করবে। আম পেয়ে নাচতে লাগল।

বাবা বললেন, শুধু শুধু বুড়োমানুষকে ঠকাতে গেলি কেন রে মিঠুন ?

মিঠুন এবার রেগে বলল, শুধু শুধু? ঐ কিপ্‌টে বুড়ো বাগানের গাছে আম পাড় গেলে আমাদের তাড়া করেছিল কেন? তাই একটু এ্যাডফেঞ্চার করলুম। কায়দা ক বুড়োকে কেমন ঠকিয়েছি!

গুণের কদর

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

কোকিলে ডাকিয়া কাক বলে রূঢ়-ভাসে
'তোর কোন রূপ দেখি লোকে ভালবাসে ?'
কোকিল হাসিয়া বলে, 'রূপে নয় ভাই,
আমার কণ্ঠের গুণে বিমুগ্ধ সবাই।'

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ সমুদ্র-সৈকতে ল্যাম্পো ॥

সেবার ল্যাম্পোকে নিয়ে আমি প্রথমবার সমুদ্রের ধারে গেলাম। সুদৃশ্য টির্‌হেনিয়ান গালফের পটভূমিকায় সেটা একটি বিস্তৃত বেলাভূমি। যদিও ল্যাম্পো সব কিছুই বেশ একটি কৌতূহল ও আশ্চর্য হবার ভঙ্গীতে দেখছিল, তবুও ওর ভাবভঙ্গী দেখে আমি চট্ করেই বুঝে ফেল্লাম যে, সমুদ্র-সৈকত ওর কাছে নতুন কিছু জিনিস নয়। যদিও ও বেশ ফুর্তিতেই ছিল, তবুও মনে হচ্ছিল বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ও বোধ হয় কিছু ভাবছিল। নোনা হাওয়াটা ও বেশ জোরে জোরে শুঁকছিল, আর যখন সফেন তরঙ্গমালা তীরের ওপরে আছাড় খেয়ে পড়ে ওর পায়ের থাবা ভিজিয়ে দিচ্ছিল, ল্যাম্পো তখন ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং পরমুহূর্তেই আবার ফিরে আসছিল ঐ বিশ্রী ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি হয় কিনা দেখতে।

যাই হোক ও যে খুবই আনন্দ উপভোগ কচ্ছিল, তা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। ও কখনও ছুটে চলে যাচ্ছিল চারদিকে বালুর মেঘ উড়িয়ে, আবার কখনও বালুর ওপরে গলাগড়ি খাচ্ছিল ; তারপরেই লাফিয়ে উঠে এঁকেবেঁকে জিগ্‌জ্যাগের ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছিল একেবারে জলের প্রান্তে, আবার সেখান থেকে ছুটে চলে আসছিল। আসলে ওর চালচলনটা, শুধু মজারই ছিল না, যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক মনে হচ্ছিল আমার কাছে।

মোটকথা সমুদ্রে এসে ও যে ভারী খুশী হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। এখানে ওর একমাত্র অসুবিধে হচ্ছিল এই যে, ও বড় বড় গাছ আর রাস্তার মোড় ও কোণগুলোর অভাব বোধ করছিল। কিন্তু এখানেও ও বুঝিয়ে দিল যে, কাজ গুছিয়ে নিতে ও কিরকম লায়েক। ও নিজের প্রয়োজন মত রোদে বসবার ছাতার ডাণ্ডা ও বাচ্চাদের তৈরী বালুর প্রাসাদগুলিকে ওর সদ্ব্যবহারে লাগালো। এক্ষেত্রে স্নানার্থীরা চেঁচিয়ে গালাগাল দিয়ে ওকে তাড়া করবে সেইটাই স্বাভাবিক। ফলে, দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে ও সোজা ছুটে আসত আমার কাছে শরণার্থি হয়ে, আর ওর চোখের দৃষ্টিতে থাকত আর্ত ও বিরক্তির ভাব দুই-ই। সে দৃষ্টিতে যেন না বলা ভাষায় প্রশ্ন : বলি, হয়েছে কি ? এত কিসের চেঁচামেচি থামকা ? কুকুররা তাদের প্রকৃতিগত নিয়ম পালন করতে পারবে না, এমন কোন আইন আছে নাকি ?

শেষকালে একদিন যখন আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, দেখলাম ল্যাম্পো কোনমতেই আমাকে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক নয়—খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে একটানা চেঁচাতে লাগল, কিন্তু নিজে জলে নামল না। আমি অবশ্য ওকে জলে নামাবার জন্য অনেকরকম খোশামোদ করলাম, কিন্তু সব বৃথা—আসলে ও ছিল বেজায় জেদি। অন্যান্যবারের মত এবারেও ও বুঝিয়ে দিল যে, ও এক বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কুকুর। কোন জিনিস যদি ওর পছন্দমত না হয়, বা কোন কিছু যদি ও করতে না চায়, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কেউ নেই যে ওর মত পরিবর্তন করতে পারে। শেষে আমি সোজা পন্থা অবলম্বন করলাম। লাঠির বাঁটের মত ওর লেজটা চেপে ধরে, নিজের মাথার ওপরে ওকে দু'বার বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলাম বরুণদেবের পক্ষপুটে—যেখানে জল বেশ গভীর। দিব্যি একটি সুরেলা 'ঝপাং' আওয়াজ করে আমাদের বন্ধুটি জলের তলায় আদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু সে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। তারপরই শ্রীমান্ পূর্ণ দর্শন দিল। নাক মুখ ঝাড়ল, তারপর গোটাকয়েক তীক্ষ্ম আওয়াজ করে আমার দিকে কট্‌মট্ করে তাকালো। মোটকথা, কথা বলতে জানলে ও আমাকে যা কিছু ভাষার সাহায্যে বলত, সেইটাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করল। তারপর তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে উঠে নিজেকে সম্পূর্ণ জলমুক্ত করে ঝেড়েঝুড়ে একেবারে উর্ধ্বশ্বাসে লাগালো দৌড়।

সমস্ত দিনের মধ্যে ওকে আর একবারও সমুদ্রের ধারে দেখতে পাইনি। চারদিকে ওকে খুঁজলাম, ওর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকলাম, কিন্তু কোথাও ওর টিকিটিও দেখতে পেলাম না। শেষকালে ভয় পেলাম হয়ত ও পথ হারিয়ে ফেলবে। কারণ, সমুদ্র থেকে আমাদের বাড়ী ছিল মাইল দুয়েকের ওপর। কিন্তু সন্ধ্যে বেলায় যখন আমার গাড়ীর কাছে গেলাম, দেখি আমাকে দেখে ও হৃষ্টচিত্তে লেজ নেড়ে এগিয়ে আসছে। ভাবলুম, তাহলে ও আমাকে ক্ষমা করেছে।

'এই ক্যাপাটে কুকুরটা কী আপনার ?' পার্কিং-এর ভারপ্রাপ্ত ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা

করলেন। তিনি আরও বললেন, 'এই গাড়ীর কাছে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, কারুকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না, আর ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে।'

ল্যাম্পো গাড়ীতে উঠে জানালার কাছে বসল, তরপর অস্তগামী সূর্যের রশ্মিতে উদ্ভাসিত সমুদ্রকে যেন একবার শেষ দেখা দেখে নিলো। তারপর আবার আমার দিকে ফিরে তাকালো। আমার সঙ্গে ওর দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। আমি একটু হাসলাম, মনে হ'ল সমুদ্রের সঙ্গে মুখোমুখি দ্বন্দ্বে ও যেন খুশীই হয়েছে।

॥ স্নানের মৌসুম ॥

গ্রীষ্মকালে আমি আবার একদিন সমুদ্রের ধারে গেলাম। এবার সপরিবারে। একদিন যখন চোখ বুজে শুয়ে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছি, মনে হ'ল গরম একটা কিছু আমার কাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেল। আমি লাফিয়ে উঠলাম। ঘুরে তাকিয়ে দেখি শ্রীমান্ ল্যাম্পিনো মনের আনন্দে লেজ নাড়ছে।

ও এখানে এল কেমন করে? প্রশ্নটার উত্তর চট করেই মনে এসে গেল। ল্যাম্পো তার নির্দিষ্ট ট্রেনে প্রতিদিনের মত সেদিনও ক্যাম্পিগ্‌লিয়া থেকে পিওম্বিনোতে এসেছিল। আমাদের বাড়ীতে না-দেখে এবং গ্যারাজ গাড়ী-শূন্য দেখে, সে নিজের বিবেচনায় একা-একাই সমুদ্র-সৈকতে চলে এসেছে। বোধহয় ওর সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি এবং ওর প্রথমাবারের সমুদ্র-স্নানের স্মৃতি ওকে এখানে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু ও রাস্তা খুঁজে বের করল কেমন করে সেটাই প্রশ্ন? সেটা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠলাম না। মনে হ'ল বোধ হয় সুতীব্র ঘ্রাণশক্তির সাহায্যেই ওর এখানে আসা সম্ভব হয়েছিল।

ল্যাম্পো রোদ-নিবারণী ছাতার নীচে আমাদের সঙ্গে অল্পক্ষণই বসেছিল। বোধহয় ও রোদ সহ্য করতে পারছিল না। তাছাড়া খানিকটা বৈচিত্র্যের জন্যই বেচারা নখ দিয়ে বালু খুঁড়ে গভীর গর্ত করে ভেজা বালু বের করতে লাগল। খুব মনোযোগ দিয়ে ও এই কাজে লেগেছিল। কিন্তু এর ফলে চার দিকে এমনভাবে বালু ছিটাচ্ছিল যে, আশেপাশে যারা ছিল, তারা বৃথাই রাগারাগি ও প্রতিবাদ করছিল। অগত্যা স্নানার্থীরা সকলেই ল্যাম্পোর ক্রিয়াকলাপের চৌহদ্দির বাইরে সরে পড়ল, আর ল্যাম্পো তখন পুরো বালুতটের যেদিকেই তাকাচ্ছিল, তার সবটারই একচ্ছত্র অধিপতি যেন হয়ে উঠেছিল ও নিজে।

সমুদ্র-সৈকতের জীবনযাত্রায় ও বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল। ক'দিন বাদে ওর জলের ভীতিটাকেও তাড়াতে আমি সমর্থ হলাম। একদিন আমি জলে ডুবে যাবার ভান করলাম এবং যত জোরে সম্ভব চীৎকার করতে লাগলাম। ল্যাম্পো মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাকে

হো হো করে হাসছি, তখন ও বেজায় রকম রেগে ক্ষেপে তীরে ফিরে গেল। কিন্তু আমার জন্য আমাদের ছোট্ট ল্যাম্পোর ভালবাসার প্রমাণ পেয়ে আমি ভারী খুশী হয়েছিলাম।

এরপর পুরো স্নানের মৌসুমটা প্রতিদিন ও আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে আসত, আর স্নান করতে এত ভালবাসত যে ওকে জল থেকে তোলাই হয়ে দাঁড়াত এক সমস্যা। ও রবারের নৌকা খুব পছন্দ করত এবং তার ওপরে শুয়ে থাকত, আর ঢেউ-এর দোলায় দোল খেতো। তারপর হঠাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়তো। এরপর খুব খানিকটা সাঁতার কেটে, তীরে ফিরে এসে গরম বালুর ওপরে গড়াগড়ি যেতো। শেষ পর্যন্ত একটা হাস্যকর পরিণতি হোত এবং ও ওর সঙের মত বালুর পোষাক গা থেকে ঝেড়ে ফেলতো। আশপাশের লোকদের ও যে এভাবে রাগ-বিরক্তির উদ্রেক করছে, তার জন্য ওর মাথা ব্যাথা ছিল না। তারা প্রথমে এ দৃশ্যে মজা পেতো, পরে চটে যেতো। অতএব স্নান করে, বালুর মধ্যে গর্ত খুঁড়ে, দৌড়াদৌড়ি করে, স্নানের মৌসুমটা ল্যাম্পো বেশ আনন্দে কাটিয়ে দিল। কেবল একটা জিনিস আমাকে তখনও ভাবিয়ে তুলত, সেটা হ'ল : কেন ল্যাম্পো মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে একটা উঁচু ঢিবির ওপরে উঠে, সুদূর প্রসারিত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং কী দেখবার চেষ্টা করত? তখন মুখে যেন ওর ভেসে উঠতো একটা দুশ্চিন্তার ভাব! যেন মনে হোত—

'নয়ন কিসের প্রতীক্ষারত, বিদায় বিষাদে উদাস মতো!' (ক্রমশঃ)

সেই ছেলেটা

শ্রীমণীন্দ্র রায়

সেই ছেলেটার সঙ্গে আমার
বারেবারেই হয় দেখা।
কেউ কাছে নেই এমন দিনেও
একলা সময় নয় একা।

ছোখের সামনে পিচ-ঢালা পথ,
চুন-সুরকির শাদা পাহাড়,
মনে কিন্তু সেই ছেলেটার
সাতটি রঙের পাতাবাহার।

কিংবা কাজে পিষ্ট যখন
ক্লান্তিতে প্রায় হারমানি,
সেই ছেলেটা অমনি এসে
পাঠায় দূরের হাতছানি।

কালের বেড়া ডিঙোই তখন
কিশোর সাধে মন ভোলে।
সেই ছেলে কি স্বপ্ন আমার?
মৌচাকে পথ সেই খোলে!

স্ট্রেপ্টোমাইসিন

শ্রীসুনীল সরকার

এমন একদিন ছিলো যখন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত রোগী তীলে তীলে মৃত্যুকে বরণ করে নিতো। কেন না, তখন এ রোগের কোন ওষুধই আবিষ্কার হয়নি। তবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকেই এ রোগের উপযুক্ত প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা করে আসছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই মাত্র কয়েক বছর আগে যক্ষ্মা রোগের অদ্ভুত একটি প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কারের ইতিহাসটা এই রকম:

ফিলাডেলফিয়ার কৃষি কলেজে পড়তেন জেকব ওয়াক্সম্যান। এখানে পড়ার সময় তাঁর মনে একটি প্রশ্ন জাগে: তিনি ভাবতে থাকেন, মৃত মানুষকে যখম মাটির নীচে কবর দেওয়া হয়—তখন দেহের জীবাণুগুলোও নিশ্চয়ই মাটির নীচে চাপা পড়ে? কারণ সেগুলো তো আর মাটি ভেদ ক'রে উপরে উঠে আসতে পারে না। তবে জীবাণুগুলো যায় কোথায়? কাজেই তাঁর ধারনা হলো, মাটিতে নিশ্চয়ই এমন কোন জীবাণু আছে—যা ঐ জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করতে পারে!

প্রশ্ন অবান্তর নয়। কাজেই তিনি আর সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। সুরু করলেন গবেষণা। কেবল কবরখানার মাটি নিয়ে। তিনি অকৃতকার্য হলেন না। গবেষণার ফলস্বরূপ মাটি থেকে আবিষ্কার করলেন এক ধরণের জীবাণু। যার নাম দিলেন তিনি—স্ট্রেপ্টোমাইসিন গ্রিসিয়াস'। সেটা ১৯১৫ সালের কথা।

এই আবিষ্কারের পরই ওয়াক্সম্যান রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাণুতত্ত্বের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু তিনি মাটির জীবাণুদের কথা ভুলতে পারলেন না। তাইতো নানা রকম মাটি যোগাড় করে তিনি তা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। সঙ্গে সহকারীরূপে নিলেন ফরাসী যুবক রেণী জুলে দোবো'কে।

দু'জনে মাটি নিয়ে গবেষণা করে, মাটির জীবাণু নিঃসৃত রস থেকে একটি ঔষধ আবিষ্কার করলেন—যার নাম রাখলেন 'গ্রামিসাইডিন'। এই ঔষধটির বহু রোগ জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হলো না। কারণ এতে কোন বিপদজনক ফল হতে পারে!

তিনি পুনরায় গবেষণা করতে লাগলেন। একদিন তিনি একটি মুরগীর অন্ত্রের ভিতরে 'স্ট্রেপ্টোমাইসিন গ্রিসিয়াস' জীবাণুর সন্ধান পেলেন। এবং বহু গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই জীবাণু-নিঃসৃত রস থেকেই তিনি আবিষ্কার করলেন যক্ষ্মার মহৌষধ—'স্ট্রেপ্টোমাইসিন' যা চিকিৎসা জগতে নিয়ে এলো যুগান্তর।

এরপরই চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও দেশ-বিদেশের মানুষেরা ডঃ ওয়াক্সম্যানকে জানালো অভিনন্দন ও তিনি পেলেন নোবেল পুরস্কার। সেটা ১৯৪৪ সালের কথা।

গতির কথা

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

বাসে ঝুলতে ঝুলতে চলেছি কোন দিকে তাকাবার জোটি নেই, হঠাৎ 'গেল গেল' শব্দে চমকে উঠলাম। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সবার সঙ্গে আমিও ব্যাপারটা কি দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। খুব বেঁচে গিয়েছে ছেলেটা, ডবল-ডেকারের চাকাটা যে ওর ওপর দিয়ে মাড়িয়ে যায়নি, এটা ছেলেটার খুবই সৌভাগ্য বলতে হবে। তবে চলন্ত বাস থেকে নামতে গিয়ে বেচারীর মুখটা কেটেকুটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তোমরা অবিশ্যি সকলেই জান চলন্ত বাস থেকে নামতে গেলে বাঁ পা বাড়িয়ে কিছুটা পেছনে শরীরটা হেলিয়ে বাস থেকে না নামলে, নির্ঘাত পথের বুকে আছড়ে পড়তে হবে। এর কারণ কি তাও তোমরা মোটামুটি জান। পার্থিব সব বস্তুই হয় থেমে থাকবে, নয় চলতে চায়। বস্তুর এই থেমে থাকা বা চলন্ত অবস্থায় থাকার স্বাভাবিক যে প্রকৃতি (যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় Inertia অর্থাৎ স্থিতিজাড্য বা গতিজাড্য বলে) তা পালটাতে হলে বাইরে থেকে একটা শক্তি প্রয়োগ দরকার হয়। ধর একটা বল তুমি মেঝেয় গড়িয়ে দিলে, তা কিছুতেই থামবে না যতক্ষণ না মেঝের সঙ্গে সংঘর্ষে বা বাতাসের চাপে থামতে বাধ্য হয়। কিংবা আর একটা মজার উদাহরণ দিই। এক জল-ভর্তি গ্লাসের ওপরে একটা পিচবোর্ড ও পিচবোর্ডটার ওপরে একটা মুদ্রা রাখ। টুসকি মেরে পিচবোর্ডটা ঠেলে দাও। বলতে পার কেন পিচবোর্ডটা গ্লাসের মুখ থেকে সরে যাবার সঙ্গে মুদ্রাটাও বেরিয়ে না গিয়ে জলভর্তি গ্লাসে টুপ করে পড়ে যায়। এর কারণ মুদ্রাটা যে জায়গায় ছিল সে জায়গায় থাকতে চায়, কিন্তু পিচবোর্ডটা ঠেলে দেবার সময় বোর্ডটার সঙ্গে মুদ্রাটার এমন ফ্রিকশন বা সংঘর্ষ হয় না, যাতে করে মুদ্রাটায় সংঘর্ষ-জনিত শক্তি দিয়ে বোর্ডটার সমান গতি সঞ্চার করা যায়। অতএব মুদ্রাটা জলে না পড়ে উপায় কি? বিপরীত ভাবে চলন্ত ঘোড়া হঠাৎ থেমে গেলে ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার মাথা ডিঙিয়ে যেমন ডিগবাজী খায়, তেমনি চলন্ত গাড়ী হঠাৎ ব্রেক কষলে আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি সামনের দিকে। চলন্ত গাড়ী থেকে নামবার সময় আমাদের পায়ের গতি থেমে যায় মাটির সংস্পর্শে, কিন্তু ওপরের শরীরে তখন গাড়ীর মত এগিয়ে চলার গতি। তাই সেটুকু না জেনে নামতে গেলেই বিপদ। চলন্ত গাড়ী থেকে নেমেই ছুটলে তবেই পড়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।

এখন নিশ্চয় তোমরা প্রশ্ন করবে, গতি জিনিসটা বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে বাড়া-কমার কারণ কি? কোন উঁচু গম্বুজ থেকে একটা পাথর আর একটা কাগজ যে এক সময় মাটিতে এসে পৌছোয় এ তোমাদের অনেকের জানা। অ্যারিস্টটল ছিলেন একজন গ্রীক পণ্ডিত, তাঁর মত ছিল যে

বস্তু যত ভারী হবে মধ্যাকর্ষণের জন্য সে ততো তাড়াতাড়ি উঁচু থেকে মাটিতে পড়বে। কিন্তু গ্যালিলিও প্রথম দেখালেন যে, ব্যাপারটা মোটেই ঠিক নয়। অবশ্য এটা ঠিক, এই গতি নির্ভর করে বস্তুটির ওজনের ওপর নয়, আয়তনের ওপর। পালক বা বরফের গুঁড়ো হালকা বলে নয়, বিশেষ আকারের জন্যেই বাতাসের বাধা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে নেমে আসা শক্ত বলেই তারা মাটিতে দেরীতে নামে। অথচ বাতাস-শূন্য কোন আধারে একটা পালক ও একটা ভারী মুদ্রা একসঙ্গেই ওপর থেকে নীচে নামবে।

প্যারাস্যুট করে মাটিতে নিরাপদে অবতরণ করা যায়, কারণ যে তার আয়তন এটা আর তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। বাতাসের বাধা গতির পথে একটা বিশেষ বাধা, এই মোটর গাড়ীই বল, প্লেনই বল, গতি তোলার ব্যাপারে বাতাসের বাধা কমাবার জন্য তাদের চেহারায় নজর দেওয়া হয়। তবে ওপর থেকে নীচে নামার গতি কিন্তু একরকম নয়। গম্বুজের মাথা থেকে একটি বস্তু ছেড়ে দিলে সেকেণ্ডে যদি ত্রিশ ফুট তার গতিবেগ হয়, কিছু পরে-পরেই ক্রমশঃ বস্তুটির পতন-বেগ যায় বেড়ে।

নিউটনের বহুখ্যাত এই কথাটি তোমাদের শোনা : Every action has its equal and opposite reaction. এই গতির ব্যাপারটার ক্ষেত্রেই তাই। যদি একটা চেয়ার থেকে সামনে ঝাঁপ দাও তুমি, দেখবে চেয়ারটা পেছন দিকে ছিটকে পড়বে। বন্দুক থেকে যখন বুলেট বেরিয়ে আসে, তখন বুলেটের সেই গতিবেগ বিপরীত দিকে বন্দুকধারীর কাঁধে জোর ধাক্কা দেয়। তাই যখন আমরা বলি কোন কিছু চলছে সামনের দিকে, তার অর্থ সে তার চলাটা সম্ভব কচ্ছে পেছন দিকে কিছু ঠেলে দিয়ে। তাই আমরা যখন সাঁতার কাটি তখন হাত-পা নেড়ে আমরা জলটা পেছনের দিকে ঠেলে দিই বলেই সাঁতার কাটা যায়। মসৃণ মেঝেতে দৌড়োন যায় না, তার কারণ ছোটবার সময় আমাদের পা দুটো মসৃণ মেঝেতে কোন friction বা সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা পা দুটো মেঝেতে ঠুকে বিপরীত গতিবেগ তৈরী করতে পারি বলেই আমাদের শরীর সামনের দিকে এগিয়ে যায়। দড়ি ধরে ওঠবার সময় এ ব্যাপারটা তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে। মোটামুটি এই হ'ল গতির কথা।

এই পৃথিবী গতির যুগ। অনবরত চলা আর চলা ; কিন্তু চলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লে তো চলবে না, তাই বুঝে-সুজে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। তাহলেই আমাদের চলা বা অগ্রগমন কেউ আটকাতে পারবে না।

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর

শ্রীমিনতি গঙ্গোপাধ্যায়

খাদ্য হিসাবে দুধের তুলনা নেই। এর এতো গুণ যে, ছোটবড় সকলেই দুধ খেয়ে সবল হয়। কিন্তু সকলের পক্ষে নানা কারণে দুধ খাওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে। তাই যখন দেখি, একটি সেবা প্রতিষ্ঠান কলকাতা শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছেলেমেয়েদের প্রত্যহ দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছে তখন আশ্চর্য হই। এমন সুখবর সচরাচর আমরা পাই কি?

প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ খুললে মনটা খারাপ হয়ে যায়। প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় হিংসা আর মারামারির খবর। এই কি আমাদের প্রকৃত রূপ? আমরা কি পরস্পরকে ভালবাসতে ভুলে গেছি? সেবার ব্রত কি উঠে যেতে বসেছে? কিন্তু তেমন হতাশ হবার কারণ নেই। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, মাদার টেরেসার প্রতিষ্ঠান এবং আরও অনেকে এমনভাবে দুঃস্থ, পীড়িত ও আর্ত নর-নারীর সেবা ক'রে যাচ্ছে যা বিশেষভাবে অনুকরণের যোগ্য। এদের কাজের প্রচার নেই। তাই অনেকের হয়ত নজর এড়িয়ে যায়।

এই রকম আর একটি সংস্থা হ'ল Co-operative for American Relief Every-where, সংক্ষেপে যাকে বলা হয় 'CARE' (কেয়ার)। এই সংস্থাটি গ'ড়ে উঠেছে আমেরিকার ২৬টি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়। 'কেয়ার' দল-নিরপেক্ষ সেবা প্রতিষ্ঠান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে এর প্রধান দপ্তর।

কলকাতার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির লক্ষাধিক ছেলেমেয়েদের দুধ যোগানোর জন্যে 'কেয়ার' প্রস্তুত। অবশ্য, এখন অতো ছেলেমেয়ে দুধ পায় না। বেলগাছিয়ায় রাজ্য সরকারের যে দুগ্ধশালা আছে, সেইখান থেকে দুধ তৈরী হ'য়ে সাতটি দুধের গাড়ি ক'রে তা স্কুলে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই দুধের গাড়ীগুলিও 'কেয়ার' রাজ্য সরকারকে দিয়েছে। গুঁড়ো দুধ, গম, ময়দা ও উদ্ভিজ্জ তেল 'কেয়ার' সরবরাহ ক'রে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের সহযোগে এই কাজ চলছে।

'কেয়ার'-এর কাজ আমাদের দেশে সুরু হয় ১৯৫০ সালে। বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার দেওয়া এর একটি প্রধান কাজ। প্রায় আট বছর আগে মাদ্রাজে এই সেবাব্রতের সূত্রপাত হয়। ক্রমে ক্রমে ভারতের পনেরোটি রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে এখন ছেলেমেয়েদের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে নিয়মিত কিছু পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য পায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই 'কেয়ার' খাবারের ব্যবস্থা করেছে।

মেদিনীপুর নির্মল হৃদয় আশ্রমকে এই যন্ত্রগুলি 'কেয়ার' উপহার দেয়।

'কেয়ার' বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে। প্রায় দশ লক্ষ নর-নারীর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয় 'কেয়ার'কে। জরুরী অবস্থার জন্যে দুঃস্থ পরিবার ও স্কুলের ছেলেমেয়েদের রান্না-করা খাবারও সরবরাহ করা হয়।

পশ্চিম বাংলার নয়টি জেলায় কাজের বদলে 'কেয়ার' গম দিয়েছে। এই পরিকল্পনা প্রথম পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছিল মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায়।

কলকাতার কাছে গঙ্গারামপুরে বরেজ টাউনে 'কেয়ার' জলের পাম্প, ট্রাক্টর ও কিছু বীজ

দার্জিলিঙের তিব্বতী উদ্বাস্তু কৃষি সমবায় সমিতি 'কেয়ার'-এর কাছ থেকে কৃষি কাজের জন্যে চার একর জমি পেয়েছে।

কৃষি উন্নয়নে সাহায্য করা 'কেয়ার'-এর অন্যতম কাজ। এই কর্মসূচী অনুসারে 'কেয়ার' সম্প্রতি মেদিনীপুরে নির্মল হৃদয় আশ্রমকে একটি যান্ত্রিক লাঙ্গল দিয়েছে। এর দাম হবে প্রায় সাড়ে বারো হাজার টাকা। নির্মল হৃদয় আশ্রমের তত্ত্বাবধানে উপজাতীয় ছাত্রদের একটি মাধ্যমিক স্কুল চলে। এই স্কুলে একটি কৃষি বিভাগ আছে। এই বিভাগের ছাত্রদের সাধারণ কৃষি বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রেরা উন্নত পদ্ধতিতে শস্য উৎপাদন, উন্নততর বীজ ও সারের ব্যবহার এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন শেখে।

পৃথিবীর উনচল্লিশটি দেশে 'কেয়ার'-এর সেবাব্রত চলেছে নিরলসভাবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

'কেয়ার'-এর সেবাব্রত এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সার্থক-নামা 'কেয়ার'।

নদীর তীরে

শ্রীবেলা চক্রবর্তী

কাজল কালো মেঘ জমেছে
দূর আকাশের ঈশান কোণে,
দখিন হাওয়া যায় বয়ে ঐ
তাল-তামাল-হিজল বনে।
গ্রামের বধূ জল নিয়ে যায়
ঘাটের থেকে কলস ভরে
দমকা হাওয়ায় ঘোমটা ওড়ে
ছোট্ট বধূ লাজে মরে।
গাছের তলে রাখাল ছেলে
বাজায় বাঁশী আপন মনে,
প্রাণ-মাতানো সে সুর শুনে
নাচে নদী ক্ষণে ক্ষণে।
নীড়ের পানে উড়ে চলে
দূর গগনে পাখীর দল

সন্ধানী

মাল-সরবরাহের নতুন আধার

আজকাল নানা গড়নের আধারে মাল-চালানীর ব্যবস্থা ক্রমেই বাড়ছে। আলগা মাল না পাঠিয়ে এসব আধারে ভর্তি কোরে মাল-চালানীর সুবিধা অনেক। এতে মাল ভাঙ্গে না, হারায় না, ভর্তি ও খালাস করার সুবিধাও যথেষ্ট। এই আধারগুলিকে বলে কন্‌টেনার। কিছুদিন থেকেই জাহাজে মাল-চালানীতে কন্‌টেনার সার্ভিস চালু হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে রেলে ও বিমানেও এই ব্যবস্থা প্রবর্তন হবে। সম্প্রতি হামবুর্গে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাইউড ও প্লাস্টিকের নানারকম কন্‌টেনার দেখানো হয়েছে।

তেলের কবলে দশ হাজার পাখী

সমুদ্রের জলে তেল পাখীদের পক্ষে যে কি বিপজ্জনক ইদানীং তার এক প্রমাণ পাওয়া গেছে। কোন এক জাহাজের অবিবেচক এক কাপ্‌তেন সাহেব উত্তর সাগরে জাহাজের তেল উজাড় কোরে দেবার ফলে, সেই তেল সমুদ্রের জলে তিরিশ কিলোমিটার ছড়িয়ে যায়। ফলে, দশ হাজার সামুদ্রিক পাখীর গায়ে সেই তেল লেগে তারা অক্ষম অবস্থায় ভেসে বেড়াচ্ছে। পুলিস, স্বেচ্ছাসেবক ও পক্ষী-প্রেমিকরা এই বিরাট পক্ষীকুলকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। এছাড়া এই বেআইনী কাজ করার জন্য সেই অজানা জাহাজের খোঁজ হচ্ছে।

একটি দুর্লভ নৌকো

নৌ-চালনায় নিউজিল্যাণ্ডের মাউরিদের এককালে খুব খ্যাতি ছিল। এরা মৃতদেহকে কফিনে পুরে নৌকোয় চাপিয়ে ভাসিয়ে দিত। সম্প্রতি এক ভদ্রলোক কোলনের প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে পাকাপাকি রাখার জন্য কোন এক মাউরি রাজার কফিন সমেত এক নৌকো দান করেছেন। এধরণের নৌকো নাকি জগতে আর নেই। নিউজিল্যাণ্ডের একরকম ঝাউগাছের কাঠ পাথরের অস্ত্র দিয়ে কুঁদে এই নৌকো তৈরি করা হয়েছিল। চিত্র-বিচিত্র সাড়ে সাত ফুট লম্বা এ নৌকোটি আগাগোড়া লাল রঙ করা। ১৭৯০ সালে ইংরেজ নাবিকরা এইটি নিউজিল্যাণ্ড থেকে ইংলণ্ডে নিয়ে আসে। এর শেষ মালিক ছিলেন লণ্ডনের এক শিল্প ব্যবসায়ী। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা নৌকোটি বেচে দেয়। নৌকাটির দাম প্রায় দু'লাখ টাকা।

খড়িমাটির কথা

শ্রীঅর্ণবজ্যোতি দেব

যে খড়িমাটি বা চক দিয়ে স্কুলে মাষ্টারমশাই তোমাদের ব্ল্যাক-বোর্ডে অঙ্ক শেখান বা অন্যান্য বিষয় বোঝান, সেই খড়িমাটি কি করে তৈরী হয়—তা কি তোমরা জান? শোন, আজ তোমাদের কাছে এই খড়িমাটি বা চকের কথা বলছি।

এই খড়িমাটি এক-কোষ প্রাণীদের গায়ের খোলস দিয়ে তৈরী হয়।

খড়িমাটির পোকা আকারে এত ছোট যে, আমরা খালি চোখে কখনই তা দেখতে পাব না। এই পোকারা যদি হাজার হাজার একসঙ্গে এক জায়গায় জড়ো হয়, তাহলে এই অসংখ্য পোকারা এক ইঞ্চি জায়গাও জুড়তে পারে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এইসব পোকাদের আমরা কেবল দেখতে পারি।

এদের সন্ধান পুকুরের জল, খাল বিল বা নদীর জলে পাওয়া যাবে না। যে সমুদ্রের জলে চুন মেশান থাকে,—সেখানেই এই সব পোকারা বাস করে। কারণ সমুদ্রের জলের চুন টেনে এরা গায়ের খোলস প্রস্তুত করে। একটি পোকা প্রথমেই সমুদ্রের জল থেকে চুন টেনে খোলস তৈরী করে—সেই পোকাটি যখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে যায়, তখন সেই ক্ষুদ্র প্রাণীটি নিজের শরীর ভেঙে দুটি প্রাণীতে পরিণত হয়। এ অবস্থায় একটি খোলসে দুটি প্রাণী আর একসঙ্গে থাকতে পারে না। তখন খোলসের উপরকার একটি ছোট ছিদ্র দিয়ে নূতন পোকাটি বের হয়ে যায়, পরে ওই পোকাটি নিজের জন্য নূতন আর একটি খোলস তৈরী করে। এভাবে হাজার হাজার পোকার সৃষ্টি হয় সমুদ্রের জলে।

এই সব প্রাণীরা সমুদ্রের তলায় কাদার মধ্যে কিংবা শ্যাওলার মধ্যে জন্মে, তবে কিছুদিন পরে তারা মরে যায়; আর হাজার হাজার বৎসর ধরে এই সব পোকারা সমুদ্রের তলে জমা হয়ে থাকে—এভাবে পাহাড়ের সৃষ্টি হয়।

তোমরা চুনের পাথর হয়ত দেখেছ। এই পাথর এই সব পাহাড়েই পাওয়া যায়।

তাহলে তোমরা বুঝতে পারছ, যে খড়িমাটি বা চক দিয়ে ব্ল্যাক-বোর্ডে লেখা হয়, তা ওই সব এক-কোষ প্রাণীদের খোলসের দ্বারা প্রধানতঃ তৈরী হয়। পরে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই খড়িমাটি পোকার খোলস ব্যবহারের উপযোগী করা হয়।

সেনেগালে জার্মান যুব-গ্রাম

কিছুদিন আগে জার্মান গ্রন্থ প্রকাশকদের শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করতে এসে সেনেগালের রাষ্ট্রপতি লিওপোল্ড সেডার সেংহর পশ্চিম জার্মানীর কালটেন্সটাইন ক্যাসেলে জার্মান যুব গ্রাম পরিদর্শন করতে এসে স্বদেশে অনুরূপ একটি সংস্থা গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে সংস্থার তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তাঁর দেশে একটি যুব-গ্রাম খুলতে ক্রীশ্চান যুব-গ্রাম সংস্থা সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। এই সংস্থা উন্নতিকামী দেশগুলির যুবকদের জমির তত্ত্বাবধান, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকে। বর্তমানে এই সংস্থা পৃথিবীর ১২৫টি দেশে প্রায় ২২,০০০ যুবকদের নানা কলাকৌশল শিক্ষার তালিম দিচ্ছে।

অদ্ভুত ঘটনা

অদ্ভুত অদ্ভুত—ঘটনা কি অদ্ভুত,
কেওড়াতলায় ডিমের থেকে—
জন্মেছে এক গেছো-ভূত !
পালকে তার ভরা গা,
নেইকো হাত, নেইকো পা ;
পাখীর মত পেছনটা—
নাচে সদা তা-ধিন্‌তা !
কভু হাসে কভু কাঁদে
ভাব তার ধরা দায়,
কভু হাঁচে কভু কাশে
যা পায় তাই খায় !
নাম তার লেন-ভিঙ্‌,
শিরে আছে দুটো সিঙ।

শ্রীউত্তমকুমার বটব্যাল

বেড়িয়ে এলাম

এবার ঠিক হ'ল যে আমরা গরমের ছুটিতে বেনারস, এলাহাবাদ ও সিংরৌলি কোলিয়ারীতে বেড়াতে যাব। বাবা দশদিন আগে ট্রেনে রিজার্ভেসন করে রাখলেন। ২০শে মে তারিখে আমরা রওনা হলাম।

পরদিন পাঞ্জাব মেলে চড়ে এলাম বেনারসে। বেনারসে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। সেই দিনই আমরা ট্যাক্সি করে সারনাথে গেলাম বেড়াতে। সেখানে আমরা বৌদ্ধ যুগের স্তূপ, বুদ্ধ-মন্দির, যাদুঘর ও মৃগ-উদ্যান দেখলাম। সেখানকার মাটির নীচে বৌদ্ধ যুগের মঠ আবিষ্কৃত হয়েছে। বহু যুগ আগেকার ঘর-বাড়ি, পাথরের মূর্তি ইত্যাদি দেখে মন বিস্ময়ে ভরে গেল।

কাশীতে আমরা গঙ্গায় স্নান করে শুদ্ধ হয়ে বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজা দিলাম। পরদিন আমরা সেখান থেকে এলাহাবাদ রওনা হলাম।

এলাহাবাদে সবচেয়ে ভাল লেগেছে আমার সংগম। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর সংগম। এই সংগমস্থলে তখন জল কম ছিল। সেখানে একটি মাচা বাঁধা ছিল। সেখানে সকলে নৌকা বাঁধে ও তার ওপর থেকে নেমে সংগমের পবিত্র জলে স্নান করে, আমরাও স্নান করলাম। পরের দিন আবার সেখান থেকে রওনা হলাম মধ্যপ্রদেশের সিংরৌলি কলিয়ারীর দিকে।

এখানে যেদিন আমরা এলাম, সেই দিনই রিহান্দ বাঁধ ও বিদ্যুৎ তৈরির কারখানা দেখতে গেলাম। পরদিন দেখলাম এখানকার কয়লার খনি। খনিতে বিরাট একটা যন্ত্র, তার আগায় বিরাট বিরাট দাঁত লাগান আছে। সেই দাঁতগুলো দিয়ে যন্ত্রটা খনি থেকে কয়লা কাটছিল। যন্ত্রটার নাম 'শোভেল'। আর কয়লা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যে গাড়ীগুলো তাদের নাম হ'ল 'ডাম্পার'। শুনলাম এই ডাম্পারগুলো নাকি রাশিয়ায় তৈরি। খনি অঞ্চলে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ডুলিতে করে কয়লা যাচ্ছিল ইস্পাতের দড়ির পথে। তাকে 'রোপওয়ে' বলে। সে এক মজাদার দৃশ্য !

এমনি ভাবে দিন দশেক ঘুরে আমরা ফিরে এলাম খড়্গপুরে। এখন অবসর সময়ে বসে বসে বেনারস, এলাহাবাদ ও সিংরৌলির স্মৃতি মন্থন করতে বেশ ভাল লাগছে।

শ্রীবিবেক রায়

আমাদের আসর

আমাদের এই আসরটির
জানেন নাকো নাম ?
এক ডাকেতেই চেনে সবাই
এমনই এর দাম।
লোকেনদা' লিডার মোদের
মস্ত বড় গুণী,
তিনি সবার মাথার মণি
সবাই তাঁরে মানি।
ইতুদি' তো গানের টিচার
অপূর্ব তার গলা,
বলেন যা, না শুনলে পরে
দেন যে কানমলা !
সুশান্ত ও বাবুলদা'র
তুলনা না পাই,
রাগ বলে ছাই কোন কিছু
একটু তাঁদের নাই !
অশোকদা'র মনটা ভাল
ভরা অনুরাগে
ভাল কিছু করার তরে
তিনিই সবার আগে।

শ্রীখুকু ব্যানার্জী

২২শে শ্রাবণ

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্মরণে)

বিদায়ের কালে তুমি
ঝরালে যে বারিধারা,
গোপনে হৃদয়পটে
রয়েছে তা স্মৃতিভরা।
মনের মাঝারে কবি
তুমি চির স্থির রহ,
তামারে নিতি যে মোরা
পূজি আজো অহরহ।

শ্রীমিতা বসু

কৌতুক-কণা

শিক্ষক : শোন ছাত্রগণ, আগামী কাল স্কুলে ইনস্পেক্টর আসা উপলক্ষে তোমাদের সকলের স্কুল-ইউনিফর্ম নীল সার্ট পরে আসা চাই।

জনৈক ছাত্র : কাল কি শুধু ঐ নীল সার্ট ছাড়া আর কিছুই পরব না স্যার ?

*

শীতের রাতে দুটি বোকা লোক আগুনের ধারে বসে গল্প করছিল। তাদের মধ্যে একজন বোকা অপর একজনকে বললে, তুই কি এই আগুনের ধোঁয়া ধরে আকাশে উঠতে পারবি ? তখন অপর বোকা লাকটা বলল, ও আমি যখন আকাশে উঠব খন তুই বুঝি আগুনটা নিবিয়ে দেবি আর আমি নীচে পড়ে মরব !

লোকটা আবার বোকা কোথায় ?

শ্রীনির্মলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

১। অরণ্যেতে জন্ম তার অরণ্যেতে রয়,
তাহার কাছেতে যেতে সবে করে ভয়।
স্পর্শ মাত্র সর্ব অঙ্গ জ্বলে হুহু করি,
তিনটি অক্ষরে বলো কিবা নাম ধরি?

শ্রীআরতি সোম (পুরুলিয়া)

২। খাওয়ার দ্রব্য নয়
তবু লোকে খায়,
ছেলেমেয়ে খেলে পরে
মা'য় দুঃখ পায়।
যুবকেতে খেলে পরে
লজ্জা পায় মনে,
বৃদ্ধ খেলে সবে কিন্তু
হায় হায় গণে!

শ্রীবিজয়শ্রী ভট্টাচার্য (বহরমপুর)
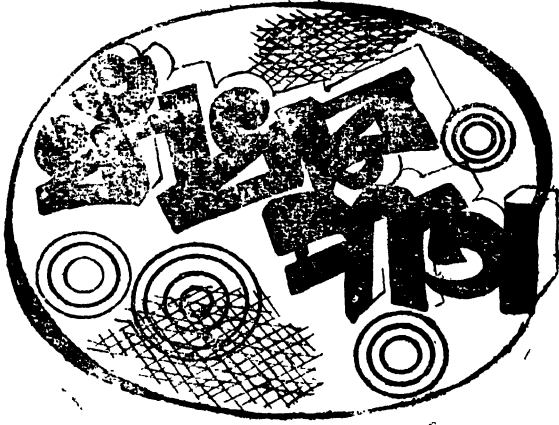
৩। তিন অক্ষর নাম তার
পাত্র বিশেষ হয়,
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে
উর্ধ্বে গাছে রয়।
শেষ দুটি নিলে পরে
বড় আদরের,
অনেকেই পায় দাদা
মজা সে দিনের।

শ্রীঅনুরাধা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই)

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। পাহাড়।

২। পলা দুই তেল এনো রেখে লাল পলা,
কলা খাও বসে বসে ছেড়ে ছলা-কলা।
তর মোরে এ-বিপদে সহেনাক তর,
করজোড়ে বলি ভাই মোরে রক্ষা কর।
ধার তোকে কেবা দেবে জিভে তোর ধার,
তার যে এনেছে ভাই কিবা নাম তার?
কাল ছেলে বসে বসে দেখেছিল কাল,
পাল তোলা নৌকা আর ছাগলের পাল।
ঝাড় থেকে বাঁশ এনে পাটিগুলো ঝাড়।
টোল খায় ঘটি বাটি, খুলেছে কি টোল?
ঝোল গিয়ে দোলনাতে, খেয়ে ঝাল-ঝোল।
গোল দেখে লেবু এন করোনাক গোল,
খোল না বাজিয়ে ভাই পুটুলিটা খোল।
বাস চেপে এল কেবা কোথা তার বাস?
দাস নয় কারো সে যে নাম রঘুদাস।
পণ দশ কলা দেবে আছে এই পণ,
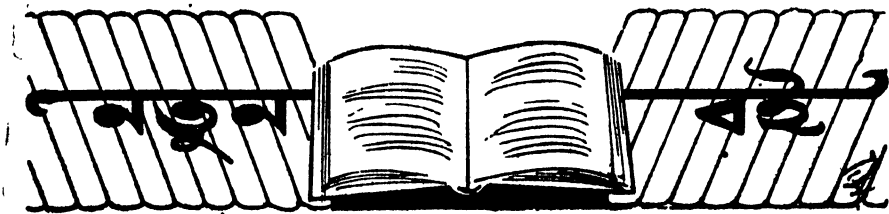
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

পাতার বাঁশী—শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত। এভারেষ্ট বুক হাউস, এ১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৩·০০

সম্পাদকসহ স্বর্গত ও জীবিত আঠারো জন লেখকের গল্প, কবিতা ও বিভিন্ন ধরণের কাহিনী আছে এই সংকলন গ্রন্থে। ছোটদের প্রখ্যাত লেখক-লেখিকাদের মধ্যে যেমন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, অমিয় চক্রবর্তী, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আছেন, তেমনি আছেন ঊর্মিলা গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও কয়েকজন।

এই সংকলন গ্রন্থের কয়েকটি নাম শিশু-সাহিত্যে অধিক পরিচিতি না হলেও, এঁদের লেখাগুলিও বিশেষ উপভোগ্য। সম্ভবতঃ সম্পাদক নাম অপেক্ষা রচনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের উপরেই বেশী ঝোঁক দিয়েছেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই সংকলন গ্রন্থের সাজসজ্জা ও চিত্র-সম্পদ। ছবিগুলি এঁকেছেন শিল্পী শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী। সম্পাদকের সঙ্গে তাঁকেও আমার ধন্যবাদ জানাই। বইখানি ছোটদের খুবই ভাল লাগবে।

সেদিনকে—শ্রীমান উজ্জ্বল। নীরাজন প্রকাশনী, ৩৫ সি, মতিলাল নেহরু রোড, কলিকাতা ২৯। মূল্য ০০·৫০

বড় হরফে খুব ছোটদের জন্যে লেখা ছোট ছোট কয়েকটি ছড়া ও এক পাতার পাঁচটি গল্প আছে এই ছোট্ট পুস্তকাটিতে। গল্পগুলি তেমন কিছু হয়নি, তবে ছড়াগুলি ছোটদের পড়তে মন্দ লাগবে না।

নানা রঙের মেলা—শ্রীসমর রায়। শ্রীদীপক রায়চৌধুরী কর্তৃক ৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা ১ থেকে প্রকাশিত। মূল্য ১·৫০

'নানা রঙের মেলা' সচিত্র ছড়া ও কবিতার বই। সব নিয়ে ছোটবড়ো আঠাশটি ছড়া ও কবিতা আছে। কয়েকটি পড়ে তোমরা যারা ছোট তারা খুবই আনন্দ পাবে। বইয়ের মলাটটিও মজাদার এবং রঙচঙে।

মেঠুড়ে

ক্রিকেট

ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিন টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে দু'দলকেই বেশ অসুবিধের মধ্যে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে নামতে হয়েছিল। তবে ইংলণ্ডের অসুবিধেই ছিল বেশী।

যে ষোলজন খেলোয়াড় নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ড সফর করছে তাঁদের মধ্যে আটজনই একেবারে নতুন খেলোয়াড়। এই আটজন খেলোয়াড়ের কোনো সফরের অভিজ্ঞতা নেই, কোনো টেস্টেও তাঁরা এর আগে খেলেন নি।

প্রথম টেস্টে ইংলণ্ডের দশ উইকেটে জয় নিঃসন্দেহে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অবনতির আর এক পরিচয়। সাম্প্রতিক ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুর্দিন চলছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে দেশের মাটিতে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ডের কাছে পরাজিত হয়। এই বছরই অস্ট্রেলিয়া সফরে হারে তিনটে টেস্টে। তারপর ক্রিকেটে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিহীন দেশ নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গেও সিরিজ ড্র করে।

গ্রিফিথের মতো বোলার এবং কানহাই, হাণ্ট, নার্সের মতো ব্যাটসম্যানের অভাবে কয়েকজন নতুন খেলোয়াড় নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ড সফর করছে। তারপর টেস্ট খেলার আগে বৃষ্টি-ভেজা ইংলণ্ডের মাটিতে খেলোয়াড়রা বেশী অনুশীলনেরও সুযোগ পাননি। টেস্টের মাঝে বৃষ্টি হয়েছে, টসে জয়ী হয়েও ভাগ্যের দোষে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নেননি।

তবু, ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সর্ববিভাগে যে দল নিয়ে ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছে, সে দলকে বলা হয়েছে বহুকালের মধ্যে ইংলণ্ডের সবচেয়ে শক্তিহীন দল। আহত ও অসুস্থ থাকায় কলিন কাউড্রে, কেন ব্যারিংটন এবং মিলবার্ণের মতো নির্ভরযোগ্য তিনজন খেলোয়াড় ইংলণ্ড দলে খেলতে পারেন নি। প্রথম দিন ছ'ঘণ্টার খেলায় ইংলণ্ডের তিন উইকেটে ২৬১ রান সংগ্রহ মন্থর ক্রিকেটেরই নজির। শুভ সূচনা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা হাত খুলে মারার ঝুঁকি নেননি। ওপেনিং ব্যাটসম্যান জিওফ

বয়কট সেঞ্চুরি করতে সময় নিয়েছেন দীর্ঘ ২৮৫ মিনিট। এমন কি, দ্বিতীয় দিনেও ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের হাত খুলে মারতে দেখা যায়নি। গ্রেভনি, ডলিভেরা, নাইট, ইলিংওয়ার্থ প্রমুখ প্রায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যাট চালিয়েছেন। ফলে দ্বিতীয় দিনের চা-পানের সময় পর্যন্ত বাকী সাত উইকেটে ইংলণ্ড ১৫২ রান যোগ করে ৪১৩ রানে ইনিংস শেষ করে।

৪১৩ রানের বিরুদ্ধে ইনিংসের সূচনা করা খুবই ভয়ের এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোনো খেলোয়াড়ই আত্মবিশ্বাস নিয়ে ব্যাট করতে পারেন নি; তার ওপর স্নো ও ব্রাউনের বোলিং সাফল্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপর্যয় ডেকে আনে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ১০৪ রানের ভেতর তাদের ছ'টা উইকেট পড়ে যায়। তৃতীয় দিন ৬৪ মিনিটের মধ্যে বাকী চারটে উইকেটে ৪৩ রান যোগ হয়ে ১৪৭ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ফলে 'ফলো-অন' করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং আরম্ভ করতে হয়। দৃঢ়তার এবং সতর্কতার সঙ্গে খেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অবশ্য দ্বিতীয় দিনে চার উইকেটে ২১৫ রান যোগ করে।

এক দিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হয় মেঘাবৃত আকাশ, অস্পষ্ট আলো এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাতের মধ্যে। বৃষ্টিতে মাঠ ভেসে যাওয়ায় মধ্যাহ্ন ভোজের পর আর খেলা সম্ভব হয় না। ওই সময় পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক সোবার্সের উইকেট সমেত আর তিনটে উইকেট হারিয়ে সাত উইকেটে ২৫৮ রান তোলে।

শেষ দিনের খেলা প্রায় নিয়ম রক্ষার খেলায় পর্যবসিত হয়। ২৭৫ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর কোনো উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ড জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে।

ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড যদিও দশ উইকেটে জয়ী হয়েছে সত্যি কিন্তু সহজ জয় সত্ত্বেও ইংলণ্ডের ব্যাটিং চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি।

ফুটবল

প্রায় দু'মাস হ'ল প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হয়েছে। এখনো যে ময়দানে ফুটবলের জোয়ার আসেনি সেটা বিভিন্ন ক্লাবের দলগত সংহতি এবং খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্যের অভাব। এ যাবৎ লীগের মাত্র একটা খেলাই দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। মোহনবাগান ও বি. এন. রেলদলের সেই খেলায় আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণে যেমন ছিল ওঠা-পড়ার ছন্দ, তেমন ছিল সারাক্ষণ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমেজ।

মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিংয়ের লীগের খেলাটা ইতিমধ্যেই 'প্রদর্শনী ম্যাচ' হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটা সকলের কাছেই বিশেষ উপভোগ্যের হয়েছিল।

মহমেডান স্পোর্টিং এবং হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবের লীগ খেলাটা দশ মিনিটের ভেতর বন্ধ হয়ে যায়। এই দশ মিনিটের ভেতর হাওড়া ইউনিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে একটা গোল দেয়। ওই গোলের প্রতিবাদে মহমেডান স্পোর্টিং আর খেলতে চায় না। অগত্যা রেফারি

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিং দলের লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়ায়, মহমেডান দলেব সুপার লীগে খেলার সম্ভাবনা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এই খেলাটা সত্তের মিনিট চলার পর পরিত্যক্ত হবার কারণ মাঠ থেকে বের হয়ে যাবার দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত খেলোয়াড়, মহমেডান দলের অধিনায়ক লতিফের মাঠ থেকে বের হবার অস্বীকৃতি। লতিফের একটা পেনাল্টির দাবি রেফারি যুক্তিযুক্ত কারণে অগ্রাহ্য করার পর লতিফ রেফারিকে শুধু গালাগালিই দেননি, তাঁর পেটে একটা ঘুঁষিও মেরেছেন বলে রেফারি অভিযোগ করেছেন। জানি না, লীগ কমিটি অথবা আই. এফ. এ. কর্তৃপক্ষ এই গুরুতর অপরাধে অপরাধী লতিফের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।
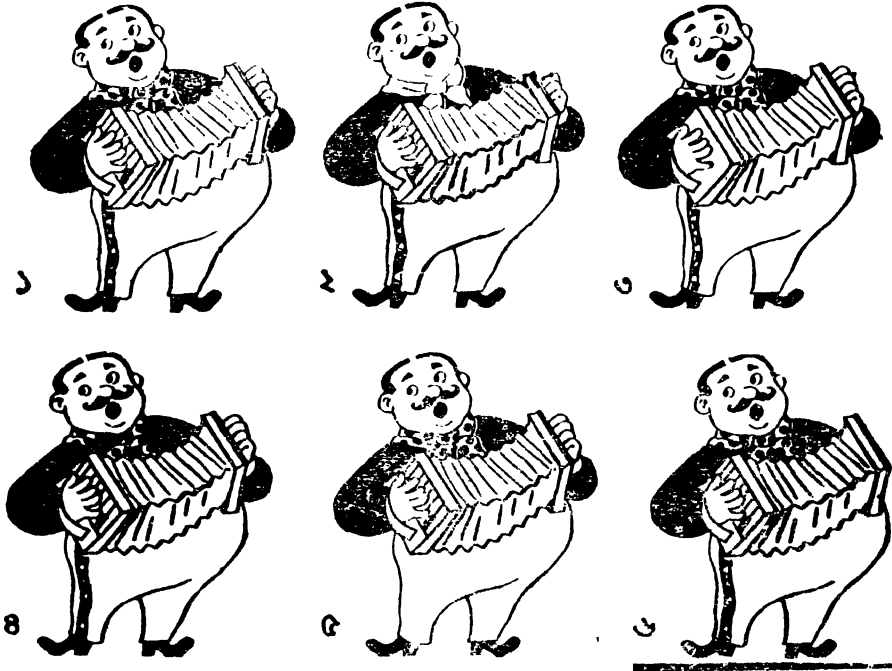
কোন দু'জন এক রকম ?

ছবিতে ছ'জন গায়ক একোর্ডিয়ান বাজিয়ে গান গাইছে। এদের ছ'জনকে ঠিক এক রকমের দেখতে হলেও, এরা সবাই এক রকম নয়। এদের মধ্যে মাত্র দু'জন এক রকম। কোন দু'জন, তা কি ছবিগুলি ভাল করে দেখে তোমরা বার করতে পার ?

এবার সব পরীক্ষাগুলির ফলাফল ঘোষিত হয়েছে—মোটামুটি খবর সব ভালই দেখছি। এত দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক—এত ধর্মঘট, স্কুল-কলেজে অসহযোগ তার মধ্যে ফলাফল বেশ সন্তোষজনক মনে করে আশ্চর্যও লাগছে। আর একটু মনস্থির করলে তোমরা যে আরো কত ভাল রেজাল্ট করতে পারো সে কথাও ভাবছি বৈকি!

চেষ্টা করতে ইচ্ছা করছে না?

একটানা দশ-এগারো বছরের স্কুল-জীবনে ক্ষান্ত দিয়ে যারা মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছ তাদের জন্য রইল আমার শুভেচ্ছা।

পরলোকে সুখলতা রাও

খবরটা পেলুম পরের দিন সকালে, সেদিন ২৬শে আষাঢ়। ২৫শে আষাঢ় সুলেখিকা সুখলতা রাও পরলোক গমন করেছেন। খবরটায় মনটা খারাপ হয়ে গেল—অবিশ্যি বয়সের হিসাবে কিছুই বলবার নেই, কিন্তু মন বলে কেন আরো পেলাম না।

ছোটবেলার কথা মনে হয়—তখন ছোটদের পড়বার মত গল্পের বই খুব কম ছিল, হাতে গোনা যায়। ছোটদের রামায়ণ, মহাভারত মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল—আর দু'একটা যা পাওয়া যেত, পাওয়া মাত্র শেষ করে নতুনের খোঁজ আরম্ভ হতো—কিন্তু হায় রে! তখন আজকের মত ছোটদের জন্য অফুরন্ত ভাণ্ডার—গল্প, রূপকথা, কবিতা, ছড়া, বিজ্ঞানের গল্প এবং ছোটদের বিশ্বকোষ পর্যন্ত কোথায় পাওয়া যেত? আজ রোজই নতুন নতুন বই, নতুন লেখক—নতুন নতুন ছবি, কত ভাবেই না শিশুমনের খোরাক যোগাচ্ছে। তখন? এসব কিছুই ছিল না।

ছোটদের বই না পেলে, বুঝি আর না বুঝি বড়দের বইতে হাত পড়তো, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার অন্তর্নিহিত ভাব কিছুই বোঝার মত মন তখন হয়নি—কেবল পড়ে পড়ে অংশ বিশেষ প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কিছু বই তখন পাওয়া যেত, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি পড়ে যেত ছোটদের মধ্যে। মাসিকপত্র? 'সন্দেশ' আর 'মৌচাক' মাসের শেষ থেকে কবে পত্রিকাখানি আসবে সেই পথের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় যেন ফুরোতে চাইতো না।

এই সময়ে কয়েকখানি বই উপহার পেলাম বাবার কাছে থেকে জন্মদিনে—তার মধ্যে

'আরো গল্প' বইখানি, যার লেখিকা সুখলতা রাও—পেলাম আর আগ্রহসহকারে পড়তে শুরু করলাম। গল্পগুলি যে মনে দাগ কেটে গেল—এত বছর পরে তা মনে করতে একটুও ভুল হয় না। বিশেষ করে একটা মানুষের বাচ্চা ভালুক নিয়ে গেল—আর তাকে মেরে ফেললো না, বরং নিজের আর চারটে বাচ্চার সঙ্গে বড় করতে লাগলো। ভালুকের চার পা, বাচ্চাটাও অনুকরণ করে দুটো হাতকে তার পা দুটোর সঙ্গে এক করে চলতে শিখলো। যত পড়েছি ততই বিস্ময় বোধ করেছি। আর অনেক দিন পর্যন্ত, মানে বড় হয়েও তাকে ভুলতে পারিনি—ভালুকের ঘরে বড় হচ্ছিল যে মানুষের বাচ্চাটা।

এমনি সুন্দর শিশু-মনোরঞ্জনে লেখা ও সৃজনী শক্তি। সারা জীবনই প্রায় তিনি লিখে গেছেন— কত কত বই ছড়া, কবিতা, গান অনুবাদ তার হিসেব করাই ভার।

ছোটবেলায় গল্প পড়ে মনে হতো লেখিকাকে যদি দেখতে পেতাম। কিন্তু তখন ছোটদের প্রতি অনাদৃত, অবহেলিত ভাবই ছিল বড়দের—'ওরা ছোট' বলে যেন নাসিকাকুঞ্চন করতে দেখা যেত। বেচারা ছোটরা কিই বা করবে? বড়দের দেখা, বড়দের লেখা, বড়দের কথা শোনা ছাড়া উপায় কি! মেয়েদের বড় জোর পুতুল বিয়ে—ছেলেদের জন্য ঘুঁড়ি লাটাই, লাট্টু লেত্তি—জোর ফুটবল। ব্যস, ঐ শেষ। কোন অনুষ্ঠান নেই, কোনো সিনেমার ছবি নেই, গান-বাজনা যা কিছু সব বড়রা সীমা রেখা টেনে বসে আছেন। বড়জোর শীতকালে আসা কার্নিভ্যাল অথবা সার্কাস কিংবা বড়দিনে সাহেব পাড়ায় বেড়াতে গিয়ে আলোকসজ্জা দেখা, একটু কেক খাওয়া। তাও সারাদিনে আশা নিয়ে বসে থেকে যখন যাওয়া হতো তখন সারা রাজ্যের ঘুম চোখ ভরে এসেছে। কাজেই লেখিকাকে দেখা? আকাশকুসুম ছাড়া কি! সভা-সমিতি কবে ছোটদের জন্য উৎসব, ছোটদের জন্য যাঁরা লেখেন তাঁদের আনা বা কিছু বলানো একেবারেই নয়। তবে 'আকাশ-বাণী'র (তখন নাম ছিল ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্ ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস) ছোটদের আসর (অধুনা গল্পদাদুর আসর) বেশ মশগুল হয়ে উঠেছিল। গল্পদাদু ছিলেন পরিচালক (আসল নাম, যোগেশচন্দ্র বসু)। কত গল্প, ধাঁধা চিঠির উত্তর পাওয়া যেত—তবে ক'টা ঘরেই বা রেডিও থাকতো, তবু সে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কিছুটা আনন্দ পেতো। কাজেই সুখলতা রাওকে দেখার ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! কেমন ভাবে একদিন দেখা হলো যে পুরীর সমুদ্র-তীরে। তখন তাঁর স্বামী জয়ন্ত রাও ওখানকার ডাক্তার। সমুদ্র-তীরে বালি নিয়ে খেলা হচ্ছে, দু'জন মহিলা গল্প করতে করতে চলেছেন—সঙ্গিনী অভয়া বললে: ঐ দেখ, ঐ যে যাচ্ছেন—উনি ডাক্তারের বউ—সুখলতা রাও—উনি নাকি বই লেখেন। আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল—

সামনে বাংলা দেশের লাবণ্যমাখা একটি মেয়ে ; মনের মধ্যে সেই ভালুকের ঘরে থাকা মানুষের বাচ্চা—অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর অবশ্য অনেক বছর পরে কিড ষ্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে মিলেছিলাম আর ছোটবেলায় তাঁর লেখা সেই মানুষের বাচ্চার জন্য আমার কৌতূহলের যে অন্ত ছিল না, সেকথা বলতেও ভুলে যাইনি। সুখলতা জন্মেছিলেন ১৮৮৬ সালে কোলকাতায় বেশ রুচিশীল মার্জিত পরিবারে। তখনকার দিনে রায়চৌধুরী পরিবারের নাম কে না জানতো! বাবা তো ছিলেন প্রথিতযশা লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর ভাই হলেন 'আবোল-তাবোলের' সুকুমার রায়—বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা তাঁকে চেনে না—এমন কেউ নেই। আর একজন আছেন সত্যজিৎ রায়—যাঁর পরিচালনায় অনেক সিনেমার ছবি তোমরা দেখে থাকো ; তিনি হলেন তাঁর ভায়ের ছেলে। বাবার কাছে অঙ্কনবিদ্যা শিখেছিলেন শ্রীযুক্তা রাও। কত সুন্দর ছবি আঁকতেন। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকে বেথুনে পড়ে তারপর তাঁর বিবাহ হলো কটকে। ডাক্তার জয়ন্ত রাও শুধু ডাক্তারীই করতেন না, একজন সাহিত্যরসিক এবং সাহিত্যিকও বটে।

জীবন পরিক্রমার অনেক দিন কেটে গেছে, বহু লিখেছেন ছোটদের জন্য—নানাদেশের রূপকথা, সোনার ময়ূর, হিতোপদেশের গল্প, ঈশপের গল্প, লালিভুলির দেশে, বনে ভাই কত মজাই—আর সেই আরো গল্প—যার নায়ক আজো আমার মনে আশ্চর্যভাবে বাসা বেঁধে আছে—পরিণত মন ও বুদ্ধি দিয়েও তাকে অলীক ভাবতে ইচ্ছা করে না।

চলে গেলেন তিনি মহাকালের আহ্বানে মহাযাত্রায়, বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্য রেখে গেলেন তাঁর মধুর, মনভোলানো লেখাগুলি আর একমাত্র পুত্র জিষ্ণু রাও আর দুই কন্যা সুজাতা ও শীলাকে।

তোমাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ না পড়ে থাকলে তাঁর লেখাগুলি সংগ্রহ করে পড়ে নিও।

সস্নেহ শুভেচ্ছা—

তোমাদের—মধুদি'

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০·৬০ পয়সা

শরতের শোভা

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্র *

৫০শ বর্ষ]   ভাদ্র ঃ ১৩৭৬   [৫ম সংখ্যা

শেয়ালের খেয়াল

শ্রীনবগোপাল সিংহ

১

বক্‌সীডাঙার একশো বিঘেয়
খ্যাঁকশেয়ালীর মামা,
হুক্কাহুয়া ছেড়ে হঠাৎ
ধরলো সা-রে-গা-মা।
কানপুরে এক ছুটির দিনে
তানপুরোটা আনলো কিনে
মখমলি এক মাখন-জিনে
বানিয়ে নিলো জামা।
পান করে সে লাগলো, গানে
হবেই খ্যাতনামা।

২

কিন্তু উপযুক্ত গুরু
কোথায় খুঁজে পাবে ?
তানপুরোটা বক্ষে ধরে
প্রাণ ভরে তাই ভাবে।
কোতুলপুরের অতুল মাঝি
গলা সাধেন সকাল-সাঁঝই
এক কথাতেই হলেন রাজী
মামারই প্রস্তাবে,—
শিষ্যে তাঁহার তাঁর ঘরানার
ওস্তাদি শেখাবে।

৩

ভোর বেলাতে দীক্ষা হলো
ভৈরবী সারগমে
বিকেল বেলা পূরবী আর
ইমন দিলেন ক্রমে।
সাধছে গলা খ্যাঁকশেয়ালী
ললিত বেহাগ আর ভুপালি
ন' মাত্রাস্তে দেখিয়ে 'খালি'
আসছে ফিরে শমে,
মামার গলায় ওস্তাদি গান
উঠছে এবার জ'মে।

৪

একশো বিঘেয় একশো রকম
রাগ-রাগিণী চলে
শেয়াল মামা সিদ্ধি পেলো
তপস্যারই ফলে।
অতুল মাঝি সেদিন ডেকে
বললে, 'চ'লো এখান থেকে,
আপনাকে আর লুকিয়ে রেখে
লাভ কি এ জঙ্গলে?
গান শুনে লোক মূল্য দেবে,
মাল্য দেবে গলে।'

৫

মস্তবড় জলসা সুরু
মুখর চতুর্দিক,
ভীম পলাশী ধরলো মামা
বিকেল বেলা ঠিক।
তানপুরোটা বাগিয়ে ধরে
গাইছে গায়ক কণ্ঠ ভ'রে
হঠাৎ এসে কেমন ক'রে
বাঘা আকস্মিক—
ঝাঁপিয়ে পড়ে মামার ঘাড়ে
এমন বেরসিক।

৬

জমজমাটি আসরখানা
হঠাৎ গেলো ভেঙে
মিষ্টি সুরের কণ্ঠখানা
রক্তে গেলো রেঙে।
'হুক্কাহুয়া ছেড়ে শেয়াল
সভার মাঝে গাইবে খেয়াল?
তাই তো এমন করনু বেহাল'
কইলো বাঘা রেগে।'
জাতশত্রু চিরদিনই
এমনি থাকে লেগে।

বন্ধু

শ্রীচিত্রিতা দেবী

*

দুপুর বেলায় মা ঘুমিয়ে পড়লেই সুমন্ত চুপিচুপি বিছানায় মায়ের পাশ থেকে উঠে এসে বারান্দায় গিয়ে বসে। ওদের বারান্দা থেকে একটা প্রকাণ্ড মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। তার একধারে গরু-মহিষের খাটাল, আর তার পাশেই রামধুনিয়াদের বস্তী। টিনের চাল দেওয়া কয়েকটা মাটির ঘর।

রামধুনিয়া কিন্তু ঘরে থাকতে ভালবাসে না। সারাদিন মোষের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। রামধুনিয়ার পরনে একটা লাল টুকটুকে গামছা। আর মাথাতেও থাকে একটা ঐরকম গামছা পাগড়ির মত বাঁধা। রামধুনিয়ার রঙটা খুব ফরসা। যদিও সারাক্ষণ গায়ের এখানে-ওখানে ধুলো কাদা মাখা থাকে, তবু কালো মোষের পিঠে লাল গামছা পরা ছোট্ট ফরসা রামধুনিয়াকে দেখতে সুমন্তর ভারী ভাল লাগে। সুমন্তর অবশ্য রঙটা অত ফরসা নয়। কিন্তু ওর বড় বড় পিছি ঢাকা কালো চোখ যখন দুষ্টুমিতে জ্বলজ্বল করে, তখন ওকে দেখতে রামধুনিয়ারও ভারী ভাল লাগে।

সুমন্ত সকাল বেলায় ইস্কুলে যায়। বারোটায় বাড়ী ফিরে মুখ হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে মায়ের পাশে বিছানায় গিয়ে শোয়। তারপর যেই দেখে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন, অমনি চুপিচুপি বারান্দায় ও চলে আসে। রামধুনিয়াও মোষের পিঠ থেকে নেমে সুমন্তদের গরাদ দেওয়া বারান্দার বাইরে এসে দাঁড়ায়। তখন দু'জনে মিলে অনেক গল্প হয়। সুমন্ত সোজা হিন্দীতে বাৎচিৎ চালিয়ে যায়, আর রামধুনিয়া বাংলাতে। সুমন্ত বলে, "এ রামধুনিয়া মুঝ্‌কো মোষকা পিঠমে চড়াও।" আর রামধুনিয়া বলে, "এ সুমস্তো, হামাকে ইস্কুলমে লে চল্‌বে ?"

দু'জনে ভারী ভাব হয়ে গেছে। রামধুনিয়া সুমন্তকে কত-কি এনে দেয়। পাথরের টুকরো, বাঁশের কঞ্চি, পাখীর পালক, কত-কি ! সুমন্তও তার ভাল্লুক পুতুলটা দিয়ে দিয়েছে রামধুনিয়াকে। আর তার নীল বলটাও। লাল বলটা কাউকে প্রাণে-ধরে দিতে পারবে না সুমন্ত, যতই ভাব থাকনা যার সঙ্গে। সেদিন মোষের ঘাড়ের ওপরে পুতুলটা বসিয়ে, তার দু'পা চেপে ধরে, মোষের পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে রামধুনিয়া যখন চলে গেল, তখন সুমন্তর মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। সুমন্ত ঠিক করল, কালকে ও রামুর সঙ্গে মোষের পিঠে চড়বেই-চড়বে।

ঠিক্ যা বলেছে তাই। পরদিন সুমু করেছে কি, সেই বড় টুলটাকে ঠেলে ঠেলে এনে দরজার কাছে রেখেছে, তারপরে মোড়াটা এনে রেখেছে টুলের কাছে। মোড়াটায়

চড়ে টুলের ওপরে উঠে দরজার ছিট্‌কিনিটা খুলে দিয়েছে। ব্যস্, দু'জনে মিলে তখন কি হাসি! তারপরে সুমু তাকের ওপর থেকে বিস্কুটের টিনটা এনে রামুকে দুটো ক্রীম দেওয়া মিষ্টি বিস্কুট ও একটা চকলেট দিল। বিস্কুট আর চকলেট পেয়ে রামু খুব খুশী হয়ে উঠল। তারপর বলল, "চল সুমু ভাইয়া, আজ তুকে ভঁইসা চড়াব।"

সুমু বলল, "বহুৎ আচ্ছা রামু, কাল তোকে লজেন্স দেগা।"

তখন চৈত্রের শেষ, রোদের তাপ খুব বাড়লেও মাঝে মাঝে সুন্দর ঝিরঝিরে হাওয়া দেয়, আর পথের পাশের রাধাচূড়া গাছের লাল আর সোনালী ফুলগুলো টুপটুপ করে ঝরে পড়ে।

সুমুর হাত ধরে রামু মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। মোষটা পিছন পিছন আসতে আসতে মাঝে মাঝে আনন্দে হাম্বা হাম্বা করে মৃদু মৃদু আওয়াজ করতে লাগল। নতুন বন্ধু পেয়ে মোষটাও খুশী হয়ে উঠেছিল। রামু বলল, "রজনী, বইঠ যা ভাইয়া।" মোষটার নাম রজনী। রামুর কথায় মোষটা দিব্যি থপাস ক'রে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল। তখন সুমুকে সামনে বসিয়ে রামুও তার পিছনে চড়ে বসল। আর অমনি রজনী টল্‌মল্ করে দাঁড়িয়ে উঠল। রামু তার ছোট্ট ছড়িটা দিয়ে রজনীর পায়ে মেরে বলল, "চল্ চল্, এ রজনী হো।" রজনী কিন্তু ছুটলো না; ও বেশ বুঝেছিল ছুটলে সুমু ভয় পাবে। তাই সে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। তবু ভয়ে সুমুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। কিন্তু সেই ভয়টাও ওর ভীষণ ভাল লাগছিল। ও বাড়ীর কথা, মার কথা, সব ভুলে দু'হাতে রজনীর ঘাড় চেপে ধরে বসে রইল।

এদিকে বাড়ীর দরজা খোলা পেয়ে রামুদের বড় সাদা দুধেল গাইটা করেছে কি, উঠে সোজা চলে এসেছে ভিতরে। এতক্ষণ বাইরে খাটালের একপাশে বসে বসে আরাম করে জাবর কাটছিল। হঠাৎ দরজা খোলা দেখে বোধহয় ওর কৌতূহল হোল। গরুদের কি কৌতূহল থাকতে নেই? না হয় মানুষ নাই বা হোল!

গরুটা ঘরে ঢুকতেই ওর ঠেলা লেগে টুলটা পড়ে গেল।

সেই আওয়াজে সুমুর মায়ের ঘুমটাও গেল ভেঙে। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। বুধনীও ততক্ষণে বারান্দার আর বসার ঘর পেরিয়ে সোজা এসে তাঁদের শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, বড় বড় কালো চোখে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

ওরে বাবা! এ কী কাণ্ড! সুমুর মা তো ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন। কিন্তু দুপুর বেলা বাড়ীতে তো আর কেউ নেই, আর সুমুর বাবাও তো আপিসে! তখন আস্তে আস্তে তাঁর সাহস বাড়ল। তিনি উঠে ওপাশের দরজা দিয়ে রান্নাঘর থেকে দু'খানা আটার রুটি

নিয়ে এসে পিছন থেকে ডাকলেন, "আয়, আয়, বুধনী আয়।" ততক্ষণে সুমুর মাকে বুধনী চিনতে পেরেছে। এদিকে সমুকে না দেখতে পেয়ে মায়ের বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তবু ভয় চেপে রুটির লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে মা বুধিনীকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে এসে

'সুমুর হাত ধরে রামু মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল।'—পৃঃ ২১০

রুটি খেতে দিলেন। তারপর দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখের দু'পাশে হাত দিয়ে 'সুমু সুমু' করে চেঁচাতে লাগলেন।

সুমুরা অবশ্য ফিরেই আসছিল। সুমুর নিজেরই মনে পড়লো, এই রে দরজা খোলা রেখে চলে এসেছে! রামু বলল, "চল্ চল্, রজনী চল।" কিন্তু সুমুকে পিঠে নিয়ে রজনী ছুটতে রাজী নয়।

দূর থেকে রামু আর সুমু দুজনেই দেখতে পেল মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে "সুমু সুমু" বলে ডাকছেন।

রামু ভাবছিল মোষের পিঠে সুমুকে দেখে সুমুর মা যদি রাগ করেন। কিন্তু সুমু এ দৃশ্য মাকে না দেখিয়ে ছাড়বে না। পোকা দেখে সে ভয় পায় বলে মা ভাবে সুমু ভীতু; হুঁ, এখন দেখুক তো একবার! সত্যিই মা দেখছিলেন অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

মায়ের সামনে এসে রজনী ডাকল, হাম্বা! তারপরে নিজে থেকেই বসে পড়ল। টাল সামলাতে না পেরে সুমু একেবারে পড়ে যাচ্ছিল। রামু তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলল। ততক্ষণে মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করে দিয়েছে। মাকে দেখেই তো রামু ও সুমু দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর মাকে কাঁদতে দেখে আর ওদের মুখে কথা সরল না।

রামু আস্তে আস্তে চুপিচুপি পালিয়ে গেল। আর সুমু মায়ের আঁচল ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে মুখ হাত ধুয়ে, চুলটুল আঁচড়ে, সুমু যখন মায়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরুল, তখন দেখে রামধুনিয়া খাটালের পাশের নারকোল গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছল্‌ছল্‌ চোখে চুপ করে চেয়ে আছে।

মা ডাকলেন, "রামধুনিয়া কাছে আয়। রামু প্রথমটা আসতে চাইছিল না। তারপর আস্তে আস্তে কাছে এল। সুমুর মা তাকে বললেন, "রামু, তুই আমার কাছে পড়বি?" কথাটা শুনে রামুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ঘাড় নেড়ে বলল, "হাঁ।"

পরদিন থেকে তাই ঠিক হোল। খাওয়াদাওয়া সারা হতেই দেখা গেল রামু এসে দাঁড়িয়েছে। মা ওকে ভিতরে এনে দরজা বন্ধ করে দিলেন।' তারপর বললেন, "দুই বন্ধু মিলে বসে খেলা কর। আমায় না বলে কেউ বাইরে যাবে না, খবরদার!" তারপর আধঘণ্টা বিশ্রাম করে মা ওদের নিয়ে পড়াতে বসান, রামুর জন্য মা নতুন খাতা বই স্লেট পেন্সিল কিনে এনেছেন। পড়া হয়ে গেলে রামু সুমু দু'জনকেই মা জলখাবার খেতে দেন। তারপর দু'জনে মিলে তরা মাঠে খেলতে যায়; সুমন্তর আর একলা লাগে না। তাছাড়া রজনী বুধনী, কালী, শ্যামা সকলের সঙ্গেই সুমুর আজকাল ভাব হয়ে গেছে। ওরা সবাই সুমন্তকে ভালবাসে।

সুমন্তদের বাড়ীর সকলেও রামুকে কম ভালোবাসেন না। এমন কি সেদিন সুমন্তর দিদিমাও ওর জন্য একটা নীলের উপুরে সাদা ডোরাকাটা চমৎকার সার্ট কিনে এনেছিলেন। সেটা পরে রামুকে যা সুন্দর দেখাচ্ছিল! রামু সুমু প্রায়ই বলাবলি করে, যে বড় হয়েও ওরা দু'জনে এই রকমই বন্ধু থাকবে।

পৃথিবীকে জানো

শ্রীজ্যোতির্ময় ছুই

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি সেই সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সব সময় সুস্পষ্ট এবং অভ্রান্ত নয়। যেমন মনে করো, আমরা অনেকেই বলে থাকি এবং অনেক পাঠ্যপুস্তকেও লেখা আছে—'পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল', 'পৃথিবীতে সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান চেরাপুঞ্জী', 'ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের $\frac{৪}{৫}$ অংশ নাইট্রোজেন'—সাম্প্রতিককালের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় কিন্তু ধারণাগুলির পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেছে। আচ্ছা, পৃথিবী সম্পর্কে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো আমি আগে উপস্থাপিত করি, তারপর তার সঠিক উত্তর নিয়ে আলোচনা করছি।

প্রশ্ন :—

১। পৃথিবীর উপরে স্থলভাগ ও জলভাগের সঠিক অনুপাত কত?

২। তোমরা জানো পৃথিবী ঠিক গোলাকার নয়, কমলালেবুর মতো উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। দুই মেরু বরাবর পৃথিবীর ব্যাস ও নিরক্ষীয় ব্যাসের মধ্যে পার্থক্য কত?

৩। সমুদ্র সমূহের গড় গভীরতা কত?

৪। পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব কত?

৫। কোন্ মৌলিক পদার্থ পৃথিবীতে সর্বাধিক পরিমাণে রয়েছে?

৬। সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় পৃথিবীর কোন্ স্থানে?

৭। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ সর্বাধিক আছে?

৮। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের শতকরা পরিমাণ কত?

প্রথমে তোমরা নিজেরা চেষ্টা করে দেখো উপর্যোক্ত প্রশ্নগুলোর ক'টার সঠিক উত্তর দিতে পারো, তারপর নীচের উত্তরগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

উত্তর :—

১। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত স্থলভাগ ও জলভাগের সঠিক অনুপাত হলো ৩:৭ অর্থাৎ পৃথিবীর ৭ ভাগ জল এবং ৩ ভাগ স্থল, আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ভূপৃষ্ঠের সমগ্র ক্ষেত্রফলের শতকরা ৭১ ভাগ জল।

২। প্রায় ৪০ কিলোমিটার বা ২৬ মাইল।

৩। ১২,৫০০ ফুট।

৪। বৈজ্ঞানিকগণের মতে পৃথিবীর সমগ্র অংশের এক ঘন সেন্টিমিটারের গড় ভর ('গড়' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে যেহেতু পৃথিবীর সকল অংশের উপাদান অভিন্ন নয়) ৫.৫২ গ্রাম অর্থাৎ পৃথিবীর গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব মোটামুটি ৫.৫ বলা চলে।

৫। অক্সিজেন। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলেই শুধু অক্সিজেন নেই, অক্সিজেন বিভিন্ন যৌগাকারে (ধাতব অক্সাইড ইত্যাদি) ভূত্বকেও রয়েছে। তোমরা জানো নিশ্চয়ই জলেরও একটা উপাদান হলো অক্সিজেন। প্রকৃতপক্ষে ভূত্বকের রাসায়নিক বিশ্লেষর করে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বলে জানা গেছে।

৬। মৌসিংগ্রাম। এই স্থানটিও চেরাপুঞ্জীর ন্যায় খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য এলাকার আওতায় অবস্থিত। মৌসিংগ্রামে বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় পরিমাণ ৫০০ ইঞ্চিরও অধিক। সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের জন্য চেরাপুঞ্জীর নাম বলা হতো, এখন বৃষ্টিপাতের পরিমাণের বিচারে চেরাপুঞ্জীর স্থান দ্বিতীয়।

৭। লোহা ও নিকেলের ন্যায় ভারী ধাতু প্রচণ্ড চাপ ও উষ্ণতায় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে (Core) রয়েছে।

৮। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলে আয়তন অনুসারে শতকরা ৭৮ ভাগ এবং ওজন অনুসারে শতকরা ৭৫ ভাগ নাইট্রোজেন রয়েছে। একথা ভুল করে বলা হয় যে, বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৮০ ভাগ অর্থাৎ $\frac{8}{\text{৫}}$ অংশ নাইট্রোজেন।

প্রজাপতিকে ঃ খুকু

শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রং-বেরঙের পের্‌জাপতি
আলপনা তার গায়,
ধরতে গেলেই পাখনা মেলে
অমনি উড়ে যায়!
পের্‌জাপতি পের্‌জাপতি
লক্ষ্মীসোনা ভাই,
আয়-না কাছে, একটু তোকে
ধরতে আমি চাই;

আলতো করে ধরবো তোকে
ছিঁড়বে না তোর ডানা,
ধরে আবার ছেড়েই দেবো
যেথায় খুশি যা-না—
পের্‌জাপতি তুষ্টু অতি
হাওয়ায় ভেসে যায়,
পাখনা মেলে ডাকছে আবার ঃ
আয়-না কাছে আয়!

পরলোকে লেখিকা সুখলতা রাও

শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত

সুখলতা রাও

যে পরিবারের সঙ্গে বাংলা শিশু-সাহিত্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, যে পরিবারের কাছে শিশু-সাহিত্য চির ঋণী, সেই পরিবারের সবচেয়ে বর্ষীয়সী মানুষটি লোকান্তরিত হয়েছেন। আমি ছোটদের প্রিয় লেখিকা সুখলতা রাওয়ের কথা বলছি।

সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে সুখলতার দিন কেটেছে ছোটবেলা থেকেই। বাংলা শিশু-সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন সুখলতার বাবা। ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করার জন্যে তিনি নানান মজাদার ছড়ার আকারে পুত্রকন্যাদের চিঠি লিখতেন। ছেলেমেয়েদের খুব ভাল লাগত এই সব চিঠি। তারা উৎসাহ পেত কিছু লিখবার। ছেলেবেলার সেই সব মজার ঘটনা সবিস্তারে লিখেছেন সুখলতার বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিকথাতে। ছোটদের ভালো পত্রিকার অভাব তখন বাংলা দেশে। সেই অভাব ঘোচাবার জন্যে উপেন্দ্রকিশোর প্রকাশ করলেন মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ'। গল্প, কবিতা, ছড়া, পুরানো কাহিনী, ধাঁধা নানান জিনিসের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে ভরা সন্দেশ—ছোটদের কাছে খাবার সন্দেশের মতই প্রিয় হয়ে উঠল। বাড়ীর অন্যান্য সকলের সঙ্গে সুখলতাও সন্দেশের সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন নিজেকে। অন্যান্য সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন সঙ্গে ছোটভাই 'আবোল-তাবোল'-এর অমর স্রষ্টা সুকুমার রায়, ওস্তাদ বিজ্ঞান-কাহিনীর লিখিয়ে সুবিনয় রায় ও সেই সঙ্গে আরো অনেকে।
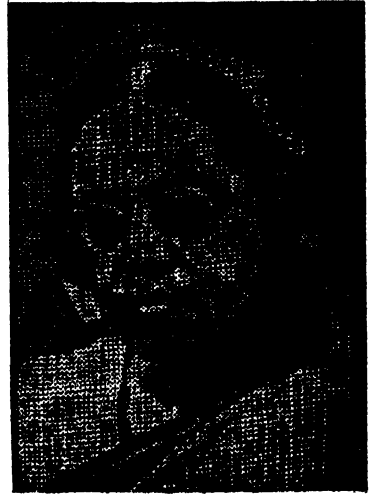
১৯১৩ সালে প্রথম গল্প প্রকাশিত হ'ল 'সন্দেশ'-এ। সেই থেকে চলতে লাগল নিরবচ্ছিন্ন গতিতে শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি। ছাড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, নাটক সব কিছুই তিনি লিখতে লাগলেন। ছোটদের ভালো লাগার মত ভাষায় সুন্দর এই সব লেখা সে যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে পরম প্রিয় হয়ে উঠল। দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশী শিশুদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে সুখলতা যে সব বই লিখেছেন, তার সংখ্যা প্রায় খান কুড়ি হবে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মতো বই হচ্ছে ঈশপের গল্প, হিতোপদেশের গল্প, সোনার ময়ূর, নতুন ছড়া, দুই ভাই, আরও গল্প, বনে ভাই কত মজাই, আলিভুলির দেশে, বিদেশী ছড়া, নানান দেশের রূপকথা, খেলার ছড়া, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। ছোটদের প্রিয় লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্র "যাদের লেখা তোমরা পড়" বই-এ লিখেছেন :

'বিদেশী গল্পকে স্বদেশী ছাঁচে ঢেলে, নূতন রূপ দিয়ে তার দ্বারা শিশু-চিত্ত জয় করার

অসাধারণ শক্তির অধিকারিণী তিনি। এঁর ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি শিশুরা লজেন্সের মতই ভালোবাসে। এঁর ভষায় রয়েছে বাংলার সরস সুন্দর স্নিগ্ধ শ্রী—যা আর কারো রচনায় তেমন চোখে পড়ে ন।

বাংলা ছাড়া ইংরেজীতে লিখেছেন বিখ্যাত চাঁদ সওদাগরের কাহিনী নিয়ে 'বেহুলা'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখলেন 'বেহুলা'র ভূমিকা। কবিতার বই হচ্ছে 'লিডিং লাইটস'। উড়িষ্যাতে থাকাকালে তিনি ওড়িয়া ভাষা রপ্ত করেছিলেন ভাল ভাবে। তাঁর কয়েকটি বই ওড়িয়া ভাষাতে প্রকাশিত হয়েছে।

আজীবন শিশু-সাহিত্য সেবার জন্যে, শিশু-সাহিত্যিকের পুরস্কার ভুবনেশ্বরী পদক তাঁকে দেওয়া হয় ১৩৬৬ সালে। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে শিশু-সাহিত্য শাখার সভানেতৃত্ব করেছেন একবার। ১৯৫২ সালে কটকে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হন। শিশু-সাহিত্যের জন্যে 'মৌচাক' পুরস্কারও পেয়েছেন একদা। ১৯৫১ সালে পেয়েছেন ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'গল্প আর গল্প' বইয়ের জন্য। পরবর্তীকালে তাঁর আরও দুটি বই পুরস্কৃত হয়েছে। 'নিজে পড়', 'নিজে শেখ' ছোটদের প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধার জন্যে বই দুটি লেখা। ভারত সরকার আয়োজিত ছোটদের বইয়ের প্রতিযোগিতায় তাঁর 'নানান দেশের রূপকথা' বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়।

সুখলতা রাও খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। বাবা উপেন্দ্রকিশোরের কাছেই ছবি আঁকা শিখেছিলেন তিনি। কালি, পেন্সিল, জল রং, তেল রং, প্রভৃতি সব রকম দিয়েই তিনি ফুটিয়ে তুলতেন নানা রকমের ছবি—সমুদ্রের দৃশ্য, প্রকৃতিক দৃশ্য, পোট্রেট ইত্যাদি। নিজের লেখা অনেক বইয়ের ছবি একেছেন নিজেই।

সুখলতা জন্মেছিলেন কলকাতায় ১৮৮৬ সালে। ছাত্রী-জীবন কেটেছে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ও বেথুন কলেজে। বছর দুই ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষিকা হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। উড়িষ্যার বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্যিক মধুসূদন রাওয়ের বড় ছেলে ডাঃ জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দীর্ঘদিন বাস করেছেন উড়িষ্যায়, সেখানকার নানা সমাজ সংস্কারের কাজে লিপ্ত থেকে প্রতিষ্ঠা করেন কটকে শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, ওড়িয়া নারী সেবা সঙ্ঘ ইত্যাদি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উড়িষ্যায় রেডক্রস সেনাবাহিনী গঠনের জন্যে ইংরেজ সরকার তাঁকে দেন রৌপ্যপদক কাইজার-ই-হিন্দ। বিবাহের পর থেকেই তিনি হয়েছিলেন উড়িষ্যার বাসিন্দা। কটকে কেটেছে তাঁর বহুদিন। যখনই কোন বাঙালী কটকে বেড়াতে গেছেন, তখনই তাঁর বাসভবন দেখিয়ে গাইড সানন্দে বলত—এই বাড়ীতে থাকেন বাংলা দেশের বিশিষ্ট লেখিকা সুখলতা রাও। শেষ জীবনে তিনি স্থায়ীভাবে ছিলেন কলকাতায়। গত ৯ই জুলাই ৮৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তোমাদের প্রিয়বন্ধুকে আশা করি তোমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে চিরদিন। শিশু-সাহিত্যের চিরসম্পদ তাঁর রচনাবলী তোমরা অবশ্যই পড়বে অবকাশ মত।

ব্লটার

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

কালি দিয়ে লেখবার সময় দৈবাৎ কাগজের ওপর কালি পড়ে গেল কিংবা লেখার পর ভিজে কালি তখনই শুকিয়ে ফেলবার দরকার হলে, আমরা সাধারণতঃ এক টুকরো ব্লটিং পেপার ব্যবহার করি ; কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, ঠিক দরকারটির সময়ে সেটা হাতের কাছে পাওয়া যায় না। এই ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যাওয়া ব্লটিং পেপারের পাট একেবারে তুলে দিয়ে, এমন একটা জিনিস যদি করা যায়, যেটা ব্লটিং পেপারের মতোই কাজ করবে এবং সেই সঙ্গে পেপার ওয়েটের অর্থাৎ কাগজ চাপার কাজ করবে, তবে সেটাই কি ভালো নয়? এই জিনিসটার নাম 'ব্লটার' (blotter), এর মানে হোলো, যা শুকিয়ে ফেলে বা শুষে নেয়। এই ব্লটার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহলেও তোমরাই তৈরী করে নিতে পার—অবশ্য যদি ইচ্ছা করো।

ব্লটার তৈরী করতে লাগবে—আট ইঞ্চি চৌকো এক টুকরো মাঝারি মোটা পিচবোর্ড, ফেলে দেওয়া রবার স্ট্যাম্পের একটা হ্যাণ্ডেল বা হাতল, কিছুটা মজবুত কাগজ (বাদামী রঙের মোটা
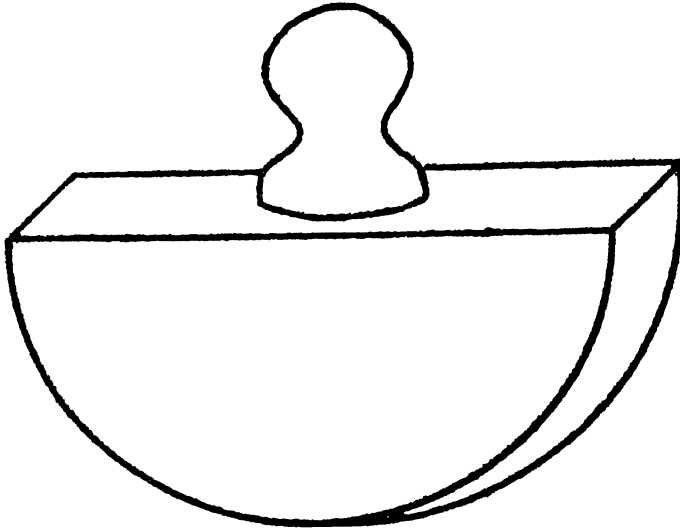
প্যাকিং কাগজ হলেই ভালো হয়), এক প্যাকেট প্যারী প্লাষ্টার (Plaster of Paris), কাঁচি ও আঠা।

ডাক্তারখানায়, দাঁত-বাঁধাইয়ের সরঞ্জাম বিক্রেতার দোকানে অথবা আর্টিস্টের সরঞ্জাম

বিক্রেতার দোকানে প্যারী প্লাষ্টার কিনতে পাওয়া যায়। এটা ময়দার মতো সাদা গুড়ো। জল দিয়ে কিছুক্ষণ রাখলে জমে শক্ত হয়ে যায় এবং শুকিয়ে গেলে ব্লটিং পেপারের মতোই কালি ও জলীয় পদার্থ শুষে নিতে পারে।

প্রথমে মজবুত কাগজটা থেকে কাঁচি দিয়ে এক ইঞ্চি চওড়া কয়েকটা ফিতে কেটে নাও। তারপর পিচবোর্ডটার একপাশ থেকে আড়াই ইঞ্চি চওড়া ও সাড়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা পীস্ কেটে নাও। এবার বাকি পিচবোর্ডের ওপরে কমপাস্ দিয়ে সাড়ে চার ইঞ্চি ব্যাসের একটা বৃত্ত বা সার্কেল এঁকে, কাঁচি দিয়ে গোল করে কেটে, একটা চাকা তৈরী করো। এবারে বৃত্তটার কেন্দ্র বা মধ্য বিন্দু থেকে দু'পাশে সিকি ইঞ্চি করে ছেড়ে, অর্থাৎ আধ ইঞ্চি ব্যবধানে দুটো সমান্তরাল লাইন টেনে, সেই লাইন দুটো ধরে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলো। এতে অর্ধবৃত্তাকার দুটো টুকরো পাবে। এই অর্ধবৃত্তাকার টুকরো দুটো এবং আগে কাটা লম্বা টুকরোটার ধারগুলো সিরিশ কাগজ ঘ'ষে মসৃণ করে দাও।

এবার অর্ধবৃত্তাকার টুকরো দুটো দু'পাশে রেখে সে দুটোর মাঝখানে ২½″ × ৬½″ মাপের পিচবোর্ডটা রেখে দু'পাশের পিচবোর্ড দুটোর গোল ধারের এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত বেঁকিয়ে, কাগজের ফিতেয় আঠা লাগিয়ে তিন টুকরো পিচবোর্ডই পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দাও। এতে সেটা অনেকটা নৌকোর মতো দেখতে হবে। এটাই হবে ব্লটারের ছাঁচ। কাগজের ফিতের আঠা শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ছাঁচটা একপাশে রেখে দাও।

নৌকোর খোলটার মধ্যে যতোটা ধরে তার তিনগুণ প্যারী প্লাষ্টার নিয়ে একটা পাত্রে রেখে গরম জলে দিয়ে কাদার মতো থকথকে করে মাখো। তারপর খোলটার কানা থেকে এক ইঞ্চি ছেড়ে কাদার মতো প্যারী প্লাষ্টার তার মধ্যে ঢেলে দাও। এখন রবার স্ট্যাম্পের হ্যাণ্ডেলটা প্যারী প্লাষ্টারের ওপরে ঠিক মাঝখানে খাড়া করে বসিয়ে, হাত দিয়ে ধরে রেখে, প্যারী প্লাষ্টার দিয়ে খোলের কানা পর্যন্ত ভরে দাও এবং প্যারী প্লাষ্টার জমে শক্ত হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত নাড়াচাড়া না করে একপাশে রেখে দাও।

প্লাষ্টার বেশ শক্ত হয়ে জমে গেলে কাগজের ফিতে দিয়ে আটকানো পিচবোর্ডের টুকরো তিনটে সাবধানে টেনে খুলে ফেলো এবং শুকিয়ে খটখটে না হওয়া পর্যন্ত তুলে রেখো। ঠিক ভাবে করতে পারলে সেটা কি রকম দেখতে হবে তা ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

প্যারী প্লাষ্টার বেশ খটখটে হয়ে শুকিয়ে গেলে সেটার আগাগোড়া, বিশেষ করে গড়ানে ধারটা, মিহি সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘ'ষে প্লেন করে দাও। এই ব্লটারটার হ্যাণ্ডেল ধরে সেটা লেখার ওপরে রেখে এধার-ওধার গড়িয়ে কালি শুকোতে হয়। সুতরাং গড়ানে দিকটা খুবই প্লেন হওয়া দরকার, নইলে সর্বত্র সমান ভাবে চাপ পড়বে না।

ব্যবহার করতে করতে যদি দেখো ব্লটারটা কালির দাগে ভরে গেছে এবং আগের মতো কালি শুষে নিচ্ছে না, তবে গড়ানে ধারটা আবার ঘ'ষে ঘ'ষে পাতলা এক স্তর প্লাষ্টার তুলে ফেলবে। তাতেই সেটা আবার কাজের উপযোগী হবে।

অল্প কথার গল্প

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

পুরনো কালের কথা।

রোম সম্রাটের দরবারে ছিলেন এক মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। দেশ জোড়া তাঁর নাম, তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পণ্ডিত্যের খ্যাতি।

সম্রাট খুব সমাদর করেন তাঁকে। শ্রদ্ধাভক্তি করে রাজ্যসুদ্ধ লোক।

পণ্ডিত লোক বটে, কিন্তু দেখতে ছিলেন তিনি কুৎসিত। ক্ষীণ, বেঁটে, বদখত চেহারা।

রাজকুমারীর তো ওঁকে দেখলেই হাসি পেত। কী কদাকার! এঁর পেটে এত বিদ্যা? এই নিয়ে আড়ালে কত হাসাহাসি, কানাকানি।

একদিন তো সে ঐ পণ্ডিত ব্যক্তিকে মুখোমুখি কথাটা বলেই ফেলল,—আপনি তো মশায় এতটুকু ক্ষুদে লিক্‌লিকে মানুষটি, দেখতেও কিম্ভূতকিমাকার! কিন্তু আপনার নাকি অগাধ পাণ্ডিত্য? আমার তো অবাক লাগে।

পণ্ডিত লোকটি হেসে বললেন,—রাজকুমারী, তোমার পিতা তো মদ খান এবং অতি উৎকৃষ্ট মদ। অতিথি-অভ্যাগতরা ঐ মদের কত প্রশংসা করেন। আচ্ছা, ঐ সেরা জিনিস কোথায় কোন পাত্রে রাখা হয়েছে বল তো?

রাজকুমারী জবাব দিল,—কেন? এক অন্ধকার কুঠরীতে, মাটির জালায়?

যেন খুব অবাক হয়েছেন এমনি ভাবে পণ্ডিত ব্যক্তি বললেন—বল কী? সে তো নেহাৎ গরীব-দুঃখীরাও রাখে! রাজবাড়িতেও কি সেই ব্যবস্থা? এখানে তো থাকবে সোনা-রুপোর পাত্রে, আর যখন জিনিসটাও সেরা।

কথাটা রাজকুমারীর মনে ধরল। অতএব ব্যবস্থাও করতে হ'ল। রাজকন্যার আদেশে ভৃত্যরা মাটির জালা থেকে মদ ঢেলে ঢেলে রাখল সব সোনার কলসীতে।

কিছুকাল পরের কথা। সেদিন কী এক উপলক্ষে রাজপ্রাসাদে উৎসব। অনেক মান্যগণ্য অতিথি উপস্থিত। ভোজসভায় মদ পরিবেশন করা হ'ল অতিথিদের। কিন্তু, ও মদ কেও মুখে দিতে পারল না। সব বিস্বাদ!

সম্রাট অবাক, অপ্রস্তুত। কী লজ্জা! কী লজ্জা!

কেন এমনটা ঘটল তা জানা গেল পরদিন। সোনার কলসে রাখাতেই মদটা ও-রকম বিস্বাদ হয়ে গেছল। রাজকুমারী তখন ঐ জ্ঞানী ব্যক্তিকে চেপে ধরল, কেন তিনি ঐ বদ পরামর্শ তাকে দিয়েছিলেন?

পণ্ডিত উত্তর করলেন,—রাজকুমারী, তবেই দেখ, উৎকৃষ্ট মদ যেমন খারাপ পাত্রেও থাকতে পারে—সুদৃশ্য পাত্রে রাখলেই বরং নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা—তেমনি পাণ্ডিত্য বেঁটে, কদাকার চেহারার মানুষের মধ্যেও থাকতে পারে। সুশ্রী লোকের তা নাও থাকতে পারে, কিংবা থাকলেও হয়ত তা কাজে আসে না।

একটি গল্প

শ্রীঅমর রাউত

এক চাষীর গোয়ালে বাঁধা ছিল একটা ছাগল, তার পাশেই ছিল একটা লাউ, আর কিছু দূরে পড়েছিল একটা রামদা। গভীর রাত্রে তারা ঝগড়া লাগল।

লাউ বল্লে— প্রভু বলে—লাউটা তো ভারী সুন্দর,
ডালে চাটনীতে এর কত না আদর!

শুনে ছাগল তো হেসেই অস্থির। বল্লে—কি লাউ! তার আবার আদর! প্রভু আমায় কত আদর করে জানিস্? বলে সে ছড়া কাটল -

'রামু' বলে ডাকে
কাছে কাছে রাখে,
স্নান করি প্রতিদিন।
ঘাস, ছোলা খাই,
কত স্নেহ পাই,
মোর চেয়ে তুই হীন।

ছাগলের কথা শুনে 'রামদা' দাঁড়িয়ে বল্লে—

নাম আমার 'রামদা'
শুনেছিস গুণ মোর?
বল্‌ছি তা' শুনে যা—
কত যে ছাগল, বাঁশ, ডালপালা
কেটে করি খান্ খান্।
প্রভু হেসে বলে—'রামদা'তে আছে
ভারী সুন্দর 'সান'!
কত না আদর, কত প্রয়োজন
তোরা বল দেখি ভাই!

ছাগল আবার বল্লে— তোর চেয়ে বুঝি আমি কোন্ গুণে
কম স্নেহাদর পাই?

লাউ মুখ ভেংচে বল্লে— 'কম স্নেহাদর পাই'
মিছে কথা তোর, প্রভু বলে তুই—
করিস্ তো খাই খাই।

ছাগল তো রেগেই আগুন। চোখ পাকিয়ে বল্লে—কী, আমি খাই খাই করি? তবে দ্যাখ্ আজ তোকেই খাব। এই বলে লাউকে খেতে শুরু করল। লাউ কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—

আমায় খাবি খা,
তোকেও খাবে, আমার মত
যাচ্ছি বলে তা'।

ছাগল বল্লে— প্রভু থাকতে আমায় খাবে?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ছাগল লাউকে খেতে শুরু করল।

ছাগল লাউকে খেয়ে ফেল্লে, একটুও ফেলে রাখলে না।

পরদিন চাষী গোয়ালে এসে দেখলে—লাউটা নেই। ভাবল, কোন চোর হয়ত লাউটা চুরি করে নিয়ে গেছে, তবে তো ছাগলটাও কোনদিন নিয়ে পালাবে! ভেবে, লোকজন ডেকে নিয়ে চলল সেটাকে কাটবার জন্যে। সঙ্গে নিল 'রামদা'খানা। একটু দূরে গিয়ে ছাগলের শিংয়ে, মুখে, দড়ি বেঁধে একজন টান দিয়ে ধরল। আর একজন সামনের পা দু'টো পিঠের উপর তুলে, পিছনের পা দু'টো আর এক হাতে টেনে ধরল। চাষী 'রামদা' খানা তুলে এক 'কোপ' মারল ছাগলের ঘাড়ে—কাটল না; আবার এক 'কোপ', কাটল না; তখন 'রামদা' হাসতে হাসতে ছাগলকে বল্লে—

জানিস্ কি তুই, প্রভুর কাছে
আমার কত দাম?

আমি রে তোর জীবন নেবো
'রামদা' আমার নাম।

চাগল মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভ্যা-ভ্যা করতে করতে বল্লে—

বেশ রামদা বেশ!
কেউ রবে না এ সংসারে
সবার হবে শেষ।

চাষী চার 'কোপ' দেবার পর ছাগল কাটল। বিরক্ত হয়ে চাষী বল্লে—না, 'রামদা'খানা এক্কেবারে গেছে, অনেক দিন হ'ল, এর 'সান' নষ্ট হয়ে গেছে। এবার নূতন একখানা গড়াতে হবে।

বিকাল বেলায় চাষী 'রামদা'খানা নিয়ে কামারবাড়ী গিয়ে হাজির হয়ে বল্লে—একখানা রামদা গড়ে দাও তো কামার ভাই! আর এখানায় গড়ে দাও একটা 'হাতুড়ী'।

সঙ্গে সঙ্গে কামার ভাই 'রামদা'খানা নিয়ে কামার শালের আগুনে ফেলে দিলে। তখন রামদা কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—

লাউ আর ছাগল তোরা
আয় ফিরে ভাই,
ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দিয়ে
মিতালী পাতাই।

রামদা পিটিয়ে তৈরী হ'ল একটা কয়লা-ভাঙা হাতুড়ী। চাষী নিয়ে বাড়ী ফিরল।

তা'হলে তোমরা বুঝতে পারছ, পৃথিবীতে নিজেকে বড় বলে মনে মনে গর্ব করা উচিত নয়!

ভাদুমণি

শ্রীনৃপেন আকুলি

ভাদুমণি ঘরে এলো আজ বুঝি তাই
উঠেছে নদীর বুকে মধুর সানাই।
আকাশেতে নীল চেলি উড়ে যায় তার,
আঁচলেতে দুলে ওঠে শালুকের ভার।

মনে হয় মধুপের গুঞ্জরনে—
কাঁকনের ধ্বনি তার কেয়ার বনে।
দোপাটীর রাঙা ফুলে চরণ দুটি
সবার উঠানে যেন রয়েছে ফুটি।

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ল্যাম্পো ও ডাইনিং-কার ॥

ক্যাম্পিগ্‌লিয়ায় আসবার প্রথম দিন থেকেই আমি ল্যাম্পোর ভাবভঙ্গী, চালচলন খুব ভাল করেই লক্ষ্য করি। ওর অনস্বীকার্য বুদ্ধি, ভালবাসার অভিব্যক্তি ও প্রকাশ ছাড়াও ওর আর যেটি আমি লক্ষ্য করেছিলাম, তা হ'ল ওর জীবনযাত্রার ভঙ্গীটি অনন্য—অন্যান্য কুকুরদের চেয়ে একেবারে অন্য রকম।

বিকেলের দিকে আমি যখন আপিস-ঘরে খুব বেশী কাজের চাপে থাকি ল্যাম্পোর ব্যবহারটা কেমন অদ্ভুত ঠেকে। বেলা দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত ও আমার ঘরের রেডিয়েটরের কাছে ওর সেই প্রিয় কোণটিতে পড়ে ঝিমুবে। তিনটে নাগাদ আচম্‌কা হেসে উঠবে, মাথা তুলে কান দুটো খাড়া করবে, তারপর ছুটে যাবে দরজার দিকে। তারপর নাক দিয়ে ঘ'ষে দরজাটা খুলে একেবারে অদৃশ্য। মিনিট দশেক বাদে ফিরে আসবে আবার। তখন বেশ খুশী-খুশী ভাব। দেখা যাবে, চোয়াল চাট্‌ছে। নিজের কোণটিতে গিয়ে শোবে। আবার একটানা ঘুম। অল্পক্ষণ বাদে সেই মূকাভিনয়ের একই দৃশ্যাবলী। দ্বিতীয়বারেও ফিরে আসে বেশ পরিতৃপ্তভাবে। আবার ঐ কোণটিতে গিয়ে গভীর ঘুম লাগাবে।

একদিন কৌতুহলবশতঃ অনুসরণ করে চল্লাম দেখতে কী ব্যাপার।

বেশ নিশ্চিত পদক্ষেপে সোজা একনম্বর প্ল্যাটফরমে গিয়ে দাঁড়াল ল্যাম্পো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই·টুরিন-রোম এক্সপ্রেস এসে পড়ে। মাথাটা উঁচু করে, চোখ দুটো গাড়ীর জানালায় নিবদ্ধ রেখে, কুকুরটা প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলে। তারপর থামে একেবারে ডাইনিং-কারের সামনে গিয়ে। রান্নাঘরের জানলার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আশ্চর্য হয়ে দেখি, ডাইনিং-কারের রাঁধুনী ল্যাম্পোর দিকে চেয়ে হেসে নীচু হয়ে ওর দিকে বেশ কিছু মাংস মেশানো হাড় ছুঁড়ে দেয়। ল্যাম্পো তৎক্ষণাৎ সবটুকু খেয়ে আমার আপিস-ঘরে ফিরে আসে। দশ মিনিট বাদে আবার হয় ল্যাম্পোর দ্বিতীয় অভিযান। আবার আমি ওকে অনুসরণ করি। এবারে ও গিয়ে উপস্থিত হ'ল ২নং প্ল্যাটফরমে। তক্ষুনি সেখানে এসে দাঁড়ালো রোম-জেনোয়া-টুরিন এক্সপ্রেস। মুহূর্তে ল্যাম্পো ডাইনিং-কার খুঁজে বের করে, ঠিক রান্নাঘরের জানালার সামনে গিয়ে ভৌ-ভৌ করে রাঁধুনীকে ডাকল। সাদা টুপি-পরা লোকটা ল্যাম্পোকে দেখেই ওর দিকে বেশ হাসি মুখেই কিছু পাঁচমিশেলী ছোট হাড় ছুঁড়ে দিল। ল্যাম্পো তক্ষুনি সেগুলি চর্বিতচর্বণ করতে লাগল। খিদেটা বেশ ভালই ছিল দেখলাম।

ভুরিভোজের শেষে বুদ্ধিমান জন্তুটি আমার আপিসে ফিরে এল। কোন জন্তুর এমন অদ্ভুতরকম স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বোধ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি না।

এটা সুস্পষ্ট যে, কোনদিন হয়ত আকস্মিকভাবে ল্যাম্পো ডাইনিং-কারের সামনে উপস্থিত ছিল এবং রাঁধুনীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু উচ্ছিষ্টের উপহার পেয়েছিল। সেই থেকে স্থান, কাল ও দাতার চেহারা সম্বন্ধে ওর কোন ভুলচুক হ'ত না। ওর নির্ভুল অনুভূতির সাহায্যে ও প্রতিদিন ঠিক ডাইনিং-কার যুক্ত এক্সপ্রেস গাড়ীর সামনে পৌঁছে যেতো।

কিন্তু একটা জায়গায় ল্যাম্পোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত রহস্যাবৃত থেকে যায়। সেটা হ'ল : অভিজ্ঞ ষ্টেশন মাষ্টারের মত ও যে কি করে এক্সপ্রেস গাড়ীর টাইম টেবিল জানতে পারে তা বুঝে উঠতে পারি না। হতে পারে ও লক্ষ্য করেছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঐ গাড়ী দুটি এখানে আসে, এবং কতকটা প্রবৃত্তির তাড়নায় ও সময়টা আঁচ করে নেয়। তবুও সমস্যা রহস্যাচ্ছন্ন থাকে। কারণ, বহুবার কোন-না-কোন বিশেষ কারণে, হয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন আকস্মিক বাধা-বিপত্তিতে এই এক্সপ্রেস গাড়ীগুলি যথাসময়ে না এসে, কোন মালগাড়ী বা প্যাসেঞ্জার গাড়ীর পরে আসে, ও কুকুরটা কিন্তু সেদিন একটুও নড়ে না। ও যেন আগে থেকে জানতে পেরে যায়। তারপর ঠিক যখন গাড়ীর তীক্ষ্ণ বাঁশী শোনে, তখনই বোঝে ডাইনিং-কার সমেত এক্সপ্রেস-গাড়ী প্ল্যাটফরমে এসে পড়ল বলে এবং তখনই লাগায় ভোঁ-দৌড়।

ল্যাম্পো গাড়ীর কোচের চেহারাও বেশ চেনে। অন্যান্য কোচ থেকে ডাইনিং-কারের

চেহারার পার্থক্যও ওর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝে নেয়, তাই সেটা খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধেই হয় না ওর।

॥ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কুকুর ॥

প্রতিদিন ল্যাম্পো নির্দিষ্ট সময়ে এক্সপ্রেস গাড়ীর অপেক্ষায় বেরিয়ে যায়। রাঁধুনীরা এতদিনে ওকে ভালই চিনে গেছে এবং তারা ওকে খুশী করবার মতই যথেষ্ট খেতে দেয়। যদি কখনও রান্নাঘরের লোকেরা কাজের ব্যস্ততায় ওর কথা ভুলে গিয়েছে এবং জানলায় দেখা দেয়নি, অথচ এদিকে গাড়ী ছেড়ে দিল, তখন ল্যাম্পো গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়য় এবং যতক্ষণ না ওরা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওকে কিছু ছুঁড়ে দেয়, ততক্ষণ পরিত্রাহি চেঁচাতে থাকে।

ভাগ্য সর্বদা প্রসন্ন থাকে না। কতবার এমন হয়েছে যে, ল্যাম্পো বৃথাই গাড়ীর পেছনে দৌড়েছে যৎকিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টের আশায়। শেষে ক্ষুব্ধ নিরুদ্যম হয়ে ফিরে আসে আমার আপিসে। চিন্তাক্লিষ্ট দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে যেন বলতে চায়: আজ আমার দিনটা খুবই অলক্ষুনে ছিল।

এইরকম কিছু অভিজ্ঞতার পরে ও যেন দুর্দিনের জন্য ভাবতে শিখল। ফলে, যেদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকতো এবং ও যথেষ্ট পরিমাণে উচ্ছিষ্টের উপহার পেতো, সেদিন মনের আনন্দে যত ইচ্ছে খেয়ে, বাদবাকীটা একটু একটু করে মুখে করে তুলে এনে জমিয়ে রাখত, বিশ্রী গোপনীয় সব জায়গায়। তারপর যখন আবার খিদে পেতো, চলে যেতো ওর সেই গুপ্তস্থানে।

এ সম্পর্কে একটা মজার ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকবে। একদিন ও যখন চলন্ত গাড়ীর সঙ্গে দৌড়চ্ছিল, গাড়ী থেকে কেউ এক থলে ভর্তি কিছু ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। ল্যাম্পো প্রথমটা তার ভেতরে নাক ঢুকিয়ে শুঁকল, তার পরেই বুঝতে পারল ওতে মাংস নেই। থলেটা ছিল শুধু কমলালেবুর খোসায় ভর্তি। এ ব্যাপারে ও ভীষণ চটে গেল। রেগে, ফুলে, প্ল্যাটফরম থেকে আপিস ঘরে ফিরে এল। আমি সমস্তই দেখছিলাম। হাসতে হাসতে বললাম, এবার ওরা তোমায় কেমন বোকা বানালো ল্যাম্পো? ও আমার দিকে এমন ঘৃণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকালো, যেন বলতে চাইলো, নিজের চরকায় তেল দাও, পরের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে যেয়ো না।

আর একদিনের ঘটনার কথা বলি। একদিন ও যখন ওর খাবার হাড়গুলো লুকিয়ে রাখছিল ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসেবে, আমি তখন ভাবলাম একটু মজা করা যাক। অর্থাৎ যেই এক জায়গা থেকে মাংস নিয়ে ও অন্য জায়গায় রাখতে যাবে, আমি সেই ফাঁকে, ওর অলক্ষ্যে, বাকী সব হাড়গুলো তুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখলাম। ল্যাম্পো ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখল জায়গাটা

সব শূন্য! এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে ও আমার পায়ের উপর পড়ে, ওর চার পায়ের থাবায় আমার পা আঁকড়ে ধরে চীৎকার সুরু করে দিল। বলতে চাইলো: চালাকী কোরো না বাছা, আমার হাড়-মাংসগুলো সব ফেরত দাও।

ল্যাম্পোর এই বুদ্ধি এবং এমন পরিষ্কার বুঝে ফেলা দেখে, আমি ওর অনুরোধ এড়াতে পারিনি, বাধ্য হয়ে ওঁর দাবী অনুযায়ী হাড়গুলো আবার যথাস্থানে এনে রেখে দিই। ল্যাম্পো তৎক্ষণাৎ তার সেই মহামূল্য সম্পদের দিকে তাকিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু একবারে তো অতগুলো মুখে করে একসঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না, তাই ওগুলো মুখে করে টানতে টানতে নিয়ে চলল কোন নিরাপদ জায়গায়।

অল্পদিনের মধ্যেই ষ্টেশনসুদ্ধ লোক ও এইসব ডাইনিং-কার যুক্ত দিনের বেলার এক্সপ্রেস গাড়ীর নিয়মিত কর্মী ও যাত্রীরা সকলেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আমাদের এই কুকুরটির ক্রিয়াকলাপ ও অভ্যাসগুলি ভাল করেই জেনে গেল। বেশ কিছুদিন ধরে দেখা গেল, রেলের কর্মী ও আশপাশের সকলের গল্পের একমাত্র বিষববস্তু হ'ল ল্যাম্পো।

যেসব যাত্রীরা লোকমুখে ল্যাম্পোর গল্প শুনেছে, তারা ক্যাম্পিগ্‌লিয়া দিয়ে যেতে অথবা এই ষ্টেশনে এলেই ল্যাম্পোর কথা জিজ্ঞাসা করত। তারা ওর ঝানু বুদ্ধি ও চালচলনের কথা শুনে অশ্চর্য হয়ে যেতো এবং ওকে দেখকে চাইত। কেউ ওর সঙ্গে কথা বলত, কেউ ওর পিঠ চাপড়াতো, আবার কেউ বা ছবি তুলে নিতো।

অজ্ঞাত, পরিত্যক্ত ও বর্ণসঙ্কর কুকুর ল্যাম্পো ক্রমেই প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলতে লাগল। এবং অকস্মাৎ অপরিচিত সামান্য বেওয়ারিশ কুকুর থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে খ্যাতির উজ্জ্বল সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠে গেল।

এইভাবে আরও কিছুদিন কেটে গেল। ক্রমে এদিক-ওদিক থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে আমরা ল্যাম্পোর রহস্যাবৃত আদিপর্বের কিছু তত্ত্ব আবিষ্কার করলাম। লেগহর্ণ মেন ষ্টেশনের কর্মচারীরা কিছুদিন ধরে একটা নোংরা মত সাদা বর্ণসঙ্কর কুকুরকে প্রায়ই দেখতো। কুকুরটা বেশ চালাক-চতুর এবং প্রাণবন্ত ছিল। কিন্তু তার চোখে ছিল কেমন একটা বিপদের ছায়া। ছোট সাইজের এই বেওয়ারিশ কুকুরটাকে প্রায়ই দেখা যেতো রেলওয়ে লাইনের ওপরে কিছু খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে। রেলওয়ে কর্মী বা যাত্রীরা ওর দিকে কিছু ছুঁড়ে দিলে ও তক্ষুনি গোগ্রাসে সেটা গিলে নিতো। একদিন ওখানকার ষ্টেশন মাষ্টারের নজর পড়ল ওর দিকে। তিনি এই ভেবে ভয় পেলেন যে, এইরকম একটা কুকুর ষ্টেশনের আশেপাশে থাকলে হয়ত যাত্রীরা বিরক্ত হবে। তাই তিনি শহরের কুকুর-ধরা সংস্থার কর্তৃপক্ষকে খবর দিলেন, এই কুকুরটিকে সরাবার জন্য। কুকুর-ধরা সংস্থার লোকেরা এসে যখন প্রায় ওর গলায় ফাঁস পরিয়ে

দেয়-দেয়, এমন সময় কয়েকজন রেলের কর্মী ও কুলি দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে কুকুরটাকে সাবধান করে দেয়। তারপর ওরা এমনভাবে দৌড়তে শুরু করে দিল, যাতে কুকুরটা ওদের পেছনে দৌড়য়। শেষকালে ওরা কুকুরটাকে ঘাড় ধরে একটা মালগাড়ীতে বসিয়ে দিল। গাড়ীটা ঠিক তখনই ছাড়ছিল। কুকুর-ধরার লোকটা তো রেগে আগুন; হাতে ওর তখনও ঝুলছে শূন্য ফাঁস। চারদিকে যাত্রী ও দর্শকদের চলছে তখন বিদ্রূপ ও অট্টহাস্য।

এখন কথা হচ্ছে, লেগহর্ণ কী ওর জন্মভূমি, না সেখানে ও কোথা থেকেও ভেসে এসেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর সন্দেহের মধ্যেই থেকে যায়।

হতে পারে ল্যাম্পো কোন একটা বেওয়ারিশ কুকুর-মায়ের বাচ্চা। যখন থেকে ও নিজে চরে-টরে খেতে শিখল, পারিবারিক দীনতা ও ভিক্ষাবৃত্তির হীনতায় ক্ষুব্ধ ও ক্লান্ত হয়ে ও ভাগ্যের সন্ধানে একদিন বেরিয়ে পড়েছিল। সেদিন ওর হৃদয় ছিল আশাতে পূর্ণ আর চিন্তা ছিল স্বপ্নে ভরা।

(ক্রমশঃ)

॥ বর্ষা সিজন্ ॥

অনিরুদ্ধ

[সাধারণতঃ অনেকে যেমন বাংলা বলার সঙ্গে অযথা প্রায়ই ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে, এই কবিতাটিও সেই ঢঙে লেখা।]

Rain এসেছে morning-এ আজ
　　ক'দিন ছিলো dry,
Lunch-এতে তাই জমবে very,
　　খিচুড়ি সাথে fry—
Bring the পাঁপর, Cauliflower,
জিভেতে যে হচ্ছে Shower,
Kick-off করো চিন্তা পড়ার
　　Hail the বরুণদেব!
ফুলুরি আছে? Cold water?
ভূতের Story শোনাও Brother
Basic জিনিস ঠিকটি রেখে
　　Mind যা বলে করো।

Father-Mother কেউ বাড়ী নেই
তাই তো বলি this সুযোগেই
Dance and Sing প্রাণটি খুলেই
　　Enjoy the life.
লুডো লে আও, Board ক্যারমের
কিংবা আনো Packet তাসের
চানাচুরটি খেতে খেতে
　　Trump ও Double দেবো।
ওরে ব্বাবা, Father-Mother
ঐ যে আসেন, পালাও Brother
Good boy সব হও দেখি man
　　Book-টি খুলে বসো।

অ্যাপোলো ১১ ও চাঁদ

শ্রীপারমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

'ঐ তো ছোটো চাঁদ,
ছুটি মুঠোয় ওরে
আনতে পারি ধরে।'
দাদা শুনে হেসে কেন
বললে আমায়, 'খোকা',
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।
চাঁদ যদি এই কাছে আসত
দেখতে কত বড়ো।' (রবীন্দ্রনাথ)

যতো দূরেই থাকুক, আর যতো বড়ই না হোক না কেন, আজ কিন্তু চাঁদ আর আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে নয়। যা ছিল মানুষের কল্পনারও অতীত তা সম্ভব হয়েছে গত ২১শে জুলাই সকাল ৮টা ২৬ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে। মানুষ চাঁদে পৌঁছেছে।

প্রথম যে মানুষটি চাঁদের বুকে নামেন তাঁর নাম নীল আর্মস্ট্রং। কুড়ি মিনিট পরে তাঁকে অনুসরণ করেন এডউইন অ্যালড্রিন। এই সময় তাঁদের অপর সঙ্গী মাইকেল কলিন্স মূল-মহাকাশযানটিতে থেকে চাঁদের কক্ষপথে ঘুরতে থাকেন। মানুষের এমন দুঃসাহসিক অভিযানের পরিচয় আগে কখনও পাওয়া যায়নি।

চাঁদ সম্বন্ধে যুগ যুগ ধরে মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। বিজ্ঞানের চর পেছনে লেগে জেনে নিয়েছে এর গোপন ঠিকানা। পৃথিবী থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল (২৪০,০০০) দূরে তার অবস্থান। তার বয়স প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর। পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তার সময় লাগে ২৭⅓ দিন। এই প্রদক্ষিণের সময় একটা পিঠ সে পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে রাখে। তার অপর পিঠ দেখা যায় না। পৃথিবীর চারভাগের এক ভাগ হচ্ছে চাঁদের আয়তন। সেখানকার অভিকর্ষ আমাদের এখানকার এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র। চাঁদে আবহাওয়া নেই। গ্রহ-নক্ষত্রের জগতে চাঁদ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। কখনও কখনও এর ওপর যে কালো কালো ছোপ দেখা যায়, তা হ'ল বড় বড় গহ্বর ও পাহাড়।

বিখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ১৬১০ সালে প্রথম টেলিস্কোপের সাহায্যে চাঁদকে দেখেন। তখনই তিনি বলেছিলেন যে, চাঁদ মসৃণ ও সমতল নয়। এমনকি ঠিক গোলাকারও নও ; বরং এটি বন্ধুর ও নানা গহ্বরে পূর্ণ।

পৃথিবীর মতো চাঁদেরও নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলোতে সে ভাস্বর। চাঁদের দিন

যে চন্দ্রযানটি চাঁদে নেমেছিল তার মডেল। ২৪ ফুট উঁচু এই মডেলটি নয়া দিল্লীতে এখন দেখানো হচ্ছে।

ও রাত্রি অতি দীর্ঘ। পৃথিবীর ১৪ দিনে সেখানকার একদিন, আর ১৪ রাত্রে সেখানকার এক রাত্রি।

আবহাওয়া না থাকার দরুন চাঁদের তাপমাত্রা খুব বেশী ওঠানামা করে। দিনে চাঁদ ১২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম হয় এবং রাত্রে তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের ১৭২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচে।

বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে একমত যে, চাঁদে জলের অস্তিত্ব নেই। তবে অনেকে মনে করেন চাঁদের মাটির নীচে বরফের আকারে জল থাকলেও থাকতে পারে।

আজ থেকে বারো বছর আগে মহাকাশযাত্রার তোড়জোড় শুরু হয়। ১৯৫৭ সালে ৪ঠা অক্টোবর রাশিয়া স্পুটনিক-১ মহাশূন্যে পাঠায়। তারপর ১৯৬১ সালে রুশ মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন প্রথম অজানাকে জানার উৎসাহে দ্যুলোকে পাড়ি দেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ

করা যেতে পারে যে, প্রথম মহিলা মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা রুশ দেশেরই নাগরিক।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ১৯৬১ সালে প্রস্তাব করেন যে, বর্তমান দশকের মধ্যেই আমেরিকাকে মানুষ পাঠাতে হবে চাঁদে। ক্রমে ক্রমে শুরু হয় মার্কারি ও তারপর জেমিনি অভিযান। এ থেকে বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পান যা অ্যাপোলো অভিযানে বিশেষ কাজে লাগে। অ্যাপোলো অভিযানের লক্ষ্য হলো চাঁদ জয় করা। প্রথম ছয়টি অভিযানে মানুষকে পাঠানো হয়নি। অ্যাপোলো-৭ প্রথম মানুষকে নিয়ে মহাকাশে যায়। তারপর গত ডিসেম্বর মাসে অ্যাপোলো-৮ চাঁদের চারিধারে ঘুরে আসে। অ্যাপোলো-৯ চন্দ্রযানকে মহাশূন্যে কি ভাবে নামানো-ওঠানো যায় তার পরীক্ষা করে। গত মে মাসে অ্যাপোলো-১০ চাঁদে নামার চূড়ান্ত মহড়া দেয়। মার্কিন মহাকাশচারী টমাস ষ্ট্যাফোর্ড ও ইউজিন সারন্যান এই যানটি করে চাঁদের নয় মাইল ওপর পর্যন্ত যান।

গত ১৬ই জুলাই রাত্রি ৭টা ২ মিনিটে তিনজন মার্কিন মহাকাশচারী—নীল আর্মষ্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডউইন অ্যালড্রিনকে নিয়ে অ্যাপোলো-১১ কেপ কেনেডি থেকে চাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। চাঁদে পৌছতে সময় লাগে ১০২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট্ ৪২ সেকেণ্ড। সেখানে আর্মষ্ট্রং ও অ্যালড্রিন থাকেন ২১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট ১৭ সেকেণ্ড। তাঁদের দুই ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগে চাঁদের মাটিতে দরকারী কাজকর্ম সারতে। তারপর তাঁরা চন্দ্রযানে ফিরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম করেন। চাঁদে যাতায়াত করতে সবসুদ্ধ ১৯৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ২১ সেকেণ্ড সময় লেগেছিল। তাঁদের উদ্দেশ্যকে সফল ও সার্থক করার জন্যে এই সময়ে প্রায় চল্লিশ হাজার বিজ্ঞানী, এঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ নিরলস কাজ করে যান।

আর্মষ্ট্রং, অ্যালড্রিন ও কলিন্স-এর মহাশূন্যে পরিক্রমা এই প্রথম নয়। এর আগেই তাঁদের মহাকাশযাত্রার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমেরিকার ৪৯ জন মহাকাশচারীদের মধ্যে থেকে চাঁদে পাঠানোর জন্যে তাঁদের বেছে নেওয়া হয়। এই অভিযানে প্রস্তুতি হিসেবে তাঁদের দৈনিক বারো ঘণ্টা করে মহড়া দিতে হ'ত। আর্মষ্ট্রং, অ্যালড্রিন ও কলিন্স প্রত্যেকের বয়সই ৩৯ বছর।

চাঁদে পা দিয়ে আর্মষ্ট্রং ও অ্যালড্রিনের মনে হয়, চাঁদের পিঠটা যেন পাউডারের তৈরী। এর রং অনেকটা কাঠকয়লার গুঁড়োর মত কালচে। যে চাঁদকে অনেকে শুভ্র ও উজ্জ্বল বলে জানতো তাদের এই ধারণা আজ বদলে গেল।

আর্মষ্ট্রং ও অ্যালড্রিন চাঁদের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটু ভিজে-ভিজে মাটি দেখতে পান। এই ব্যাপারটি বিজ্ঞানী-মহলে কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশের জনৈক বিজ্ঞানীর

ARMSTRONG
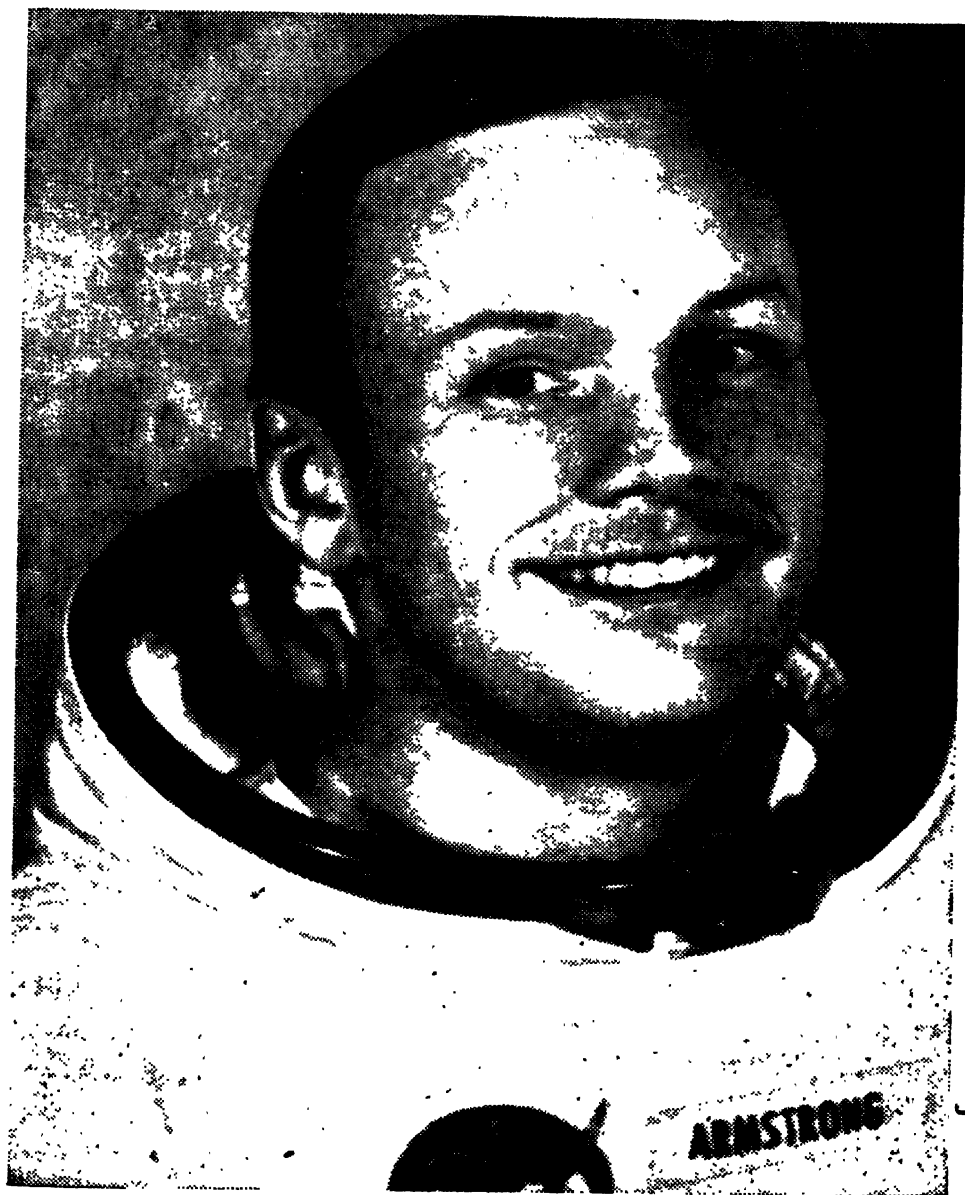
অভিমত এই যে, চাঁদের মাটিতে ১১৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জল কিছুতেই তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। চাঁদ বা মহাকাশের বিশেষ অবস্থায় যা থাকতে পারে তা হচ্ছে গ্লিসারল। গ্লিসারল সাধারণ গ্লিসারিণের বিশুদ্ধ অবস্থা। এই রকম অনেক নতুন তথ্য আরও জানা যাবে।

অ্যাপোলো-১১ অভিযানে মানুষ যেমন চাঁদে চলা-ফেরা করে বেড়িয়েছেন, অ্যাপোলো-১৬ প্রকল্পের মহাকাশচারীরা সেখানে মোটরে চড়ে ঘুরে বেড়াবেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তাঁরা চারশো পাউণ্ডের একটি ছোট জীপ রকেটে তুলে নিয়ে যাবেন। ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে জীপের চারটি চাকা ঘোরানো হবে। এতে মহাকাশচারীগণ ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পথ ঘুরবেন।

মহাকাশ অভিযানের এই অভিনব সাফল্যের মূলে বহু দেশের বহু মনীষীর যে দান আছে তা আজ ভোলা যায় না। এঁদের মধ্যে রুশজ্যোতিবিজ্ঞানী ভোসলভস্কি, ব্রিটিশ বিজ্ঞানী নিউটন ও কেপলার এবং জার্মান বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আর্মষ্ট্রং ও অ্যালড্রিন চাঁদের মাটি ও পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে এনেছেন। চাঁদে জল, বাতাস বা আবহাওয়া নেই বলে সেখানে পৃথিবীর মত শিলা-মৃত্তিকার অবক্ষয় ঘটে না। তাই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সেখানকার পাথর থেকে সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে যাবার জন্যে চাঁদকে মাঝপথের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা বিজ্ঞানীরা তাও অনুসন্ধান করে দেখছেন। চাঁদের পর আমেরিকার লক্ষ্য মঙ্গল-গ্রহ। বিজ্ঞানীরা আশা করেন ১৯৮২ সালের মধ্যে সেখানে পৌছানো সম্ভব হতে পারে।

অ্যাপোলো অভিযানের বার্তা আমেরিকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে জাগিয়েছে প্রবল উৎসাহ ও উত্তেজনা। ফলে সেখানকার খেলনার কারবার হঠাৎ খুব ফেঁপে উঠেছে। মহাকাশযাত্রার জন্যে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের অনুকরণে নানা রকম ছোট বড় খেলনা তৈরী করা হচ্ছে। মার্কিন ছেলেমেয়েরা এখন মেকানোর সাহায্যে চন্দ্রযান তৈরী করে যে আনন্দ পাচ্ছে তা অভাবনীয়।

প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকার মত আমেরিকার খরচ হয়েছে অ্যাপোলো অভিযানে। কেউ কেউ বলছেন, এত খরচ ক'রে মানুষকে চাঁদে পাঠিয়ে লাভটা কি? এঁদের মধ্যে বিখ্যাত দার্শনিক বার্টাণ্ড রাসেল, ঐতিহাসিক টয়েনবি এবং বিজ্ঞানী সি, ভি, রমনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্যারাডের একটি কথা মনে পড়ে। তাঁর বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পর একজন ফ্যারাডেকে জিজ্ঞাসা করেন: "কিন্তু আপনার এই বিদ্যুতের প্রয়োজনটা কি?" ফ্যারাডে পাল্টা প্রশ্ন করেন: "বলতে পারেন একটি নবজাত

শিশুর কি প্রয়োজন ?" বস্তুতঃ মানুষ চাঁদকে জয় করেছে মানুষেরই কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এই কৃতিত্বটি ভবিষ্যতে যাতে মানুষের নানা কল্যাণে লাগে তারই চেষ্টা চলেছে। তাই মহাকাশ অভিযানের বিপুল ব্যয়কে অপচয় বলে ধরাটা ঠিক হবে না।

বাস্তবিক, মানুষ নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম ক'রে গ্রহনক্ষত্রলোকের কথা জানতে চাচ্ছে—এটা কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। ১৪৯২ সালে কলম্বাস নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের আশায় সমুদ্রযাত্রা করেন। তারপর এই শুরু হ'ল ব্রহ্মাণ্ডের অজ্ঞাত রহস্যভেদের বৃহত্তম অভিযান।

সমুদ্রের স্বাদ

শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

খোকন মাকে বলল ডেকে,
কেন গো মা, থেকে থেকে
　　পুরী যাবো, দীঘায় যাবো বলো ?
　　লুকিয়ে যে রয় ঘরের পাশে,
　　তাকেই তুমি খোঁজার আশে,
যোজন যোজন পথের দিকে চলো ?
　　আষাঢ় মাসে মেঘের ডাকে
　　　　সমুদ্দুর কি দূরে থকে ?
　　ডাক শুনে এই শহরে দেয় লাফ।
　　ভোরের বেলায় বাইরে দূরে
　　দেখি মা ঠিক সমুদ্দুরে—
　　জল থৈ থৈ, জলের নেই'কো মাপ।
　　যে এসেছে নিজে নিজে
　　তাকে দেখে মন না ভিজে
　　গাঁয়ের যোগী পায়নাকো মা ভিখ্।
　　জানি ছুটির পেলে গন্ধ
　　　　বাপির সঙ্গে ভালোমন্দ,
　　　　কাথায় হবে পুরী যাওয়াই ঠিক।

কর্পূরের মতো

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ।। উপন্যাস ।।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

জলের তলায় কিছু ঠেকছে কি? তীর থেকে ত্রিলোচনবাবু ক্রেণম্যানকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরেও ঈষৎ উদ্বেগের স্বর।

পান্সী নৌকার ওপর থেকে জবাব এল—হ্যাঁ, নীচে কিছু ঠেকছে, মনে হচ্ছে ভারী একটা কিছু তলায় আছে।

স্কুলের গাড়ী বলে মনে হচ্ছে?

ক্রেণম্যান নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তবু জবাব দিলে—ঠিক কি করে বলবো,—হতেও পারে স্কুলের গাড়ী।

হতেও পারে? ক্রেণম্যান বলে কি? তা'হলে মাধু সিং স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে তিলুড়ির জলে গিয়ে পড়েছে। মনটা হায় হায় করে উঠলো!

পান্সী নৌকো থেকে ফাঁপা তারে বাঁধা একটা পাঁউরুটি জলের তলায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ পাঁউরুটিটা পারা বোঝাই, জলের ভেতর কিছু ডুবে থাকলে বোঝাবুঝির জন্যে পারদের এই ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের সকলেরই বুক উড়ে গেছে! করুণতম ঘটনার সাক্ষী হতে মন চাইছিল না। বিশ্রী, ভারী, বিষণ্ণ কেমন একটা অনুভূতিতে মন ভরে গেছে। অথচ প্রকৃতির কোথাও কোন বিষাদের চিহ্ন নেই। রোদে চারিদিক ভরে গেছে, চকচকে রুপোলী

রোদ যেন অন্য দিনের তুলনায় আজ একটু উজ্জ্বল বলে মনে হলো। আকাশও বেশ পরিষ্কার, নির্মেঘ, নীল। এই যে কাল সন্ধ্যায় এতবড় একটা সর্বনাশা, করুণ বিপর্যয় ঘটে গেল—প্রকৃতির সেদিকে কোন খেয়াল নেই। ভারী আশ্চর্য লাগে—এতগুলি লোকের বেদনার স্বল্পতম সাক্ষ্যও প্রকৃতি গায়ে মাখলো না।

পারা বোঝাই পাঁউরুটিখানা জলের তলায় পেঁাছে কিছু সংকেত জানালো নাকি? উদ্বেগে, আগ্রহে, বেদনায়—অর্ধমৃত নিশ্চুপ সেই মানুষগুলির বুকের ঢিব্ঢিব্ আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। এমনই স্তব্ধ হয়ে সবাই অপেক্ষা করছে—সময় বুঝি নিশ্চল হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জমাট বাঁধা এক মহান্ বেদনা শুধু মূর্ত হয়ে উঠেছে!

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ করতে করতে একটা জিপ গাড়ী সেখানে এসে হাজির হলো। পুলিশের গাড়ী। জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছে ত্রিলোচনবাবুর কাছে। মাধু সিং আর বাচ্চাদের খেঁাজ পাওয়া গেছে।

এদিকে পান্সী নৌকোর ওপর ক্রেণম্যান রূপজামের সকলকে হতাশ করেছে। মস্ত একটা পাথরের চাঁই তুলেছে ক্রেণের সাহায্যে।

পুলিশের গাড়ী থেকে সাব্ ইন্সপেক্টরে জাতীয় একজন অফিসার নেমে ত্রিলোচন-বাবুকে খেঁাজ করলেন। দারোগাসাহেব আর ত্রিলোচনবাবু ক্রেণম্যানের কাজকর্ম দেখছিলেন। স্টেশন-ওয়াগনের বদলে ক্রেণ একটা ভারী পাথর তুলেছে দেখে যারপর-নাই হতাশ হয়েছেন।

সাব্ ইন্সপেক্টার বললেন—মাধু সিং-এর খবর পাওয়া গেছে, চন্দ্রপুরা থানায় সে আজ অতি প্রত্যুষে গেছে। একটু পরেই সে স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে এখানে আসবে।

ছেলেরা? ছেলেরা সব আছে তো? আমাদের খোকা?

হ্যাঁ—ছেলেরা সবাই ভালো আছে,—তাদের সকলকে নিয়েই মাধু সিং এখানে আসছে। থানায় মাধু সিং-এর এবং অন্য সকলের এজাহার নেওয়া হচ্ছে। এজাহার লেখানো শেষ করে সে সোজা আসবে রোটাংডি থানায়, তারপর সে যাবে রূপজামে।

সুতরাং তিলুড়ির মোড় দিয়েই তাকে ফিরতে হবে, চন্দ্রপুরা থেকে আসতে হলে লুন্টির পথ হয়ে তিলুড়িতে আসতেই হবে।

কোথায় ছিল মাধু সিং? ছেলেদের নিয়ে কোন্ পথেই বা সে অন্তর্ধান করেছিল, চন্দ্রপুরাতেই বা গেল কেন?

সকলের মনে যখন স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে, তখন কিন্তু রৌদ্রকরোজ্জ্বল উন্মুক্ত আকাশের তলায় প্রকৃতির এমন রূপোলী রঙ খারাপ লাগালো না। বরং প্রকৃতির এই খুশি

ভালই লাগলো। দুঃস্বপ্নের পর জেগে উঠে বাচ্চা যেমন তার মাকে দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে বড় বড় চোখ মেলে, জোরে আনন্দের নিঃশ্বাস ফেলে, তেমনি আমাদেরও বুকের ভার কমে গেল, হাল্কাভাবে আমরাও এতক্ষণে যেন একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম!

কিন্তু মাধু সিং এখনো আসছে না কেন? এত দেরি হচ্ছে কেন? গভীর জলের তলা থেকে ডুবন্ত জিনিসপত্র কেমন করে তোলে—সেটা জানার কৌতূহল আর নেই; শুধু মাধু সিং কখন আসবে—সেই প্রতীক্ষায় ছটফট করছি। দূরে কোনো মোটরের শব্দ হলেই কান পেতে থাকি—ওই বুঝি মাধু সিং এল।

এই রকম অধীরতার মধ্যে সত্যি সত্যিই জনতা—কি মেয়ে, কি পুরুষ—সকলেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—ওই, ওই মাধু সিং আসছে—মাধু সিং আসছে, স্কুলের গাড়ী আসছে! ওই যে—ওই, ওই—

স্টেশন-ওয়াগনের হর্ণ সকলেরই চেনা, অন্ততঃ মায়েদের সকলের। তাদের অশান্ত বুক কাঁপতে লাগলো—কেমন দেখবে তাদের বাচ্চাদের, আহা সারারাত এই শীতের সময় না জানি কত কষ্ট হয়েছে, খাওয়া হয়নি, ঘুম হয়নি, বাচ্চাদের মুখ শুকিয়ে গেছে—

তিলুড়িতে বীরুয়ার চায়ের দোকানে এসে মাধু সিং বীরুয়ার কাছে এখানকার উদ্বেগের কথা শুনেই সে সোজা গাড়ী নিয়ে এখানে হাজির হয়েছে।

ব্যাপার কি মাধু সিং?

ফিরতে পেরেছি যে সে আপনাদের আশীর্বাদের জোর।—মাধু সিং বলতে লাগলো। মাধু সিং-এর মুখের ভাষা আমি বাংলা করে বলে যাচ্ছি।

মাধু সিং-এর কথা তখন শোনে কে। ছেলেরা হুড়দাড় করে নেমে পড়েছে গাড়ী থেকে, মা-বাবার কোলে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে, কান্নায়-খুশিতে মেলামেশার এক উজ্জ্বল নাটক যেন। এ দৃশ্যটিও দেখবার মতো। পৃথিবীতে সন্তান-স্নেহের মতো পবিত্র জিনিস বোধ হয় আর কিছু নেই। ছেলেকে কোলে জড়িয়ে মা-বাবা আনন্দে চোখের জল ফেলছে—ছেলেও মার কোলে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে—এ দৃশ্য দেখলেও পুণ্য হয়।

উত্তেজনা একটু কমলে দারোগাসাহেব আর ত্রিলোচনবাবু মাধু সিংকে একটু ফাঁকা জায়গায় ডেকে নিয়ে গেলেন। আমিও গেলাম সেদিকটায়।

মাধু সিং দারোগাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলতে লাগলো—ঠিক যে কোথায় গিয়েছিলাম জানি না। তবে ডাকাতেরা আমাদের সবাইকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

সে কি?

এ অবশ্য বিশ্বাস করার কথা নয়, বিকেল বেলা দশটা ছেলে-সহ আমার মতো শক্ত-সমর্থ

একজন ড্রাইভারকে বন্দী করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তবু গতকাল বিকেলে এই জিনিস ঘটেছে।

রোটাংডি থানা থেকে বেরিয়ে রোজ যেমন আসি, তেমনি গাড়ী চালিয়ে আসছি, তিলুড়ি হ্রদের কিছু আগে দেখি পথের ওপর আড়াআড়িভাবে একটা ভ্যান পথ আটকে দাঁড়িয়ে। ভ্যানের ধারে-কাছে কেউ নেই, ভ্যানের ড্রাইভারকেও দেখতে পেলাম না, হর্ণ দিলাম, কোনো ফল হলো না। গাড়ী থামিয়ে নেমে দেখতে গেছি যেই—আচমকা ওই ভ্যান থেকে কয়েক-জন ডাকাত বের হয়ে আমাকে জাপ্টে ধরলে ; প্রথমেই হাত মুখ বেঁধে ভ্যানের মধ্যে পুরলে, পরে পিচমোড়া করে বেঁধে ফেললে।

আমার অবস্থা দেখে ছেলেরা কান্না জুড়ে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন গুণ্ডা ছেলেদেরও হাত মুখ বেঁধে ফেললো। (ক্রমশঃ)

পনেরোই আগষ্ট

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

অনাদিকালের রুদ্ধ দুয়ার খুলে
শুভ্র-সকালে হেসেছ' জ্যোতির্ময়।
স্ফটিক হৃদয়, সাগর উঠেছে দুলে,
স্বপ্ন অমৃত এনেছ হে নির্ভয়!
মন্ত্রিত সুরে বিজয় তূর্য ওই—
শত শহীদের শৌর্য-কাহিনী বলে ;
দীপ্ত শপথে হৃদয়ে জাগে মা-ভৈঃ
হতাশা তিমিরে আশার মানিক জ্বলে।

পনেরো আগষ্ট—নূতন সূর্য জাগে
নব জীবনের শুভ-ইংগিতে, গানে
গন্ধে, বর্ণে—পুষ্প কলিরা ফোটে,
সুপ্ত পাখিরা জেগেছে পুলকে, প্রাণে।
পনেরো আগষ্ট! কর্ম-যজ্ঞ শালে
জাগাও মানবে, ত্যাগের দীক্ষা দাও!
কি পেয়েছি, আর পাইনি বিগত কালে
ভেবে লাভ নেই। সত্য-শিঙা বাজাও।

আমেরিকার নাম আমেরিকা কেন?

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

আমেরিকা আবিষ্কার করেন ক্রিষ্টোফার কলাম্বাস—একথা আমরা সবাই জানি। আর তাই যদি হয়, তা হ'লে তো এই নতুন দেশের নাম তাঁর নামেই হওয়া উচিত ছিল। অন্ততঃ কোন একটি জায়গা, একটি জেলা বা বিভাগ বা একটি প্রদেশ। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তার কিছুই হয়নি। অনেক পরে একটি Stateকে Columbia নাম দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তাও অনেক অনেক পরে।

এর কারণ হচ্ছে কলম্বাস বেরিয়েছিলেন পশ্চিম মুখে ভারতবর্ষের পথ খুঁজতে, আর আমেরিকা পৌছে তিনি ভেবেছিলেন ভারতবর্ষে তিনি পৌঁছে গাছেন। তবুও তিনি আমেরিকার আসল ভূখণ্ডে পেঁাছোননি, তিনি পেঁাছেছিলেন মেক্সিকো উপসাগর ও ক্যারেবিয়ান সাগরের কাছের কয়েকটি দ্বীপে। তাঁর বার বার যাত্রার একবারও তিনি আমেরিকার আসল ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন নি। সেটা করেছিলেন তাঁর পরবর্তী লোকেরা।

এই পরবর্তী লোকদের একজন ছিলেন আমেরিকো ভাস্পুসি। এই ভাস্পুসি ছিলেন একজন ইতালীয় ভদ্রলোক, তিনিও ছিলেন ওঁদেরই মত একজন দুঃসাহসিক যাত্রী, যিনি বেরিয়েছিলেন তাঁর ভাগ্য-পরীক্ষায়। কলম্বাসের যাত্রার পাঁচ বৎসর পরে ১৪৯৭ সালে ভাস্পুসি যাত্রা করেন পশ্চিম দিকে, প্রথমে পৌছোন ক্যানার দ্বীপপুঞ্জে, তারপর এই মেক্সিকো উপসাগর ও ক্যারিবিয়ান সাগরের কাছাকাছির দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে তিনি আসল আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেন।

ভাস্পুসি ছিলেন লেখক, বেশ সুলেখক, যা কলম্বাস ছিলেন না। তিনি ঘুরে-ফিরে এসে তাঁর এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেন। মুদ্রাযন্ত্র তখন জার্মানীতে কেবলমাত্র উদ্ভাবিত হয়েছে! তাঁর এই ভ্রমণ-কাহিনীতে আমেরিকার আসল ভূখণ্ডে প্রথম পদার্পণ করবার দাবী তিনিই করেন। কথাটা সত্য কিনা আজ অবশ্য তা প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু কথাটা টিকে গেছে। তাঁর একখানা পুস্তকের নাম ছিল, 'ভাস্পুসির নয়া দুনিয়া' সেই সময়ে জার্মানীতে ছিলেন এক মানচিত্র নির্মাণকারী আর মানচিত্রও তখন হাতে তৈরী হতো। দুনিয়ার মানচিত্রে নতুন দুনিয়া তখনও স্থান পায়নি। কিন্তু এই মানচিত্র নির্মাণকারী একটি সারা দুনিয়ার মানচিত্র প্রস্তুত ক'রে, তাতে নতুন আবিষ্কৃত দেশের নাম দিয়েছিলেন, 'আমেরিকা, আমেরিকা ভাস্পুসির নয়া দুনিয়া।' সেই থেকেই এই নামটাই আমেরিকার গায়ে আটকে গেছে।

মেঠুড়ে

টেনিস

উইম্বলডনকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর টেনিস রসিকদের মধ্যে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল, পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানের পর তা শেষ হয়েছে। পেশাদার ও অপেশাদার খেলোয়াড়দের সংমিশ্রণে সদ্য সমাপ্ত উইম্বলডনের দ্বিতীয় আসরের পর এখন টেনিস নিয়ে নানা আলোচনা চলেছে। টেনিস বিশেষজ্ঞরা এবার আশা করেছিলেন, টনি রোচ অথবা জন নিউকোম্ব এবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হবেন।

উইম্বলডন খেলা আরম্ভের দিন খবরের কাগজে খবর ছিল : রড লেভার তাঁর হাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁকে ব্যথা-নিরোধক ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হট ট্রিটমেণ্টও করা হচ্ছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ করে এবং ব্যথা কাটিয়ে উঠে টেনিস জগতে 'রক হাম্পটন রকেট' নামে অভিহিত গতবারের বিজয়ী রড লেভারই আবার উইম্বলডন জয় করেছেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভারতের প্রেমজিতলালের কাছে ছাড়া চতুর্থ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে তিনি আর কারো কাছে বেগ পাননি।

অ্যামেচার জীবনে দু'বার এবং পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে দু'বার, মোট চার বার উইম্বলডন জয় যুদ্ধোত্তর টেনিসের দুর্লভ সম্মান। শুধু যুদ্ধোত্তর টেনিস কেন, ১৯২২ সাল থেকে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড উঠে যাবার পর আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষ খেলোয়াড় চারবার উইম্বলডনের চ্যাম্পিয়নশিপ পাননি।

আমেরিকার ডোনাল্ড বাজের পর পৃথিবীর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৬২ সালে লেভার 'গ্রাণ্ডস্লাম'-এর অধিকারী হয়েছিলেন। আজ প্রথম সারির খেলেয়োড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রড লেভার আবার গ্রাণ্ডস্লাম লাভের মুখে এসে পৌঁচেছেন। উইম্বলডন জয়ের আগে তিনি অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন। এখন গ্রাণ্ডস্লামের জন্যে বাকি শুধু 'ফরেস্ট হিলস' অর্থাৎ আমেরিকার চ্যাম্পিয়নশিপ জয়।

যোগ্যতার বিচারে অষ্ট্রেলিয়ার মার্গারেট কোর্টকেই দেওয়া হয়েছিল মহিলাদের বাছাই তালিকায় এক নম্বর আসন, যদিও আমেরিকার মিসেস বিলি জিন কিং ছিলেন গত তিন বছরের উইম্বলডন বিজয়িনী। কিন্তু মার্গারেট কোর্ট সেমি-ফাইনালে ব্রিটেনের মিসেস অ্যান জোনস-এর কাছে হার স্বীকার করেন। দু'নম্বর বাছাই বিলি জিন কিংকে ফাইনালে হারিয়ে অ্যানই লাভ করেন মহিলাদের চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৯৬৭ সালে ফাইনালে বিলি জিনের কাছে অ্যান হার স্বীকার করেছিলেন। গতবার সেমি-ফাইনাল অ্যান পরাজিত হয়েছিলেন বিলির কাছে। এবার পরাজয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মানও লাভ করলেন। ১৯৬১ সালে অ্যাঞ্জেলা মোর্টিমোরের উইম্বলডন জয়ের পর গ্রেট ব্রিটেনের দ্বিতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে অ্যান জোনসের এই কৃতিত্ব সত্যিই গর্বের।

উইম্বলডনে এবার ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যর্থ ভূমিকার নিরানন্দকে আনন্দময় করে তোলেন প্রেমজিতলাল দ্বিতীয় রাউণ্ডে রড লেভারের সঙ্গে তাঁর জীবনের স্মরণীর খেলার জলুসে। প্রেমজিতের ভাগ্য একটু সহায় এবং শরীর পুরোপুরি ঠিক থাকলে, পৃথিবীর পয়লা নম্বর খেলোয়াড় রড লেভারকে হয়তো দ্বিতীয় রাউণ্ডেই প্রেমজিতের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ত।

ক্রিকেট

ম্যাঞ্চেস্টারের প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড দশ উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারাবার পর লর্ডস-এ দু' দেশের দ্বিতীয় টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে। লর্ডস টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অবশ্যই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। টসে জয়ের পর তাঁদের ব্যাটিং প্রশংসার দাবি রাখে, কিন্তু প্রায় পরাজয়ের মুখ থেকে সরে গিয়ে ইংলণ্ড এই টেস্টের শেষ মুখে যেভাবে জয়ের সম্ভাবনার মধ্যে এসেছিল তা প্রশংসা করার মতন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৩৮০ রানের উত্তরে যখন মাত্র ৩৭ রানের ভেতর ইংলণ্ডের চারজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসমান আউট হলেন, তখন অনেকেই ধারণা করেছিলেন, ইংলণ্ডের 'ফলো অন' নিশ্চিত। কিন্তু নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় হাম্পশায়ার, অ্যালান নট এবং অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থের অসাধারণ দৃঢ়তায় খেলার মোড় ঘুরে যায়। হাম্পশায়ার ও ইলিংওয়ার্থ সেঞ্চুরি করেন। বোলার হিসেবে পরিচিত ইলিংওয়ার্থের জীবনে এটাই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি।

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস যখন ৩৪৪ রানে শেষ হ'ল, তখন ড্র খেলা সম্পর্কে কারোই সন্দেহ ছিল না। খেলার ফলাফল শেষ পর্যন্ত ড্র-ই হয়।

* * *

লীডসের হেডিংলে মাঠে তৃতীয় এবং শেষ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে তিরিশ রানে হারিয়ে ইংলণ্ড আবার 'রাবার' পেয়েছে।

ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই সিরিজে যেমন চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত ক্রিকেটের পরিচয় মেলেনি, তেমনি খেলা দেখার জন্যে দর্শকদের মধ্যে উৎসাহের জোয়ারও আসেনি। হেডিংলেতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে যখন ৩ উইকেটে ২১৯ রান এবং জয়ের জন্যে তাদের দরকার ৮৪ রান, তখন কে ভেবেছিলেন সাতটা উইকেট নিয়ে তাঁরা এই রান করতে পারবেন না, কিন্তু লয়েডের হঠাৎ আউট এবং সোবার্সের শূন্য রানে বিদায়ের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পতন শুরু হয়। জয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ৩১ রান কম থাকতে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

সিরিজ জয়ের মূলে ইংলণ্ডের অবশ্যই কৃতিত্ব আছে। বিশেষ করে নতুন অধিনায়ক রে. ইলিংওয়ার্থের পক্ষে। ইংলণ্ডেরও তিন চারজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় এ সিরিজে খেলতে পারেন নি। কাউড্রে ও মিলবার্ন আহতের তালিকায়, ব্যারিংটন অসুস্থ। সুতরাং ইলিংওয়ার্থ তাঁর সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে যেভাবে দলকে জয়যুক্ত করেছেন, তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নতুন খেলোয়াড়, যাঁরা অনেক সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এবার ইংলণ্ড সফরে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফেড্রারিক এবং চার্লি ডেভিস ছাড়া কেউ তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। তবে নতুন উইকেট-কিপার হিসেবে মাইক ফিণ্ডলে প্রতি খেলায় উন্নতির নজিরে দর্শকদের সাধুবাদ পেয়েছেন। পুরনোদের মধ্যে ক্লাইড লয়েডস অবশ্যই ভালো খেলেছেন, কিন্তু অধিনায়ক সোবার্স তাঁকে ছ' নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলিয়ে তাঁর ওপর সুবিচার করেন নি। অন্ততঃ দুটো টেস্টে লয়েডকে প্রধানতঃ বোলারদের সঙ্গে শেষ দিকে ব্যাট করতে হয়েছে।

ফুটবল

লীগের পনেরটা খেলায় অপরাজিত এবং সমান পয়েন্টের অধিকারী দুই শীর্ষ ক্লাব মোহন-বাগান ও ইস্টবেঙ্গল চ্যারিটি হিসেবে আয়োজিত তাঁদের শেষ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলার শেষ মিনিটে জয়সূচক গোল করে ইস্টবেঙ্গল অপরাজিত অবস্থায় একক লীগ কোঠার শীর্ষস্থান বজায় রেখেছে। বিতর্কমূলক গোলে খেলার জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হওয়ায়, মোহন-বাগানের খেলোয়াড় ও সমর্থকরা মরসুমের প্রথম পরাজয়কে খুশী মনে মেনে নিতে পারেন নি। খেলাটিতে দু' দলের খেলোয়াড়রাই গোল করার বহু সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করতে না পারলেও, হাবিব ও পরিমল দে-র একটা করে দর্শনীয় ভলি, এবং সেই শট বাঁচানো,

এ, বি, গাঙ্গুলী এবং আলোক চ্যাটার্জির একটা করে হেডের ক্ষেত্রে উন্নত নৈপুণ্যের পরিচয় মিলেছে।

* *

এবছর কুমারটুলি ইনষ্টিটিউট, ভবানীপুর ক্লাব এবং চৈতালী সংঘ এই তিনটি ক্লাব নিজ নিজ বিভাগীয় লীগে চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব অর্জন করেছেন। এই তিনটি ক্লাবের ভেতর দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন কুমারটুলি ইনষ্টিটিউটের প্রথম ডিভিসনে খেলায় অধিকার অর্জন ক্রীড়ামোদিদের কাছে বিশেষ আনন্দের সংবাদ।

প্রথম ডিভিসনের নামকরা ক্লাব হিসেবেই ভবানীপুর ক্লাব ফুটবলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু কালের চক্রে ভবানীপুর ক্লাবকে প্রথম ডিভিসন থেকে দ্বিতীয় ডিভিসনে এবং দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় ডিভিসনে নেমে যেতে হয়। এবার আবার তৃতীয় ডিভিসনে লীগ জয় করে ভবানীপুর ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলার অধিকার অর্জন করেছে।

সহ্য করা শেখ

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

সহ্য করা শেখরে, গোপাল, সহ্য করা শেখ,
নয় দুনিয়ায় তিষ্ঠোতে তুই পারবি না তিলেক।
মিছিমিছি নিন্দে করে? করুক না যে চায়
দে যেতে দে, গরম জলে ঘর কি পোড়ান যায়,
পান খেকে চুন খসলে যদি চোখ পাকাতে চাস,
ঘটাবি তুই তাতেই গোপাল, নিজের সর্বনাশ।
উত্তেজনায় ছলকে উঠে রক্ত যে রে ঘাড়ে,
ব্লাডপ্রেসারটা হয়তো আবার চেগে উঠতে পারে।
কথা-কাটাকাটির থেকে লাঠালাঠি হলে
তাকেই লোকে চায়ের কাপে তুফান তোলা বলে।
মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখিস, যে যাই করুক দোষ
তাতে কোনো লজ্জা আছে, করে কি কেউ রোষ?
পুঁথির পাতায় তাই তো দেশের বিজ্ঞ জনে কহে
রচনাতেও লিখেছিস তো, যে সহে সে রহে।
তোর নাকেতে রাম-ঘুষি এই লাগিয়ে দিলাম এক
করবি নে রাগ, এখন থেকে সহ্য শিখে দেখ।
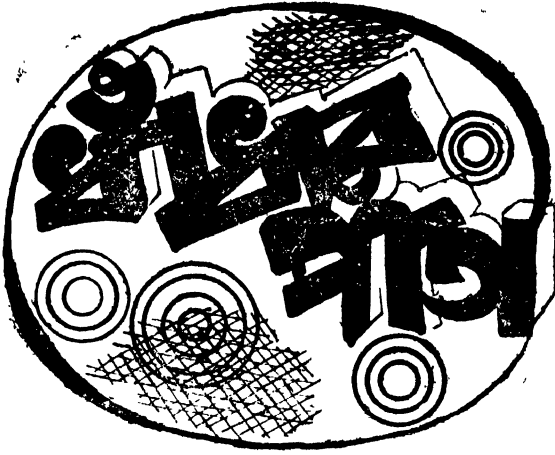
১। তিন অক্ষরের এমন একটি শব্দ বলতো যার প্রথম অক্ষর এবং একটি প্রতিশব্দের প্রথম অক্ষর মিলিয়েই সেই শব্দটি হবে।

২। এক অক্ষরের এমন একটি জিনিসের নাম করো, যার সঙ্গে একটি অক্ষর যোগ করলে অন্য একটি জিনিস হবে, এবং আর একটি অক্ষর যোগ করলে একটি ফল হবে।

৩। দুই অক্ষরের এমন একটি পশুর নাম করো, যা উল্টে দিলে পাখির নাম হয়।

৪। দুই অক্ষরের এমন তিনটি শব্দ বার করো, যাদের শেষ অক্ষর বাদ দিলে তাদেরই প্রতিশব্দ হয়।

৫। দুই অক্ষরের এমন তিনটি শব্দ বার করো, যাদের সঙ্গে এক-একটি অক্ষর যোগ করে তাদেরই প্রতিশব্দ হয়।

৬। চার বর্ণে স্থান এক ভারাত ভিতরে,
শেষার্ধেও তার প্রায় স্থান অর্থ ধরে ;
প্রথম দুইটি মিলে যে কথাটি পাই,
ভাল হোক মন্দ হোক তাহা কিন্তু চাই।

৭। দিনে একবারও না—প্রতি সপ্তাহে আমি একবার যাই,
প্রতি মাস আর বৎসর-এ—কয়বার যাবো বল তো ভাই ?
আমি কে তাও বলা চাই। —শ্রীবিনয় বাগচী

৮। থাকা ভাল, পাওয়া দোষ—পেলে হয় আপসোস।

৯। পৃথিবীর কোন্ পুষ্টিকর খাদ্যে একটুও ভেজাল নেই ?

—শ্রীমিতা বসু

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গতমাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। বিছুটি ২। আছাড় ৩। ডাবর

বৃষ্টি ! বৃষ্টি !! বৃষ্টি !!!

শ্রাবণের ধারা ঝরে পড়ছে—মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আকাশ গঙ্গা হয়ে গেল। কিন্তু এই বর্ষাঋতুর এই তো রূপ। চারিদিকে কলকল—ছলছল! যতকিছু মলিনতা, রুক্ষতা, শুকনো ঝরা মরা পত্র পুষ্প সব ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সতেজ সজীবতার সন্ধান। ফসল ফলে উঠবে, নদী ভরে উঠবে, সব কিছু উজ্জ্বল, উচ্ছল। তাই তো বর্ষাঋতুকে আমরা বলি, 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল।' অবিরাম বর্ষণ শেষে মাটির বুক ঠাণ্ডা করে বর্ষাঋতু চলে যাবে, তখন দেখা দেবে শরতের অরুণ আলোর অঞ্জলি। কিন্তু বর্ষণমুখর দিনগুলিও আমাদের পরমাদরের অতিথি।

তোমরা যারা পল্লী অঞ্চলে থাকো—তারা শুনেছ কি বৈরাগীর একতারা বাজিয়ে ভক্তি-সঙ্গীত? ছোটবেলায় যখন দেশের বাড়ীতে যেতাম—ভোরের মিষ্টি বাতাস গায়ে লাগতো, আর কানে আসতো বৈরাগীর মধুর কণ্ঠ: 'চাঁদ চাঁদ চাঁদ শ্যামের বামে চাঁদবদনী দাঁড়ালো।' এই চাঁদের সঙ্গে চাঁদবদনী অর্থাৎ শ্রীরাধাকে তুলনা করা হয়েছে, আর চাঁদ হলেন শ্রীকৃষ্ণ—শ্যামচাঁদ তাঁর আর একটি নাম!

চাঁদকে নিয়ে, তার সুন্দর আলো নিয়ে, মানুষের কত না জল্পনা, কল্পনা, তুলনা। গানের কলি রচনা থেকে মা'র ছেলে ভোলানো ছড়া পর্যন্ত—

আয় চাঁদ আয়,
বাঁশবনের ভিতর দিয়ে
নীল সাগরে সাঁতার দিয়ে
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

এই চাঁদ হলো মা'র খোকন। আবার কত লোভ দেখানো—

মাছ কাটলে মুড়ো দেবো
ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো
.........টি দিয়ে যা।

তার মানে সুন্দর চাঁদ তাঁর আলোর সমারোহ নিয়ে এসে খোকনের সঙ্গে খেলবে।...এইসব

কল্পনা দীর্ঘদিন ধরে শেষ হলো সেদিন। চাঁদমামা এলেন না, নড়লেন না। অবশেষে আমরাই তোড়জোড় করে যাত্রা করলুম তার আবিষ্কারে। তবে ব্যাপারখানা ভাবো তো? অবিশ্যি আমি যখন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, তার অনেক আগেই তোমরা ঘটনাটা শুনেছ, সংবাদপত্রে পড়েছ, যাওয়া-আসার সবকিছু কাহিনী। এই যাত্রা পর্বে ব্যয় ও তার সাজসরঞ্জামের জন্যও কত পড়েছে তাও পড়েছ। তাছাড়া এই মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়াও তো কম কথা নয়! আর কি অবিশ্বাস্য ভয়ংকর এই যাত্রা! যাত্রী তিনজনের যেমন শিক্ষা গ্রহণ, তেমনি অভূতপূর্ব সাহস। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সফল হলো। তোমরা জানলে চিনলে সেই তিনজন সাহসী বীরকে—যাঁরা ইতিহাসে ও মানুষের মনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

বই-এর পাতা থেকে—

"রাত্রি সার্ধ দ্বিপ্রহর। অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু পরিষ্কার। বজরার পাহারাওয়ালা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, একবার ঢুলিতেছে। তীরে একটা কশাড় বন ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া একব্যক্তি তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায়। প্রতাপ রায় দেখিলেন প্রহরী ঢুলিতেছে। তখন প্রতাপ রায় আসিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলেন। প্রহরী জলের শব্দ পাইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'হুকুমদার!' প্রতাপ রায় উত্তর করিলেন না। প্রহরী ঢুলিতে লাগিল। নৌকার ভিতরে ফষ্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়া ছিলেন। তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া বজরার মধ্য হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন একজন স্নান করিতে নামিয়াছে।

এমন সময় কশাড় বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল। বজরার প্রহরী গুলীর দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রতাপ তখন যেখানে নৌকার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া ওষ্ঠ পর্যন্ত ডুবাইয়া রহিলেন।"

এই কথাগুলি পড়তে তোমাদের নিশ্চয় ভালো লাগবে। লিখেছেন আমাদের কাছে যিনি সাহিত্য-সম্রাট বলে সম্মানিত—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যে বই থেকে উদ্‌ধৃতিটুকু নেওয়া হয়েছে তার নাম 'চন্দ্রশেখর'। একটি টুকরো ছবি, তবু এইটুকু পড়তেই কৌতূহল জাগে। সাহিত্যিক যখন উপন্যাস রচনা করেন, তখন তার মধ্যে তুলে ধরেন কত চরিত্র, নিপুণ হাতে আঁকেন কত চিত্র। তাতে লেখা থাকে কত বিচিত্র ঘটনা। সব মিলিয়ে চিত্রটি হয় সম্পূর্ণ। তোমরা আরো বড় হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সঙ্গে পরিচিত হবে—তখন দেখবে কি অমূল্য রত্নের ভাণ্ডার তোমাদের জন্য সাজিয়ে রেখে গেছেন তিনি। বহু বিভিন্ন চরিত্র তাঁর সাহিত্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁদেরই একজন প্রতাপ রায়।

বাংলা দেশে তখন নবাবী আমলের শাসন। দিল্লীর বাদশাহীর গৌরব-রবি তখন অস্তমিত।

ইংরেজ বণিক সুবা বাংলায় অনেক দিন বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছেন, এবার তাঁর স্বপ্ন দেখছেন রাজনৈতিক প্রভুত্বলাভের। নবাবের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ আসন্ন—এমনি যুগের কথা বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন চন্দ্রশেখর গ্রন্থে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তখন অনিশ্চয়তা আর বিশৃঙ্খলা—তা সত্ত্বেও বাঙ্গালীদের মধ্যে সেদিন শৌর্যমান পুরুষের অভাব হয়নি। ইংরেজের বন্দুক তুচ্ছ করে বাঙ্গালীর লাঠি সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিল, অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে। ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন নিতান্ত স্বার্থপর অর্থলোভী, নৈতিক দিক থেকেও তাঁরা ছিলেন অনেকখানি নীচুতে। এমনি একজন অন্যায়কারী ইংরেজ কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রতাপ যে শৌর্যেয় পরিচয় দিয়েছিলেন—বাঙ্গালী মাত্রই তার জন্য গৌরব বোধ করবে।

তোমরা যখন এই গ্রন্থ পড়বে তখন তার মধ্যে পাবে নবাবী শাসনের অবসানে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপনের কাহিনী, অবক্ষয়ের যুগ কিন্তু তারই মধ্যে পাবে শৌর্যে-বীর্যে দৃপ্ত পুরুষসিংহদের কথা। এঁদের কথা চিরদিন মনে রাখার কত।

শুভেচ্ছাসহ···

তোমাদের মধুদি'

সম্পাদক: শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০'৬০ পয়সা

অপরূপ রূপ তায় আধো আধো হাসি

আলোক চিত্র :— সুনন্দা সেনগুপ্ত

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্র *

৫০শ বর্ষ]　　আশ্বিন ঃ ১৩৭৬　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

পুণ্যফল

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

সেদিন বোধহয় আম-বারুণীর ছিল ব্রত।
গঙ্গা নাইতে লোক চলেছে শত শত।
রিক্স, ট্যাক্সি, ঘরের গাড়ি সারে সারে
আসছে, যাচ্ছে, জমছে কেবল ঘাটের ধারে।
তেলিপাড়ার বামুন-গিন্নী রিক্স ডাকে।
রিক্সওলা দেড়টি টাকা ভাড়া হাঁকে।
চেঁচিয়ে বুড়ী বল্ল, "কাহে এৎনা মাঙ্‌তা?
নিয়োগী-ঘাট আধা মাইল—নেহি জান্‌তা?
পরব্‌ ব'লে না-হয় নিবি বারো আনা।
মওকা মিল্‌লে কাটিস্‌ গলা আছে জানা।"

রিক্সওলা নাম্‌ল তখন পাঁচ সিকিতে;
বুড়ী রাজী হ'ল একটি টাকা দিতে।
গিন্নীর সাথে আছেন বৌমা, ক্ষুদে হাতি,
তার পেছনে চারটে হোঁৎকা নাতনী-নাতি।
হুড়্‌মুড়িয়ে উঠল সবাই রিক্সখানায়;
রিক্সওলা গররাজী হয় রিক্স-টানায়।

বুড়ি বলে, "টেনেই দেখ্ না—তুলোর বস্তা।
একটা টাকা রিক্স-ভাড়া নয়কো সস্তা।"…
কখনো আস্তে কখনো হুন্,
ঠুন্-ঠুন্-ঠুন্-ঠুন্ ঠনাৎ ঠুন্—
ঘণ্টা বাজিয়ে রিক্স ছোটে।
রিক্সওলার হাসি কই ঠোঁটে?
ঘাড়টা নামিয়ে, পিঠ্‌টা বেঁকিয়ে
টানছে ভিড়ের ভেতর দিয়ে।
ডেঁপো ছেলেদের ঠাট্টা শোনে;
কচ্ছে গজগজ আপনার মনে।
কপাল বেয়ে পড়ছে ঘাম;
দিচ্ছে ভুলিয়ে বাবার নাম।

গঙ্গার তীরে পোয়াতে রাত্রি,
গিশগিশ কচ্ছে চানের যাত্রী।
ধাক্কাধাক্কি, হাঁক্‌ডাক, হৈ-চৈ।
ঘোলা জল জোয়ারের কচ্ছে থৈ থৈ।
কষ্টে ভেদ ক'রে জনতার জঙ্গল,
পৌঁছল ঘাটেতে বামুনীর দঙ্গল।
বৌমা বাচ্চারা আগেই নেমে,
ভিড়ের মাঝখানে রইল থেমে।

"এ বুড়্‌ঢী মা, জল্‌দি ভাড়া।"…
"থাম্ মুখপোড়া, দিচ্ছি দাঁড়া।"…
আঁচলের খুঁট্‌টা গিন্নী খুলে,
গুন্‌ল একমুঠো খুচরো তুলে,
রিক্সওলার হাতে দিয়ে
নিমেষে মিলালো তল্পি নিয়ে।

দু'-দু'বার গুনে একে একে
নব্বই পয়সা বেচারা দেখে।
তারি মধ্যে একটা সিকি
বেজায় ঘষা, অচল ঠিকই।
পাড়্‌ল গালি পয়সার শোকে
বুড়ীটা আর অদৃষ্টকে।
মুষ্‌ড়ে খানিক রইল দুখে;
খৈনি বানিয়ে পুর্‌ল মুখে।
যেম্নি গদিটা ঝাড়তে গেছে,
অম্নি প্রাণটা উঠল নেচে।
একটি আধুলি, চাবির থোলো—
গদির কোণায় নজরে প'লো।
বৌমার খুঁট খুলে পড়েছে ওটা।
পুণ্যফলের শুক্‌নো বোঁটা!

* * *

ফিরতি পথের যাত্রী মিলল, ভাড়া দু'গুণ
ছুটল রিক্স—ঠন্-ঠন্-ঠনাৎ—টুন্-টুন্-ঠুন্-ঠুন্।

ডাকাতের গল্প

শ্রীসুমিতচন্দ্র মজুমদার

'দাদু, আমায় গল্প বলো', ছোট্ট খোকন দাদুর গায়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চশমাটা নিতে চাইল।

'উঃ, কি ডাকাত ছেলে রে বাবা, তা বল্—কি গল্প শুনবি?' দাদু জিজ্ঞেস করেন।

খোকন বললে, 'ডাকাতের গল্প,—ডাকাতের গল্প বলো দাদু।'

'তুই-ই তো একটা ডাকাত, আবার অন্য ডাকাতের গল্প শুনবি কি রে!'

'বলো তুমি।' বলে খোকন হাঁক দিলে দিদিকে, 'দিদি গল্প শুনবি আয়।'

খুকু ছুটে এসে বসল দাদুর পায়ের কাছে। দাদুকে প্রশ্ন করলে, 'কিসের গল্প দাদুভাই?'

খোকন চোখ বড়ো বড়ো করে বললে, 'ডাকাতের রে দিদি, একেবারে সত্যিকারের ডাকাত।'

'সত্যি নাকি দাদুভাই।' এবার অবাক হবার পালা খুকুর।

'হাঁ দিদিভাই', দাদু গল্প আরম্ভ করলেন, 'তখন আমি মফস্বলের একটা কলেজে পড়াতাম। গ্রাণ্ট ট্রাঙ্ক রোডের একধারে ছিল আমাদের কলেজ আর থাকবার জায়গা। মাঝখান দিয়ে অন্য একটা রাস্তা চলে গেছে শহরের দিকে। শহরের থেকে কিছু দূরে চাষের জমি। সামনের রাস্তা পেরিয়ে বনজঙ্গল। সেখানে থাকে শুধু কয়েক ঘর চাষী-মজুর। সন্ধ্যে নামার পর থেকেই আমাদের অঞ্চলটা জনশূন্য হয়ে পড়ত। একটু বেশী রাতে একা যেতেও ভয় হ'ত। পাতার খসখসানি, মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক, অতি সাহসী লোকও ভয় পেত।

'সেদিন অমাবস্যার রাত্রিতে কি ভীষণ বৃষ্টি! ঘরের বাইরেই যাওয়া দায়। আর সেই সঙ্গে ঝড়। তারই মাঝে চুরি হয়ে গেল একজনের বাড়ীতে। অনেক কিছু নিয়েই পালিয়েছে চোরেরা। বাড়ীর চাকরের মুখ বাঁধা ছিল কাপড় দিয়ে—চেয়ারে বসিয়ে দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধেছে। বাড়ীতেও কেউ ছিল না সেই রাত্রে।

'যাই হোক এই চুরির পর সকলেরই মনে ভয়—এবার কার বাড়ীতে কি হয়! কেউ আর বাড়ী থেকে বেড়াতে যেতেও ভরসা পায় না। এর মধ্যেই শোনা গেল, ডাকাতের এক বিরাট দল আসবে। ভয়ে আমাদের বুক গেল শুকিয়ে। পালা করে রাত জেগে পাহারার ব্যবস্থা হ'ল।

'কয়েক দিন বাদে এল আমার পালা। প্রত্যেক রাতেই মনে হয়, আজ-ই বুঝি ডাকাতের দল এসে পড়ল।

'কলেজের বিরাট সীমানার এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। চাঁদের আলোয় অনেক দূর

পর্যন্ত দেখা যায়। ভোর হতেও দেরি নেই। এরই মধ্যে আমরা হঠাৎ দেখতে পেলাম ছায়ার মতন কি যেন রাস্তার ও-পারে জঙ্গল পেরিয়ে চলেছে। আমার এক জায়গায় জমা হলাম—হাঁক পাড়লাম, 'কে যায়?' কোন উত্তর নেই। শুধু শুনতে পেলাম বিদ্রূপ করে কে যেন বলছে, 'হ্যাট হ্যাট।'

'বুঝলাম এই সেই ডাকাতের দলের লোক। আরো একটু দূরে মশালও দেখতে পেলাম। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে, দুটো বিরাট শরীর সাদা কাপড়ে ঢেকে এগিয়ে চলেছে সেই মাশালের দিকে। দু'জন পুলিশ ততক্ষণ জঙ্গলের দিকে ছুটেছে। আমরা গেলাম বন্দুক আনতে।

'এক-দুই-তিন, আস্তে আস্তে সময় চলে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট হয়ে গেল। এক এক মিনিট যেন এক এক ঘণ্টা। আমরা সবাই অপেক্ষা করছি, কখন ডাকাতের দল এদিকে আসে। খবর যেন ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়ীতে বাড়ীতে লাঠি বন্দুক নিয়ে সবাই প্রস্তুত। একজন পেছনের রাস্তা দিয়ে থানার দিকে গেছে খবর দিতে। সরু আর একটা রাস্তা দিয়ে আমরা কয়েকজন এগিয়ে চললাম—কি জানি পুলিশ দু'জনের কি অবস্থা! হয়তো ডাকাতদের হাতে—।'

খুকু আর খোকন ততক্ষণে দাদুর আরোও কাছে সরে এসেছে। খোকন প্রশ্ন করলে, 'তারপর ডাকাতদের দেখা পেলে—পুলিশ দু'জন বেঁচে ছিল?'

'বেঁচে ছিল কি দাদুভাই—মনের আনন্দে দু'জনে বেশ সুখে খৈনী খাচ্ছে ডাকাতদের সঙ্গে!'

'ডাকাতরা কিছু বললে না?'

'ডাকাতই নয়। একজন চাষী জোড়া বলদ নিয়ে চাষ করতে চলেছে। ভোর হয়ে আসছে, রাতের থেকে ওরা যাত্রা সুরু করেছে। থাকে মাইল দুয়েক দূরে। রাতে না বেরুলে ভোরের মধ্যে কাজে লাগতে পারে না।'

'তবে মশাল?'

'ওই জঙ্গলে থাকত কয়েক ঘর চাষী আর কিছু মজুর। একজনের দাঁতে ব্যথা। বেচারী ঘরের বাইরে আগুন জালিয়ে সেঁক দিচ্ছিল।'

'আচ্ছা দাদুভাই, তবে যে বললে চুরি হয়ে গেল একটা। খুকুর কথা শেষ না হতেই হা হা করে হেসে উঠলেন দাদু। বললেন, 'পরে জানা গেল চাকরটাই ভাইকে দিয়ে চুরি করিয়েছিল—দু'জনে কাজ সেরে চাকরটা ভাইকে দিয়ে নিজেকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। যাতে কেউ না বুঝতে পারে সে দোষী।'

'জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দুটো শরীর এগিয়ে চলেছে।'—পৃঃ ২৫

'ডাকাতের গল্পই হ'ল না', বলে দু'জনে তারা রাগ করে বেরিয়ে গেল।

দাদু হেসে কাগজে মন দিলেন।

কয়েক মিনিট বাদে খোকন একটা দড়ি নিয়ে এসে হাজির। বললে, 'দাদুভাই, যেমন আছ সেইরকম ভাবেই বসে থাকো। আমি চেয়ারের সঙ্গে তোমাকে বেঁধে তোমার চশমাটা ডাকাতি করে নিই।'

প্যাট্রিশ লুমুম্বা একটি নাম। কৃষ্ণ মহাদেশ আফ্রিকার ঘন তমসাচ্ছন্ন রাজ্য কঙ্গোর এই বীর সন্তানই তাঁর অসাধারণ দেশপ্রেমের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আফ্রিকার কালো মানুষদের শিরায় শিরায়। ভূগোলের পাতায় সীমাবদ্ধ এই অন্ধকার দেশ আজ আর শুধু একটি ভৌগোলিক নাম নয়, বিশ্বের সকল স্বাধীন দেশের পাশে আজ সে স স ম্মা নে স্থান করে নিয়েছে। এই নবজাগরণের তরুণ বীর নায়ক প্যাট্রিশ লুমুম্বার কথাই আজ তোমাদের এখানে বলব।

আফ্রিকার কেন্দ্রস্থলে বিষুবরেখার দক্ষিণে মধ্য-আফ্রিকার অনেকটা জুড়ে এই কঙ্গো। আয়তনে ভারতবর্ষের চেয়ে কিছু ছোট। এই বিরাট দেশের বেশীরভাগই গহন অরণ্যময় ভূমি। এরই মাঝে মাঝে আফ্রিকার কালো মানুষদের বাস। প্রতিবেশী এদের গরিলা, হাতী, সিংহ, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র জানোয়ার। সারা পৃথিবী যখন সভ্যতার আলোর পথ ধরে এগিয়ে গেছে অনেক দূর, তখনও এরা সহজ, সরল, আদিম জীবনযাত্রা অনুসরণ করে চলেছে। ঘন পত্রসন্নিবিষ্ট অরণ্যে সূর্যের আলোর মত সভ্যতার আলোও পৌছেছে এখানে অনেক দেরিতে। পৃথিবীর প্রাচীনতম মানবজাতির একটি ধারা—নিগ্রো ও বাণ্টু জাতের এরা।

এই সরল, নির্বোধ, মানুষরা কোনদিন জানত না যে খনিজ-সম্পদে ভরপুর তাদের এই বিশাল দেশ। তাছাড়া অরণ্য-সম্পদ তো আছেই। কিন্তু সভ্যতার শ্যেনদৃষ্টি একদিন অরণ্য ভেদ করে পড়লো এই প্রকৃতির রাজ্যে। বেলজিয়মের রাজা ২য় লিওপোল্ড কাঙ্গোর এই সম্পদের খোঁজ পান এবং অভিভাবকহীন কাঙ্গোর অগণিত মানুষের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসেন। বিখ্যাত ভূপর্যটক ষ্ট্যামলীর সহায়তায় তিনি কঙ্গোর উন্নতি করলেন অনেক।

জঙ্গলাকীর্ণ এই অন্ধকার দেশে তৈরী করলেন তাঁরা কত বড় বড় নগর, উঁচু পাকা রাস্তা, হাসপাতাল, রেল লাইন, বিদ্যালয় ও নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। মূক, নির্বোধ, অসহায় কঙ্গোলীরা তিল তিল করে নিজেদের ক্ষয় করে গড়ে তুলল এই নতুন কঙ্গো। বাইরে থেকে দেখতে গেলে বেলজিয়নরা কঙ্গোতে কোনই অভাব রাখল না। ভালো

খেতে পরতে পারলে চিরকাল এদের উপর প্রভুত্ব করতে পারবে, এই বুঝি ছিল তাদের ধারণা। কারণ কঙ্গোলীদের মধ্যে চেতনার অভাব মাত্রও ছিল না। এই দেশের সব কিছুর উপরেই যে তাদের জন্মগত অধিকার, সেই সম্বন্ধে তারা ছিল সম্পূর্ণ অচেতন। বিদেশী কূটবুদ্ধি শাসক উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেনি তাদের জন্য—পাছে সেই রন্ধ্রপথে আসে জাতীয় চেতনা। কিন্তু যুগ-চেতনার ঢেউ একদিন এসে লাগলো এই অরণ্যময় দেশেও। সারা পৃথিবীর উপনিবেশগুলি একে একে স্বাধীনতা লাভ করল। প্রতিবেশী ঘানার আন্দোলন এই মূক জাতির রক্তে দিল দোলা—প্যাট্রিশ লুমুম্বা তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মীতা দিয়ে কঙ্গোলীদের বুকে মুক্তির স্পৃহা জাগিয়ে তুললেন। সারা পৃথিবী সবিস্ময়ে একদিন লক্ষ্য করল এই সরল, অশিক্ষিত জাতিও চায় মুক্তি— চায় ঐক্যবদ্ধ কঙ্গোর স্বাধীনতা। এই দাবীর কাছে মাথা নোয়াতে হ'ল বিদেশী শাসককে। ১৯৬০ সালের ৩০শে জুন কাঙ্গো স্বাধীন দেশ বলে ঘোষিত হ'ল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্যাট্রিশ লুমুম্বা হলেন প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু জাতির এই শুভলগ্নকে বিষময় করে তুলল স্বার্থান্ধ কয়েকজন কঙ্গোলী—যাদের কাছে নিজের দেশের সার্বভৌম স্বাধীনতার চেয়েও বড় নিজের স্বার্থ। বিদেশীরাও এই সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়লো না। স্বার্থান্ধ কঙ্গোলী নেতাদের সঙ্গে হাত মেলালো তারা। তাদের সহায়তায় শোম্বে নামক এক কঙ্গোর নেতা কাতাঙ্গা প্রদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা ক'রে, নিজে তার রাষ্ট্রনায়ক হয়ে বসলেন। দেশপ্রেমিক লুমুম্বার এ আঘাত নিজের অঙ্গচ্ছেদের মতই বেদনাদায়ক মনে হ'ল। তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন কঙ্গো কয়েকজন চক্রান্তকারীর হাতে পড়ে হ'ল খণ্ডিত। বীর তরুণ এই নেতা রুখে দাঁড়ালেন এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। তিনিই ছিলেন তখন একমাত্র কঙ্গোর মানুষ, যিনি সমগ্র কাঙ্গোর ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতার কথা ভাবতে পেরেছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর, তাঁরই মত দেশপ্রেমিক কয়েকজন তরুণ যুবকের অসীম মনোবল ও নিষ্ঠা। নেতা হওয়ার সব গুণই ছিল প্যাট্রিশের। এই অসাধরণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ যুবকের জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেশের তরুণদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিত। কিন্তু ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারী দেশের শত্রুদের নীচতা, ছলনা, বুঝবার মত কূটবুদ্ধির একান্তই অভাব ছিল তাঁর। তাই বোধহয় তাঁকে এমন ভাবে প্রাণ দিতে হ'ল। কয়েকজন স্বার্থান্ধ কঙ্গোলী চক্রান্ত ক'রে লুমুম্বাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত করে, পরে তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে।

দীর্ঘদেহী, তেজোদীপ্ত সেই দেশপ্রেমের মূর্ত-প্রতীক প্যাট্রিশ আজ আর নেই, কিন্তু এই তরুণ বীরের অমর স্মৃতি চিরদিন কঙ্গোর প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। লুমুম্বার মৃত্যু নাই—হতে পারে না।

কর্পূরের মতো

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ।। উপন্যাস ।।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কিন্তু স্টেশন ওয়াগনটা গেল কোথায় ? ত্রিলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

বলছি।—দম নিয়ে মাধু সিং ফের বলতে সুরু করলো—ছেলেদের আর আমাকে স্টেশন ওয়াগানে পুরে ওদের একজন স্টেশন ওয়াগানটা চালিয়ে ভ্যানের মধ্যে গাড়ীটা তুলে দিলে! ভ্যানের তুলনায় স্টেশন ওয়াগানটা ছোট—কাঠের পাটাতন বেয়ে ভ্যানের মধ্যে গাড়ীটা উঠে গেল—অসহায়ভাবে শুধু দেখতে লাগলাম। আমরা সকলে শুধু যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি—তা নয়, বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বড্ড কষ্ট বোধ করতে লাগলাম। তারপর বুঝলাম, ভ্যান গাড়ীটা চলছে। আমার বলতে যতটা সময় লাগছে—ভাববেন না এতটা সময় ধরে ঐ সব কাণ্ড হলো। সব ব্যাপারটা যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল।

দারোগাবাবু মন্তব্য করলেন—ভ্যানের মধ্যে এই ভাবে গাড়ীসুদ্ধ ছেলেদের চুরি করে নিয়ে যাওয়া—এ সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার! যাক, তারপর কি হলো—বলো ?

সব বাচ্চাদেরই চোখে জল—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেও থাকবে। কিন্তু ক'ষে মুখ বাঁধা, বাচ্চাদের হাতও বাঁধা। আমাকে শুধু আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল শক্ত করে। চোখ আমার খোলা ছিল, ভ্যানের ভেতরটা অন্ধকার, তবু আমি বুঝতে পারলুম বাচ্চারা কাঁদছে, তাদের চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে। কতক্ষণ ধরে যে গাড়ীটা চললো তা বলতে পারবো না,

তবে বেশ জোরেই যাচ্ছিল। যখন থামলো—তখন রাত বেশ হয়ে গেছে, একটা ঘেরা জায়গার মাঝখানে ভ্যানটা দাঁড়িয়ে,—চারিদিক ঘেরা, ভেতরে ঢোকার ইয়া বড় একটা দরজা। সেই দরজা দিয়ে ভ্যানটা ঢোকার পর দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হলো, তালা দেবার শব্দ পেলাম—ভ্যানের মধ্যে থেকেই। ঘেরা জায়গার ভেতরে গাড়ীটা এলে আমাদের টেনে নামানো হলো, আমার হাতের বাঁধন ছাড়া—আর সব খুলে দেওয়া হলো, ছেলেগুলোর বাঁধনও খুলে দেওয়া হলো। তৎক্ষণাৎ তাদের জন্যে হাতমুখ ধোয়ার জল এল, প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা ছিল দেখলাম, ছেলেদের খেতে দেওয়া হলো।

তারপর ?

ছেলেরা প্রথমটা কিছু মুখে দেয়নি, মুখের বাঁধন খুলে দিতে তারো জোরে কাঁদবার সুযোগ পেলে। আমি তাদের কাঁদতে বারণ করলুম—এখানে কেঁদে কোনো লাভ নেই এমন এক নির্জন জায়গায় আমরা এসে পড়েছি—এখানে কাঁদলে বনের পশুও টের পাবে না। আমি বললাম—খাবারগুলো আগে আমার মুখে ধরো, আমি খেয়ে দেখি, তারপর ছেলেরা খাবে ওদের দলের সর্দার এতক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে আমায় বললে—ভয় নেই, ওতে কোনো রকম বিষ নেই। ছেলেদের আমরা সুস্থ রাখতে চাই। ওদের বিনিময়েই আমাদের টাকা রোজগার করতে হয়। ওদের অভিভাবকদের কাছ থেকে, না হয়—সুদূর আরব দেশের লোকের কাছে বিক্রী করে দিলে প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে।

কী সাংঘাতিক ! এতক্ষণ পরে কৃষ্ণমূর্তি মন্তব্য করলেন।

তারপর ? তুমি বলে যাও মাধু—দারোগা বাবু বললেন।

তারপর আর বেশী কিছু নেই। সর্দারের হুকুমে আমারও হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। আমাকে খেতে দেওয়া হলো। কিছু খাজা, কচুরী, বালুসাই আর প্যাঁড়া। রাত্রে চাল-ডালের গরম খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা। খিচুড়ি খেয়েই আমি সুযোগ খুঁজতে লাগলুম—কি করে পালানো যায় এখান থেকে। দু'জন পাহারাদার দেখলুম গেটের ধারে, তারিয়ে তারিয়ে মহুয়ার রস খাচ্ছে। আমি তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললুম। একটু-আধটু প্রসাদ পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই একেবারে গলে গেল। কথায় কথায় তাদের থেকে জানলাম এরা কারা ; সারা ভারত কেন, বিশ্বব্যাপী ছেলে চোরের দলের এক অংশ এটি। সর্দারের বড় জোর কারবার। সারা জগৎ জুড়ে ছেলে চুরির আর বিক্রীর ব্যবসা কোন্ জায়গা জানতে চাইলে তারা বললে—এটা তেলোর জঙ্গল। আমি তেলো চিনি, এখান থেকে চন্দ্রপুরা থানা খুব দূরে হবে না ; কিন্তু কি করে থানায় যাই—তাই ভাবতে লাগলুম। কথায় কথায় ওদের থেকেই শুনতে পেলুম—চন্দ্রপুরা থানার কাছে এখান থেকে

লোক যাবে, থানায় কোনো খবর এসেছে কিনা গোপনে জানতে যাবে। আমি ফন্দী আঁটতে লাগলুম—কি করে যাওয়া যায় এদের সঙ্গে! দু'হাঁড়ি মাহুয়ার দাম ধরে দেব—যদি আমাকে ওরা গোপনে একবার এখান থেকে বের হতে দেয়! চৌকিদার দু'জন নেশায় বিভোর, তবু এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ইশারায় আমাকে বের করে দিলে, আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম—কিন্তু চন্দ্রপুরায় যাবো কি করে? তেলো থেকে চন্দ্রপুরা তো অনেক দূর। আমার স্টেশন ওয়াগনটা কোথায়—জানতে চাইলুম। ওরা বললে, সেটা বাইরের বাগানেই আছে, কালকে চালান যাবে মাদ্রাজে—সেখানে বিক্রী হবে। গাড়ী আমাকে দাও—আমি তোমাদের দু'হাজার করে টাকা দেব। ওদের দু'জনের দুটো মত। একজন বলে—তুমি চাঁদু খুব চালাক—সরে পড়ো। অর একজন বলে—আমাদের একজনকে সঙ্গে করে চলো, টাকা হাতে দাও! যাই হোক, টাকা সঙ্গে সঙ্গেই দেব বলে ওদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চন্দ্রপুরায় এলাম। সঙ্গে যে ছিল—সে ব্যাটা থানা চিনতো না,—থানার সামনে যেতে বললুম—এই আমার বাড়ী, শীগ্‌গিরই আমি আসছি টাকা নিয়ে, তুমি গাড়ীতে বসো। সে বললে—আমি একা বসবো না চাঁদু, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। বেশ তাই চলো, বলে তাকে গাড়ী থেকে নামালুম।

গেটের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই বোধহয় তার নেশা কেটে গেল—সে বুঝতে পারলে যে সে থানায় এসে পড়েছে। ততক্ষণে আমি চীৎকার করে সেপাইদের তুলে ফেলেছি, সঙ্গীটাকে জাপ্টে ধরে ফেলেছি। পুলিশ অফিসারকে সব বললুম। সঙ্গীটাকে হাজতে পুরে তখনই লোকজনসহ আমরা তেলোর জঙ্গলে এলাম। রাত তখন তিনটে হবে। স্টেশন ওয়াগনে আমি চন্দ্রপুরা থানা থেকে তেল ভরে নিয়েছিলুম, স্কুলের ছেলেরা আটকা পড়েছে—এ যে আমার পক্ষে কি কষ্টের—সে কথা পুলিশ অফিসার চট করে বুঝেই তিনি তার যথাকর্তব্য করেছেন। ভোর হতে না হতেই তিনি তেলোর জঙ্গল ঘিরে ছেলেদের উদ্ধার করলেন, দলবলসুদ্ধ সর্দারকে ধরলেন। চন্দ্রপুরা থানায় সন্ধ্যাতেই নাকি ধানবাদ থেকে, রোটংডি থেকে আমাদের হারানোর খবর দেওয়া হয়েছিল। তেলো থেকে চন্দ্রপুরা থানায় কেস লিখিয়ে দিয়ে এই তো এসে হাজির হলাম!

বৃদ্ধ তিনু সিং এগিয়ে এসে শুধু বললে—সাবাস বেটা, সাবাস! আমি জানতাম—তুই হারাবি না, অন্যেরও কিছু খোয়াবি না। প্যাট খেলা দেখাতো আর বলতো—জগতে কিছু হারায় না, কুচ খোয়া যায় না—

বলতে বলতে তারিণীদা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সমাপ্ত
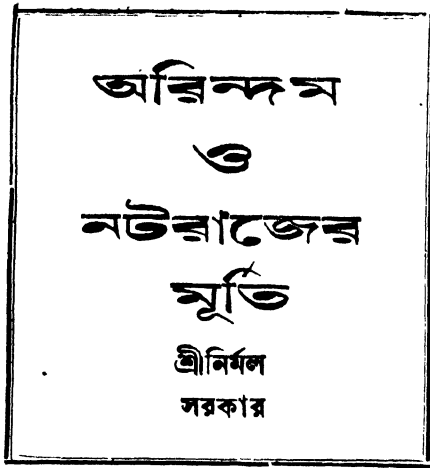
কলকাতার ভিড় থেকে একটু দূরে জায়গাটা। প্রায় একটা খোলা মাঠের মত পড়ে—শহরের দক্ষিণপ্রান্ত ছাড়িয়ে গেলেই। এখানেই ডক্টর দেবের মিউজিয়াম। ডক্টর রমেন দেব একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তাঁর নাম শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। খবরের কাগজে প্রায়ই তার লেখা ও ছবি ছাপা হয়। তবে যে ছবিটা ছাপা হয় সেটা অল্প বয়সের ছবি। সুন্দর চেহারা, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। ডক্টর দেবকে এখন দেখলে কিন্তু চেনা শক্ত হবে। এখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর। দেহের ও মনের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে ইতিমধ্যে।

ডক্টর দেবের মিউজিয়ামে সাধারণ লোকেরা যায় না। তবে ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, গবেষণা করেন, তাঁদের কাছে ডক্টর দেবের মিউজিয়াম যে একটি আকর্ষণীয় বস্তু, একথা বলা চলে। সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে বিদেশী ট্যুরিষ্ট পর্যন্ত অনেকেই এখানে এসে থাকেন। বাড়ীর একতলা এবং দু'তলায় মিউজিয়াম, তিনতলায় ডক্টর দেব থাকেন। তাঁর সংসারে একজন বেয়ারা আর এক দূর সম্পর্কের ভাইপো বিকাশ আছে। বিকাশের বয়স প্রায় কুড়ি। কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারীর গণ্ডি এখনও পার হতে পারেনি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে রকে আড্ডা দিয়ে এবং সিনেমা দেখেই তার সময় কাটে, স্কুলে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। প্রথম প্রথম ডঃ দেব তাকে অনেক শাসন করেছিলেন, বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে ভস্মে ঘি-ঢালা ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

সেদিন মিউজিয়ামে একটা সোরগোল শুনতে পেল বিকাশ। তার একটু পরেই দরোয়ান এসে খবর দিল যে, ডঃ দেব তাকে জোর তলব জানিয়েছেন। চোঙা প্যাণ্টটা কোন রকমে গলিয়ে সে নীচে নেমে এল। ডঃ দেব মিউজিয়ামের মধ্যে তখন জোর কদমে এ-ধার থেকে ও-ধার পায়চারি করছেন। কাকা যে দারুণ উত্তেজিত হয়েছেন তা বুঝতে দেরি হ'ল না বিকাশের। কিন্তু তাকে কাকার হঠাৎ কি এমন প্রয়োজন হ'ল তা সে অনুমান করতে পারল না। ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল বিকাশ। ডঃ দেব একটা জানলার দিকে আঙ্গুল দেখালেন। বিকাশ লক্ষ্য করল জানালার

একটা কাঁচ ভাঙা। কিন্তু একটা সামান্য জানালার কাঁচ ভাঙার জন্যে তাকে ডেকে আনার কি দরকার, তা সে বুঝতে পারল না। তবে কাকার ভাবভঙ্গী দেখে ব্যাপারটা যে সামন্য নয়, সেটা অনুমান করে একটু ভয় পেল বিকাশ।

—কাল সন্ধ্যায় কোথায় ছিলে? জিজ্ঞেস করলেন ডঃ দেব।

—সিনেমায়। উত্তর দিল বিকাশ।

—কখন ফিরেছ?

—রাত দশটায়।

—নটরাজের মূর্তিটা কোথায়? ডঃ দেবের গলার স্বরটা গম্ভীর।

বিকাশ শো-কেসের দিকে তাকিয়ে দেখল কাঁচটা ভাঙা আর মূর্তিটাও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কোন উত্তর দেবার আগেই ডঃ দেব রাগে যেন ফেটে পড়লেন।

—তোমার টাকার দরকার তো বলনি কেন? কার কাছে বিক্রি করেছ বল শীগ্‌গির।

—আমি জানি না। শক্ত হয়ে উত্তর দিল বিকাশ।

—সাধু সাজছ? তুমি আমার পার্কার পেনটা বেচে দাওনি?

—হ্যাঁ দিয়েছি।

— আমার টেপ-রেকর্ডার চুরি করনি?

—হ্যাঁ, তাও করেছি।

—তা'হলে এখন সাধু সাজবার চেষ্টা করছ কেন? আমি তোমায় যত টাকা চাও দেব। তুমি নটরাজের মূর্তিটা ফেরত দাও। ডঃ দেব বিকাশের দিকে এগিয়ে এলেন।

—কিন্তু কাকা আপনি ভুল করছেন, আমি নটরাজের মূর্তি স্পর্শ করিনি।

—তুমি না ছোঁও, অন্য লোককে দিয়ে কাজটা করিয়েছ নিশ্চয়! আমি পুলিশকে কিছু জানাব না, তুমি শুধু আমার ওই মূর্তিটা ফেরত দাও।

—আমি জানি না। শক্ত হয়ে উত্তর দিল বিকাশ।

—জান না? বেশ। তা'হলে পুলিশ ছাড়া আর উপায় নেই। আই মাষ্ট ইন্‌ফরম দি পুলিশ। টেবিলে রাখা টেলিফোনটা ডায়াল করলেন ডঃ দেব।

থানা অফিসার নরেনবাবু তখন সবেমাত্র দুপুরের আহার সেরে একটু বিশ্রাম নেবার সুযোগ করছিলেন, এমন সময় ঝন্‌ঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো, বিরক্ত হয়ে সাড়া দিলেন নরেনবাবু—কে বলছেন?

—আমি ডক্টর দেব। আমার মিউজিয়াম থেকে একটা নটরাজের মূর্তি চুরি হয়েছে।

—কখন চুরি হয়েছে?

—কাল রাতে। উত্তর দিলেন ডঃ দেব।

—তা'হলে সকাল থেকে জানান নি কেন? 'আমি নিজেই একটু খোঁজ করছিলাম, তা জানাতে দেরি হয়ে গেল।

—ঠিক আছে, আমি একজন লোক পাঠাচ্ছি। বিরক্ত হয়ে লাইনটা কেটে দিলে নরেনবাবু। ভাবলেন,—আশ্চর্য কাণ্ড! কার নটরাজের মূর্তি হারিয়েছে, কার কলের ট্যাপ হারিয়েছে,কার বা ট্রামের টিকিট খোয়া গিয়েছে—তুমি ব্যাটা ঘুরে মর! আড়মোড়া ভেে নরেনবাবু একটু কাত হলেন। কয়েক মিনিট মাত্র গিয়েছে, আবার টেলিফোন বেে উঠল সশব্দে। রিসিভার তুলে নরেনবাবু কিছু বলবার আগেই বড়সাহেবের গম্ভীর গল শোনা গেল।

—ও. সি?

—ইয়েস্ স্যার। নরেনবাবুর চোখ কপালে উঠেছে।

—দেব মিউজিয়ামে নটরাজের মূর্তি চুরির খবর পেয়েছেন?

—হ্যাঁ, স্যার।

—কেউ গেছে?

—না স্যার, মানে হ্যাঁ স্যার, এখুনি যাচ্ছে। থতমত খেলেন নরেনবাবু।

—তাড়াতাড়ি আমি খবর চাই। লাইনটা কেটে দিলেন বড়সাহেব।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন নরেনবাবু।

জরুরী তলব পেয়ে অরিন্দম যখন থানায় এসে পৌছল, তখন নরেনবাবু অবস্থ শোচনীয়। অরিন্দমকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, অরিন্দম আমাকে বাঁচাও।

—কেন কি হ'ল? একটা চেয়ারে বসল অরন্দিম।

—হয়েছে আমার মাথা! দেব মিউজিয়াম থেকে নটরাজ না কিসের একটা মূর্তি হারিয়েছে, তাই নিয়ে মহা হুলুস্থুল। বড়সাহেব নিজে টেলিফোন করেছেন।

—তাতে অত ব্যস্ত হবার কি আছে? বলল অরিন্দম।

—না ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। বুড়ো বয়সে শুধু চাকরীটা খোয়া যাবে এই যা! নরেনবাবু কাতরোক্তি করলেন একটা।

—আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি নরেনবাবু, আমি নটরাজ উদ্ধার করবই।

—বাঁচালে আমায় অরিন্দম। সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নরেনবাবু।

ডক্টর দেবের সঙ্গে অরিন্দমের সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও, নামটা তার কাছে সুপরিচিত। অরিন্দম যখন তাঁর বাড়ীতে পৌছল, যখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

অরিন্দমকে দেখে কিন্তু ডঃ দেব খুশী হতে পারলেন না। তিনি আশা করেছিলেন পুলিশ অন্ততঃ একজন অভিজ্ঞ লোককে পাঠাবে। সে জায়গায় অল্প বয়সের একজন লোককে দেখে তিনি যে বিরক্ত হয়েছেন এটা বুঝতে পারল অরিন্দম।

—আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। বলল অরিন্দম।

—বেশ করুন।

—নটরাজের মূর্তিটা কোথা থেকে পেয়েছিলেন।

—কালিকট থেকে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের একজন লোক আমাকে এর সন্ধান দেয়। একজন কুলী এটা পেয়েছিল। তার কাছ থেকেই আমি এটা সংগ্রহ করেছি।

—মূর্তিটি কিসের তৈরী ছিল?

—অষ্টধাতুর ওপর পান্না বসান।

—এর দাম কত হতে পারে?

—আনাড়ী লোক দু'একশ টাকা দিতে চাইবে। তবে যারা এর কদর বোঝে তাদের কথা আলাদা। নিউ ইয়র্কের জন্ ওয়ালেস দশ হাজার ডলার দিতে চেয়েছিল।

—দেননি?

—না। তবে এখন মনে হচ্ছে, ওয়ালেসকে দিলে ভালই হ'ত; এভাবে খোয়া যেত না জিনিসটা।

—কাকে সন্দেহ হয় আপনার?

—বিকাশকে। দূর সম্পর্কে আমার ভাইপো হয়। অল্প বয়সে বকে গিয়েছে। টাকার জন্যে ওই নিশ্চয় চুরি করেছে বা করিয়েছে।

অরিন্দম মিউজিয়ামের চারিদিকটা তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল। বেশীরভাগই পাথর বা ধাতুর মূর্তি। তাছাড়া বিভিন্ন যুগের অস্ত্র, মুদ্রা আর প্রস্তরলিপিও রয়েছে অনেক রকমের। একধারে একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর ইজিপ্সিয়ান মমিও রয়েছে দেখতে পেল অরিন্দম। মিউজিয়ামটা ভালভাবে দেখার পর কয়েকটা ধারণা তার বদ্ধমূল হ'ল। প্রথমতঃ, ডঃ দেব বয়সে প্রবীণ এবং চিন্তাশীল হলেও তিনি সাধারণ পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেন না। টেবিলের ওপর গাদা-করা বই আর কাগজপত্র সমেত চুরুটের ছাই থেকে শুরু করে মেঝে পর্যন্ত সবই ধুলোয় ভর্তি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যেন সর্বক্ষণ আশঙ্কিত হয়ে রয়েছেন। যখন অরিন্দম ইজিপ্সিয়ান মমির কাছে দাঁড়িয়ে, তখন ডঃ দেব কেন যে হঠাৎ অস্থির হয়ে পড়লেন, তার কারণও সে বুঝে উঠতে পারল না। অরিন্দম আবার চেয়ারে এসে বসল

ডঃ দেবের কাছ থেকে নটরাজের একটি ফটোর কপি সংগ্রহ করে অরিন্দম বিদায় নিল।

—ডঃ দেব, আপনার মিউজিয়াম কে দেখাশোনা করে? আবার প্রশ্ন করল অরিন্দম।

—কে আবার? আমি নিজেই করি।

—দেখে মনে হচ্ছে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা দরকার।

—ঐতিহাসিক জিনিস যদি পরিষ্কার করতে হয়, তা'হলে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

—বুঝলাম, কিন্তু মেঝেটা? অপরিষ্কার মেঝের দিকে ইঙ্গিত করল অরিন্দম।

--জমাদারটা কয়েক দিন থেকেই কামাই করছে। বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন ডঃ দেব।

—নটরাজের মূর্তির কোন ফটো আছে?

—নিশ্চয়, সব ক্যাটলগ করা আছে।

ডঃ দেব পাশের র‍্যাক থেকে একটা মোটা এ্যালবাম বার করলেন। তা থেকে

নটরাজের একটা ফটোর কপি সংগ্রহ করে এবং ডঃ দেবকে প্রচুর আশ্বাস দিয়ে, অরিন্দম বিদায় নিল।

নরেনবাবু এদিকে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কয়েক দিন কেটে গিয়েছে, অরিন্দমের কিন্তু কোন পাত্তা নেই।

হঠাৎ সেদিন অরিন্দম ঢুকল নরেনবাবুর ঘরে।

—কিছু খবর পেয়েছ? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

—আচ্ছা নরেনবাবু, গবেষক হলেই কি অপরিষ্কার হতে হবে?

—তা কি করে জানব? আমি তো আর গবেষক নই। কিছু খবর পেয়েছ? আবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—হ্যাঁ, খবর পেয়েছি কয়েকটা। প্রথম হ'ল ডঃ দেব, বেশ অপরিষ্কার।

—সে তো শুনলুম। তার সঙ্গে নটরাজের মূর্তি চুরির কি সম্পর্ক আছে?

—তা ছাড়া ডঃ দেবের টাকারও খুব টানাটানি মনে হ'ল।

—তাতে তোমার কি হে বাপু? কে অপরিষ্কার, কার টাকাকড়ি নেই, এ সব খবরে তোমার কি দরকার? নরেনবাবু দস্তুরমত রেগে গেলেন।

—বাড়ী যাই। উঠে দাঁড়াল অরিন্দম। দারুণ খিদে পেয়েছে। পরেশকে বিশ্বাস নেই। সে ব্যাটা হয়ত রান্নাবান্না ছেড়ে কাকাতুয়ার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

—বেশ যাও; কিন্তু বিকাশকে আমি এ্যারেস্ট করব। পাড়ার নামজাদা ছেলেদের সঙ্গেই ও মেশে, সে খবর আমি জানি।

—করুন, আপত্তি নেই; তবে নটরাজের মূর্তি ও চুরি করেনি।

—কি করে জানলে?

—সে কথা পরে বলব। তবে একটা কথা বলতে পারি যে, ডঃ দেবের মাথার একটু গোলমাল আছে।

—ভদ্রলোক নটরাজের মূর্তি হারিয়ে দেখছি তোমার কাছে অনেকগুলো বিশেষণ পেয়ে গেলেন। আর, টাকাকড়ি নেই—আবার এখন বলছ পাগল!

—তবে কি জানেন নরেনবাবু, যারা গবেষক শ্রেণীর লোক তাদের চিন্তা একদিকেই যায়। অন্য কিছু আর তারা ভাবতেই পারেন না। অবশ্য লোক উনি যে খুবই ভাল এ কথাও সত্যি। কথাটা বলে অরিন্দম বাইরে চলে গেল, আর নরেনবাবু হাঁ করে চেয়ারে বসে রইলেন।

সেদিন বিকালেই অরিন্দম আবার এল। নরেনবাবু কিছু প্রশ্ন করার আগেই সে বলল—

—চলুন নরেনবাবু চোর ধরতে যাই।

—কোথায় ?

—দেব মিউজিয়ামে।

—প্রথমেই বলেছিলুম, বিকাশকে এ্যারেস্ট করি, তুমি তো আমায় পাত্তাই দি না। অনুযোগ করলেন নরেনবাবু।

ডঃ দেব মিউজিয়ামেই ছিলেন। অরিন্দমকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন—

—নটরাজের মূর্তির খোঁজ পেয়েছেন ?

—পেয়েছি ডঃ দেব। তার আগে গোটাকতক প্রশ্ন আছে আমার।

—আবার প্রশ্ন ! বেশ জিজ্ঞাসা করুন। মোটা লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকালেন ডঃ দেব।

—ব্যাঙ্কে আপনার কত টাকা আছে ?

—তার মানে ?

—তার মানে ইদানীং কি আপনার টাকার টানাটানি হয়েছিল ?

—হাউ ডেয়ার ইউ ! চীৎকার করে উঠলেন ডঃ দেব—আমার টাকা থাক না থাক—

—না কারুর কিছু নয় ; তবে ঐ সংক্রান্ত কয়েকটা খবর আমরা পেয়েছি।

—কি রকম ?

—বাজারে আপনার অনেক দেনা হয়েছে। এমন কি চাকর বা জমাদারেরও বে কয়েক মাসের মাইনে বাকী রয়েছে। এবং সেই কারণে আপনি মিউজিয়ামের অনেং জিনিসই বিক্রী করেছেন।

—আমার জিনিস আমি বিক্রী করেছি এটা তো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। গর্জে উঠলেন ডঃ দেব।

—ঠিক, কিন্তু মাইনে না দেওয়ার জন্যে জমাদার বেশ কয়েকদিন এই ঘরে ঝাড়ু দেয়নি তাই না ?

—হ্যাঁ তাই ! আমার মিউজিয়াম যদি আমি পরিষ্কার না করি, তাতে—

—না কারুর কিছু বলার নেই। সঙ্গে সঙ্গে বলল অরিন্দম, কিন্তু ডঃ দেব চোরে শার্সি ভাঙল, গ্লাসকেসের কাঁচ ভাঙল অথচ টুকরোগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল মেঝেতে তার চিহ্ন পেলাম না কেন ?

—তা আমি কি করে জানব ? হঠাৎ যেন থতমত খেয়ে গেলেন ডঃ দেব।

—কিন্তু আমি জানি। বলল অরিন্দম। তারপর একটা ফোলিও ব্যাগ থেকে কাগজ মোড়া একটা পুলিন্দা বার করল। সেটা খুলতেই তার মধ্যে একটা ঝাড়নে মোড়া অনেকগুলো কাঁচের টুকরো দেখা গেল। আচ্ছা ডঃ দেব—বলতে লাগল অরিন্দম, আপনি বলেছেন যে চোরটা শার্সি ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল, তাই না ?

—হ্যাঁ, তাই। বললেন ডঃ দেব।

—তা'হলে লক্ষ্য করে দেখুন তো, গ্রীলের মধ্য দিয়ে কি একটা লোক ঢুকতে পারে ?

—এ্যা, পারে না ? ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন ডঃ দেব। তারপর বললেন, তা'হলে —শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

—জিনিসটা সাজাতে গিয়ে অনেক ভুল করে ফেলেছেন। আপনার আঙুলের ছাপ সব জায়গায় আমরা পেয়েছি। শুধু পাইনি, শার্সি আর গ্লাস কেসে।

—কেন ? বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

—তার কারণ ও দুটো ভাল করে মুছে দিয়েছিলেন আপনি। আর একটা ঝাড়ন দিয়ে ধরে আপনিই শার্সির আর গ্লাসকেসের কাঁচ ভেঙেছিলেন। একে বয়স হয়েছে তার ওপর চোখে ভাল দেখতে পান না, তাই পাছে কোথাও চোট লাগে সেই ভয়ে ঝাড়ন দিয়ে কাঁচ ধরেছিলেন। কিন্তু ভুল করে টুকরোগুলো মেঝেতে না ফেলে রেখে, আপনি জানলা গলিয়ে বাইরের বাগানে ঝাড়ন-সুদ্ধ ফেলে দিয়েছিলেন।

—কিন্তু, নটরাজের মূর্তি—চেয়ারে বসে পড়লেন ডঃ দেব।

কোন কথা না বলে অরিন্দম ইজিপসিয়ান মমিটার কাছে দাঁড়াল, তারপর ডালাটা খুলে নটরাজের মূর্তিটা বার করে আনল।

—কিন্তু ওখানে গেল কি করে ? অভিনয় করলেন ডঃ দেব।

—আপনিই রেখেছিলেন লুকিয়ে ; নিজের জিনিস নিজেই চুরি করেছেন ডঃ দেব। আমরা জানি ওটা অনেক টাকায় ইন্‌সিওর করা ছিল। আর ইজিপসিয়ান মমির ওই খোলাটার মধ্যে ওটা লুকোবারও সুবিধে আছে। সহজে লোকে ওর কাছে কেউ যাবে না বলেই ভেবেছিলেন আপনি। তবে আশপাশের অন্যান্য জিনিসের ওপর মাকড়সার জাল আর ধুলো রয়েছে, শুধু মমিতেই তার অভাব ছিল।

ডঃ দেব টেবিলের ওপর মাথা রাখলেন।

নিউবেরী পুরস্কার

াল রায়

পৃথিবীর সব দেশেই ছোটদের জন্য সুন্দর কিছু লিখলে তার পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও শিশু-সাহিত্যের উন্নতির জন্য এবং ছোটদের ভাল কিছু লেখার প্রসা জন্য অনেক পুরস্কার আছে।

এদের মধ্যে ক্যালডিকট্ মেডেল এবং নিউবেরী পুরস্কার বেশ নামকরা।

আমরা এখানে নিউবেরী পুরস্কারের কথা বলব।

এই পুরস্কার ১৯২২ সাল থেকে দেওয়া হয়ে আসছে। আমেরিকার শিশুদের জন্য লেখা সব চাইতে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতির জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। বিদেশের লেখকরাও এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হতে পারেন, কিন্তু তাদের সেই বই প্রথম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হতে হবে। এই পুরস্কারের জন্য কোনও সংগ্রহ বই বিবেচিত হয় না, সর্বদা মৌলিক রচনা হতে হবে।

পূর্ববর্তী এক বছরে প্রকাশিত বই-ই কেবল এই পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

আমেরিকার লাইব্রেরী সমিতির America Library Association, সংক্ষেপে যার নাম হ'ল (A. L. A.)।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

জুন মাসে এর বার্ষিক অধিবেশন হয়, সেই সময় ক্যালডিকট্ পুরস্কার এবং নিউবেরী পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

নিউবেরী পুরস্কার একটি ব্রোঞ্জ পদক। এই পদকটি দিয়েছেন আর. আর. বোউকার কোম্পানীর ফ্রেডারিক জে. মেলচার। এই পদকের নক্সা এবং তৈরীর পরিকল্পনা করেছিলেন আমেরিকান স্থপতি রেনে চেম্বারলেন।

এই পদকটির নাম 'নিউবেরী পুরস্কার' করা হয়েছিল, লণ্ডনের একজন বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী জন্ নিউবেরীর (১৭১৩—১৭৬৭) নামে। ইনি-ই সর্বপ্রথম কেবলমাত্র ছোটদের জন্য সুন্দর সুন্দর বই প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। জন্ নিউবেরীর বিখ্যাত শিশু-গ্রন্থাগারের বইগুলি ছিল চার ইঞ্চি লম্বা আকারের এবং সব বইগুলিই সুন্দরভাবে নক্সা করা সোনালী কাগজ দিয়ে বাঁধান ছিল।

১৯২৮ সালে স্বর্গত ধনগোপাল মুখার্জীকে তাঁর 'Gay Neck' বইয়ের জন্য এই পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পুরস্কার লাভ করেন।

* * *

ধনগোপাল মুখার্জী ১৮৯০ সনের ৬-ই জুলাই কলিকাতার কাছাকাছি কোনও এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতার নাম কিশোরী এবং ভুবন (গোস্বামী) মুখোপাধ্যায়। এঁরা ছিলেন পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত।

তাঁদের বাড়ী ছিল একটা বনের ধারে। ছোট ছেলে ধনগোপালের সেই বনের উপর ছিল গভীর আকর্ষণ। ছোটবেলায় ধনগোপাল জানালার ধারে বসে সেই বনের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন—দেখতেন কত নানারকম জন্তু-জানোয়ার। এটা ছাড়া বনের আরও একটা প্রভাব ছোটবেলায় তাঁর উপর গভীরভাবে পড়েছিল। বন তার শূন্যতা নিয়ে, অন্ধকার নিয়ে, সেই বালককে ঘিরে ধরত, তার ছোট মনের উপর প্রভাব বিস্তার করত।

বড় হলে ধনগোপাল পুরোহিত সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে গভীর বনে যেতেন। সেখানে সারারাত কাটিয়ে দিতেন। বনের যে একটা অন্য সৌন্দর্য রয়েছে, সেখানে থাকতে তারা সেটা উপলব্ধি করতে পারতেন। ধনগোপাল তখন জানতে পেরেছিলেন যে, 'বনের পশুরাও আমাদের ভাই, তারা আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, আমাদেরও তাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত।'

পরবর্তী জীবনে তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে এই চিন্তার কথাই ফুটে উঠেছিল নানাভাবে।

এছাড়া মা-র প্রভাবও তাঁর জীবনে ছিল বিরাট। তাঁর মা লিখতে বা পড়তে পারতেন না, কিন্তু ভারতের নানারকম পুরাণ ও উপকথার কাহিনী ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। তিনি সবাইকে সে সব গল্প বলতেন।

ধনগোপাল মা-কে শ্রদ্ধা করতেন গভীরভাবে। তাঁর মা জীবনের নানারকম জটিল প্রশ্নগুলি উত্তর নিজেই দেবার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন সুন্দর কথা, উপদেশ দিতেন আর সুন্দরভাবে, 'তোমার হৃদয়ের সব ক'টি দুয়ার খোলা রাখ, যাতে করে ভগবানের প্রভাব, তাঁ সত্য-চিন্তা প্রবেশের পথ না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।'

ধনগোপাল ছিলেন বাড়ীর কনিষ্ঠ সন্তান, তাই তাঁরই উপর গ্রাম্যদেবতার পূজা ভার এসে পড়েছিল। আর এগারো বছর বয়সের আগেই তাঁকে নানারকম ধর্মী আচার-অনুষ্ঠানের—যেমন বিবাহ, মৃতদেহের সংকার প্রভৃতির ভার নিতে হ'ত।

ধনগোপালের দুই বিখ্যাত দাদার কথা তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। তাঁরা হলেন ক্ষীরোদগোপাল আর যাদুগোপাল। এঁরা দু'জনেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের আন্দোলনে জড়িত ছিলেন।

১৯০৮ সালে ক্ষীরোদগোপাল যখন বর্মায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ক্ষীরোদগোপালের কাছ থেকে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতেন মাসিদি আফগানের সহযোগিতার অস্ত্র-সংগ্রহের চেষ্টায় ক্ষীরোদগোপাল অন্তরীণ হ' ১৯১৫ সালে। ইনি পরে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন।

আর যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথা বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবে তাঁর লেখা 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' পড়লে। বড় হয়ে বইটা তোমরা পড়ে দেখ।

যাহোক্ ধনগোপালের কথায় এবার ফিরে আসা যাক্। দশ বছর বয়সে ধনগোপাল একটি স্কচ্-প্রেজবিটীরিয়ান স্কুলে ভর্তি হলেন।

চোদ্দ বছর বয়সে ধনগোপালকে পুরোহিত হিসাবে দীক্ষা দেওয়া হ'ল। ওটা ছিল—আগেই বলেছি—তাদের পৈতৃক বৃত্তি।

এরপর দু'বছর ধরে ধনগোপাল বিশাল ভারতবর্ষের নানা তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে তিনি তখন জীবিকানির্বাহ করতেন। কিন্তু যে ভগবান-এর অনুসন্ধান তিনি করছিলেন, তা' এতে বিন্দুমাত্রও তৃপ্ত হ'ল না। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, আঠারো বছর বয়সে হঠাৎ একদিন পাড়ি দিলেন জাপানের পথে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর তিনি শিল্পবিদ্যা এবং পাশ্চাত্যে উৎপাদন-পদ্ধতি বিষয়ে পড়াশোনা করেন।

কিন্তু জাপানও তার আর ভাল লাগল না। তিনি তখন আমেরিকার গল্প শুনেছেন তাই ১৯১০ সালের একদিন ইয়াকোহামার বাঙালী ব্যবসায়ীদের থেকে কিছু ধার করে তিনি যাত্রা করলেন আমেরিকার উদ্দেশে।

তাঁর সংগ্রহশালায় তখন যা জমা ছিল তা হ'ল তাঁর অপূর্ব 'মিণ্টনিক ইংরেজী।'

যে অর্থ তিনি ধার করে এনেছিলেন, তার সবই ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য শেষ হয়ে গেল।

এরপরই শুরু হ'ল সেই বিদেশে এক তরুণ বাঙালীর জীবন-সংগ্রাম।

আমেরিকায় ধনগোপাল বাড়ীতে বাড়ীতে ডিম্ ধুয়ে বা অন্য যে কোন কাজের বিনিময়ে তাঁর জীবিকানির্বাহ করতে লাগলেন। এই সময় অনেক দিন তাঁকে না খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। এরপর ১৯১৪ সালে তিনি লিল্যাণ্ড স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেটাফিজিক্স-এ পিঁ. এইচ. বি. ডিগ্রী লাভ করলেন।

আমেরিকায় তাঁর সেই প্রথম দিনের সংগ্রাম এবং তপস্যার ফল-সিদ্ধির কথা রয়েছে তার 'Caste and Outcaste' (১৯২৩ সালে প্রকাশিত) বই-এ। [এই বইটি শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় 'ঘরের ছেলে বাহিরে' নামে অনুবাদ করেছেন।]

এই সম্মান লাভের পর ধনগোপাল লিল্যাণ্ড স্ট্যানফোর্ড এবং নানারকম সংস্থায় 'তুলনামূলক সাহিত্য' সম্বন্ধে নানা আলোচনা-সভায় যোগ দিতে লাগলেন। ইংল্যাণ্ডে তিনি অবশ্য সবচেয়ে বেশী বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

১৯১৮ সাল তিনি একজন আমেরিকান রমণী, ইথেল রে ডুগনকে বিবাহ করেন।

শ্রীমতী ইথেল রে ডুগান ছিলেন পেন্‌সিলভ্যানিয়ার নরিস টাউনের অধিবাসিনী। কিন্তু তিনি শিক্ষকতা করতেন নিউ ইয়র্কের ডালটন স্কুলে।

এই সময় ধনগোপাল দুই খণ্ডে কবিতার একটি বই এবং দুটি নাটক প্রকাশ করেন।

দীর্ঘদিন তিনি নিজের দেশ ভারত থেকে চলে এসেছেন, তাই ১৯২১ সালের একদিন সেই প্রিয় জননী-জন্মভূমি ভারতবর্ষের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। আর তারপরই তিনি ভারতবর্ষে ফিরে চললেন।

দেশে তখন তুমুলভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন চলেছিল, আর পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার অনুপ্রবেশের ফলে এ দেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের হানি হয়েছিল বলে তার মনে হয়েছিল। তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলনের এক মহান্ বাণী এ দেশ থেকে ফিরে যাবার সময় নিয়ে গেলেন। তার আধুনিক ভারতবর্ষ ভ্রমণের কথা লিখেছেন তার 'My Brother's face' (১৯২৪) নামক গ্রন্থে।

আমেরিকায় ফিরে গিয়ে ধনগোপাল কলেকটিকাটের নিউ মিলফোর্ড শহরে তার স্ত্রী এবং ছেলে, ধনগোপাল (২য়) কে নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন।

আগেই বলেছি, ১৯২৮ সালে তার বই 'Gay Neck' 'নিউবেরী পুরস্কার' পেয়েছিল।

এই বইটির প্রধান চরিত্রে রয়েছে একটি পায়রা, 'চিত্রগ্রীব' তার নাম। ত জীবনের বড় হবার এবং নানারকম অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী নিয়ে এই আশ্চর্যসুন্ বইখানির কাহিনী গড়ে উঠেছে।

বইটি 'চিত্রগ্রীব' নামে অনুবাদ করেছেন ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তোমরা যা এখনও বইটা পড়নি তারা অবশ্যই পড়ে ফেলবে।

এ ছাড়াও তিনি ছোটদের জন্য আরও অনেক বই লিখেছেন। এ'গুলির মে আছে—Kari, the Elephant (১৯২৩), Jungle Beasts and Men (১৯২৩), Hari, th Jungle lad (১৯২৪), Ghond, the Hunter (১০২৮), The Chief of the Her (১৯২৯), [এই বইটি 'যূথপতি' নামে অনুবাদ করেছেন ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।] এ Rama, the hero of India (১৯৩০)।

আমাদের দেশের জন্তু-জানোয়ার, সাপুড়ে-বাজীকর আর বোম্বেটে-জলদস্যুদের নানা কাহিনী তার বইয়ে তিনি সুন্দর, সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন।

Gay Neck এবং Ghond, the Hunter বই দুটির ছবি এঁকেছিলেন বোরিস আর জব্যাসেফ্। এই ছবিগুলি এত ভাল হয়েছিল যে, আমেরিকার 'গ্রাফিক আর্ট সংস্থা' এই ব প্রকাশের বছরে তাদেরই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছিলেন।

ধনগোপাল এরপর ১৯২৯ সালের শীতকালে আরও একবার ভারত-ভ্রমণে আসেন তখন তিনি গান্ধীজীর দ্বারা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভা লিখেছেন তিনি তাঁর 'Disillusioned India' (১৯৩০) নামক গ্রন্থে।

কিন্তু ভারতের এই মহান্ সন্তান ১৯৩৬ সালের ১৪ই জুলাই নিউ ইয়র্কে উদ্বন্ধে আত্মহত্যা করেন। মানসিক অশান্তি-ই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই তো গেল ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। কিন্তু তার সম্বন্ধে আর দু-চার কথা না বলা হলে, অনেক কিছুই বলা বাকী থেকে যাবে।

মিস্ ম্যাকলাউড্ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দর একজন বিশেষ ভক্ত এবং তিনি জাপানী কাউন্ট ওকাকুরাকে ১৯০২ সালে ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন 'After Swamiji, Dhan is the proper person to interpret India to the West'—স্বামীজীর পর ধনগোপালই পাশ্চাত্যের কাছে ভারতবর্ষের যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

মিস্ ক্যাথরিন মেয়ো ভারতবর্ষের নিন্দা করে 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক একটি গ্রন্থে

নানা কুৎসা রটনা করেছিলেন। এতে আমাদের দেশ প্রবল আলোড়ন দেখা দেয়। এমন কি গান্ধীজীও এতে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। বিদেশ থেকেই ধনগোপাল তার যথার্থ উত্তর দেন—'A son of Mother India answers', 'ভারতমাতার এক সন্তান উত্তর দিচ্ছে।' এই বইয়ে তিনি আমাদের দেশের যথার্থ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিদেশে যে তিনি ভারতবর্ষকে নানাভাবে পরিচিত করার চেষ্টা করেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। ভারত-কে জানবার জন্য তিনি লিখেছিলেন—'Visit India with me, আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে চলুন।

এ ছাড়াও বড়দের জন্য তাঁর আরও অনেক বই রয়েছে। মনীষী Earl Brewster এবং তাঁর স্ত্রী ধনগোপালের লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তার 'Face of Silence' বইটির কাহিনী শুনে মনীষী রোম্যা রোঁল্যা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী রচনায় মন দিয়েছিলেন। ধনগোপালের দুই দাদা যেমন দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তেমনি দেশকে ধনগোপালও ভালবাসতেন খুব। দেশ থেকে অনেক দূরে থেকেও, সেই দেশেরই নানা কাজ করে গিয়েছেন তিনি নানাভাবে।

ভারতের এই মহান্ সন্তান সম্বন্ধে তেমন কোন আলোচনা আজও আমাদের দেশে হয়নি। তোমরা বড় হয়ে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে আরও জানবে, তার লেখা নিশ্চয়ই পড়বে, এ'টা আশা করা যায়।

অভিমান

শ্রীসন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত

বন্ধুত্ব তোমার মোরা দিনু বিসর্জন।
সেদিন বন্ধুত্ব পুনঃ করিব গ্রহণ॥
যেদিন হেরিব তব হয়েছে সুমতি।
সর্বহারা দলে দিবে কিছুও সম্পত্তি॥
দীর্ণ বক্ষে দিবে কিছু সান্ত্বনার লেপ।
শীর্ণ গাত্রে দিবে কিছু খাদ্যের প্রলেপ॥
যেথায় আঁধার সেথা আলো জ্বেলে দিবে।
সেদিন মিলাতে এসো জীবে আর শিবে॥
নতুবা স্বরগ-পতি স্বর্গে যাও ধেয়ে।
মৃত্তিকা-সন্তান মোরা রবো মাটি খেয়ে॥

ষাঁড়ের লড়াই

লাটুখুড়োর গল্প

শ্রীরবিদাস সাহারায়

এক দেশে ছিল এক বুড়ো কাঠুরে। সবাই তাকে লাটুখুড়ো বলে ডাকত। ভোর হলেই সে কুড়ুল কাঁধে করে চলে যেত বাড়ি থেকে অনেক দূরে এক পাহাড়ে। সারাদিন সে সেখানে কাঠ কাটত আর সন্ধ্যে হলে সেই কাঠ বয়ে নিয়ে যেত পাহাড়ের নীচেকার এক বাজারে। সাথানে কাঠগুলি সে বিক্রী করত। এই ছিল তার রোজকার কাজ। এত কষ্ট ও পরিশ্রম করে সে যা রোজগার করত তা খুবই সামান্য। তাতে একখানা রুটির চাইতে বেশি সে কিছুই কিনতে পারত না। একটি রুটিতে কি খিদে মেটে? তাই রুটির সঙ্গে বেশ কিছুটা জল খেয়ে পেটটা ভরতি করে নিত। এমনি ভাবে দিনের পর দিন কষ্ট ভোগ করে করে লাটুখুড়ো ধীরে ধীরে অধৈর্য হয়ে উঠল।

একদিন কাঠ কাটতে কাটতে ক্লান্ত লাটুখুড়ো একটা গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করছিল আর নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছিল। এমন সময় একটু দূর থেকে কে একজন ডেকে বলল, "লাটুখুড়ো, লাটুখুড়ো, তোমার কাছে যাবো?"

পাহাড়ের উপর এই গভীর জঙ্গলে হঠাৎ অচেনা গলার আওয়াজ শুনে লাটুখুড়ো অবাক হয়ে গেল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল ·পেল না। তখন খুড়োর মনে ভয় হ'ল একটু। তবু সাহস সঞ্চয় করে বলল, "বেশ তো, এসই না বন্ধু, দেখি তুমি কে!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে গাছপালার মধ্যে থেকে পাকা দাড়িওয়ালা থুড়থুড়ে একটি বুড়ো এসে হাজির হ'ল লাটুখুড়োর সামনে। এসে বলল, "বসবো তোমার পাশে?"

লাটুখুড়ো বলল, "বসো।"

বুড়ো লোকটি লাটুখুড়োর পাশে বসে নানা গল্প জুড়ে দিল। গল্পের মাঝখানে হঠাৎ বুড়োটি বলে উঠল, "আচ্ছা লাটুখুড়ো, তুমি তো বেশ সুখেই আছ, না?"

সে কথা শুনে অবাক হয়ে গেল লাটুখুড়ো। লোকটি তার নাম জানল কি করে? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে লাটুখুড়ো জবাব দিল, "তা যা বলেছ, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রাত্রে জোটে একখানা রুটি, পেটের এক কোণও ভরতি হয় না। এমন ভাবে খেয়ে ক'দিন আর খাটতে পারা যায় বলো! তার ওপর বয়স তো আর কম হয়নি। এ বয়সে লোকে বিশ্রাম নেয়, কিন্তু খাটতে-খাটতেই আমার জীবন গেল!"

বুড়োটি এতক্ষণ তার কথা মন দিয়ে শুনছিল। এবার বলল, "আমি তোমায় একটা পথ বলে দিতে পারি, যদি শোন তবে বলি।"

মাথা নেড়ে লাটুখুড়ো বলল, "নিশ্চয় শুনব, তুমি বলই না।"

বুড়োটি বলল, "তা'হলে শোন বলি। সামনের ঐ রাস্তা দিয়ে তুমি সোজা হাঁটতে স্থরু করে দাও। রাস্তায় যদি কেউ তোমায় জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছ, বলবে ভাগ্যের সন্ধানে চলেছি।"

কথা শেষ করেই বুড়োটি অদৃশ্য হয়ে গেল। লাটুখুড়ো ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর বুড়োর কথা মতই যাত্রা স্থরু করে দিল।

হাঁটতে হাঁটতে সে একটা নদীর ধারে গিয়ে পড়ল। সেখানে কোন লোকজন নেই। আছে শুধু ছোট্ট একটা নৌকো আর তাতে একজন মাঝি। মাঝিটি দেখতে অনেকটা আগেকার সেই দাড়িওয়ালা বুড়োর মতই। সে জিজ্ঞেস করল, "লাটু খুড়ো, লাটুখুড়ো, কাঁধে কুড়ুল নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?"

বুড়ো যা বলে দিয়েছিল সেই ভাবে লাটুখুড়ো জবাব দিল, "কোথায় আর যাব ভাই, এই ভাগ্যের সন্ধানে চলেছি।"

মাঝি বলল, "তাই নাকি? তা'হলে তো তোমায় অনেক দূরে যেতে হবে। আমার নৌকায় এসো। তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি।"

লাটুখুড়ো বলল, "কিন্তু আমার কাছে যে ভাই কিছু নেই। তোমার মজুরী দেব কেমন করে?"

মাঝি বলল, "যে সত্যকথা বলে তার কাছ থেকে মজুরী নিই না। এসো আমার নৌকোয়।"

লাটুখুড়ো তখন নৌকায় উঠল। উঠতেই নৌকোটি এমন ভাবে দুলে উঠল যে, মনে হ'ল এক্ষুনি ডুবে যাবে। ভয় হ'ল লাটুখুড়োর। মাঝি তা বুঝতে পেরে বলল, ভয় নেই, ডুববে না।"

মাঝি নৌকো চালিয়ে দিল। নদীর ঢেউয়ে দুলতে দুলতে চলল সেই নৌকো। পথ আর ফুরায় না। মনে হ'ল এ চলার যেন আর শেষ নেই। সন্ধ্যে হয়ে এল। তারপর রাতও গভীর হ'ল। লাটুখুড়ো ঘুমিয়ে পড়ল নৌকোর পাটাতনের ওপর। পরদিন খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙল। চোখ মেলেই সে দেখতে পেল নদীর পারে স্থন্দর একটি রাজপ্রাসাদ। সেই রাজপ্রাসাদের সামনে নৌকো ভিড়িয়ে দিয়ে মাঝি বলল, "এখন নামো। ঐ যে রাজপ্রাসাদ দেখে যাচ্ছে, সেখানেই তোমার ভাগ্যের সন্ধান পাবে।"

লাটুখুড়ো নৌকো থেকে নামতে নামতে বলল, "মাঝি ভাই, তোমাকে ধন্যবাদ।"

মাঝি বলল, „তুমি সত্য কথা বলেছ বলেই তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে

দিয়েছি। নইলে তোমাকে নদীতে ডুবিয়ে মারতাম। ঐ যে রাজপ্রাসাদের সদর দরজা দেখা যাচ্ছে, সেখানে ঢুকতে গেলেই দেখবে দুটো বামন লোক রয়েছে পাহারায়। তারা তোমার পথ আটকাবে। তখন সত্য কথা বললেই পথ ছেড়ে দেবে।"

লাটুখুড়ো মাঝিকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে প্রাসাদের দিকে এগোতে লাগল। একটু পরেই পেছনে তাকিয়ে দেখল, নৌকাসহ মাঝি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

লাটুখুড়ো ধীরে ধীরে এগোতে লাগল প্রাসাদের দিকে।

সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখল দুটো বেঁটে লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোক দুটো লাটুখুড়োকে জিজ্ঞেস করল, "কি চাও ?"

লাটুখুড়ো বলল, "আমি আমার ভাগ্যের সন্ধান এখানে করতে চাই।"

বেঁটে লোক দুটো বলল, "তোমার ভাগ্য এখানেই আছে, কিন্তু তা দেখে কি করবে, তার চাইতে ফিরে যাও।"

লাটুখুড়ো বলল, "একবার দেখতেই দাও না, তারপর যা ভাগ্যে আছে তাই হবে।"

লোক দুটো বলল, "বেশ, যদি তুমি একান্তই দেখতে চাও, তা'হলে এই প্রাসাদের ভিতরে যাও। হ্যাঁ দেখ, ঘর গুণতে গুণতে যেও। দশ নম্বর ঘরে তুমি তোমার ভাগ্য দেখতে পাবে।

লাটুখুড়ো তাড়াতাড়ি প্রসাদের ভিতর ঢুকে পড়তেই বেঁটে লোক দুটো চেঁচিয়ে বলল, "আরে এত তাড়া কিসের ? এর ভেতর পথ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। ভাগ্য খুঁজতে গিয়ে শেষকালে তুমি নিজেই হারিয়ে যাবে।"

একটা বেঁটে লোক দৌড়ে গিয়ে লাটুখুড়োকে নিয়ে এগিয়ে চলল। একটু এগিয়েই ওরা ঢুকে পড়ল একটা সরু লম্বা বারান্দার মধ্যে। বারান্দার দু'ধারে সারবন্দি ঘর। সব ঘরের দরজাই ভেজানো। একটু ঠেলা দিলেই খুলে যায়।

একটি ঘরে তারা উঁকি দিয়ে দেখল, হীরের মুকুট মাথায় দিয়ে সিল্কের পোশাক পরে একজন লোক সিংহাসনে বসে আছে। পোশাকের ওপর সোনার কাজ করা। কিছুক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে লাটুখুড়ো জিজ্ঞেস করল, "ইনি কে ?"

বেঁটে লোকটি বলল, "এই হচ্ছে পৃথিবীর সব চাইতে বড় ধনীর ভাগ্য।"

লোকটিকে দেখে লাটুখুড়োর ভয়ানক হিংসা হ'ল। ইস্, এমন ভাগ্য যদি তার হ'ত। বেঁটে লোকটি এগিয়ে গিয়ে আর একটি ঘরের দরজা খুলল। সেই ঘরেও সোনার মুকুট ও সিল্কের পোশাক পরা একজন লোক বসেছিল। পোশাকে রূপোর কাজ-করা।

লাটুখুড়ো জিজ্ঞেস করল, "ইনি কে ?"

বেঁটে লোকটি বলল, "এই হ'ল পৃথিবীর দ্বিতীয় ধনীর ভাগ্য।"

লাটুখুড়ো মনে মনে ভাবল, হায় রে এমন ভাগ্যও যদি আমার হ'ত!

বেঁটে লোকটি বলল, "আরো দেখবে চলো।"

এমনি ভাবে ঘুরে ঘুরে ঘর-গুলো দেখতে দেখতে বেঁটে লোকটি হঠাৎ একটি ঘরের দরজা খুলে ধরল। সেখানে বসে আছে ছেঁড়া নোংরা কাপড়-পরা একজন লোক। তাকে দেখে লাটুখুড়োর মনে দয়া হ'ল। অজান্তেই তার মুখ থেকে বের হ'ল আহা বেচারী!

বেঁটে লোকটি বলল, "এতেই এমন অবস্থা! একটু সবুর কর, এক্ষুনি আমরা তোমার ভাগ্যের কাছে যাচ্ছি। তা দেখলেই বুঝতে পারবে যে, এ দেখে তোমার দুঃখ করার কোন কারণ নেই।" এই বলে সে দশ নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সেই ঘরের দরজা খুলতেই দেখা গেল, সেখানে আগের চাইতেও ছেঁড়া ও নোংরা কাপড় পরে একটি লোক বসে আছে। তার রোগা শরীরের প্রতিটি পাঁজরা গোনা যায়।

'সোনার মুকুট ও সিল্কের পোশাক পরা একজন লোক বসে।'

বেঁটে লোকটি বলল, "এই হ'ল তোমার ভাগ্য।"

লাটুখুড়ো তা দেখে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি কিন্তু একবারও তার দিকে ফিরে তাকাল না। লাটুখুড়োর তখন মনে দুঃখ ও অভিমান হ'ল। সে বলল, "আমি তোমার জন্য এতদূর এলাম আর তুমি একবার ফিরেও তাকলে না?"

লোকটি বলল, "বেশ তুমি যদি তাই চাও, তবে আমি তোমায় সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।"
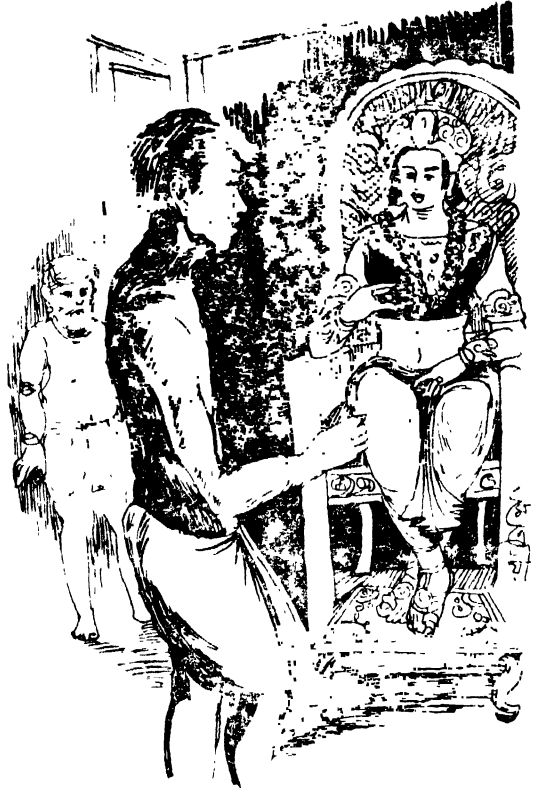
লাটুখুড়ো ভীত হয়ে বলল, 'চমৎকার সাদর সম্ভাষণ! তুমি যদি আমার ভাগ্য না হয়ে, তুমি যা তাই হতে তা'হলেও আমি তোমায় চাইতাম না।''

এই কথা শুনে লোকটি হাততালি দিয়ে উঠতেই একটি দৈত্যের মত লোক এসে হাজির হ'ল।

লোকটি বলল, ''একে আরও কিছুদূর নিয়ে যাও।''

লাটুখুড়ো দৈত্যের মত লোকটির পিছন পিছন চলল। একটির পর একটি ঘর ঘুরে কুড়ি নম্বর ঘরের দরজা খুলতেই দেখল, বিরাট এক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একজন অস্থিচর্মসার লোক বসে আছে, আর তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য সাপখোপ ও পোকামাকড়।

লাটুখুড়ো ভয়ে আঁতকে উঠল। দৈত্যের মত লোকটিকে বলল, ''চল আমরা ফিরে যাই।''

লোকটি বলল, ''আরও যে কয়েকটা ঘর বাকী রইল, দেখবে না?''

লাটুখুড়ো তখন ফিরে যেতে পারলে বাঁচে। তাড়াতাড়ি বলল, "না, আর দেখব না।"

তারা আবার সেই দশ নম্বর ঘরের সামনে এসে হাজির হ'ল। ঐ ঘরের লোকটি এবার বলল, "যদি তুমি আমায় বদলিয়ে অন্য কোন ভাগ্য নিতে চাও, তবে এক কাজ কর। চোখ বুজে তোমার যে সব ভাগ্যের কথা মনে পড়বে তার প্রথমটি নাও।

লাটুখুড়ো ভাবল, ভাগ্য বদলাতে পারলে ভালই হয়। কিন্তু প্রথম দিককার ভাগ্যের কথা মনে না পড়ে যদি তার শেষের দিককার ঘরের ভাগ্যের কথা মনে পড়ে! ভাবতেই সে শিউরে উঠল। চীৎকার করে সে বলে উঠল, "না, আমি তোমায় বদলাতে চাই না।"

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে লাটুখুড়ো আবার সেই নদীর দিকে ছুটে চলল।

দেখল, ঘাটে বসে আছে নৌকা নিয়ে সেই বুড়ো মাঝি। মাঝি জিজ্ঞেস করল, "লাটুখুড়ো কি হ'ল, ভাগ্যের সন্ধান পেলে?"

লাটুখুড়ো কোন জবাব না দিয়ে নৌকায় উঠে বসল। সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল তার দিকে চেয়ে বুড়ো মাঝি মিটমিট করে হাসছে।

অবশেষে লাটুখুড়ো কুড়ুল নিয়ে সেই জঙ্গলে এসে হাজির হ'ল। সেখানে পৌছতেই পাকা দাড়িওয়ালা সেই থুড়থুড়ে বুড়োটি এসে দাঁড়াল তার সামনে। বুড়ো জিজ্ঞেস করল, "কি লাটুখুড়ো, ভাগ্যের সন্ধান পেলে?" লাটুখুড়ো তখন সব কথা খুলে বলল। বলতে বলতে শেষের দিকে তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। গল্প শেষ করে সে বলল, ''এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার চাইতেও হতভাগ্য এই পৃথিবীতে আছে। কাজেই এখন আর আমার কোন দুঃখ নেই।"

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥
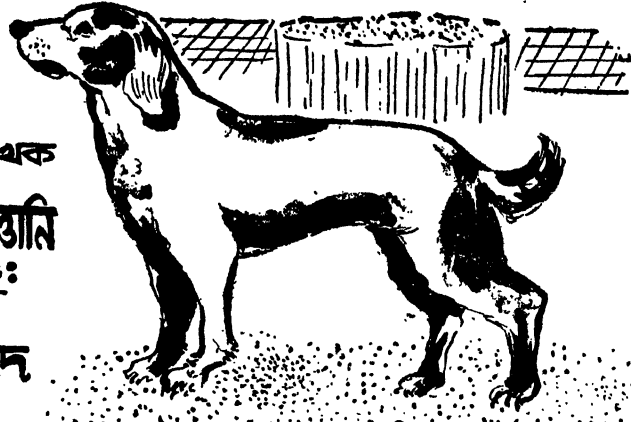
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ সিগন্যাল ঘন্টি ॥

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কেটে গেল দ্রুতগতিতে। ল্যাম্পো এখনও আমাদের কাছে। ও বুঝে গেছে এখানে থাকলে ও পাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও ভরপেট অন্ন। অতএব ক্যাম্পিগলিয়া ত্যাগ করবার বাসনা ওর মোটেও নেই। এখনও ও প্রতিদিন ডাইনিং-কারের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু আগে যেমন প্রাণপণে চেঁচাতো রাঁধার লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য, এখন আর তা করে না—চেঁচায় না। শুধু আজকাল জানলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নয়ত যতদূর পারে গাড়ীর সঙ্গে ছুটে চলে। ওর জনপ্রিয়তা এখন এত বেড়ে গেছে যে, সকলেই ল্যাম্পোকে দেখতে চায়, বিশেষ করে তার গাণ্ডেপিণ্ডে গেলা। যখনই ও ডাইনিং-কারের দিকে ছুটে যায়, দলবাঁধা লোক ওর পেছনে দেখতে চলে যে ও ঠিক ওর রেঁস্তোরাটি খুঁজে নিতে পেরেছে কিনা। এমন কী অত্যন্ত অবিশ্বাসী যারা এবিষয়, তারাও নিজে চোখে এই প্রমাণ পেয়ে আশ্চর্য হয়ে মেনে নিয়েছে। ল্যাম্পো কিন্তু এতসব আড়ম্বর ভালবাসত না, বরং চটেই যেত। রেগে গরগর করে যেন বলতে চাইত—"তোমরা নিজেদের কাজে মন দাওনা বাপু! আমার কাজ আমাকেই শান্তিতে সমাধা করতে দাও।"

ফলে এই হ'ল- ল্যাম্পোই যেন হয়ে দাঁড়াল 'সিগন্যালের ঘন্টি'। যখনই ও ছুটে বেরিয়ে

যেতো আপিস থেকে, এবং বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করত, তখনই বোঝা যেত তা'হলে এবার এক্সপ্রেস গাড়ী আসবার সময় হয়েছে। ষ্টেশন ময় সাড়া পড়ে যেত। ডাকপিয়ন ও কুলীরা যারা মাল ভরা এবং খালি করার কাজ করে, তারা সবাই নিজের নিজের ঠেলা ও গাড়ী নিয়ে চলে যেত নির্দিষ্ট জায়গায়। রেলের পুলিশরা সাজপোশাক ও বেশবাস ঠিকঠাক করে নিত। টুপিটা মাথার ওপরে ঠিক করে এবং সাদা দস্তানা হাতে পরে নিত। ষ্টেশনমাষ্টার যে-যখন ডিউটিতে থাকতো হাতে প্যালেটটি তুলে নিত, বিভিন্ন বিভাগে সিগন্যাল্ পাঠাবার জন্য। জলখাবারের গাড়ীর ছোঁড়াটা ঠেলাগাড়ী ঠেলে নিয়ে প্ল্যাটফরমে এসে হাঁফ ছেড়ে 'স্যাণ্ডুইচ, অরেঞ্জ, বীয়ার' প্রভৃতি বলে চেঁচাত। খবরের কাগজ বিক্রি করে যে স্ত্রীলোকটি, সেও পাল্টা চেঁচিয়ে 'সচিত্র পত্রিকা বিক্রী আরম্ভ করে দিত। যেসব যাত্রীরা যাত্রা করবে, তারাও নিজেদের মালপত্র এক জায়গায় জড়ো করে নিত, গাড়ীতে উঠতে হবে বলে। আত্মীয়দের বিদায় সম্ভাষণ জানানোর পালা চলত। সত্যিই দেখা যেত, মিনিট কয়েকের মধ্যেই যে ট্রেনের আগমন সিগন্যাল ল্যাম্পো ঘোষণা করেছিল—সে ত্বরিত গতিতে এসে ঢুকল ষ্টেশনে।

ল্যাম্পিনোর অন্যান্য গুণাবলীর সঙ্গে আরও একটি বিশেষত্ব এবার লক্ষ্য হ'ল। ও শুধু হিসেবীই ছিল না, রীতিমত বিচক্ষণও ছিল। যখনই ও রেল লাইন পার হোত, দেখা যেত প্রথমে থেমে, ডাইনে-বাঁয়ে দু'বার ভাল করে দেখে নিয়ে, তারপর ও লাফিয়ে পার হয়ে যেত। ও বুঝে গিয়েছিল ট্রেনগুলো খেলনা নয়, অতএব বাবা তাদের সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে চলাই শ্রেয়ঃ!

আমার মনে হয় ওর এই বিচক্ষণতার মূলে আছে মাসকয়েক আগের একটি ঘটনার অভিজ্ঞতা। একদিন ও যখন ডাইনিং-কারের খুব কাছে দাঁড়িয়ে হাড় চিবোচ্ছিল, সেই সময় একটি চলতি গাড়ার ফুটবোর্ডের জোর ধাক্কা খেয়ে ও একেবারে চীৎপটাং। নিশ্চয় এই ঘটনাটি ওর মনে মোক্ষম রকম একটা ছাপ রেখে, ওকে উত্তমরকম শিক্ষা দিয়ে গেছে। সেই থেকে ও গাড়ী থেকে একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়ায় এবং গাড়ী ষ্টেশন ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত খাওয়া শুরু করে না। ও বুঝতে পারে, এরপরে ধীরে-সুস্থে তারিয়ে-তারিয়ে খাওয়াটা জমবে ভালো।

ল্যাম্পোর ন্যায়সঙ্গত রক্ষক বলতে গেলে আমি। ওর কীর্তিকলাপে আমি ক্রমেই বেশী করে উৎসাহিত হতাম আর ওর সম্বন্ধে মনে মনে একটা গর্ববোধও করতাম। প্রতিদিন কাজে গিয়ে প্রথমেই যদি ওকে না দেখতাম ভয় হোত, মনে হ'ত বুঝি বা ও ক্যাম্পিগ্লিয়া ছেড়ে চলে গেছে। অতএব খোঁজাখুঁজি শুরু করতাম। তারপরে আর সে প্রয়োজন হোত না। ও আমার ট্রেনের সময় বুঝে গিয়েছিল। কোন্ প্ল্যাটফরমে আসে—তাও জানত। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে

প্ল্যাটফরমের ওপরে আমার জন্য অপেক্ষা করত। আমাকে দেখে আহ্লাদে লাফিয়ে লেজ নেড়ে অস্থির। এইটাই ছিল ওর স্নেহভরে 'সুপ্রভাত' জানাবার ভঙ্গী।

॥ শৈলবিহারে ল্যাম্পো ॥

সে বছর আমরা আমাদের ছোট মেয়েটিকে ওর দিদার সঙ্গে গরমের ছুটি কাটাতে সান্তা ফিয়োরার পাহাড়ে পাঠিয়েছিলাম। জায়গাটি ভারী মনোরম। মাউণ্ট এ্যামিয়াটার ওপরে ২৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত একটি ছোট্ট পাহাড়ী এলাকা।

এ্যামিয়েটা পাহাড়ের চূড়া থেকে সাত মাইল দূরে ঘনশ্যামলতায় ভরা একটি গ্রাম। চারিদিকে বাদাম গাছের ঘন বন যেন অঙ্গাচ্ছাদনের মত পাহাড়টিকে আবেষ্টন করে আছে। এর হাওয়া এত বিশুদ্ধ যে ইটালীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের প্রিয় গ্রীষ্মাবাস এই সান্তা ফিয়োরায়।

যখনই আমি এবং আমার স্ত্রী আমাদের আদুরে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, ও বলত, যদি মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য ওর বন্ধু ল্যাম্পোকে ও কাছে পায় তাহ'লে ওর সঙ্গে মাঠের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে খেলে একটু মজা পেতে পারে। মির্ণার পাহাড়ে থাকবার মেয়াদ যখন প্রায় শেষ, আমরা ওকে সান্তা ফিয়োরা থেকে ফিরিয়ে আনা ঠিক করলাম। সেই সময় আমরা ল্যাম্পোকে সঙ্গে নিলাম। ওকে যখন 'কারে' উঠতে বললাম, দ্বিতীয়বার আর বলতে হ'ল না। বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে উঠেই ও পেছনের সীটে বসে পড়ল। তারপর জানলার কাছে ওর নাকটা এগিয়ে দিলো।

পিওম্বিনো থেকে সান্তা ফিয়োরা প্রায় বিরাশী মাইল। কারে ঘণ্টা দুই লাগে। বড় রাস্তাটা চট্ করেই পার হওয়া যায়। তারপরেই ছিল পাহাড়ী রাস্তা। চারপাশে গ্রামের দৃশ্য দেখে ল্যাম্পিনো খুব খুশী। একবার কারো সীটের ওপরে কুঁকড়ে বসে পড়ছে, পরমুহূর্তেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে বাইরের দৃশ্য দেখছে। রাস্তাটা ক্রমেই উঁচুতে চলেছে, এঁকেবেঁকে (মাথার কাঁটার মত) ঘূর্ণি-পথে। আমি মজা করবার জন্য ইচ্ছে করেই খুব বেগে গাড়ী ঘোরাচ্ছিলাম। ফলে ল্যাম্পো সীটে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। সামনের আয়না দিয়ে পেছন দিকে তাকাতেই দেখি ল্যাম্পো একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় বলতে চাইছিল, "এ আবার কী ঢং হচ্ছে? এমনি করে মানুষ গাড়ী চালায় নাকি?"

মির্ণা ও ল্যাম্পিনোর পুনর্মিলনের আনন্দের বর্ণনা করা আমার সাধ্যের অতীত। এক মাসের ওপর হয়ে গেছে ওরা একসঙ্গে খেলা করেনি। দু'পক্ষের আদরের উচ্ছ্বাস অনেকক্ষণ ধরে চলল। তারপর মির্ণা চুমোতে-চুমোতে আমাকে ভরে দিল। ওর আদরের কুকুরটাকে যে ওর কাছে এনে দিয়েছি, এটা সেই কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদস্বরূপ।

বিকেলের দিকে আমরা 'কারে' করে বেড়াতে বেরুলাম। এদিক-ওদিক দেখতে-দেখতে যাচ্ছি, হঠাৎ চোখ পড়ল একটা ছোট্ট সুন্দর গির্জা। আমরা গির্জার ভেতরে গেলাম। কিন্তু কুকুরটা যে আমাদের পেছনে পেছনে আসছিল, তা খেয়ালই করিনি। আমরা যখন প্রার্থনায় মগ্ন হঠাৎ গোলমাল শুনে দেখি, গির্জার রক্ষক ঝাঁটা দিয়ে ওকে তাড়া করছে আর বকবক করছে। হায়! আমাদের ছোট্ট জন্তুটি অমন পূতস্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিটির প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে চেপে মেঝের ওপরে বসেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যেরকম মোড় নিল, তা ল্যাম্পো বুঝতে পেরে লম্ফ দিয়ে চম্পট।

আমরা এত অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম যে, রক্ষক যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করল কুকুরটা আমাদের কিনা, ঠিক পিটারের মতই আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলাম এই বলে যে, "ওকে আমরা জানি না।"

গির্জা থেকে বেরিয়ে কুকুরটাকে আমাদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করতে দেখলাম না। অনেকক্ষণ খুঁজলাম, কিন্তু ল্যাম্পো বে-পাত্তা! শেষকালে বাড়ী চলে আসাই ঠিক করলাম। ভাবলাম, সেখানেই হয়ত সে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু সেখানে ফিরেও পেলাম শুধু হতাশা। এখানের এই পাহাড়ী বাড়ীগুলো সব এক ধরণের দেখতে। সেই সরু রাস্তা, একই রকম সদর দরজা, সবই এত বেশী এক রকমের যে, নতুন জায়গায় ল্যাম্পোর পথ হারিয়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। ল্যাম্পো এল না। মির্ণা ভীষণ কান্না জুড়ে দিলে। আমি এবং আমার স্ত্রীও রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। মেয়েকে শান্ত করবার জন্য বললাম, "কাল সকাল নাগাদ ওকে পাওয়া যাবেই।" আসলে আমি মনে-প্রাণে সেইটাই কামনা করছিলাম। কারণ, যদি ও কাল না আসে, খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে আমাকে কাল পিওম্বিনোতে অবশ্যই ফিরতে হবে।

সত্যি কথা স্বীকার করছি, এই পাহাড়ী গ্রামে কুকুরটাকে চিরকালের মত ফেলে যেতে হবে ভাবতেই আমার মন বেজায় খারাপ লাগছিল। যদি ওকে দেখাশুনো করবার কেউ জুটে যায়, তা'হলেও কী ও এই রকম জায়গায় থাকায় অভ্যস্ত হতে পারবে? সমস্ত জীবন তো রেলওয়েতেই কেটেছে ওর। রেল-বিভাগ যে ওর রক্তে মিশে গেছে। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা মানেই ওর মৃত্যু।

সারারাত্রি একপলকও ঘুমোতে পারিনি। সামান্য একটু আওয়াজ শুনলেই উঠে বসে দরজার দিকে দেখেছি—হয়ত ল্যাম্পো এসেছে, এই আশায়। কিন্তু ল্যাম্পোর ছায়াটুকুও সেখানে দেখতে পাইনি।

ভোর হতেই আমরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। গ্রামের সমস্ত জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। চাষীদেরও জিজ্ঞাসা করলাম, বাদামী ছাপওয়ালা একটা সাদা কুকুর ওরা দেখেছে কিনা। আমাদের মুখে দুশ্চিন্তার ভাব দেখে স্থানীয় লোকেরা বেশ কৌতুক বোধ করল। বোধহয় বলতে চাইছিল—"একটা কুকুর বৈ তো নয়!"

অদম্য কান্নায় অস্থির হয়ে মির্ণাও আমাদের পেছন-পেছন খুঁজতে চলল। বিকেল বেলা কয়েকজন চেনাশোনা লোককে ফোনে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা কুকুরটিকে দেখেছেন কিনা এবং যে তাকে খুঁজে পাবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এই কথা জানিয়ে, তবে অনেক কষ্টে মির্ণাকে বাড়ীতে বসানো গেল।

(ক্রমশঃ)

গোবরগণেশ

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

গোবরবাবু লাল খাতা আর গণেশঠাকুর নিয়ে,
পয়লা বোশেখ কালীঘাটের মন্দিরেতে গিয়ে
হাজির হলেন রিকশা চ'ড়ে, তখন সবে ভোর,
মোল্লাপাড়ায় মুরগি তখন ডাকছে ভীষণ জোর।
চত্বরেতে আসন পেতে পুরুতঠাকুর ব'সে,
ইঁদুর ধরার জন্যে বেড়াল ওত পেতেছে ক'ষে;—
"আসুন আসুন বাবুমশাই, এই আসনে বসুন,
লাভের ঘরে শূন্য হবে, যতোই অঙ্ক কষুন,
যদি না ঐ নতুন খাতায় সিঁদুর লাগাই আমি,
যতোই খাওয়ান হালখাতাতে মণ্ডামিঠাই দামী।"
গোবরবাবু হলেন কাবু, পা বাড়ালেন ফাঁদে,
খুশির হাওয়ায় পুরুতঠাকুর পৌঁছে গেলেন চাঁদে।
হঠাৎ এলো কোত্থেকে এক মস্ত বড়ো ষাঁড়,
লম্বা শিংয়ে উঠিয়ে নিয়ে ভাঙা দইয়ের ভাঁড়;
ষণ্ডমশাই দৌড় মারেন খেরোর খাতা দেখে,
ঐ দু'জনের মধ্যে খানিক গোবর ফেলে রেখে।
হকচকিয়ে ওঠেন বাবু, উঠলো হাত যে ন'ড়ে,
সেই গোবরে গণেশঠাকুর হঠাৎ গেলেন প'ড়ে।
গোবরগণেশ হয়ে দাদা ফেরেন দোকান ঘরে,
হরি হরি বল্ রে সবাই, বল্ রে তারস্বরে॥

মহাত্মা গান্ধী শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব

রামধুন

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিতপাবন সীতারাম
মঙ্গল-পরশন রাজা রাম
পতিতপাবন সীতারাম ॥
শুভ শান্তি বিধায়ক রাজা রাম
পতিতপাবন সীতারাম ।
বরাভয় দানরত রাজা রাম
পতিতপাবন সীতারাম ॥
নির্ভয় কর প্রভু রাজা রাম
পতিতপাবন সীতারাম ।
দীন-দয়াল রাজা রাম
পতিতপাবন সীতারাম ॥
রাজা রাম জয় সীতারাম
পতিতপাবন সীতারাম ॥
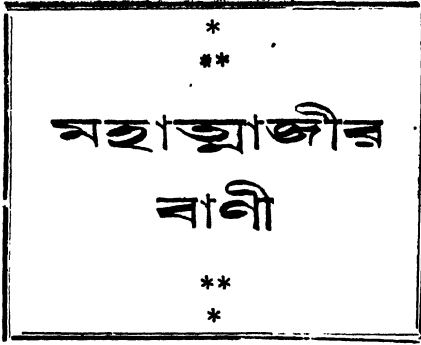
প্রকৃত শিক্ষা তাকেই বলবো, যার দ্বারা মানসিক শক্তি, বোধশক্তি ও শারীরিক শক্তির বিকাশ ঘটবে।

সমগ্র মনুষ্য জাতির মঙ্গল সাধনের ভেতর দিয়েই আমি ঈশ্বরকে জানবার চেষ্টা করছি। আমি জানি, ভগবান ঊর্ধ্বে শূন্যাকাশে বা পৃথিবীর কোন গহ্বরে বাস করে না—প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যেই তিনি বিরাজ করেন।

*

আমার কল্পনার স্বরাজে জাতি বা ধর্মের কোন বিভেদ বিচার নেই। আমার স্বরাজ সকলের জন্য—লক্ষ লক্ষ অন্ধ, মূক, বিকলাঙ্গ ও বুভুক্ষু জনগণও নিশ্চয় তাদের মধ্যে থাকবে।

*

পিতামাতার আজ্ঞা পালন করা ছাত্রদের পরম ধর্ম। বয়স্কদের মান্য করাও ছাত্রদের কর্তব্য? কিন্তু পিতামাতার আজ্ঞার সঙ্গে যখন ভগবানের নির্দেশের বিরোধ বাধবে, তখন ভগবানের নির্দেশকেই মানতে হবে। এমনি সঙ্কটের সময় যে ছাত্র ধর্মাচারণ করতে চায়, তাকে প্রহ্লাদের কথা স্মরণ করতে হবে। প্রহ্লাদ সম্মানের সঙ্গেই যেমন পিতৃআজ্ঞা পালনে অস্বীকার করেছিল, আমরাও তেমনি সত্যের বিপক্ষে হ'লে বয়স্কের আজ্ঞা অস্বীকার করতে পারি।

*

ঈশ্বরলাভের পথ বীরের জন্য, কাপুরুষের জন্য নহে। সত্যই হরি, সত্যই রাম, সত্যই নারায়ণ, সত্যই বাসুদেব।

*

যারা আমার উপর দোষারোপ করে, আমি তাদের উপর যেন ক্রুদ্ধ না হই। তাদের হাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, তা'হলেও যেন তাদের অমঙ্গল চিন্তা না করি—ঈশ্বর যেন আমাকে এমনিই মানসিক শক্তির অধিকারী করেন।

*

যুগ যুগ ধরে হিন্দুদের উন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা নীচু স্তরের (অস্পৃশ্যদের) উপর যে অন্যায় করেছে, আজ সে জন্য ঐ উন্নত সম্প্রদায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সত্যিকার সমাজ-সংস্কারের দ্বারা ও সেবার দ্বারা অস্পৃশ্য হরিজনদের জীবনকে বড় করে তুললেই এই প্রায়শ্চিত্ত করা যায়।

যে জাতির ছেলেরা নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা না নিয়ে, বিদেশীয় ভাষার ভেতর দি শিক্ষালাভ করে, সে জাতি আত্মহত্যা করে।

*

স্বরাজ কেবল একটি দেশের জন্মগত অধিকার নয়, সব দেশেরই জন্মগত অধিকা স্বরাজের উপর সভ্যদেরও যেমন দাবি আছে, অন্য লোকদেরও তেমনি দাবি আছে।

*

আমি সেই ভারতকে গড়ে তোমার কাজ করে যাব, যে ভারতে দীনতম ব্যক্তিও ম করবে যে, এ-দেশ তারই দেশ। এ-দেশ গড়ে তুলতে তার অভিমতও কার্যকর হবে। যে ভারতে উঁচু বা নীচু শ্রেণী বলে মানুষের কোন সমাজ থাকবে না।

মহাত্মাজী

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহারাজ
ভারতবর্ষে নতুন কালের ছিলেন ভগীরথ।
সত্য উপাসনায় ছিলেন একক সব্যসাচী
ছাপার হরফ থেকেই এসব
জানবে ভবিষ্যৎ।

মৃত্যুকালের রক্তে রাঙা ধুতি ও চপ্পল,
থাকবে বিরলা-ভবন এবং
পবিত্র রাজঘাট,
চিতাভস্ম ভাসিয়েছিল যেসব নদীর জল
থাকবে চিত্রে শেষযাত্রার বিজয়ী সম্রাট।

বীরের মৃত্যু এমনি করেই হয়,—
বলবে লক্ষ ছাপা কেতাব
'মহাত্মাজীর জয় !'
মনে মনে বলবে তবু বুদ্ধিমন্ত প্রাণী
বার্ণার্ড শ দিয়েছিলেন প্রবীণ সত্যবাণী।
ভালোর সীমা মানলে ভালোই হয়,
জীবনটা বাস্তবে বাঁধা আদর্শে তো নয়।
তর্কে তর্কে ভরবে পুঁথি,
গান্ধীবাদের ভাষ্যে—
হে মহাকাল ! ভরবে শ্মশান তোমার
ফুলের হাস্যে।

আমরা ছিলাম লক্ষ লক্ষ
সংকটে সংশয়ে,
দীর্ণ-হৃদয় দীর্ঘ পরাজয়ে।
ফুটেছে ফুল সেই আমাদের ডাণ্ডীতে,
কয়রাতে
অমৃৎসরে, চাম্পারাণের মাঠে।
গ্রামে গ্রামে দিগ্‌বিদিকে প্রাচীন ভারতবর্ষে
নতুন দিনের রোদ উঠেছে একটি লোকের স্পর্শে।
পাঞ্জাব আর নোয়াখালি, বিহার ও কাশ্মীর
শবাচ্ছাদন মহাত্মা গান্ধীর।

তবু, যে ফুল ফুটলো, যে রোদ
উঠলো অন্ধকারে
তার মহিমা মোছে কি সংসারে ?
আমরা, যারা সাধারণের দলে
আমরা বলি দেখেছি প্রাণপদ্ম নয়নজলে।
দেখেছি ফুল ফুটিয়ে তোলার
মোহন সব্যসাচী
গান্ধী মহাত্মাজী।

মহাত্মাজীর দর্শন

শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরী

১৯৪৫ সনের স্মরণীয় দিন। আমি তখন ছিলাম কলিকাতায়। হঠাৎ পত্রিক দেখলাম গান্ধীজী আসছেন শান্তিনিকেতনে বিনয় ভবনের ভিত্তি স্থাপন করতে। এক শুনেই তাঁকে দর্শন করবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু এই স শান্তিনিকেতনে ডিসেম্বরে প্রচণ্ড শীত, তার উপর এত ভিড়ের মধ্যে আমার দুটি শি পুত্র-কন্যা নিয়ে সেখানে কোথায় উঠি সেই চিন্তাই করতে লাগলাম। যাহোক সাহ ভর করে শান্তিনিকেতনে রওনা হয়ে গেলাম। তখন মহাত্মাজীর আগমনে সেখানে ি ধরারও জায়গা ছিল না, কাজেই সেখানে গিয়েও যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছি যাহোক মহাত্মাজীর দর্শনলাভ করবো এই উৎসাহে তখন সব কষ্টই ম্লান হয়ে গেল।

পরদিন বিনয় ভবনের ভিত্তি স্থাপন করবেন মহাত্মাজী। শান্তিনিকেতনের প দিকে ধান ক্ষেত পার হয়ে প্রায় এক মাইল দূরত্বের পথ বিনয় ভবন। মধ্যাহ্নে পর আশ্রমবাসীরা দলে দলে চলছেন উৎসবে যোগ দেবার জন্য। শান্তিনিকেতন হ যাওয়া-আসার জন্য সেখানে তখন মাত্র একটি বাস চলাচল করতো। কাজেই এ ভিড়ে সেই বাসে ওঠা একেবারে অসম্ভব ছিল। অগত্যা বাসের আশা ছেড়ে দি আমার ছেলেটিকে কোলে নিয়ে এবং মেয়েটির হাত ধরে টানতে টানতে, ধান ক্ষে আলের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে সেই দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে বি ভবনে গিয়ে হাজির হলাম।

সেখানে গিয়ে মহাত্মাজীর দর্শন লাভ করে, আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'ল। তার মাহাত্মাজীকে কি করে আঁকা যেতে পারে সেই চিন্তাই আমার মাথায় ঘুরতে লাগ হঠাৎ শান্তিনিকেতনে আসা ঠিক করাতে সঙ্গে স্কেচ-বুক এবং পেন্সিল আনতে ভু গিয়েছিলাম। সেদিন শান্তিনিকেতনে সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ ছিল, কাজেই কা পেন্সিল কিছুই কিনতে পারলাম না, অগত্যা একটি ছোট শিশুর খাতা থেকে এক টুক কাগজ ছিড়ে নিয়ে একটি যেমন-তেমন পেন্সিল যোগাড় করে আমি শিকারের খোঁ বেরিয়ে পড়লাম। এখন আঁকা যায় কি করে! কারণ মহাত্মাজী একবার উত্তারা প্রবেশ করলেই সেখানকার গেইট বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর আর সেখানে ঢো পথ থাকবে না। তখন মনে মনে ঠিক করলাম, মহাত্মজী উত্তরায়ণে প্রবেশ করব পূর্বেই সেখানে আমাকে পৌছতে হবে। কিন্তু বাস কোথায় পাব? এবং কি ক এত তাড়াতাড়ি সেখানে পৌছবো এই ছোট শিশু দুটোকে নিয়ে! তখন হঠাৎ দেখ

পেলাম একখানি বাস শান্তিনিকেতন অভিমুখে রওনা হচ্ছে। ছোট শিশু দুটিকে নিয়ে, অসহায় ভাবে বাসের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে,—বাসের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলেন, "তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়ুন!" এতক্ষণে আমার দেহে প্রাণ এলো। আমার চোখের সামনে কে যেন আশার আলো ধরে তুললেন। আমি ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাসে উঠে পড়লাম। দৈবক্রমে সেই বাসটি সোজা গিয়ে প্রবেশ করলো একেবারে উত্তরায়ণের ভিতরে—মহাত্মাজীর বাড়ীর (শ্যামলীর) দরজায়। অলক্ষিতে কে যেন আমায় নিয়ে এলো একেবারে মহাত্মাজীর চরণতলে! যা নাকি আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম! এ যেন ভগবানেরই লীলাখেলা! তখন আমার চোখ দিয়ে আনন্দ-অশ্রু ঝরতে লাগলো, এবং কেবলই মনে হতে লাগল, প্রবল ইচ্ছা থাকলে তিনিই পথ করে দেন। কথাতেই বলে,—"ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।"

যাহোক 'শ্যামলী'তে ঢুকেই দেখি—মহাত্মাজী সুতা কাটছেন এবং খুব হাসছেন। এ যেন তাঁরই চক্রান্ত! তারপর তাঁকে প্রণাম করেই আমি তাঁর প্রতিকৃতি আঁকতে বসে গেলাম। আনন্দে আমার প্রাণ ভরে গেল! ক্ষণকালের জন্য ভুলেই গেলাম আমি কোথায় আছি। মনে হ'ল যেন কোন্ দেব-লোকে চলে এসেছি! সত্যিই যেন দেব-সান্নিধ্য লাভ করলাম—আমার জীবন ধন্য হ'ল।

তারপর আমার আঁকাও শেষ হ'ল, মহাত্মাজীকে গৌর প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হ'ল সান্ধ্য-উপাসনার জন্য সুসজ্জিত মঞ্চের উপর। সেদিন ছিল পূর্ণিমার সন্ধ্যা। শাল বৃক্ষের ফাঁক দিয়ে পূর্ণচন্দ্র উদিত হচ্ছিল। অপর দিকে দিনান্তের ক্লান্ত রবি তাঁর শেষ বেলার সমস্ত জ্যোতি বিকিরণ করে, সমগ্র ধরণীকে গৈরিক বসন পরিয়ে অস্ত গেল! যেন মহা তপস্বী ধ্যানে বসলেন!

এমন একটি সুন্দর সন্ধ্যায় মহাত্মজীকে ঘিরে তাঁর শিষ্যেরা 'রামধুন' গান সুরু করলেন। ধূপ-দীপ প্রজ্বলিত সুসজ্জিত বেদী-পরে মহাত্মাজী সান্ধ্য-উপাসনায় বসলেন। তখন মনে হচ্ছিল যেন কোন্ স্বর্গরাজ্যে আমরা বিচরণ করছি! যেন রূপসাগরে ডুব দিলাম! সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি। আজও সেই সুন্দর স্মৃতি আমার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে! কিছুক্ষণ পর আমার তন্দ্রা ভাঙ্গল। সভা শেষ হ'ল। একে একে যে যার আলয়ে চলে গেল। এতক্ষণে আমারও ঘোর কাটলো! তারপর মনে হ'ল আমার ছোট শিশু দুটি কোথায় গেল! এই ভিড়ের মধ্যে তারা কোথায় হারিয়ে গেল! তারা তো এখানকার পথ-ঘাট চেনে না।

তখন বড় ভাবনায় পড়ে গেলাম। যাহোক কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দু'জনে আমায় খুঁজে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির।

তারপর আবার দুর্দিন নিয়ে ফিরে এলো ১৯৪৮ সাল। সমস্ত ধরণীকে চোখের জলে ভাসিয়ে মহাত্মাজী এ ধরা থেকে চিরবিদায় নিলেন।

আকস্মিক খবর এলো—সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ আর এ-জগতে নেই! তিনি এক নরাধমের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রামনাম জপ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এই দুঃসংবাদে আমার মন শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মহাত্মা-বিহীন চারিদিক যেন অন্ধকার দেখলাম। এই মারামারি, হানাহানির দিনে কে আমাদের আলোর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন? চারিদিক যেন শূন্য মনে হ'ল। চোখের জল কিছুতেই বন্ধ করতে পারিনি।

পরদিন যখন তাঁর মরদেহ দিল্লীতে রাজঘাটে দাহ করা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশে আশ্রমবাসীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছিলেন এবং তখন কেউই চোখের জল রোধ করতে পারেন নি।

আবার ১৯৪৯ সাল ফিরে এলো; বেদনা-ভরা দিনগুলো স্মরণীয় করে রাখবার জন্য দিল্লীতে রাজঘাটে তাঁর প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী উৎসব পালন করা হ'ল। সে এক বিরাট আয়োজন। সেই সময় রাজঘাটে দেখেছি লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম। তখন মনে হয়েছিল, যেন এক মহামানবের সাগর তীরে আমরা সকলে মিলিত হয়েছি। সেখানে এক বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল মহাত্মাজীর স্মৃতি-আলেখ্য দিয়ে। সেই বিরাট মণ্ডপে আলপনা দেবার ভার পড়েছিল আমার উপর এবং ভারতের অনেক দেশ থেকেই শিল্পীরা এসেছিলেন ঐ মণ্ডপটি সজ্জিত করবার জন্য। সেই সময় রোজই দেখেছি মাননীয় জহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ এবং আরো কত জগদ্‌বিখ্যাত ব্যক্তির আনাগোনা সেই মণ্ডপে। সেই মহাতীর্থে যোগ দেবার সৌভাগ্য আমার হওয়াতে আমি ধন্য হয়েছি। সেই সময় রোজই রাজঘাটে চিরনিদ্রিত মহাযোগীর সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছি।*

গান্ধী শতাব্দী-সংবাদ হইতে।

*
**

গান্ধীজীর কারাজীবন

**
*

দক্ষিণ আফ্রিকায়—ট্রান্সভাল পরিত্যাগ না করায় ১০ই জানুয়ারী, ১৯০০ সালে জোহান্সবার্গে তাঁর দু'মাস কারাদণ্ড হয়। নিগ্রো ও সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে তাঁকে রাখা হয়। জেনারেল স্মার্টসের সঙ্গে মিটমাট হওয়ার ফলে ৩০শে জানুয়ারী তিনি মুক্তি পান।

ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের নিউক্যাসল থেকে নাটাল অভিযানের নেতৃত্ব করার সময় পামফোর্ডে ৬ই নভেম্বর, ১৯১৩ সালে তিনি গেপ্তার হওয়ায় পর বেলে মুক্তি পান। ৮ই নভেম্বর, আবার ১৯১৩ সালে স্টেনভারটনে বন্দী হন ও বেলে মুক্তি পান। পরদিন ৯ই নভেম্বর, আবার তাঁকে টিকওয়ার্থে গ্রেপ্তার করে ডুণ্ডীতে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ১১ই নভেম্বর ভারতীয় মজুরদের নাটাল পরিত্যাগে সাহায্য করবার জন্য তাঁর ন'মাস কারাদণ্ড হয়। ১৭ই নভেম্বর, বহিষ্কৃত লোকদের ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে সাহায্য করার অপরাধে তাঁর দ্বিতীয়বার বিচার হয়, এবং তিনি তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ভারতীয় কয়েদীদের কাছ থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র রাখবার জন্য ঐ মাসেই ব্লুমফনটিনে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভারতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে গান্ধীজীর প্রথম সংঘর্ষ বাধে ১৭ই এপ্রিল, ১৯১৭ সালে। চম্পারাণের চাষীদের অভাব-অভিযোগ শোনবার জন্য তাঁকে মতিহারী যেতে হয়। মতিহারী ত্যাগ করবার জন্য তাঁর উপর আদেশ জারী করা হয়, তিনি সে আদেশ অমান্য করেন। কয়েক দিন কারাবাসের পর সেবার বিচারে তিনি মুক্তি পান।

১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রিল, 'সত্যাগ্রহ সপ্তাহে' পাঞ্জাবের পথে দিল্লীর কোছে কোসিতে (Kosi) তাঁকে বন্দী করা হয় এবং বোম্বাইয়ে নিয়ে এসে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯২২ সালের ১০ মার্চ, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় প্রবন্ধ লেখবার জন্য সবরমতীতে গ্রেপ্তার হন। সেবারের বিচারে তিনি ছ'বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং জেলেই এপেণ্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হন। ১৯২৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি মুক্তি পান।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ, ডাণ্ডী মাচের সময় কাবাড়ীতে লবন-আইন অমান্য করেন। কিন্তু সে সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় না, পরে ৩রা মে, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরের বছর ২৬শে জানুয়ারী, তিনি মুক্তি পান।

১৯৩১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিনা বিচারেই তাঁরা আটক থাকেন। ১৯৩৩ সালের ৮ই মে যখন তিনি অনশন আরম্ভ করেন, তখন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ৩১শে জুলাই আইন অমান্যের জন্য আবার গ্রেপ্তার হন এবং যারবেদা জেলে কিছুদিন তাঁকে আটক রাখা হয়। ৪ঠা আগষ্ট তিনি মুক্তি পান, কিন্তু তাঁর উপর কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। সেইদিনই তিনি সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন, ফলে এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৪২ সালে কংগ্রেস 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবটি পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ৯ই আগষ্ট বোম্বাইতে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন। তাঁকে আগা খাঁ প্যালেসে আটক রাখা হয়। অসুস্থতার জন্য ১৯৪৪ সালের ৬ই মে তিনি মুক্তি পান।

মহাত্মাজী সম্বন্ধে

"ভারতের সেবায় এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় মহাত্মা গান্ধীর অবদান এত অসামান্য ও অনুপম যে তার জন্য তাঁর নাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সর্বযুগে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।"

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

*

"তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, সম্পূর্ণ পারি বা না-পারি, সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের অন্তরে ও আচরণে রিপু ও পাপের সংগ্রাম আছে, তা সত্ত্বেও পুণ্যের তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে সত্যব্রত মহাত্মার নিকটে।···যে অবিচলিত নিষ্ঠা তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছে, এই যে অপরাজেয় সংকল্পশক্তি, এ তাঁর সহজাত, কর্ণের সহজাত কবচের মত—এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*

"তাঁর শিক্ষার মূল কথা—সত্য, নির্ভীকতা এবং কাজ। এই কাজ করার সময় সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে জনগণের মঙ্গলের দিকে।"

—জওহরলাল নেহরু

*

"ইনি সেই মানুষ, যিনি ত্রিশ কোটি মানুষকে কর্মপ্রেরণায় জাগিয়ে তুলেছেন, সারা বৃটীশ সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন, যিনি মানুষের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেছেন প্রায় দু'হাজার বছরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এক নীতির আন্দোলন আদর্শ।"

—রোমাঁ রোলাঁ

*

'কঠোর তপশ্চর্যায় জীবনযাপন করতেন বলে তাঁর স্বদেশবাসীগণ তাঁকে প্রেরণাসম্পন্ন মহামানব জ্ঞানে পূজা করত। তাঁর প্রভাব তাঁর সমধর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সাম্প্রদায়িক বিরোধে জর্জরিত ভারতবর্ষে তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসরকাল সর্ববিধ ভারতীয় সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত-প্রতীক।"

—এট্‌লি (বৃটেনের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী)

গান্ধীজীর গল্প

শ্রীঅমরনাথ রায়

একবার দিল্লীতে এক ধনী শেঠের বাড়ীতে গান্ধীজীকে অতিথি হতে হয়েছিল। শেঠজী স্নান করে আসার পর গান্ধীজী ঢুকেছিলেন স্নান ঘরে।

শেঠজী সবে স্নান সেরে গেছেন। মেঝেতে তাঁর ছাড়া ধুতি পড়ে আছে। স্নান সেরে গান্ধীজী নিজের এবং শেঠজীর ধুতি কেচে রোদে শুকাতে দিলেন। শেঠজী তা দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন।

বল্লেন, এ আপনি কি করলেন বাপুজী!

সহজ গলায় গান্ধীজী জবাব দিলেন, তাতে হয়েছে কি। ফর্সা কাপড় মাটিতে লুটোচ্ছিল। পা লেগে নোংরা হয়ে যেতো। তাই কেচে মেলে দিলাম। সাফাইয়ের কাজে আমার লজ্জাবোধ হয় না।

—শেঠজী কিন্তু লজ্জা পেয়েছিলেন।

আর একবার।

গান্ধীজী তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় মহামতি গোখ্‌লে গেলেন সেখানে। অতিথি হলেন গান্ধীজীর।

এক মস্ত ভোজসভায় নিমন্ত্রণ ছিল গোখ্‌লের। বেরুবার আগে জামা কাপড় পরে তৈরি হচ্ছেন। এমন সময় দেখেন যে, তাঁর দামী চাদরটা গেছে কুঁচকে। গোখ্‌লে ওটা গায়ে দেবেন কিনা ভাবছেন।

এমন সময় গান্ধীজী তাঁকে শুধালেন, চাদরটা আমি সুন্দরভাবে ইস্ত্রি করে দেব কি? গোখ্‌লে বল্লেন, না বাপু, তোমাকে আমি ভাল উকিল বলেই জানি, ভাল ধোপা হিসাবে তোমার যোগ্যতার ওপর আমার আস্থা নেই। যদি দামী চাদরটা নষ্ট করে ফেল তো কি হবে! আমার কাছে ঐ চাদরটা খুবই মূল্যবান কেন জান?—কারণ, ঐ চাদরটা আমি উপহার পয়েছিলাম আমার গুরু মহামতি রাণাডের কাছে থেকে।

ওটা তাঁর স্মৃতিচিহ্ন।

এ সব শুনেও গান্ধীজী দমলেন না।

জেদ ক'রে চাদরটা তিনি ইস্ত্রি করতে লাগলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইস্ত্রি সেরে ফেল্লেন। তাঁর সুন্দর ইস্ত্রি করা দেখে গোখ্‌লে খুব প্রশংসা করলেন। আর গান্ধীজীও হলেন মহা খুশী।

বল্লেন, এরপর যদি সারা জগৎ আমার ধোপাগিরির প্রশংসা না করে তো আমি কিছু পরোয়া করি না।

মেঠুড়ে

ক্রিকেট

ইংলণ্ডের মাটিতে দ্বৈত ক্রিকেট সফর ব্যবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে রাবার জয়ের পর ইংলণ্ড নিউজিল্যাণ্ডকে লর্ডসের প্রথম টেস্ট পাঁচ দিনের খেলার চার দিনের মাথায় ১৩০ রানে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দেয়। খেলার আগে অনেক ক্রীড়ারসিকই আশা করেছিলেন নিউজিল্যাণ্ড এই খেলায় ভালো খেলবে। বিশেষ করে তাদের বোলিং শক্তি যখন অনেক উন্নত।

লর্ডসে খেলার সূচনায় বোলিং শক্তির কিছু পরিচয় দিয়েছিল নিউজিল্যাণ্ড মধ্যাহ্নভোজের মধ্যে মাত্র ৬৮ রানে ইংলণ্ডের পাঁচটা উইকেট ফেলে দিয়ে। সত্যই সূচনায় বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল ডিক মজ ও ক্রস টেলরের সঠিক লেংথের বলে। অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ এবং ডলিভেরার দৃঢ়তার জন্যেই শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ১৯০ রান সংগ্রহ করে।

বোলিং দক্ষতার সঙ্গে বেশ কিছুটা সামঞ্জস্য রেখে ইনিংসের সূচনা করলেও, প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ড ১৬৯ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারে না। ইলিংওয়ার্থ এবং আণ্ডারউডের বলে শেষ দিকের ব্যাটসম্যানরা অল্প সময়ে পর পর আউট হতে থাকেন।

মাত্র একুশ রানে এগিয়ে থেকে ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ব্যাট করতে আরম্ভ করে। ফলে রান ওঠার গতি মন্থর হলেও কোন উইকেট পড়ে না। কিন্তু বিপক্ষের তরুণ বোলার হাওয়ার্থের স্পিন, ফ্লাইট ও লেংথ ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মাঝে মাঝে বেগ দিতে থাকে। প্রথম ইনিংসের বিপর্যয় মনে রেখে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা এক রকম মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন। ওভারে দেড় রানের বেশী সংগ্রহ হয় না। ওপেনিং ব্যাটসম্যান এডরিচের সিঞ্চুরির পর অবশ্য ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা হাত খুলে মারতে আরম্ভ করেন। তার ফলে যাদের তিন উইকেটে রান ছিল ২৩৭, তৃতীয় দিনের শেষে তারা সংগ্রহ করে ৯ উইকেটে ৩০১ রান। ৬৪ রানের মধ্যে ছ-টা

উইকেট পড়ে যায়। একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের সকালে ইংলণ্ড ৩৪০ রানে দ্বিতীয় ইংনিস শেষ করে, তখন জয়ের জন্যে নিউজিল্যাণ্ডের ৩৬২ রানের দরকার।

ডেরেক আণ্ডারউড রুদ্রমূর্তিতে বল করা আরম্ভ করলে নিউজিল্যাণ্ডের পতন শুরু হয়। এক একজন ব্যাটস্‌ম্যান আসেন ও বিদায় নেন। কিন্তু এই বিপর্যয়ের মধ্যেও একজন তরুণ খেলোয়াড় যত রকমের সম্ভব আক্রমণ তুচ্ছ করে, অবিচলভাবে ব্যাট চালিয়ে যান এবং পৃথিবীর কনিষ্ঠতম ও নিউজিল্যাণ্ডের একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে এক রেকর্ড করেন। এই খেলোয়াড়টির নাম গ্লেন টার্নার। সারা ইনিংসে তিনি এক দিক আগলে রেখে শেষ পর্যন্ত ৪৩ রানে নট আউট থাকেন।

*

নটিংহামের ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠে ইংলণ্ড নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে।

প্রথম টেস্টের মতো দ্বিতীয় টেস্টেও ইংলণ্ড সহজে নিউজিল্যাণ্ডকে হারাতে পারত, যদি বৃষ্টি খেলায় বাধা সৃষ্টি না করত। তৃতীয় দিন বৃষ্টির জন্যে আঠারো মিনিটের বেশী খেলা হয়নি। চতুর্থ দিনেও বৃষ্টির জন্যে এক ঘণ্টার মতো সময় নষ্ট হয়েছে। আর পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলা ঘণ্টাখানেক চলার পর বৃষ্টির জন্য বন্ধ হয়ে যায়। খেলা বন্ধের সময় ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের রান থেকেও নিউজিল্যাণ্ডের ৯১ রানের ঘাটতি ছিল। নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ২৯৪ রানের উত্তরে ইংলণ্ড ৪৫১ রানে ইনিংস সমাপ্তি (৮ উইকেট) ঘোষণার পর নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় এক উইকেটে ৬৬ রান তুলেছিল। তবে এ বিষয় সন্দেহ নেই, বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েও নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা দৃঢ়তার সঙ্গে এবং যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে ব্যাট করেছিলেন। নিউজিল্যাণ্ডের দু'জন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় টার্নার ও টেলর আহত থাকায় দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেন নি। তাই টার্নার ও টেলর না খেলা সত্ত্বেও নিউজিল্যাণ্ড মোটের ওপর লর্ডস টেস্টের চেয়ে ট্রেন্ট·ব্রিজে ভালো খেলেছে এ কথা বলা চলে।

*

ওভালের তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ড অতি সহজে নিউজিল্যাণ্ডকে আট উইকেটে পরাজিত করে। তৃতীয় টেস্টে নিউজিল্যণ্ডের সহজ পরাজয় তাদের ব্যাটিং ব্যর্থতারই পরিচয়। প্রথম দিন দিনের শেষে, তারা ৭ উইকেটে ১২৩ রান করে। দ্বিতীয় দিন ১৫০ রানে নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হবার পর ইংলণ্ডের ৫ উইকেটে ১৭৪ রান হয়। তৃতীয় দিন ২৪২ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ। নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ২২৯ রানে

সমাপ্তি। জয়ের জন্যে ইংলণ্ডের ১৩৮ রানের প্রয়োজনের মধ্যে ওই দিনই এক উইকেটে ৩২ রান। শেষ দিন ন-টা উইকেট হাতে নিয়ে বাকী ১০৬ রান। জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি।

ইংলণ্ড সফরের পর নিউজিল্যাণ্ড দল আসছে ভারত সফরে। ভারতে তাদের তিনটে টেস্টের প্রথম টেস্ট আরম্ভ হবে ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯। দেখা যাক, নিউজিল্যাণ্ড দল ভারতে কেমন খেলে।

ফুটবল

এক বছর অসমাপ্ত থাকার পর ১৯৬৯ সালের ফুটবল লীগের ওপর যবনিকা পড়েছে। তিন বছর পর মোহনবাগান আবার লীগ জয়ের সম্মান অর্জন করেছে। এবার নিয়ে মোহনবাগান চোদ্দ বার লীগ জয় করল। মোহনবাগানের যে সব খেলোয়াড় ক্লাবকে চতুর্দশ লীগ জয়ের সম্মান এনে দিয়েছেন, তাঁদের ভূমিকা অবশ্যই সফল হয়েছে। তবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান লাভ না করলেও তাদের ভূমিকা ব্যর্থ বলতে পারি না।

সুপার লীগে দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সুপার ম্যাচ গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ায় মোহনবাগানের লীগ জয়ের আশা নিশ্চিত হয়। মোহনবাগানের সমর্থকদের লীগ জয়ের আনন্দ-নৃত্যে মাঠ মুখর হয়ে ওঠে। এই খেলায়, খেলার মান যে খুব উঁচুতে উঠেছিল এমন কথা বলা চলে না। তবে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের মধ্যে ছিল ওঠা-পড়ার ছন্দ এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খেলার আকর্ষণও পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। গোল করার সুযোগ এসেছিল দু'দলের সামনেই সমানভাবে। সেই হিসাবে খেলার গোলশূন্য ফলাফলে দু'পক্ষের কৃতিত্ব এবং অকৃতিত্বও সমান সমান।

অ্যাথলেটিকস

দূর পাল্লার দৌড়বীর রন হিলের কৃতিত্ব ম্যারাথন দৌড়ে। ম্যাঞ্চেস্টারে সর্বপ্রথম আয়োজিত আন্তর্জাতিক ম্যাস্কোল ম্যারাথন রেসে ব্রিটিশ অ্যাথলীট রন হিল পৃথিবীর প্রথম সারির সব প্রতিযোগিদের হারিয়ে দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। প্রায় দু'শ জন প্রতযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ছাব্বিশ মাইল তিনশ' পঁচাশি গজের ম্যারাথন দৌড়ে রন হিলের সময় লাগে দু'ঘণ্টা তেরো মিনিট বিয়াল্লিশ সেকেণ্ড।

*

তাইওয়ানের 'গোল্ডেন গার্ল' চি চেঙ্গ মেক্সিকো আশি মিটার হার্ডল রেসে পেয়েছিলেন ব্রোঞ্চ পদক। সম্প্রতি ডাবলিনে আয়োজিত ক্লনলিফ হ্যারিয়ার্স ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় চি চেঙ্গ একশ গজ দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য এই রেকর্ডে

তিনি একক কৃতিত্বের অধিকারিণী নন। অষ্ট্রেলিয়ার এম. উইলডি এবং আমেরিকার নিগ্রো মেয়ে উওসিয়া টাইউসের সঙ্গে ব্রাকেটে তাঁর বিশ্ব রেকর্ড। এই প্রতিযোগিতার তিনদিন আগে কার্ডিফের এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এশিয়ার এই মহিলা অ্যাথলীট একশ ও দু'শ মিটার দৌড় এবং একশ মিটার হার্ডল রেসে বিজয়িনী হন।

রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও পূর্ব-জার্মানীর ত্রিদলীয় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট রাশিয়ার মহিলা অ্যাথলীট নাদেজদা বিজোভা ২০'৯ মিটার দূরে লোহার গোলা ছুঁড়ে যে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন তা অতুলনীয়। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী নাদেজদা'র কৃতিত্ব হ'ল দুটি। প্রথম, পৃথিবীর প্রথম মহিলা হিসেবে শটপুটে সর্বপ্রথম কুড়ি মিটারের বাধা অতিক্রম এবং দ্বিতীয়, মেক্সিকো অলিম্পিকে স্বর্ণপদক বিজয়িনী এবং বিশ্ব রেকর্ডের স্রষ্টিকারিণী পূর্ব-জার্মানীর মহিলা অ্যাথলীট মার্গারিটা গামেনকে পরাজিত করা।

চিড়িয়াখানার ডাক্তার

চিড়িয়াখানায় কতরকমের পশুপক্ষী থাকে। তবে পশ্চিম বের্লিনের মত এতো বড় চিড়িয়াখানা সারা ইওরোপে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে স্তন্যপায়ী পশুর সংখ্যা ১০৪০ আর পাখীর সংখ্যা ৩৭৮২, এছাড়া অ্যাকোরিয়ামে মাছ আছে ৮১২২। এর ওপর আছে নানাজাতের সাপ আর কীটপতঙ্গ। চিড়িয়াখানাটি ১২৫ বছরের পুরোনো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বোমার ঘায়ে এই চিড়িয়াখানা প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, জীবিত ছিল মাত্র ৯১টি প্রাণী। এখানে কয়েকটি দুর্লভ প্রাণী আছে যেমন পাহাড়ী জেব্রা ও কয়েক জাতের বুনো ষাঁড়।

যুদ্ধের পর এই চিড়িয়াখানাকে আবার দাঁড় করিয়েছেন এর পরিচালক ডাক্তার কৃলোজ ও তাঁর সহকারীরা। চিড়িয়াখানার পশুপক্ষীদের নানারকম অসুখবিসুখ লেগেই থাকে। সিংহ মহাশয়ের হঠাৎ দাঁতের ব্যথা সুরু হয়, কিংবা দর্শকদের দেওয়া যা-তা খেয়ে গোরিলা-বাবাজীদের দারুণ পেট কামড়ানি আরম্ভ হয়। নিজেরা মারামারি করে ঠোঁট ভাঙে, ঠ্যাং ভাঙে, রক্তারক্তি কাণ্ড হয়। তখন ডাক্তারবাবু আসেন। কারুর ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়, কারুর হাড় ঠিকমত বসিয়ে দেন, কামড়ানির ক্ষতে ওষুধ লাগান, জ্বরজারি হলে দাওয়াই দেন। ডাক্তারবাবুর নাম রাইনহার্ট গোল্টেনবোথ। পোষমানাই হোক আর হিংস্রই হোক, কোন পশুকে তিনি অজ্ঞান কোরে চিকিৎসা করেন না। এমনি তাঁর হাতযশ।
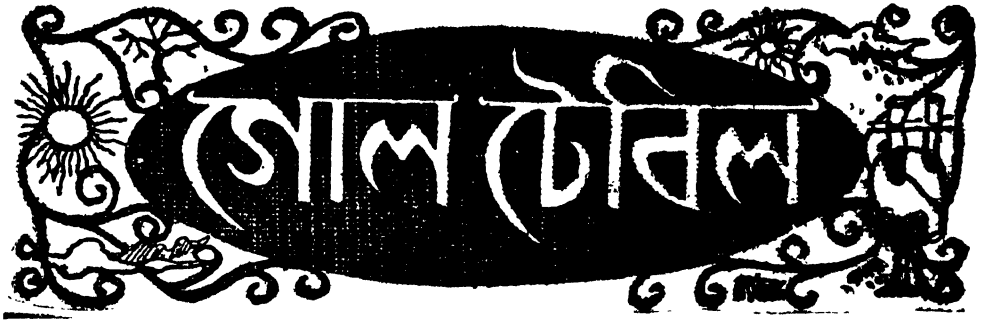
লোহা থেকে সোনা

শ্রীসুনির্মল রায়

'লোহা থেকে সোনা'—কথাটা শুনেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ, তাই না? কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে। তোমরাও লোহা থেকে সোনা বানাতে পার। এবারে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে কি করে এটা সম্ভব? এর উত্তর দেবার আগে পরমাণু (ইংরেজীতে বলে এ্যাটম) কাকে বলে আর তার অন্দরমহল সম্বন্ধে কিছুটা জানা দরকার।

মৌলিক পদার্থের সবচাইতে ছোট অংশের নাম পরমাণু। মৌলিক পদার্থকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করলে পরমাণুর চাইতে আরো বেশী ছোট টুকরো পাওয়া সম্ভব নয়। এই পরমাণু আবার নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন কণিকা দিয়ে তৈরী। প্রোটন আর নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে আর কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে ইলেকট্রন। প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎ বহন করে, আর ইলেকট্রন বহন করে ঋনাত্মক বিদ্যুৎ। নিউট্রন কণিকার কোন বিদ্যুৎ থাকে না। আর এদের ওজনের কথা জানতে চাও? ১৮৪০টা ইলেকট্রনের ওজন যা হবে, একটা প্রোটনের ওজন তার সমান হবে।

বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রনের সংখ্যার রকমফেরের জন্যই বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন রকম আকৃতি-প্রকৃতি হয়েছে। সোনার প্রতি পরমাণুতে আছে উনআশিটি প্রোটন, একশ আঠারটি নিউট্রন আর উনআশিটি ইলেকট্রন। লোহার পরমাণুতে আবার এদের সংখ্যা বিভিন্ন। লোহার পরমাণুর প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন বাড়িয়ে কমিয়ে একে সোনার পরমাণুতে পরিবর্তিত করা যায়।

তা'হলে বুঝতে পারছ লোহা থেকে সোনা তৈরী করা কি করে সম্ভব। এখন নিশ্চয়ই অনেক লোহা থেকে সোনা তৈরী করে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখছ। শেষকালে তাদের একটু নিরাশ না করে বিদায় নিতে পারছি না। মনে রাখবে, সোনা তৈরী করার সময় যা খরচ হবে তার কথা চিন্তা করাও যায় না!

স্বাধীনতা দিবস

"কেঁদ না। মা, তোমার ছেলে আজ বীরের মতোই দেশমাতৃকার পায়ে নিজেকে বলি দিয়েছে! মৃত্যু একদিন আসবেই। কিন্তু সে মৃত্যুতে তো কোন গৌরব নেই। কিন্তু তোমার ছেলের নাম মৃত্যুর পরও চিরদিন আপন গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মৃত্যুর পরও সে অমর হয়ে থাকবে। ভেবে দেখ মা, তোমার এক ছেলে গিয়েছে কিন্তু হাজার হাজার ছেলে বেঁচে রয়েছে!" নিঃশব্দে তাকালেন মা ছেলেগুলির দিকে। সত্যিই আজ তার কান্না শোভা পায় না। আজ তাঁর একমাত্র ছেলে বীরের মতো হাজার শহীদের সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছে, এ তো তাঁর গর্বের বিষয়। কিন্তু হায়, অবুঝ মন বুঝি কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। চোখের সামনে ভেসে উঠছে তাঁর একমাত্র সন্তানের মুখখানা, বার বার মনে পড়েছে ছেলের যাবার সময়কার কথাগুলি। মাকে প্রণাম করে দাঁড়িয়েছিল সুকান্ত। মা জড়িয়ে ধরেছিলেন তাকে। অবিরামগতিতে মায়ের চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছিল অশ্রুধারা ছেলেরই গণ্ডদেশে। "কেঁদ না মা", বলেছিল সুকান্ত, "তোমার ছেলে আজ দেশমাতৃকার জন্য প্রাণ দিতে চলেছে। বন্দিনী দেশমাতাকে আমাদের যে উদ্ধার করতেই হবে। এই ভাবে জ্বলন্ত চিতা বুকে করে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু যে অনেক শ্রেয়! চেয়ে দেখ মা, হাজার হাজার সন্তানরা আজ বন্দিনী দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করতে যাচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে হাসি মুখে তোমার সন্তানকেও বিদায় দাও। তোমরা কাঁদলে, তোমাদের সন্তানরা যে কোনও দিনও সফল হবে না।" আর কাঁদেননি মা, শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন ছেলের মুখের দিকে। কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, কি অদ্ভুত জ্যোতি সেই মুখে! সুকান্ত চলে গেল। মা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ছেলের গমন-পথের দিকে। শুধু বললেন, "ঠাকুর ওরা সফল হোক্—সফল হোক ওরা।" অস্ফুটে ধ্বনিত হলো মায়ের কণ্ঠস্বর। চিন্তার খেঁই ছিঁড়ে গেল মার। ফিরে তাকালেন তিনি ছেলেগুলির দিকে। চোখের জল তখন মুছে ফেলেছেন, আর কাঁদবেন না মা। তাঁর সন্তান আজ অমর হয়ে আছে তাঁর বুকে। শত শত সন্তানের মাঝে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে সে। মৃত্যু এসে আর কোনদিন তাঁর সন্তানকে কেড়ে নিতে পারবে না তাঁর কাছ থেকে!

আজ এই দিনটাতে, শুভ-স্বাধীনতাদিবসে এসো আমরা দেশের এই সব শহীদ মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সন্তানদের আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। জয় হিন্দ!

শ্রীমিতা বসু

প্রিয়জন

যা বাবা বাছাধন, এখন তুই যা,
ঘুরে ফিরে চরে-টরে পেট ভরে খা।
ভালবাসার টানে পড়ে
আসিস আমার কাছে,
গা চেটে তুই করিস সোহাগ
রেগে যাই পাছে।
কি করি বল, তোর জ্বালাতে
শুতে পারি না,
কান চাটবি, মুখ চাটবি,
মারলে যাবি না।
তুই তো আসিস করত আদর
আমার যে হয় রাগ,
দু'এক ঘা বসিয়ে দিয়ে,
বলি এখন ভাগ্।
কে বলে তুই ছাগল ছানা,
হোলোই বা চার পা!
ভালবাসি তোরেই আমি
মিথ্যে বলছি না।

শ্রীঅনাথবান্ধব সাউ

সূর্যের সংসার

সূর্য হলেন বাড়ীর কর্তা
ছেলেরা সব গ্রহ,
নয়টি ছেলে বাস করছে
বুড়ো বাপের সহ।
ছেলেগুলো সারা জীবন
আগলে তাঁকে আছে,
বুধ-বাবাজী চলেন-ফেরেন
সবার চাইতে কাছে।
সবার দূরে থেকেও প্লুটো
বাপের খবর লন,
তবুও কেন বুড়ো বাপ
রেগে আগুন হন?
চাঁদ ছোঁড়া যে নাতী তাঁহার
বাপের কাছে রয়,
এমন নাতী থাকলে দূরে
কার বা প্রাণে সয়?
শনি-বাবাজীর নয়টি ছেলে
বৃহস্পতির বারো,
বাইশ নাতী থাকলে দূরে
সুখটি থাকে কারো?

শ্রীমিহির ভৌমিক

গ্রামের পথে ফেরিওয়ালা
শিল্পী. শ্রীঅতিনেন্দ্র দেবরায়
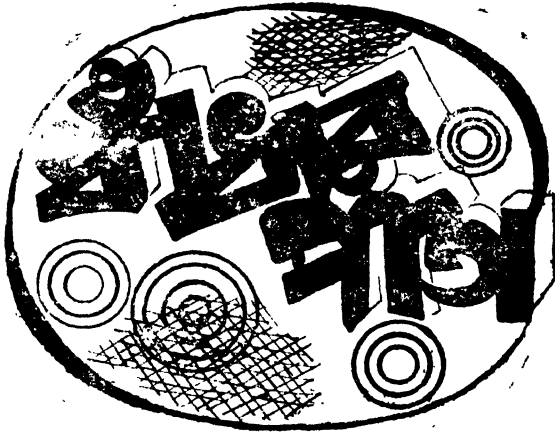
১। এক বাক্স কমলালেবু থেকে একজন সব কমলালেবুর অর্ধেক আর একটি বেশী নিল, দ্বিতীয় একজন যা বাকী ছিল তার অর্ধেক আর একটি বেশী নিল, আর তৃতীয় জন নিল, শেষ যা বাকী ছিল তার অর্ধেক আর ছুটি বেশী। এখন বলো বাক্সটিতে সবসুদ্ধ কতগুলি কমলালেবু ছিল।

শ্রীআনন্দনাথ ব্যানার্জী
(হাওড়া)

২। মুখ নেই বলে, পা নেই চলে,
লেখাপড়া জানেনাকো তবু স্বাক্ষর
সাধ্য থাকে বলো এর কিবা উত্তর।

শ্রীবিজয়শ্রী ভট্টচার্য (বহরমপুর)

৩। ঝামুর ঝুমুর গাছটি
ফল ধরে তায় বারোটি
পাকলে সে ফল একটি।

শ্রীশিখা বক্সী (বর্ধমান)

৪। পাতাল থেকে বেরুল হাতি
লটরপটর কান;
মুখ দিয়ে তার বেরুল ছেলে
কি কল ভগবান!

শ্রীদেবীপ্রসাদ ভূঞ্যা (মেদিনীপুর)

৫। তিন অক্ষর বিশিষ্ট এমন একটি ইংরেজী শব্দ বার করো যা আমাদের শরীরের একটি অংশ বিশেষ। এই শব্দটি সোজা বা উল্টো যে দিক থেকেই পড়ো, এক হবে।

শ্রীভাস্করজ্যোতি ঘোষ (করঙ্গলি)

উত্তর আগামী মাসে বেরুবে

॥ গতমাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। ললনা। ২। চা+ল+তা=চালতা। ৩। কপি (বানর) উল্টে পিক (কোকিল)। ৪। মাতা−তা=মা, শত−ত=শ, গোরু−রু=গো। শশ+ক=শশক, ছাগ+ল=ছাগল, বীথি+কা=বীথিকা। ৬। চাইবাসা। ৭। একবার, স। ৮। ৯। মাতৃদুগ্ধে।

সম্পাদক: শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০·৬০ পয়সা

খোকন সোনা ঘুমোয়

★ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্র ★

৫০শ বর্ষ] কার্তিক ঃ ১৩৭৬ [৭ম সংখ্যা

আমিবার আদিখ্যেতা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

কোনকালে ছিল এক আমিবা।
হঠাৎ খেয়াল হোলো তার যে,
বাড়বে···বাড়বে···বাড়বে।
হোল সে বাড়ন্ত হোল সে উড়ন্ত··
হোল অফুরন্ত···
ফোটাবার ঝরাবার চক্রে ঘুরন্ত !
সব দিকে ছড়াবার
সবাইকে জড়াবার
করল চূড়ন্ত !···
আমিবার তেজ হেলো,
হাত হোলো লেজ হোলো,
ডানা হোলো ঠ্যাঙ হোলো
সাপ হোলো ব্যাঙ হোলো
শুঁড় হোলো শিং হোলো
হরিণ ফড়িং হোলো
তিড়িং বিড়িং হোলো···
আমিবা !

আকাশেও উড়লো সে
ডালে ডালে ঘুরলো সে···
হাতী হোলো উট হোলো,
দাঁত ছরকুট হোলো,
গাধা মর্কট হোলো···
আমিবা !

আমি বললাম, 'তুমি থামিবা !
এইবার থামো বাপু, আর না !'
'তোমার কথার ধারি ধার না !'
বলল দূরন্ত।
'বাড়বোই আমি আরো বাড়বোই
সহজে কি ছাড়বোই ?'
চলে না আমার বসে।···
আরো আরো বাড়লো সে।
হাস হোলো মাছ হোলো
পাখীদের নাচ হোলো···
কী জবড়জং হোলো,
কত কী যে ঢং হোলো,
রং—বেরং হোলো
আমিবা !
যার ছিল নাকো হাড়
ছিল নাকো মোটে মাস,
হোলো সে যে গণ্ডার
হোলো হিপোপোটেমাস !
আমি বললাম—'বাস্ !
এত যদি ছিল পেটে···
মোটেই না থামিবা ?
কাজ নেই খুঁটে চেটে,
এইবার উঠে হেঁটে
চলো সোজা, মরো খেটে খাটনি।
মরো গে মানুষ হয়ে
কথার ফানুস হয়ে
দিনে দিনে হুঁস হয়ে
হাঁটনি···
দূরন্ত পথ বেয়ে
হেসে খেলে কেঁদে গেয়ে,
কখনো বা চাট খেয়ে
কখনো বা চাটনি···
হন্তদন্ত হয়ে
বেগারের বোঝা বয়ে
ঘামিবা।
কোথায় যে কোন্‌কালে
উঠিবা বা নামিবা।
আমিবা !

সকাল-বিকেল

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সকালেতে এল বন্ধু 'বিমল'—
উৎসাহে ধরে হাত :
'না গেলেই নয়—যেতে হবে ঠিক
আমার খোকার ভাত !'

বিকেলেতে এল বন্ধু 'কমল' —
স্বরে একই উত্তাপ,
'না গেলেই নয়—শ্রাদ্ধ-বাসর
গত হয়েছেন বাপ !'
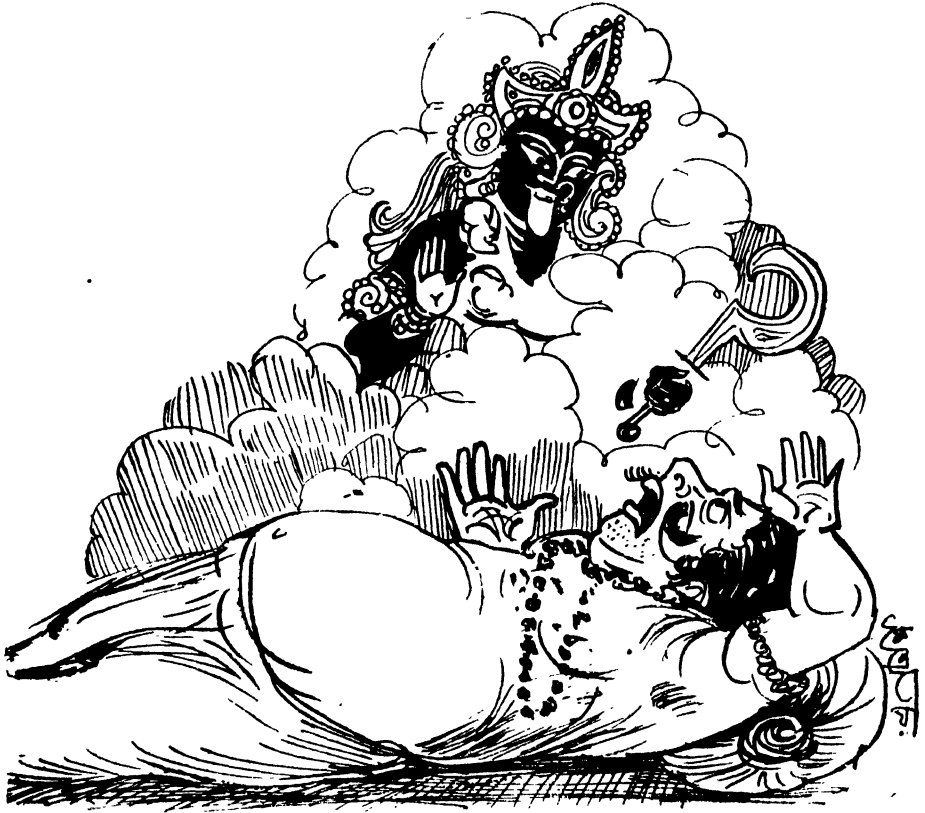
মা কালীর আবির্ভাব

শ্রীমনোজ বসু

কালীপুজোর সময় মা কালীর প্রতিমা দেখে থাক। ছবিও তো ঘরে ঘরে। মানুষের মুণ্ড কেটে তাই দিয়ে মালা গেঁথে মা গলায় পরে থাকেন। হাতে রক্ত-মাখা খড়্গ, আর এক হাতে কাটা-মুণ্ড একটা—সদ্য কেটেছেন, টাটকা রক্ত গলার নলিতে। লম্বা বর্ণনা দিয়ে কি হবে—হামেশাই তো চোখে দেখ তোমরা।

আমাদের পাড়ায় একজন ছিলেন—করালী চাটুয্যে। ঘোর কালীভক্ত তিনি—কালী ধ্যান, কালীজ্ঞান, কালী চিন্তামণি—কালী বিনে তিনি কিছু জানেন না। পরনে রক্তবসন, কপালে ডগমগে লাল সিঁদুর, গলায় একগাদা রুদ্রাক্ষের মালা। শোবার ঘরে তাকের উপর কালীমূর্তি,

চার দেয়ালে চারখানা কালীর পট। কালী কালী বলে ক্ষণে ক্ষণে করালী হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে তখন আমাদের।

মা কালী ভাবছেন, তিন ভুবনের মধ্যে এতবড় ভক্ত আর আমার নেই। মূর্তি আর ছবি নিয়ে মাতোয়ারা, পাগল হয়ে অহরহ আমায় ডাকাডাকি করে। যাই, একদিন মূর্তি ধরে দেখা দিয়ে আসি। কত আহ্লাদ করবে আমার করালী তখন!

হ'ল তাই। নিশিরাত্রে একদিন করালীর কাছে মা কালী সশরীরে হাজির হলেন। যেমনটি তোমরা ছবিতে দেখে থাক, প্রায় তাই। গলায় মুণ্ডের মালা, মুণ্ড দিয়ে টপটপ করে রক্ত ঝরছে। খড়্গ চকচক করছে ডান হাতে, এক-পিঠ চুল—সমস্ত ঠিক আছে, পায়ের নিচে কেবল শিব নেই। শিব কৈলাসে পড়ে আছেন। মা-জননী নক্ষত্র বেগে ছুটে এলেন, পদতলে তিনি আর থাকেন কেমন করে।

করালী চাটুয্যে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন, ঘুম ভাঙানোর জন্য মা কালী খড়্গের গোড়া দিয়ে আস্তে একটু খোঁচা দিলেন।

ওঠো বাবা করালী। মহা ভক্ত তুমি—প্রীত হয়ে আমি দর্শন দিতে এসেছি।

চোখ মেলেই করালী চাটুয্যে আঁতকে উঠলেন। কী সর্বনাশ, গায়ের উপরে খড়্গ—তাঁর মুণ্ডটাও কাটা পড়ে বুঝি এইবার!

ওরে বাবা, মেরে ফেলল, কে কোথায় আছ শীগগির ছুটে এসো।

প্রাণান্তকর চিৎকার। মা কালী মধুর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, চিনতে পারছ না? তুমি যে সর্বক্ষণ আমায় ডাকাডাকি করো, আমি এসেছি।

কে বা শোনে কার কথা! শয্যা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে চোঁচা দৌড়। আর আকাশভেদী আর্তনাদ: মারা গেলাম, রক্ষে করো কে কোথায় আছ—

পাড়ার মানুষ উঠে পড়েছে। ভাবল, আগুন লেগেছে চাটুয্যে-বাড়ি। কিংবা ডাকাত পড়েছে। লোকে লোকারণ্য।

কী হ'ল, চেঁচামেচি কিসের চাটুয্যে মশাই?

জড়িত কণ্ঠে কোন রকমে করালী বললেন, মা কালী উপস্থিত।

কোথায়, কোথায়?

ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন কালীসাধক করালী। ঠকঠক করে কাঁপছেন।

চলুন, দেখিগে—

করালী ঘাড় নেড়ে দিলেন: না, আমি যাবো না—

টেনে-হিঁচড়ে পাছে নিয়ে যায়, ধপ করে নারকেলতলায় বসে পড়লেন। প্রয়োজন হলে গাছ জড়িয়ে ধরে আত্মরক্ষা করবেন।

পড়শীরা দল বেঁধে কালী-দর্শনে ঘরে ঢুকে গেল।

কিছুই নয়। তাকের উপরে মাটির মূর্তিই শুধু। এবং দেয়ালের গায়ে কাগজে আঁকা পট।

মা কালী তো নেই—

নেই—সত্যি বলছ?

বারবার জিজ্ঞাসা করে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়ে লোকজনের সঙ্গে করালী ঘরে গেলেন। তাকের কালীমূর্তি নামিয়ে নিয়ে চল্লেন বাইরে।

কোথায় নিয়ে চললেন?

গোয়ালে রাখবো। ঘরে আর কাজ নেই রে বাবা। আবার যদি কোন দিন মা জ্যান্ত হয়ে ওঠেন, গরুরা দেখবে।

ভেজাল চলে না

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভেজাল কি শুধু চলে যত কিছু দ্রব্যে,
খাবারে, ওষুধে আর তেলে, ঘৃত গব্যে?
তা নয় রে, ভেজালেতে ঠাসা বহু পাঠ্য,
শিক্ষার ক্ষেত্রেও চলে নানা শাঠ্য!
অধিকার কোরে বসে যে-ই রাজতক্ত,
তারই নির্দেশ মতো লেখে যতো ভক্ত।
ইতিহাস কোরে দেয় বেমালুম উল্টা,
ভূগোলের ম্যাপে ছেপে দেওয়া হয় ভুল্‌টা।

শেখাতে রাজার স্তুতি বুড়ো, কচি-কাঁচাকে
বদ্‌লায় সাহিত্য, কবিতা ও গাথাকে।
অর্থ-সমাজ-রাজনীতি, দর্শনেতে
ধোঁকাবাজি বেশ চলে রাজাদের মতেতে।
কলাবিদেরা সব শক্তের ভক্ত।
বিজ্ঞান শুধু নয় কারো অনুরক্ত।
সদা মাথা উঁচু রাখে গণিত বা অঙ্ক।
বাজায় সত্যের ওরা নিতি জয়ডঙ্ক।

ক্ষমতা কারোর নেই গণিতকে টলাতে;
খুশিমতো বিজ্ঞানে বাজে কথা বলাতে।

দিগ্বিজয়ী গুলুমামা

॥ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥

আঃ, এই কিনা মার ডাকবার সময় হলো! ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বললুম, 'আমি ঘরে আছি মা, গুলুমামার কাছে।'

'তবে আর কি'—মার হাসির শব্দ শুনতে পেলাম, 'গুলুমামাকে পেয়েছে—আর কি এখন ক্ষিধে-তেষ্টা কিছু থাকবে'—

থাকবে নাই তো, কি করে থাকবে! গুলুমামার কথা কি আজ থেকে শুনছি? সেই যখন ইস্কুলে ভর্তি হইনি, তখন থেকে মার মুখে শুনে আসছি—আঃ তোর গুলুমামা, তার কথা আর বলিস নি, কোন্ গুণটা ছেড়ে কোন্ গুণটা বলি বল!

সত্যিই তো—গুলুমামার কোন্ গুণটা ছেড়ে কোন্টা বলবে মা! ফুটবলে কলকাতার সেরা খেলোয়াড় গুলুমামা। গুলুমামা না থাকলে নাম-করা সব ক্রিকেট ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায়। গুলুমামা ছিল বলেই না ভারতীয় জওয়ানরা এতো বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে পেরেছে। গুলুমামা না থাকলে ভারতের হকি টীম আবার জোরদার করার কথা ভাবতে পারতেন বড় বড় লোকেরা সব?

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম—'কিন্তু মা, কোন কাগজে তো গুলুমামার নাম কখনো'—

'নাম?' মা চোখ বড় বড় করে বলেছিলেন, 'একবার কি একটা কাগজ ওঁর ছবি ছেপেছিল—সঙ্গে সঙ্গে কাগজের অফিসে গিয়ে বললে, পোড়াও সব কাগজ, আমি কি নামের কাঙাল? নাম দিয়ে কি হবে?'

শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে এসেছিল।

মা বলেছিলেন; 'সত্যিই ওর নামের দরকার নেই—পৃথিবীর কোথায় ওকে চেনে না বল? শিকারের নেমন্তন্ন পেয়ে কোথায় ও না ঘুরেছে?' অবাক হয়ে বলেছিলুম, 'বলো কি মা, গুলুমামা আবার শিকারীও?' মা হেসেছিলেন—'পৃথিবীর নাম-করা শিকারীরা ওর কাছে এসে বলতো—গুলু, শিকারের যে আমরা কিছুই জানি না, সে তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি'—

সেই গুলুমামা! এতোদিন প্রতীক্ষার পর এসেছেন আমাদের বাড়ী। এসেছেন না বলে বলা উচিত পদার্পণ করেছেন।

রোগা তামাটে চেহারা। মুখের মধ্যে নাকটা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। এক মাথা কদমছাঁট চুল। দড়ির মতন পাকানো শরীর।

বিকেল থেকেই গুলুমামার তিন রাউণ্ড শিকারের গল্প হয়ে গেছে। মধ্যে মামা একটু বেরিয়েছিল বাইরে। তারপর হ্যারিকেন জেলে আবার যে বসেছি গুলুমামাকে নিয়ে—এখন আর ভূমিকম্প হলেও উঠছি না।

ইতিমধ্যেই মা দু'বার চা দিয়ে গেছে। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু ধমক দিয়ে বলেছে—'এবার ছেড়ে দে তোর গুলু-মামাকে, একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করুক, এতখানি রাস্তা এলো'—

'আঃ, থাক থাক দিদি'—গুলুমামা সর্ব-ত্যাগী হাসি হেসেছিলেন, 'আবার কবে আসবো'—

'তবে কর বকবক' —মা শূন্য চায়ের কাপ তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলেছিল, 'বাচ্চাদের সঙ্গে এতো পারিসও বাবা'—

তারপরও অনেক কীর্তি হয়ে গেছে—ব্রিসবেনের ক্রিকেট টেস্ট, রোমের অলিম্পিক,

'দিদি গো, একেবারে শেষ হয়ে গেলুম, গো'—পৃঃ ৩০৫

কিলিমাঞ্জরোর গহন বনে শিকার ইত্যাদি পেরিয়ে যে মুহূর্তে মেরু প্রদেশে শ্বেত ভল্লুক শিকারের চাঞ্চল্যকর ইতিবৃত্ত সুরু হবে—

সেই মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে গেল।

কি একটা বস্তু ফরফর শব্দ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল একেবারে গুলুমামার ঘাড়ের ওপর।

তারপর কি হলো বোঝার আগেই গুলুমামার একটি তীব্র হৃদয়-বিদারক চীৎকার, এবং—

এবং গুলুমামা আর নেই। ঘরে একমাত্র আমি দাঁড়িয়ে বোকার মত ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখছি চারদিকে।

অথচ সেই ভীষণ পক্ষী জাতীয় প্রাণীটি গুটি গুটি এগিয়ে পরিত্যক্ত একটি চায়ের প্লেটে শুঁড়

ডুবিয়েছে ততক্ষণে। হাসি পেল আমার দেখে। কিন্তু গুলুমামা কোথায়?

তবে কি বেরিয়ে গেল বাইরে? দরজা পর্যন্ত এগিয়েই একটা সম্ভাবনা মাথায় খেলে গেল।

নীচু হয়ে দেখি, ঠিক তাই। চৌকির নীচে চোখ বন্ধ করে তালগোল পাকিয়ে যে জীবটি বসে আছে—কার সাধ্যি তাকে গুলুমামা বলে চেনে!

বললুম—'গুলুমামা, বেরিয়ে এসো, ও কিছু নয়—একটা আরশোলা।'

'কি বলছিস'—গুলুমামার গলা চিঁচিঁ করছিল শুনতে পেলুম—'আরশোলা?'

হাসি চেপে বললুম—'হ্যাঁ একটা সাধারণ আরশোলা।'

কয়েক মুহূর্ত অবসর। বোধহয় নিজেকে সামলে নেবারই সময় নিলেন—তারপর বীর বিক্রমে বললেন, 'আরশোলা সাধারণ হলো? পৃথিবীতে কত রকমের আরশোলা আছে জানিস? বলিভিয়ার জঙ্গলে একটা বিষাক্ত আরশোলা মারতে পঞ্চাশজনের দল বেরিয়েছিল—সে গল্প যদি শুনিস'—

বললুম—'শুনবো গুলুমামা, আগে তুমি বাইরে এসো।'

একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাত ধরে টেনে যে মানুষটাকে মেঝেতে এনে ফেললাম সেকি গুলুমামা?

সমস্ত গায়ে অন্ততঃ কিলো দেড়েক ধুলো, মাথায় মাকড়সার ঝুলের হেলমেট; কপালটা এক জায়গায় আলুর মত ফুলতে শুরু করেছে—আর কাপড়টা উঠে—

ঠিক করতে যাচ্ছি—গুলুমামা আর একটি আর্তনাদ ছাড়ল, 'উঃ, গেছি গেছিরে—কনুইটা একেবারে খুলে বেরিয়ে গেছে'—

তাকিয়ে দেখি ছিঁড়ে গেছে একটু, বললুম—'ডেটল আনবো মামা?'

'শুধু ডেটল?' বীর বিক্রমে আবার কি বলতে গিয়েই হঠাৎ বাচ্চা ছেলের মত ককিয়ে উঠলেন—'দিদি গো, একবারে শেষ হয়ে গেলুম গো—তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো ডেটল-তুলো-ব্যাণ্ডেজ'—

॥ ব্যায়াম সম্বন্ধে মহাত্মাজী ॥

ব্যায়াম মানেই ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা করা নয়। ব্যায়াম মানে শারীরিক ও মানসিক কার্য। যেমন খাদ্যটা হাড়, মাংস ও মনের জন্য আবশ্যক, ব্যায়ামটাও তেমনি শরীর ও মনের জন্য আবশ্যক। শরীরের ব্যায়াম না হইলে শরীরের রোগ হয়, মনের না হইলে মন শিথিল হয়।...ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে যে, সুস্থ শরীরে সুস্থ মন থাকিলেই তবে তাহাকে সুস্থ বলা যায়।

চাঁদ ও আমি

শ্রীসুশীল রায়

নাম রেখেছি পরমজ্যোতি, কী-যে নামের মানে,
যে রেখেছে নামটি, কেবল সে'ই বুঝি তা জানে।
কখনো সে মায়ের কোলে,
কখনো-বা দোলায় দোলে,
কে জানে সে এতটা কাল ছিল যে কোন্‌খানে!
নামের কোনো মানে থাকে? থাকে নামের মানে?
আকাশ থেকে অমন ক'রে জ্যোৎস্না যে ওই ঢালে,
তার নামটি চাঁদ রেখেছে কে-যে সে-কোন্ কালে!
নামের মানে কেউ কি খোঁজে?
চাঁদ বলতে চাঁদই বোঝে,
যায় যদি সে কখনো দু-চোখের আড়ালে
তাকে ছোঁয়ার জন্যে উঁচু আকাশপিদিম জ্বালে।
আজকে যে ওই দুলছে দোলায়, ঢুলছে মায়ের কোলে,
জাগবে যখন, তখন তাকে থামাবে কী ব'লে?
বলবে সে, "আর ছোটটি নই
আরো অনেক বড় হবই,
দোলনা সরাও, কোলের থেকে নামিয়ে যাও চ'লে,
বেঁধে রাখলে বড় হতে পারব কি তা হ'লে?"
আজকে যাকে দেখছি এমন ছোটর ছোট অতি
সব সময়ই দৃষ্টি রাখা চলেছে যার প্রতি,
একদা সে'ই অবাক ক'রে
হয়তো যাবে দেশান্তরে,
ফিরে আসবে। ভাবব, আহা, যে ছিল এক-রতি
এটা কি সেই? জবাব পাব, "আমি পরমজ্যোতি।"
অমাবস্যার দেশ পেরিয়ে ফিরে আপন দেশে

দাদুমামীর নেমতন্ন

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

দাদুমামা বললেন, "তোদের মামী বলেছেন : ওদের কি পাঁজি দেখে দিনখন ঠিক করে আগাম নেমন্তন্ন করতে হবে নাকি ? ওরা যেদিন এসে বলবে, মামী, আজ আমরা খাব, সেদিনই আমার নেমন্তন্ন। দিনটা তা'হলে তোরাই ঠিক কর।"

লডি, বুয়া, কচি, ভীষ্ম, সঞ্জয় আর আমি—ছ'জন আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললাম, "আজই খাব দাদুমামীর নেমন্তন্ন। শুভস্য শীঘ্রম্।"

এতটা শীঘ্রম্ বোধ হয় দাদুমামা আশা (অর্থাৎ আশঙ্কা) করতে পারেন নি। কিন্তু কথা ফেরাতে পারেন না, তাই বললেন, "বেশ, তা'হলে একটা ফর্দ করে ফ্যাল কি কি খাবি। যাকে বলে মেনু। কাগজে পাকা করে লিখে ফ্যাল একেবারে। কোনো ব্যাপারেই কাঁচা কাজ ভালো নয়।"

লডি সঙ্গে সঙ্গে কাগজ পেন্সিল নিয়ে মেনু লিখতে বসে গেল, বলল, "বল তোরা কে কি খাবি। আমি প্রথমেই লিখছি পোলাউ।" বুয়া বলল, "তার আগে দু'খানা করে ফুল্‌কো লুচি, আর বেগুন ভাজা।" কচি ফুচ্‌কা আর তেলেভাজা আলুর চপ খেতে ভারী ভালবাসে, সে এদুটোর নাম করল। লাডি বলল, "তুই একটা ইডিয়ট। নেমন্তন্নে কেউ এসব খায় নাকি ?" কচি বলল, "বেশ, না হয় ফুচ্‌কাটা বাদই দিলাম, কিন্তু আলুর চপটা তুই লেখ, লডি। তোরা কেউ না খাস, আমি খাব। বাজারের তেলেভাজা খেতেই যখন এত ভালো লাগে, তখন দাদুমামীর হাতের তৈরী তো অমৃত হবে।" বাকী আমরা বললাম, "তা'হলে আমরাও খাব।" লডিকে লেখালাম, "আলুর চপ—দু'খানা করে।" সঞ্জয় বলল, "নারকেল কুচি দিয়ে ছোলার ডাল আর বেশ ঝাল আর গরম-মশলা দিয়ে আলুর দম।"

দাদুমামার বাড়ির সামনেই বাজার, সন্ধ্যাবেলাও মাছ পাওয়া যায় সেখানে মাঝে মাঝে, আমাদের বরাতে থাকলে আজও মিলবে। আমরা ঠিক করলাম দাদুমামীর হাতের রান্নাই যখন খাব, তখন বেশ একটু নতুন ধরণের রান্না খেয়ে মুখ বদলাতে হবে। আমাদের মিলিত পরামর্শে লেখা হ'ল, "মাছের টক-ঝাল ঝোল।"

শেষ পর্যন্ত দাদুমামীর নেমন্তন্নের মেনু লডির হাতের লেখায় এই রকম দাঁড়াল :

"বেগুনভাজা সহ লুচি দু'খানা করে, পোলাউ, আলুর চপ দু'খানা করে, নারকেল কুচি দিয়ে ছোলার ডাল, ঝাল আর গরমমশলা দিয়ে আলুর দম, মাছের টক-ঝাল ঝোল, মোচার ঘণ্ট, ডাঁটা-চচ্চড়ি, কিশমিশ-আলুবখরা-আনারসের মিশ্র চাটনি, পাঁপরভাজা, দই, লেডিকেনি, শোনপাপ্‌ড়ি, শঙ্খ সন্দেশ।"

মেনু দেখে আমরা সবাই খুশী, সবারই জিভে জল এসে গেল। দানুমামা বললেন, "রোদ পড়ে গ্যাছে, চল এবার রওনা হই। দোকান, বাজার সবই বাড়ির পাশে, তবু কেনাকাটা-যোগাড়-ব্যবস্থার জন্যে তোদের মামীকে কিছু সময় দিতে হবে তো?"

মেনুর কাগজটা লডি সযত্নে ভাঁজ করে নিজের পকেটে রেখে দিল। আমরা দানুমামার সঙ্গে রওনা হলাম। দানুমামা রাস্তায় বেরিয়ে ছাতাটা খুলে একবার মাথায় দিলেন, তারপর কি ভেবে রোদ আর নেই দেখে আবার গুটিয়ে ফেললেন।

দানুমামীর সঙ্গে দেখা হতেই আমাদের দলপতি হয়ে লডি বলল, "আমরা নেমতন্ন খেতে এসেছি, দানুমামী। মেনুও তৈরী করে এনেচি।"

আদর করে লডির কান মলে দিয়ে দানুমামী বললেন, "মামীকে মেনু শেখাতে চাস, তোর সাহস তো কম নয়, লডি। ওটা রেখে দে তোর কাছে। খেতে বসে আমার মেনুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখিস। তোদের মেনুর চাইতে আমার মেনু ভালো হলে সবাই কানমলা খেতে রাজী আছিস তো?"

আমরা সবাই একবাক্যে রাজী হয়ে বললাম, "একেবারে খাওয়ার শেষে। বেশ মধুরেণ সমাপয়েৎ হবে।"

"চা আমরা খেয়ে এসেছি। এদের নিয়ে পার্কে বসে ঘণ্টা দুই গল্প করে আসি। ততক্ষণে তুমি তোমার এদিককার সব ব্যবস্থা সেরে ফেল।" দানুমামীকে একথা বলে ছাতাটা আলনায় ঝুলিয়ে রেখে দানুমামা আমাদের নিয়ে বাড়ীর পাশেই পার্কে গিয়ে বসে গল্প শোনাতে শুরু করলেন। রোদ পড়ে গেছে, বৃষ্টি নামবার ভয় নেই, মামী আমাদের মেনুকে হারিয়ে দেবার পণ করে কোমর বেঁধেছেন, অতএব আমাদের গল্পের আসরটি চমৎকার জমল। শুধু লডি একবার বলল, "দানুমামী নিজের পছন্দমতোই মেনু করবেন জানলে আমরা মেনুর পেছনে অনর্থক এত মাথা ঘামাতুম না।" আমি বললাম, "অনর্থক নয়, লডি। মামীর মেনুর সঙ্গে মেলাবার জন্যে ওটা দরকার হবে।"

গল্প শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে দু'ঘণ্টারও অনেক বেশী সময় কেটে গেল, তা টেরও পেলাম না। শেষকালে হঠাৎ একবার হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দানুমামা বলে উঠলেন, "এই দেখ, প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেল। চল চল, শীগগির চল।"

আমাদের দেখেই দানুমামী বললেন, "তোদের দেরি দেখে ভাবছিলাম ডাকতে পাঠাব কিনা। সোজা চলে আয় খাবার টেবিলে। সব তৈরী। মেনুতে তোদের একটু চমকে দেব।"

যে টেবিলে আমাদের তিনি খেতে বসালেন, তার ও-পাশে একটি টেবিলের ওপর সমস্ত খাবার সাজিয়ে রেখেছিলেন তিনি। ঐ দিকে দেখিয়ে বললেন, "এই আমার পুরো মেনু। তোরা কি মেনু করেছিলি?"

লডি তার পকেট থেকে তার নিজের হাতে লেখা মেনুর কাগজখানা ভাঁজ খুলে পড়ে

শোনাতে লাগল, এক এক করে মিলিয়ে দেখা গেল আমাদের মেনু ঐ টেবিলের খাবারগুলোর সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে! মেনুতে আমাদের চমকে দেবেন কি, দাদুমামী নিজেই চমকে উঠে বললেন, "কি আশ্চর্য! আমি কি কি খাবার তৈরি করব, তা তোরা আগেই টের পেয়েছিলি কি করে?"

লডি মেনুর কাগজখানা ভাঁজ খুলে পড়ে শোনাতে লাগল।

দাদুমামীকে এভাবে চমকে দিয়ে আমরাও চমকে উঠলাম। দাদুমামাকে নিয়ে আমরা সাতজন, লুচি আর আলুর চপও গুণে দেখলাম তৈরি হয়েছে, ঠিক আমাদের মেনু অনুযায়ী সাত দু'গুণে চোদ্দখানা করে। মাছের ঝোল খেয়ে দেখলাম টক আর ঝাল মিশিয়ে চমৎকার রান্না, যেমনটি সচরাচর হয় না। চাটনিতে কিশমিশ, আলুবখরা, আনারস একসঙ্গে মেশানোটাও তাই। মামী নিজের ইচ্ছে মতো মেনু বানালে মিষ্টির ভেতর রসগোল্লা নিশ্চয়ই থাকবে ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখলাম আমাদের মেনুতে নেই বলে দাদুমামীও তাঁর মেনুতে রসগোল্লা বাদ দিয়েছেন। আমাদের মেনু যেমন আগে তৈরী তেমনি একটু খাপছাড়া, আমরা খেতে বসবার আগে দাদুমামী তার কিছুই জানতেন না। তা'হলে এমন কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল কি করে? আমরা এমন আশ্চর্য

কাণ্ড আর কখনো দেখিনি। আমাদের বিস্ময়ের চমক দেখে দানুমামা শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, আর দানুমামী বললেন, "যাঃ, আমার মেনু তোদের মেনুর চাইতে ভালো হতে পারল না। তোরা আমার কানমলা থেকে বেঁচে গেলি।"

পরদিন দানুমামা কি একটা কাজে ডায়মণ্ডহারবারে গেলেন, আমরা সেই সুযোগে দানু-মামীর কাছে গিয়ে বললাম, "আমাদের মেনু কাঁটায় কাঁটায় আপনি কি করে টের পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে আমাদের সারারাত ঘুম হয়নি। ব্যাপারটা ভারী অলৌকিক, বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা চলে না। কারণ দানুমামা আপনাকে আমাদের মেনু বলেন নি, আর মেনুর কাগজটাও বরাবর লডির পকেটেই ভাঁজ করা ছিল।"

দানুমামী একটু হেসে বললেন, "কিন্তু তোদের মেনুর হুবহু নকল করা এক ফালি কাগজ গোলা পাকিয়ে ছাতার ভেতর রেখে গিয়েছিলেন তোদের দানুমামা। তোরা যখন পার্কে চলে গেলি, সেই ফাঁকে ছাতা খুলে ওটা বার করে নিয়ে আমি তোদের মেনু জেনে নিয়েছিলাম। তোদের মামার কোটের ডান দিকের নীচের পকেটে একটা কাগজের প্যাড আর ছোট্ট এক টুকরো পেনসিল ছিল। তোরা যখন মেনু লিখছিলি, তাই শুনে শুনে পকেটের ভেতর হাত রেখেই প্যাডের কাগজে তোদের মামাও সঙ্গে সঙ্গে মেনু লিখে ফেলছিলেন গোপনে, ঐ পকেটে লুকানো প্যাডের কাগজে। ঐরকম লেখা ওঁর ভালো অভ্যেস আছে। ওভাবে লিখলে লেখা আঁকাবাঁকা এব্ড়ো-খেব্ড়ো হয় বটে, কিন্তু পড়তে খুব একটা অসুবিধে হয় না। কাগজের টুকরোটা আমি রেখেও দিয়েছি। বোস, দেখাচ্ছি।"

ব'লে দুমড়ানো, মোচড়ানো ছোট্ট এক ফালি প্যাডের কাগজ এনে আমাদের হাতে দিলেন দানুমামী। ফালিটি খুলে ছড়িয়ে পড়ে দেখলাম, আঁকাবাঁকা এব্ড়ো খেব্ড়ো অক্ষরে আমাদের পুরো মেনুটা তাতে লেখা রয়েছে—লেখাগুলো ঠিক মুক্তোর মতো না হলেও, পড়তে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না।

চাঁদ

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

এ্যাপোলো এগারো
তুমি চাঁদে যেতে পারো।
তবুও শিশুর চোখে আজো চাঁদ চাঁদেরি মতন।

নাই, কিছু নাই,
বায়ুহীন, প্রাণহীন মৃত্তিকার স্তরে।
তবু শিশু এখনো আদরে
আধো আধো স্বরে
ডাকে—
চাঁদা মামা আয়।···
জ্যোৎস্না খেলা করে তার
ছোট ওই নীল বিছানায়।
কচি কচি ডাগর দু'চোখে
চাঁদের চরকা-বুড়ি চুপি চুপি ঘুম দিয়ে যায়।

তারপর একগাল হেসে মা শুধায়ঃ
এ্যাপোলো এগারো
রকেটে বা কতটুকু চাঁদ ধরা যায়?

উদো-বুদোর কাশীযাত্রা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

উদো-বুদো পাণ্ডার সঙ্গে কাশীযাত্রা করলো। পদযাত্রা। পায়ে হেঁটে চলেছে। এতদিন বসে বসে রাজত্ব চালিয়েছে, পরে ঘরে বসে হরিনাম করেছে, হাঁটা-হাঁটির অভ্যাস নেই। তিনদিন পথ চলেই পায়ে ব্যথা হলো, হাঁটু কনকন করতে সুরু করলো। পাণ্ডা বললো—তবে গরুর গাড়ী ভাড়া করি।

উদো বললো—ওরে বাবা, ঝাঁকানি লাগবে হাড়গোড় সব মট্‌মট্‌ করে উঠবে।

বুদো বললো—তাহলে পালকি কর।

পাণ্ডা বললো—এখানে পালকি মিলবে না।

বুদো বললো—নদী কতদূর? নৌকায় যাবো।

পাণ্ডা বললো—গঙ্গা এখান থেকে একদিনের পথ।

উদো বললো—বেশ, সেই গঙ্গার পথেই চল।

বুদো বললো—কিন্তু চলতে যে বড় কষ্ট হচ্ছে, পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে।

পাণ্ডা বললো—অন্য দিকে মন ফিরিয়ে দাও, পথ চলতে আর কষ্ট হবে না।

উদো বললো—সে কেমন?

পাণ্ডা বললো—কীর্তন গাইতে গাইতে চল।

বুদো বললো—কীর্তন তো কখনও গাইনি।

পাণ্ডা বললো—আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।

পাণ্ডা সুর ধরলো—

তোমার দয়ায় যা কিছু সব করি,
ভাসিয়ে দাও, ডুবিয়ে দাও তোমার প্রেমে হরি।

—এই তোমার কীর্তন?—উদো-বুদো একসঙ্গে সুর ধরলো—ভাসিয়ে দাও, ডুবিয়ে দাও, তোমার প্রেমে হরি—

পাণ্ডা বললো—ঠিক হয়েছে, চল—

উদো-বুদো গান গেয়ে চললো, তাদের গানে পেয়ে বসলো। গলা ছেড়ে বেসুরো চীৎকার করতে করতে দু'জনে মেঠো পথ ধরে চললো।

চাষীরা ক্ষেতে ধান রুইছিল, তারা শুনলো—ভাসিয়ে দাও, ডুবিয়ে দাও—মানে? উদো-বুদোকে তারা ধরলো, বললো—এতো কষ্ট করে ধান রুইছি, তোমার হরি সব ভাসিয়ে দেবে, ডুবিয়ে দেবে? ঠেঙিয়ে ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দোব।

—আমরা হরিনাম করছি, কীর্তন গাইছি।

—অন্য কীর্তন গাও।

—বল, কি গাইব?

—তোমরা কি গাইবে, তা আমরা কি জানি!

পাণ্ডা পিছনে ছিল, এগিয়ে এসে বললো—ঠিক আছে, কি গাইবে আমি বলে দিচ্ছি—

তোমার দয়ায় তোমারই নাম করি—
আরো দাও, ভরিয়ে দাও, তোমার কৃপায় হরি।

উদো-বুদো এইবার নতুন কীর্তন গাইতে গাইতে চললো।

একদল লোক মড়া নিয়ে যাচ্ছিল। তারা কীর্তন শুনে থমকে দাঁড়ালো। কী! আরো দাও, ভরিয়ে দাও?

শবযাত্রীরা মারমুখো হয়ে উঠলো উদো-বুদোর উপর।

পাণ্ডা এসে মাঝে পড়লো, বললো--ঠিক আছে আমি নতুন কীর্তন বেঁধে দিচ্ছি—

তোমার কৃপায় সবার দিন কাটে,
নাইক জানা মৃত্যু কার লিখন ললাটে,
মরার পরে হরি আমার সব অপরাধ ভুলে,
নিও গো আমায় তোমার কোলে তুলে।

শবযাত্রীরা এবার ঠাণ্ডা হলো। উদো-বুদো এগিয়ে চললো।

এক জায়গায় একদল লোক একটা মস্ত কেউটে সাপ মেরেছিল। সাপটা একটু আগেই একটা লোককে কামড়েছিল। তারা কীর্তন শুনে রেগে আগুন হয়ে গেল। কী, হরি সাপকে কোলে তুলে নেবে? তারা মারমুখো হয়ে উঠলো।

পাণ্ডা এসে মাঝে পড়লো, বললো—ঠিক আছে, আমি নতুন কীর্তন বেঁধে দিচ্ছি—

হরি তোরে বুঝতে নারি, তোর গুণের কথা কইব কত
হরিণ দিলি বাঘের মুখে, সাপের মুখে বিষ যত।
কালো রূপে কেউটে হলি, ছোবল দিলি যাকে তাকে,
কালো রূপে আলো করা গুণ যে কত জানে না কে!

নতুন কীর্তন শুনে গাঁয়ের লোকেরা ঠাণ্ডা হলো, উদো-বুদো গাইতে গাইতে এগিয়ে চললো।

তারা এক বিয়ে বাড়ীর সামনে এসে পড়লো। বর বিয়ে করতে যাচ্ছে, বরযাত্রীরা বেরুচ্ছে। বরের ভালো নাম হরিচরণ, ডাকনাম কালো; গায়ের রং কালো বলে সবাই তাকে ওই নামে ডাকে।

বরযাত্রীরা কীর্তন শুনে থমকে গেল। কী! হরি তোর গুণের কথা কইব কত? কালো রূপে কেউটে হলি? বটে!

তেড়ে এলো ছেলে-ছোকরার দল। এই মারে তো এই মারে।

পাণ্ডা এসে মাঝে পড়লো, বললো—আমি নতুন কীর্তন বেঁধে দিচ্ছি—

হরি, তোমার কৃপা বড়
সবার তুমি ভালই কর
সবাই হাসুক করুক আনন্দ
এই দুনিয়ায় সবই ভাল, নয়ক কিছু মন্দ!

বরযাত্রীরা হাসলো, উদো-বুদো গাইতে গাইতে এগোলো।

দুটি মাতাল তাড়ি খেয়ে টলতে টলতে পথ চলছিল। একজন পথে হোঁচট খেল, তাল সামলাতে না পেরে সে পাশের লোকটিকে ধরলো। সে-ও টলছিল, সে-ও সামলাতে পারলো না। দু'জনে একসঙ্গে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লো পথের পাশে খানার মধ্যে।

এমন সময় উদো-বুদো কীর্তন গাইতে গাইতে এগিয়ে এলো।

খানার পাঁকে পড়ে মাতালদের তখন নেশা ছুটে গেছে। একজন মাতাল কীর্তন শুনে লাফিয়ে উঠলো, বললো—কি গাইছিস্ রে? সবাই হাসুক, করুক আনন্দ? দাঁড়া, আমি আনন্দ করাচ্ছি!

মাতাল উদো-বুদোকে এই মারে তো এই মারে।

পাণ্ডা পিছনে ছিল, তাড়াতাড়ি এসে পড়লো, বললো—ঠিক আছে, আমি নতুন কীর্তন বেঁধে দিচ্ছি—

হরি, তুমি করুণা কর—
দুই সঙ্গীকে এক কর
একটিকে তুমি নিয়েছ তুলে,
অপরটিকেও তুলে ধর।

মাতাল এবার হাসলো। পাণ্ডা অপর মাতালকে খানা থেকে তুলে দিলে। তারপর উদো-বুদো গাইতে গাইতে এগোলো।

পথ দিয়ে চলেছিল জমিদারের পাইক। একবার দাঙ্গা করতে গিয়ে তার একটা চোখ কাণা হয়ে যায়। সেই থেকে লোকে বলে কাণা সর্দার।

কাণা সর্দার গান শুনে বললো—কী! আমার একটা চোখ গেছে, আবার আরেকটা চোখও তুলে নিতে বলছ? উদো-বুদোকে সে রুখে দাঁড়ালো।

পাণ্ডা মাঝে পড়লো, বললো—
আমি নতুন কীর্তন বেঁধে দিচ্ছি—
একদিকে রইল আলো,
আরেক দিকে অন্ধকার।
দু'দিকই হোক আলোয় আলো
হরির কৃপায় দেখি বাহার!

কানা সর্দার ছেড়ে দিল। উদো-বুদো গাইতে গাইতে চললো।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এলো।

এমন সময় গাঁয়ের এক বাড়ীতে আগুন লেগে গেল। বাড়ীর একটা দিক, দাউ দাউ করে জ্বলতে সুরু করলো। আশপাশের লোক ছুটে এলো আগুন নিভাতে। উদো-বুদো তখন সেই পথ দিয়ে চলেছে গাইতে গাইতে।

'তারা উদো-বুদোকে তাড়া করলো।'

গান শুনে গাঁয়ের মানুষ তো ক্ষেপে গেল। কী? বাড়ীর একদিক পুড়ছে; আর উনি বলছেন, দু'দিকই হোক আলোয় আলো! মার—মার!

তারা উদো-বুদোকে তাড়া করলো।

উদো-বুদো ছুটলো। পাণ্ডা লোকগুলোকে ঠাণ্ডা করতে চাইল, কিন্তু তারা কোন কথা শুনলো না। উদো-বুদোকে গ্রামছাড়া করে তবে তারা রেহাই দিল।

গাঁয়ের পাশেই নদী। উদো-বুদো হাঁপাতে হাঁপাতে নদীর ধারে এসে বসে পড়লো।

উদো বললো—আমার আর নড়বার শক্তি নেই।

বুদো বললো—আর কাশী যাবার দরকার নেই, বাড়ী ফিরে যাই!

পাণ্ডা বললো—বাবা বিশ্বনাথের নামে বেরিয়েছি, এখন ফিরে গেলে দেশসুদ্ধ লোক হাসবে যে!

উদো বললো—কিন্তু আমি তো আর চলতে পারবো না।

—চলতে হবে না—পাণ্ডা বললো—আমরা নৌকো করে যাবো। এই নদী দিয়ে বরাবর

চলে যাবো গঙ্গায়, সেখান থেকে গঙ্গার তীরে বারানসী। ঘুমুতে ঘুমুতে নৌকায় দুলতে দুলতে চলে যাবো।

—কীর্তন গাইতে হবে না তো?

—নৌকায় বসে কীর্তন গাইবে। কেউ কিছু বলবে না। এবারকার কীর্তন হবে—

বাবা বিশ্বনাথের অনেক দয়া
নৌকো চড়ে উদো-বুদো
পৌঁছে গেল কাশী গয়া—

উদো বললো—কাশী তো যাচ্ছি, গয়া কোথায়?

পাণ্ডা বললো—গয়া কাশী, পাশাপাশি।

বুদো বললো—গয়া গেলে তো পিণ্ডি দিতে হবে।

উদো বললো—ছেলেরা পিণ্ডি দেয়, আমরা বাপমায়ের পিণ্ডি দোব। কিন্তু আমাদের পিণ্ডি কে দেবে?

পাণ্ডা বললো—সেজন্য কোন বাধা হবে না। শাস্ত্রে আছে—

সর্ব কর্মে আছে রাজার অধিকার
খুশী মত প্রজার পিণ্ডি চট্‌কাবার।
বুদো মন্ত্রী প্রজা তব নাহিক সংশয়,
তার পিণ্ডি দিতে উদো পারিবে নিশ্চয়।

উদো বললো—বুদোর তো হলো, আমার কি হবে?

পাণ্ডা বললো—

প্রজারা রাজার পুত্র সর্বলোকে কয়
বুদো তোমার পিণ্ডি দেবে নাইকো কোন ভয়।
উদোর পিণ্ডি বুদো পাবে
বুদোর পিণ্ডি উদো খাবে,
দু'জনেই স্বর্গে যাবে।

উদো বললো—তবে ঠিক আছে, ডাকো নৌকো।

পাণ্ডা নৌকা ডাকলো। উদো-বুদো নৌকায় উঠে বসলো।

উদো নৌকায় গা এলিয়ে দিয়ে বলে উঠলো—

বিশ্বনাথের পুজা দিতে এবার আমরা চনু্নু কাশী—

বুদো এতক্ষণ কীর্তন গেয়েছে, সেইবা পিছিয়ে থাকবে কেন। সেও সুর করে বলে উঠলো—

উদো-বুদোর পিণ্ডি দিয়ে গয়া থেকে ঘুরে আসি।

পাণ্ডা হেসে বললো—সেই ভাল।

নৌকো ছেড়ে দিল।

ব্রাহ্মণ-বেশী

শ্রীবেলা দে

ঢং ঢং ঢং ঢং—কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে সত্যনারায়ণের আরতি হচ্ছে। বাজনা যেই থেমে এসেছে অমনি মণ্টু, বেণু, বাঁশী আর খোকন আস্তে আস্তে গুটিগুটি মেরে উঠে গেল, আর ওদের কোন উৎসাহ নেই কিনা। বড়মা, মানে মায়ের দিদিমা আড় চোখে একবার ওদের দেখে নিলেন। ওরা তখন দৌড় দিয়েছে কারুর বাগানে কিংবা পুকুরের সন্ধানে। শহরের ছেলে গ্রামে এসেছে বেড়াতে ওদের খুশী দেখে কে! ওরা গেল রায়বাবুদের পোড়ো বাগানবাড়ীর সন্ধানে। মণ্টু বলে, এই বাগানে এত ভাল আম আর আমের গাছ, গ্রামের লোকগুলো কি বোকা ভাই, কেউ এ বাগানে ঢোকে না! বাধা দিয়ে বেণু বলে না দাদা তুমি শোননি, মুখুয্যেবাড়ীর মালীটা আমাদের এখানে ঢুকতে বারণ করেছিল? কি বলেছে জান? বলেছে রায়বাবুদের ঐ বাগানবাড়ী বড় অপয়া, সত্যনারায়ণ ঠাকুর নিজে নাকি এখানে এসে রায়বাবুদের শাপ দিয়ে গেছেন, সেই থেকেই নাকি বাড়ী পড়ে গেছে আর রায়বাবুদের অবস্থাও খারাপ হয়ে গেছে। মণ্টু হেসে উঠে বললে, আরে দূর, ওসব পাড়াগাঁয়ের গাজাখুরী গল্প, ওসবে বিশ্বাস করতে নেই।

কাজেই ওরা খুশী মনে আম জাম কাঁঠাল নিয়ে বাড়ী ফিরল। বড়মা বিরক্ত হয়ে বললেন, এ সব কোথা থেকে আনা হ'ল শুনি? বেণু বুক ফুলিয়ে বলল, কেন রায়বাবুদের পোড়ো বাগানবাড়ী থেকে। সর্বনাশ! বড়মার চোখ দুটো কপালে উঠে গেল—এই ঠিক দুপুরে কিনা ঐ সর্বনেশে বাড়ীতে যাওয়া, আর শুধু তাই নয় আবার আম জাম নিয়ে আসা! এক্ষুনি ঐগুলো ফেলে দাও, ও বাড়ীর জিনিস মুখে দিতে নেই। সবচেয়ে ছোট্ট খোকন, সে বেচারী প্রথমেই ভয়ে ভয়ে হাতের আমগুলো ফেলে দিলে। কিন্তু তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। মণ্টু সহজে ঘাবড়াবার ছেলে নয়, সে বলে উঠলো, গ্রামের লোকেদের ভয়ানক কুসংস্কার তাই সবতেই ভয়। আচ্ছা বলুন তো, কেন রায়বাবুদের বাগানে কেউ ঢোকে না, আমগাছে হাত দেয় না? বেণু মুরুব্বি করে বলে উঠল, ঐ যে দাদা বলছিলুম না যে মুখুয্যেদের মালী বলেছে সত্যনারায়ণ ঠাকুর নিজে নাকি এসে রায়বাবুদের শাপ দিয়ে গেছেন। মণ্টু বললো, দূর ওসব বাজে কথা। বাজে কথা বৈকি, তোমরা শহুরে ছেলে তাই গ্রামে কেবল কুসংস্কারের গল্প পাও। যে ঠাকুর নিজে এসে রায়বাবুদের ধনে-মানে কতবড় করে গেছেন, আবার সেই ঠাকুরই ওঁদের ওপর বিরক্ত হয়ে নিজে এসে সব কেড়ে নিয়ে গেলেন। এ তো সেদিনের কথা—একেবারে প্রত্যক্ষ ঘটনা কিনা! এ গাঁয়ে সত্যনারায়ণ ঠাকুর কত জাগ্রত তোমরা তার কি বুঝবে! ব'লে বড়মা দেবতার উদ্দেশে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন।

ওরা চুপ হয়ে গেল। কেমন যেন ভয়ের সঙ্গে বিশ্বাস এসে মিশে গেল। খোকন ভয়ে ভয়ে

চুপি চুপি বললো, ছোড়দা আমরা যে ভাই সত্যনারায়ণ পুজোর সময় পালিয়ে ঐ বাড়ীতেই ঢুকেছিলাম, এখন কি হবে ? বেণু বললে, অজান্তে কোন দোষ হয় না। আচ্ছা বড়মা বলুন না রায়বাবুদের ব্যাপারটা কি ? বাঁশী আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলো।

বড়মা বেশ তোড়জোড় করে বসে বলতে সুরু করলেন—ঠাকুরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ওদের বংশের ভুবন রায়। প্রথম জীবনটা তাঁর নানা দুঃখ-কষ্টে কেটেছে। দু'বেলা পেট ভরে ভাতও জুটতো না। ভুবন রায়ের স্ত্রী ছিলেন রূপেগুণে যাকে বলে একেবারে দেবী-প্রতিমা। প্রত্যেক পুর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পূজা করতেন, কোনো কিছুতেই ত্রুটি হবার জো ছিল না। এমনি ছিল ভক্তি। হঠাৎ একদিন এক পুর্ণিমার রাত্রে ওদের পুজো হচ্ছিল, সেই দালানে একজন খুব বুড়ো ব্রাহ্মণ এসে হাজির হয়ে বললেন, অনেক দুর-পথ হেঁটে আসছি, রাতটার মত আমাকে এখানে আশ্রয় দাও। কর্তা তো ভেবেই অস্থির—কি খাওয়াবেন, কোথায় শোওয়াবেন, ইত্যাদি। গিন্নী তখনো উপোষ করে আছেন। কর্তাকে আড়ালে ডেকে বললেন, এই ব্রাহ্মণকে তাড়িও না, আমার মন বলছে আজ পুর্ণিমার রাত্রে আমার ঘরে সত্যনারায়ণ স্বয়ং আমাদের ছলনা করতে এসেছেন। গিন্নীর কথায় কর্তারও বিশ্বাস হ'ল। তাঁরা তো ব্রাহ্মণকে খুব আদর-যত্ন করলেন। গিন্নী চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন—

বাবা, আমাদের বড় অভাব ! বড় ছেলেটি জমিদার বাড়ীর বাবুর ছেলের সঙ্গে শিকারে গেছে আজো ফেরেনি। সকলে বলে, তাকে বাঘে খেয়েছে। সেই আমাদের একমাত্র পয়সা রোজগার করে সাহায্য করতো, সে গেলে কি হবে ! তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও বাবা ! ব্রাহ্মণ গিন্নীর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। পরদিন ভোরবেলা তখনো সূর্য উঠেনি, কর্তা-গিন্নী ব্রাহ্মণকে আর দেখতে পেলেন না—তিনি কোথায় অন্তর্ধান হয়ে গেছেন ! বেণু বললে, আচ্ছা বড়মা, ঐ ব্রাহ্মণই যে সত্যনারায়ণ ঠাকুর ওঁরা কি করে বুঝলেন ?—কেন ? তোরা বুঝি পুরাণে পড়িস নি যে, সত্যনারায়ণ এক গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বুড়ো ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এসেছিলেন, আর গরীব ব্রাহ্মণকে নিজের পুজো প্রচারের জন্য বলেছিলেন। বাঁশী বলল, তারপর কি হ'ল বড়মা ? তারপর যা হয়, দেবতা যাকে ভর করেন তার কি আর কিছু অভাব হয় ? ভুবন রায়ের ছেলে বাঘের পেটে যায়নি, জলে ডুবে গেছল—নারায়ণের কৃপায় বেঁচে উঠল। শুধু কি তাই, জমিদার খুশী হয়ে তাকে এনে একটা মহলের কর্তাই করে দিলেন—তার সঙ্গে বড় বাড়ী, টাকাকড়ি, গয়না কিছুরই অভাব রইল না। গাঁয়ের সবাই ওদের ভাগ্য ফিরে এসেছে দেখে বেশ একটু হিংসে করতে লাগল। তবে ভুবন রায়ের গিন্নীটি কিন্তু গরীব-দুঃখীকে খুব দানধ্যান করতেন, আর সত্যনারায়ণের পুজো একদিনও বন্ধ করতেন না।

এমনি করে ধনে-মানে রায়গুষ্ঠীর বার পুরুষ প্রায় কেটে গেল ! কিন্তু চিরদিন কি সমান যায় ! ক্রমে ক্রমে ওদের অবস্থা ভেঙে পড়তে লাগল। গাঁয়ের সুখ-সুবিধার দিকে জমিদার বাবুদের এতটুকু

লক্ষ্য নেই, এমনকি আর আগের মত ঘটা করে সত্যনারায়ণ পুজোও কেউ করে না। বাড়ীতে ঢুকেছে নানা অনাচার। ওদের শেষ জমিটুকুর মালিক অনাথ রায় যা কিছু সম্বল ছিল সেই সব দিয়ে পাশের গ্রামের জমিদারের সঙ্গে মামলা করলেন। অনাথ রায়ের কাছে কিছু দরকারী দলিলপত্র ছিল, সেইগুলো তিনি বাগানবাড়ীর পুজোর ঘরে রেখেছিলেন। এমনি সময়ে ঘোর অন্ধকার-পক্ষের এক ভরসন্ধ্যেবেলায়, এক ব্রাহ্মণ এসে বাগান বাড়ীতে আশ্রয় চাইলেন। অনাথবাবু ভাবলেন, আবার দেবতা এসেছেন

'মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'—পৃঃ ৩১৭

তাঁর ঘরে অতিথি হয়ে। তিনি ব্রাহ্মণকে আদর-যত্ন করে খাইয়ে বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব হয়ে গেল। অনাথ রায় দুঃখের সময় ব্রাহ্মণকে আসন্ন মামলার বিপদের কথা সবই জানালেন। ব্রাহ্মণ রায়গোষ্ঠীর অনাচারের কথা বলে তাঁকে খুব বোকলেন। একদিন শেষ রাত্রে ব্রাহ্মণকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এদিকে ব্রাহ্মণ চলে যাবার পরদিনই ঠাকুরবাড়ীর একদিকে আগুন লেগে গেল। নিশুতি রাতে কতকগুলো দুষ্টুলোক ঢুকেছিল ডাকাতি করতে; কিছু পুজোর বাসন আর ঠাকুরের গয়নাপত্র নিয়ে তারা পালিয়ে গেল। এদিকে মামলার দিন এগিয়ে এলো, অনাথ রায় সিন্দুক খুলে দেখেন, সর্বনাশ! টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি যা সম্বল ছিল, কিছুই নেই;

আর নেই সেই মহামূল্য দলিলগুলো। তিনি চিৎকার করে উঠলেন! লোকজন জমে গেল। হায় হায় কি হ'ল বলে কাঁদতে লাগলেন। শেষে শোক সামলাতে না পেরে মারা গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, সত্যনারায়ণ ঠাকুর নিজে এসে একদিন রায়গোষ্ঠীতে দয়া করেছিলেন, আবার নিজে এসে আমাদের অভিশাপ দিয়ে গেলেন, তাই তো আমার এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল। এ বাড়ীতে আর তোমরা কেউ বাস করো না—এ অভিশপ্ত বাড়ী!

বড়মা বললেন, যার উপর দেবতার কোপ হয়, তাকে কি আর কেউ রক্ষে করতে পারে। যেমন অনাচার করা—তাই তো এতবড় বংশ নষ্ট হয়ে গেল!

ওরা স্তব্ধ হয়ে এতক্ষণ সব শুনছিল—মণ্টু বলল, ঐ ব্রাহ্মণ কি টাকাকড়ি কাগজপত্র সত্যিই চুরি করে নিয়ে গেছল? ছি ছি অমন কথা মুখে এনো না বাছা—ব্রাহ্মণ কি আর সত্যি সত্যি ব্রাহ্মণ! উনি তো সেই সত্যনারায়ণ ঠাকুর, যিনি ভুবন রায়ের ছেলেকে ধনী-মানী করেছিলেন—সেই তিনিই তো আবার ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এসে শাপ দিয়ে গেলেন। সেই থেকেই তো ও বাড়ীতে কেই ঢোকে না। আর ও বাগানের আম জাম ছোঁয় না। মণ্টুর মনে কিন্তু কেমন অবিশ্বাস জাগে। মনে হয়, প্রথম ঘটনার ব্রাহ্মণ আর শেষ ঘটনার ব্রাহ্মণ, দুজনেই সাধারণ মানুষ—ব্রাহ্মণের সে রাত্রে আগমনে ওরা সমৃদ্ধশালী হয়েছিল বলে তাকে দেবতা মনে করেছিল। আর সেই সঙ্গে পুরাণের কাহিনীটিকেও সত্যি করে তুলতে চেয়েছেন। রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ করেছিল ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ—এই ব্রাহ্মণও তেমনি ছদ্মবেশে ওদের অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অনাথ রায়ের ক্ষতি করেছিল কিনা তাই বা কে জানে! মণ্টু বেচারার দুঃখ, গ্রামে এসে অমন বাগানবাড়ীটায় পিক্‌নিক্ করা গেল না আর আমও খাওয়া হ'ল না। কিন্তু উপায় কি! গুরুজনদের কথা তো অবহেলা করা উচিত নয়, তাই ওরা সবাই চুপচাপ থেকে আবার একদিন গ্রামের মায়া কাটিয়ে শহরেই ফিরে এলো॥

কেন

শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী

কারা বল তুমি আমি, কেন আসি যাই।
খোকা কেন হাসে, পুষি করে খাই-খাই।
শ্রাবণের বৃষ্টি, চামেলীর গন্ধ
বহু ভালো সৃষ্টির, বহু তার মন্দ
কোথা থেকে এলো সব—গানে তান লয়
ঘরে ঘরে সুখ-দুখ, বুকে ঘৃণা ভয়।
বাউল হয় কেন বিধু, নিধু কাজ ভোলা
কে বোঝাবে এই সব কার ছলাকলা।

বাবা কেন ভালোবাসে হাবা ছেলেটায়,
মৌমাছি ফুলে বসে, মাছি পচা ঘায়।
কেন কেউ প্রিয় হয়, কেউ হয় পর—
বৌ কেন ফুল চায়, কি রাঙা ফুলের আদর!
রূপসী মেয়ের কেন বর হয় কালো,
কারো বুকে কর্দম, কারো বুকে আলো।
কান্নার পাখি কোথা করে ঘরকন্না,
বাসা ভাঙা আশা দেয় কার দোরে ধর্না।

খুড়ো কন, ওরে হারু উত্তর পাবি তার,
মনটাকে খুঁড়ে ছ্যাখ, চাষ কর বারবার॥

কেমন জব্দ ঃঃ লেখা ঃ শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়, রেখা ঃ শ্রীঅশোক ধর

ফেরিওয়ালা লাড্ডু বেচে
পথে পথে সবায় যাচে,
ঝুড়ি রেখে পথের পাশে
ঘুমিয়ে নাশে ক্লান্তি।

হেন কালে ড্যাকরা ছুটো
তুলে নিয়ে মুঠো মুঠো,
ছুটে পালায় রাস্তা দিয়ে
লুটে বেবাক লাড্ড।

তাড়া খেয়ে লাড্ডুওয়ালার
পড়লো ঘাড়ে পাহারাওলার
মাস্তানদের চেপে টুটি—
থানায় নে যায় শেষে।

জহরকোট

শ্রীনবগোপাল সিংহ

মোটর বাইকে চলে দু বন্ধু দূর পাল্লার ধাওয়া
শীতের সন্ধ্যা, গঙ্গার ধারে চলিছে ঠাণ্ডা হাওয়া।
পেছনের জন কাঁপছে হাওয়ায়, চালক থামায়ে গাড়ী
জহরকোটটা উল্টো করিয়া পরাইলো তাড়াতাড়ি।
পেছনের দিকে বোতাম থাকলো, হাওয়া লাগছেনা বুকে,
হাসিতে-খুশীতে গল্পে ও গানে দু'জনে চলেছে সুখে।
হঠাৎ পেছনে আওয়াজ বন্ধ, বন্ধু কয়না কথা,
আগের বন্ধু পেছনে শুধায় কেন এই নীরবতা ?
তবুও নীরব, চালক পেছনে তাকায় কৌতূহলে,
বন্ধু তো নেই ! কোথায় পড়লো ?—পানি যে পায়না হালে !
পিছু হেঁটে হেঁটে বন্ধু আবার ফিরে চলে সেই পথে
ব্যাকুল নেত্রে খোঁজে বন্ধুরে, পথ চলে কোন মতে।
হঠাৎ দেখিল জনতার মাঝে বন্ধু পড়িয়া আছে,
মুখে কথা নেই, চোখ ওল্‌টানো শুধান ওদের কাছে ঃ
কিভাবে কি হলো ?—"আঘাত লাগেনি, (সাগ্রহে বলে ওরা)
মুণ্ডুটা শুধু ঘুরে গেছে দেখে সোজা করে দিছি মোরা।
তারপরে আর কইছে না কথা, দেহটাও নিশ্চল।"
বন্ধু ভাবেন, জহরকোটটা ঘোরানোরই এই ফল।

যাহার যেমন রীতি-পদ্ধতি যার যা স্বভাব, ধর্ম
ব্যতিক্রমেই আনে যে বিপদ, ইহাই ইহার মর্ম।

॥ 'সুশীল ও নিরুবালা প্রতিযোগিতা'র ফলাফল ॥

আগামী অগ্রহায়ণ মাসে 'পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও তাঁদের আবিষ্কার' সম্বন্ধে 'সুশীল ও নিরুবালা প্রতিযোগিতা'র ফলাফল প্রকাশিত হবে।

এলসেশিয়ান

শ্রীবিমল দত্ত

কুকুর, কুকুর করে মিসেস দাস পাগল হয়ে উঠলেন—"কুকুর না থাকলে বাড়ী মানায় না—দোরের গোড়ায় বাঁধা থাকবে—ঘেউ ঘেউ করে আগন্তুকের আগমন ঘোষণা করবে—তবেই তো বাড়ী!"

ঘণ্টেশ্বরবাবু মাসিক খরচার বাজেট্ করছিলেন। চমকে উঠে বললেন, "সেরেছে! তবে তো আরো এক পো করে চালের বরাদ্দ করতে হবে—এদিকে আমার বাজেট্ মিল হয়েছিল—দেখি আবার কোথায় কম করতে পারি—"

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন মিসেস দাস, "অফিস থেকে ফেরবার পথে বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে লাইফ্ রিস্ক্ না করে বরং হেঁটেই এসো—গায়ে হাওয়া লাগবে, এক্সারসাইজও হবে! সেই পয়সায় কুকুরের ভরণপোষণ হবে।

বিনা প্রতিবাদে ঘণ্টেশ্বরবাবু তখনকার মত স্ত্রীর প্রস্তাব মেনে নিলেও মনে মনে গজ্ গজ্ করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত বরানগর থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত খোঁজখবর করে একটা দোআঁশ্লা এলসেশিয়ান যোগাড় হ'ল। কিন্তু বড্ড রোগা। আর পেট গাঁড়া। প্রতিবেশীরা প্রস্তাব করলো কৃমির ওষুধ দেওয়া দরকার।

ঘণ্টেশ্বরবাবু অফিস যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। মিসেস দাস এসে হাজির হলেন।

"আজ ক'টায় ছুটি?"

আশ্চর্য হয়ে ঘণ্টেশ্বরবাবু তার দিকে তাকালেন, "কেন? রোজ যেমন, আজও তেমনি সময়ে ছুটি হবে।"

"আজ সায়েবকে বলে আধঘণ্টা আগে অফিস থেকে বেরুবে—বলবে স্ত্রীর ব্যামো। তারপর যাবে ভেটেরনারী ডাক্তারের ওখানে। ওখান থেকে ওষুধ আনবে কৃমির। বুঝলে?"

কথাটা ঠিক না বুঝে ঘণ্টেশ্বরবাবু বললেন, "কেন, এই সেদিন তো পান্তুর জন্যে কৃমিনাশিনী কিনে দিয়েছি।"

মিসেস দাস ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "পান্তুর ওষুধে কি জন্তুর রোগ সারে? কুকুরের জন্যে আলাদা ওষুধ আছে। প্রেস্‌ক্রিপসন করে ডোজ, নিয়ম সব জেনে আসবে। এলসেশিয়ান কুকুরের রক্ত তো আছে ওর মধ্যে—দামী কুকুর--কিনতে তো হয়নি! কিনলে এই য়্যাত্ত টাকা পড়্ত।"

বিনামূল্যে য়্যাত্ত টাকায় কুকুরের মালিক হওয়ার গর্ব ও সৌভাগ্য কিন্তু ঘণ্টেশ্বরবাবু তেমন মেনে নিতে পারলেন না।

কিন্তু নিরুপায় ; অফিস ফেরত ভেটেরনারী সার্জন পশুপতি গ্যাঙাজির চেম্বার থেকে ওষুধ নিয়ে সন্ধ্যে ৮টা নাগাদ বাড়ী ফিরলেন। গিন্নী দোরের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওষুধটা ছোঁ মেরে হাত থেকে নিয়ে বললেন, "এনেছো, ভাল করেছো। এইবার ঐ লালবাড়ীর পটলকে একটু ডাকো তো!"

"এখুনি ?"

"হ্যা, এখুনি—ও আবার ওদের কেলাবে চলে যাবে—ওদের বাড়ীতে এলসেশিয়ান আছে—ও সব জানে।"

—"আচ্ছা পটল ছাড়া কি আর কেউ ওষুধের ব্যবস্থা দিতে পারে না ? এই সেদিন বল ছুঁড়ে দামী সার্সির কাচ ভাঙার জন্যে তাকে ধমকেছি—আর আজই আবার যাবো তাকে খোশামোদ করতে ?"

"হয়েছে ! যাক্, তোমাকে আর যেতে হবে না ; আমি মোক্ষদা-ঝিকে দিয়ে ওকে ডাকাচ্ছি তুমি বরং এ বেলার চা'টা মোড়ের ঐ ভৈরব কেবিন থেকে খেয়ে এসো—আমার আজ একেবারে অবসর নেই—বুঝলে ?"

ঘণ্টেশ্বরবাবু একেবারে জলের মত সব বুঝে ছাতাটা ব্র্যাকেটে রেখে—পাঞ্জাবী খুলে, গেঞ্জি গায়ে চটি পায়ে সোজা 'ভয়ে ঐকার র আর ব' কেবিনে গিয়ে বেঞ্চিতে বসলেন।

জটাধারী তখুনি এক কাপ গরম চা পরিবেশন করে জিগ্যেস করলে, "বিস্কুট ?" হাত নেড়ে 'না' বলে ঘণ্টেশ্বরবাবু কান পেতে শুনতে রইলেন, তিনকড়ি আদক আর আদিতকুমার শেঠের আলোচনা···

তিনকড়ি—"ছ্যাৎ ছ্যাৎ কুকুর আবার পোষে ভদ্রলোকে ! ছোঃ ! ব্যবস্থা দেখলে আমার গা পিত্তি জ্বালা করে।"

আদিত —"তোর সখ নেই তুই বুঝবি কি ! ওসব বড়লোকদের ফ্যাসান !"

তিনকড়ি—"ঝাঁটা মারি অমন ফ্যাসানে—বাবুরা খায় কুচো চিংড়ি—দু'বেলা রুটি প্রায়দিন—কিন্তু কুকুরের জন্যে চাই—ভাত, দই, ছাগলের মাথা !"

আদিত—"তা বিলেতি কুকুরের খোরাক দিতে হবে বৈকি !"

তিনকড়ি—"মুড়ো ঝাঁটা দিতে হবে—দিশী কুকুর বিলেতি কুকুর—টাকের উপর দু'গাছি চুলের টেরি !"

ঘণ্টেশ্বরবাবু নিজের ভবিষ্যৎ যেন সম্মুখে প্রসারিত দেখলেন—অসীম জ্বালাতনের হিজিবিজি জটিল হিসাব। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বারো নয়া পয়সা দিয়ে উঠলেন। শরীর ক্লান্ত। বাড়ীর পথই ধরলেন।

ঘরে ঢুকতেই দেখেন শিস্ দিতে দিতে পট্‌লা বেরিয়ে গেল।

সারারাত মিসেস্ দাসের ঘুম নেই—আর সারারাত কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করে জ্বালাতন করল। ভোরের দিকে একটু চোখের পাতা এক করে সবে ঘণ্টেশ্বরবাবু একটা স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছেন, মিসেস্ দাস লাগালেন এক ধাক্কা—"কী যে বেলা করে ওঠার অভ্যাস!—যাও বাজার করে এসো—এই নাও থলি—আলু, কফি, মাছ, বেগুন, শাক, লেবু যেমন আনো আনবে—তবে মাংসের দোকান থেকে পাঁঠার মাথা আনবে খানিকটা—ওরা কেটেকুটে দেবে—পয়সায় না কুলোলে আমাদের জন্ম বরং কুচো চিংড়ি এনো; পান্তু কুচো চিংড়ি খেতে বড্ড ভালবাসে।"

ঘণ্টেশ্বরবাবু চোখ কচলাতে কচলাতে বললেন, "চায়ের দেরি কত?"

মিসেস্ দাস ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "চা তো ভৈরব কেবিনে পাওয়া যায়—যাবার সময় খেয়ে নিও আর ফেরবার পথে কাঠের গোলার কান্তরাম মিস্ত্রীকে খবর দিয়ে যাবে—যেন আমার সঙ্গে দেখা করে—কুকুরটার জন্যে একটা ঘর তৈরী করতে হবে।"

ঘণ্টেশ্বরবাবু বুঝলেন এখন মিসেস্ দাস এলসেশিয়েনের স্বপ্নে বুঁদ। যখন যা মাথায় চাপে ছাড়ানো দায়—বচসা সুরু হলেই তো ফিট হবে—নয়ত বলবে, "যে দিকে দু' চোখ যায় চলে যাবো"—এরকম লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা সাজে না। কাজেই ঘণ্টেশ্বরবাবু বাজার-মুখো চললেন।...

বাজার করে ফিরে দেখেন মিসেস্ দাস গাছ-কোমর বেঁধে বাঁ হাতে জলের বালতি ও ডান হাতে ঝাঁটা নিয়ে সারা বাড়ী পরিষ্কার করছেন। ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় গেল। এলসেশিয়ান পুঙ্গব ক্রিমির ওষুধ খেয়ে সারা বাড়ী সক্রিমি নোংরা ফেলে এক বীভৎস ব্যাপার করে তুলেছে।...

অফিসে যাবার সময় হয়েছিল—তেল মাখতে যাবেন ঘণ্টেশ্বরবাবু, এমন সময় পান্তু এসে বললে, "বাবা, তেল-হাত করবার আগে সাঁইত্রিশ টাকা কান্তরাম মিস্ত্রীকে দিয়ে দাও, মা বল্লে, এলসেশিয়ানের জন্যে কাঠের ঘর হবে..."

ঘণ্টেশ্বরবাবু চোখ সুপুরির মত করে বললেন, "সাঁইত্রিশ টাকার কাঠ? মেহগনী কাঠের ঘর হবে নাকি রে?"

মিসেস্ দাস সশরীরে হাজির হলেন—"চাকুন্দ কাঠ—কাঠের দাম যে বেজায়—আমি অত বোকা নই—নেহাৎ বাজে কাঠেরই ঘর করাচ্ছি, ভেবো না—দিয়ে দাও—কুকুরটা ঘুমিয়ে বাঁচুক"—বলে এক গাল হেসে ঘণ্টেশ্বরবাবুকে একেবারে নীরব করে টাকা আদায় করে চলে গেলেন।

এক খাবলা তেল গায়ে ধেবড়ে ঘণ্টেশ্বরবাবু অর্ধস্ফুট স্বরে শুধু বললেন, "রীতিমত বর্গীর জুলুম!"

চান করে আসতেই আবার পান্তুর আবির্ভাব। "বাবা, মা বললেন যে আজ ক্যানটিনে খাওয়াটা সেরে নিয়ো—নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে মা এখনও উনুনে আগুন দিতে পারেন নি!"

ট্রামে যখন বাদুড়ের মত ঝুলছেন তখন ঘণ্টেশ্বরবাবু মনে হ'ল, "না জানি কপালে এখনো কত দুঃখু আছে!"

ক্যানটিনে প্রায় পাঁচ-ছ টাকা খেয়ে তবে ঘণ্টেশ্বরবাবুর খিদে মিট্‌ল। তবুও অনভ্যাসে গলা বুক জ্বালা করতে লাগল। ঘনঘন জল খেতে লাগলেন।

হঠাৎ চাপরাসি এসে জানাল যে তাঁর ফোন এসেছে। ফোন? এমন সময়ে ফোন কে করবে? দুরুদুরু বক্ষে ঘণ্টেশ্বরবাবু ফোন ধরলেন, "কে? পান্তু? তুই কোথা থেকে ফোন করছিস? কি বললি পটলদের বাড়ী থেকে? কি ব্যাপার? য়্যাঁ?...উপায়?...আমি যাচ্ছি... তুই বাড়ী যা...হ্যাঁ হ্যাঁ এখুনি যাচ্ছি।" ঘণ্টেশ্বরবাবুকে বড়বাবুর কাছে যেতে হ'ল তখুনি।

"কি ব্যাপার, ঘন্টিবাবু?" মাদ্রাজী সাহেব প্রশ্ন করলেন।

ঘন্টিবাবু তখন সবিনয়ে জানালেন যে, "তাঁর স্ত্রীকে কুকুরে কামড়েছে—তাঁকে এখুনি বাড়ী যেতে হবে!"

মাদ্রাজী সাহেব প্রশ্ন করে এলসেশিয়েনের সব খবর শুনে হেসে বললেন, "ও কিছু না। বাড়ী যান—একজন ডাক্তার দেখান—তবে ও কুকুর বাড়ীতে রাখবেন না—ও কুকুর বড় খারাপ আছে।..."

ঘেমে নেয়ে ঘণ্টেশ্বরবাবু বাড়ীতে এসে দেখেন, পাড়াপড়শী কেউ আর আসতে বাকী নেই—ঘুঘুডাঙার মাসী, ট্যাংরার পিসী, এঁড়েদার ছোট্ট ঠাকুর্দা, বাগুইআটির জামাইবাবু—বাড়ী সগরম।

নতুন তৈরী কাঠের ঘরে বাচ্চা কুকুরটা গোংরাচ্ছে আর কাঠে আঁচড় কাটছে।

পান্তু ছুটে এল, "বাবা এসেছো? চলো মা'র কাছে—মা কেমন হয়ে গেছে..." ধড়াস্ করে উঠল ঘণ্টেশ্বরবাবুর বুক। পরক্ষণেই মনে হ'ল স্ত্রীর কথা—একটুতেই বড় কাতর হয়ে পড়েন।

ঘণ্টেশ্বরবাবু ঘরে ঢুকতেই ঘর থেকে প্রায় চল্লিশজন নরনারী—বেরিয়ে এলেন। মেঝেতে শুয়ে আছেন মিসেস্ দাস—হাতের দু' জায়গায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা—নীলমণি ডাক্তার সিরিঞ্জে ইনজেকসন্ ভরছেন।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন ঘণ্টেশ্বরবাবু। স্ত্রীর মাথার কাছে ধপ্ করে বসে পড়লেন তিনি। ডাক্তার হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, "ভয় নেই কিছু—তিন দিনে ন'টা ইনজেকসন্ নিতে হবে—ঘাবড়াবার কিছু নেই।"

মিসেস্ দাস স্বামীকে দেখে চোখ তুলে তাকিয়ে ভাঁক্ করে কেঁদে উঠলেন, "ওগো, আমি আর বাঁচব না—তুমি কুকুরটাকে বিদেয় কর--"

মিসেস্ দাস আড়-চোখে ডাক্তারের ইয়া বড় ইন্‌জেকসনের ছুঁচটার দিকে তাকিয়ে আবার কেঁদে উঠলেন, "ন'টা ইন্‌জেকসন নিলে আমি কিছুতেই বাঁচবো না—তুমি, এখুনি. কুকুরটাকে বিদেয় কর—ওর ভ্যাকভ্যাকানি শুনলে আমার জ্বর আসছে!"

'ন'টা ইন্‌জেকসন নিলে আমি কিছুতেই বাঁচব না-- তুমি এখুনি কুকুরটাকে বিদেয় কর।'

সাতদিন কুকুরটাকে নজরে নজরে রাখা হ'ল। সে ক্ষেপ্‌ল না। এদিকে অন্য একজন স্পেশালিষ্টকেও দেখান হ'ল। তিনটে ইন্‌জেকসনই যথেষ্ট—বলে তিনি মত দিলেন।···

মিসেস্ দাস ভাল হয়ে উঠলেন দু' দিনেই। সাত দিন কেটে গেল অনিদ্রায়। কুকুরটা সাত দিন অনবরত নানা সুরে ডেকে সকলের কান মাথা ঝালাপালা করে দিল।

আট দিনের দিন একটা ছেঁড়া বস্তায় ভরে ঘণ্টেশ্বরবাবু ভোরবেলা একটা রিক্সা করে নারকেলডাঙার খালের ধারে কুকুরটিকে ছেড়ে দিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে বাড়ী ফিরলেন।

ফিরেই দেখেন, মিসেস্ দাস চাঁদনী থেকে কেনা বড় সাইজের পেয়ালা-পিরিচ হাতে গরম চা করে তাঁর জন্যে বসে আছেন।

সেই থেকে মিসেস দাসের বাড়ীতে আর কুকুর ঢোকেনি। কুকুরের ঘরটি আছে—তাতে ঘুঁটে রাখা হয়।

ঘণ্টেশ্বরবাবুর বাজেট প্রতি মাসে মিল হয়। তিনি বড় আরামে আছেন।

দুটি ছড়া

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ এক ॥

কালীচরণ পাকড়াশী
বুল সাহেবের চাপরাশি
সাহেব যাবেন বিলেতে
চাকরি নিয়ে মিল-এতে
কালীও কোমর বাঁধছে
বউ বেচারা কাঁদছে
লক্ষ্মী সোনা কাঁদে না
যাচ্ছি আমি চাঁদে না।

করিসনা মুখ থমথমে
ছুটলো কালী দমদমে
দুলছে প্লেন হাওয়াতে
পোঁটলা রেখে দাওয়াতে
বসলো কালী জাঁকিয়ে
ফাঁপানো চুল ঝাঁকিয়ে
হঠাৎ পাশে তাকিয়ে
উঠলো কালী ককিয়ে।

॥ দুই ॥

রাজার ব্যামো রাজ্যে সবাই ভাবনাতে হিমসিম
বদ্যি বলে ভাবনা কি ? আন্ হাটিম-টিমের ডিম।
মেঘ-পাহাড়ের টাটকা বরফ তিন কিলো আন্ পুরো,
নষ্ট চাঁদের ছাই নিয়ে আয়, বাসি রোদের গুঁড়ো।
দিনের আলো রাতের আঁধার এদের সাথে বেটে
-টে খেলেই রাজা মশায় ফের বেড়াবেন হেঁটে।

ভূতপেত্নীর মাঠে

শ্রীরথীন সরকার

রাতের বেলায় মাঠটি হলে ফাঁকা—
মামদো ভূতের খুড়তুতো এক কাকা
হাসতো সেথা, কাঁদতো সেথা, গান গাইতো হেঁড়ে ;
তাই না শুনে অন্য ভূতে বলতো —বেড়ে—বেড়ে !
স্কন্ধকাটা, শাঁখচুন্নি, ব্রহ্মদত্যি কতো—
একে একে সবাই জড়ো হতো ।

তার পরেতেই উঠতো সরগোল,
শাঁখচুন্নি সেতার বাজায় মামদো ভূতে ঢোল ।
হঠাৎ একদিন—
খ্যাংরা ভূত নাচছিলো ধিন্ ধিন্ ।
এমন সময়-তিন বেহারার পাল্কি মাঠে দেখে,

মামদো ভূত বললো তাদের হেঁকে ঃ
কোন্ নবাবের পুত্তুর যায়, পাল্কিতে তুই কে ?
উত্তর দে নইলে ঘাড় মট্‌কে খাবো যে ।
ভয়ে ভয়ে ভেতর থেকে এবার নাকি স্বুর
বললে ঃ আমি শাঁখচুন্নির হই যে শ্বশুর ।

তাই না শুনে ব্রহ্মদত্যির সেকি বিষম হাসি,
কাশতে গিয়ে পা ভাঙলে স্কন্ধকাটার মাসী ।
অনেক রাতে মাঠ হলে ফাঁকা—
মামদো ভূতের খুড়তুতো এক কাকা
হঠাৎ হাঁকলে ঃ হেই—হেই—হেই—হেই—
থামা তোরা নাচন ধেই ধেই ।

টপ সিক্রেট

বিক্রমাদিত্য

নাম : ইগর্ গুজেনকো।

পেশা : আমি হলুম অটোয়াতে অবস্থিত সোভিয়েত এম্বাসীর সাইফার ক্লার্ক।

সময় : অটোয়া—সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আমার কাজ হলো কোর্ড টেলীগ্রামে টপ সিক্রেট খবরাখবর মস্কোতে পাঠানো।

এই যে কানাডা সরকার দেখছেন, এই সরকারের প্রতি স্তরে স্তরে আমাদের চর কাজ করছে। এদের আর এক নাম হলো স্পাই। এরা অতি গোপনে কাজ করেন আর প্রতিদিন টাটকা খবর এনে আমাদের এম্বাসীর বড়ো কর্তাদের দেন। আমি সেই খবরাখবর মস্কোতে পাঠাই।

কিন্তু এই বিশ্রী নোংরা কাজ আমি আর করতে চাইনে। সোভিয়েত সরকারের প্রতি আমার আর বিশ্বাস নেই। ওদের হাত থেকে আমি মুক্তি চাই।

—তাই একদিন, আমার স্ত্রী আনা ও আমি ঠিক করলুম যে, সোভিয়েত কর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা কানাডা সরকারের কাছে আশ্রয় চাইবো। স্পাই-এর ভাষায় বলতে পারেন আমরা হবো ডিফেক্টর।

কিন্তু সোভিয়েত সরকারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া এবং ডিফেক্ট করা চাট্টিখানি কথা নয়। আগেই বলেছি আমি ছিলুম সাইফার ক্লার্ক। কাজেই এম্বাসীর বড়ো কর্তারা আমার প্রতি তীক্ষ্ণ নজরে রাখেন। বলতে পারেন, আমার ব্যক্তিগত কোন স্বাধীনতা নেই। তাইতো আমি এই বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি চাইছি।

এবার আমার গল্প শুনন :

একদিন খবর পেলুম যে আমার সহকর্মী কুলাকভই ভবিষ্যতে এই সাইফার ক্লার্কের কাজ করবেন। আমার কাজ হবে তাঁর কাজ তদ্বির-তদারগ করা। মস্কোতে আমার ফেরবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

বুঝতে পারলুম আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। একবার মস্কোতে ফিরে গেলে আর কখনই সোভিয়েত সরকারের হাত থেকে রেহাই পাবো না, পালাতে পারব না। অতএব যেমন করেই হোক আমাকে পালাবার পথ বার করতে হবে।

সে দিনটা আমার আজও মনে আছে। পাঁচই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। খবর পেয়েছিলুম যে, এন কে ভি ডি'র (nkvd) সোভিয়েত সিক্রেট পুলিশ বাহিনীর পুরানো নাম। কর্তারা আমার উপর নজর রাখছেন। অর্থাৎ আমি কী করি না করি সবই এরা নজর করছেন। হয়তো ওদের

মনে সন্দেহ জেগেছে, যে আমি এদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো। তাই আমার মস্কোতে বদলীর হুকুম এসেছে।

আজ আমি ঠিক করলুম যে কিছু বিশেষ গোপনীয়, আপনারা যাকে বলেন 'টপ সিক্রেট' কাগজ চুরি করবো। আর এই সব কাগজ কানাডা সরকারের হাতে তুলে দেবো। এই কাগজে বহু মূল্যবান খবরাখবর আছে। সম্প্রতি আমাদের কিছু স্পাই 'এ্যাটম' বোমার সিক্রেট চুরি করবার চেষ্টা করছিলো। সেই সংক্রান্ত কিছু জরুরী কাগজ আমি চুরি করবো।

আজকের দিনে এই সব গোপনীয় কাগজ চুরি করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কুলাকভের রাত্রিবেলা ডিউটি ছিলো। আমি জানতুম যে কুলাকভ পরের দিন দুপুরে বারোটার আগে ডিউটিতে আসবে না। অতএব কোন গোপনীয় কাগজ খোয়া গেলে দুপুর বারোটার আগে কারু নজরে পড়বে না। শুধু তাই নয়, এন কে ভি ডি'র কর্তা কর্নেল জাবোটীন আজ রাত্রে সিনেমা দেখতে যাবেন। কর্নেল জাবোটীনের কাজ হলো আমাদের উপর নজর রাখা।

আমি ঠিক করলুম যে প্রথমে মিলিটারী এটাচীর দপ্তরে যাবো। ঐ দপ্তরে খানিকটা কাজ শেষ করে এম্বাসীতে যাবো। গোপন কাগজপত্রাদি সবই এম্বাসীতে আছে। আমি ছিলুম এম্বাসীর অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী। তাই আমি দিন-দুপুরে যে কোন সময়ে এম্বাসীতে যেতে পারতুম। কেউ আমাকে কক্ষনো কোন প্রশ্ন করতো না। আজকে রাত্রের এই কাগজ চুরির প্ল্যান আমি বহুদিন থেকেই করেছিলুম।

মিলিটারী এটাচীর দপ্তরে এলুম।

দেখতে পেলুম কুলাকভ কাজ করছে। কুলাকভকে কাজ করতে দেখে আমার মনটা খুশীতে ভরে উঠলো। যদি কুলাকভ কাজে না আসতো, তাহলে আমাকে রাত্রের ডিউটি করতে হতো।

আমাদের দপ্তরের সিকিউরিটী গার্ড ক্যাপ্টেন গালাকন আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: গুজেনকো সিনেমায় যাবে?

কোন্ সিনেমায়? আমার এই প্রশ্নে খানিকটা কৌতূহল ছিলো।

ক্যাপ্টেন গালকিন সিনেমার নাম করলেন।

যাক মিলিটারী এটাচীর দপ্তর ত্যাগ করার একটা মৌকা মিলে গেলো। আমি তো আর কাজ করতে আসিনি। শুধুমাত্র দেখতে এসেছিলুম, কুলাকভ কাজ করতে এসেছে কিনা। কারণ কুলাকভ ডিউটিতে না থাকলে আমার চুরি করতে অসুবিধা হবে।

আমি ক্যাপ্টেন গালকিনের প্রস্তাবে সায় দিলুম। এম্বাসীর আরো দু' একজন আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা জোট বেধে সিনেমাতে গেলুম।

কিন্তু সিনেমাতে গিয়ে আমি সবাইকে বললুম : পুরানো ছবি, আমি দেখেছি। তোমরা যাও।

ওরা সিনেমাতে গেলো। আমি এম্বাসীতে ফিরে এলুম।

গেটম্যানের কাছে হাজিরার খাতা ছিলো। খাতায় নিজের নাম সই করলুম। নাম সই করবার পর দেখতে পেলুম কানাডাতে এন কে ভি ভি'র বড়ো কর্তা ভিটালী পাভলভকে। পাভলভকে আমি ভয় করতুম। আমি জানতুম যে ওর হাত থেকে সহজে রেহাই পাবো না। কিন্তু আমার ভাগ্যি ভালো ছিলো। পাভলভ আমাকে দেখতে পেলো না। আমি ওর দৃষ্টি এড়িয়ে সিক্রেট-রুমে গেলুম।

কমার্শিয়াল এটাচীর সাইফার ক্লার্ক রিয়াজনভ আমাকে দেখে লোহার দরজা খুলে দিলে। রিয়াজনভকে একা দেখে আমি খুশী হলুম।

: অনেক রাত অবধি কাজ করবে? রিয়াজনভ আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

: দু'তিনটে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। রাত্রি সাড়ে আটটার মধ্যে আমাকে দপ্তর ছাড়তে হবে। সিনেমাতে যাবো।

এবার আমি সাইফার রুমে ঢুকলুম।

প্রথমেই জাবোটীনের ড্রয়ার খুললুম। ঐ ড্রয়ারের চাবি আমার কাছে ছিলো।

আমাদের সাইফারের সমস্ত কাজকর্মের তদ্বির-তদারগ করতেন জাবোটীন। ওর কাছেই সমস্ত টপ সিক্রেট কাগজ থাকতো। আমি এই সমস্ত মূল্যবান কাগজ সার্টের ভেতর ভরলুম। তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। না, আমি যে এতো কাগজ সার্টের ভেতর পুরেছি এ কিন্তু কারো নজরে পড়বে না।

আজ রাত্রে একটি ছোট টেলিগ্রাম এনকোড করলুম। খবরটি মূল্যবান ছিলো। এমা ভইকিন বলে এক ভদ্রমহিলা কানাডার পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করতেন। ভদ্র মহিলা আমাদের কিছু জরুরী খবর দিয়েছিলেন। আজ আমি সেই খবরই মস্কোতে পাঠালুম। একটা কথা বলে রাখি, আমি সোভিয়েত এম্বাসী ত্যাগ করার পর ভদ্র মহিলার স্পাইং-এর অপরাধে তিন বছর জেল হয়। কাজ শেষ করে টেলিগ্রামটি রিয়াজনভের হাতে দিলুম। বললুম, টেলিগ্রামটি মস্কোতে পাঠাতে হবে।

তারপর আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রিয়াজনভের পানে তাকালুম। রিয়াজনভ আজ আমাকে কোন সন্দেহ করলো না। আমার সার্টের ভেতর যে গোপনীয় কাগজ আছে তা দেখতে পায়নি। বুক থেকে এক দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেলো। তারপর আমার চিন্তা হলো পাভলভকে নিয়ে।

রিয়াজনভকে যতো সহজে ফাঁকি দিতে পেরেছি, পাভলভকে ধোঁকা দিতে পারব না। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো ছিলো। নীচে গিয়ে দেখলুম যে পাভলভ চলে গেছে।

এবার আমার ভাবনা হলো এই দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য, টপ সিক্রেট কাগজ নিয়ে কোথায় যাই। আমি তো স্পাই নই। কাজেই কার কাছে এর কদর বেশী হবে জানি না। তাই প্রথমে গেলুম 'অটোয়া জার্নাল' খবরের কাগজের দপ্তরে।

এডিটার কোথায়?

নীচের একটা লোক বললো: ছ'তলায় যান।

'একটি মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো: হ্যালো কি খবর?'

কিন্তু এডিটারের ঘরে গিয়ে দেখলুম কেউ নেই। আজ শনিবার। এডিটার দপ্তরে নেই। আমার বুক কাঁপতে লাগলো। উত্তেজনায় নয়, ভয়ে। এবার এই সব মূল্যবান কাগজগুলো নিয়ে কি করি।

হঠাৎ একটি মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো: হ্যালো কী খবর? তোমাদের এম্বাসীর কী নতুন খবর আছে?

সর্বনাশ, তাহলে কী আমাকে এরা চিনতে পেরেছে। মেয়েটির প্রশ্ন শুনে আমার মুখ শুকিয়ে গেলো। আমার মনের চাঞ্চল্য দেখে মেয়েটি আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো: কী ব্যাপার?

আমি মৃদু কণ্ঠে দু' একটা কথা বললুম। বললুম, ভুল করে এই দপ্তরে এসেছি।

আমি 'অটোয়া জার্নাল' খবরের কাগজের দপ্তর থেকে বেরিয়ে এলুম। এবার কোথায় যাই?

শুকনো মুখ নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলুম। আনাকে সব কথা খুলে বললুম। বললুম : এবার কী করি ?

: চলো আবার 'অটোয়া জার্নাল' খবরের কাগজে ফিরে যাই ? আনা বললো।

: আবার ? আমি বিস্মিতকণ্ঠে বললুম।

আনা এবার তার ব্যাগে টপ সিক্রেট কাগজগুলো ঢুকালো। আমরা আবার 'অটোয়া জার্নাল' খবরের কাগজের অফিসে ফিরে এলুম।

এডিটারের সঙ্গে দেখা করতে চাই ?

অফিস-বয় গতানুগতিক জবাব দিলো। বললো, বাড়ী চলে গেছেন।

বললুম : আর কারো সঙ্গে দেখা করতে পারি কী? এই কথা বলতে আমার বুক কাঁপছিলো।

এক বুড়ো সহকারী সম্পাদক বসে কাজ করছিলো। এবার তার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললুম। টপ সিক্রেট কাগজগুলো দেখালুম। বুড়ো লোকটি কাগজগুলো নেড়েচেড়ে বললো : সরি, এ কাগজগুলো রাশিয়ান ভাষায়। আমি এর বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছি না। এ কাগজ দিয়ে আমরা কিছুই করতে পারব না। আপনি পুলিশের কাছে যান।

পুলিশ ! এই কথা শুনে আমি যেন পাগল হয়ে গেলুম। প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে মূল্যবান একটি জীবন বলে মনে হলো। হয়তো এতোক্ষণে এন কে ভি ডি'র গুপ্তচরেরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি বুড়ো ভদ্রলোককে সব কথা খুলে বললুম। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখে একই কথা। সরি, আমি কিছুই করতে পারব না। আপনি পুলিশের কাছে যান।

এবার পুলিশের দপ্তরে গিয়ে ধর্না দিলুম। ওদের কাছে গিয়ে বললুম যে, আমি পুলিশ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সরি, রাত বারোটা বাজে। এই সময়ে আপনি কারু দেখা পাবেন না। কাল সকালে আসবেন—এক পুলিশ কর্মচারী আমাকে বললো।

: দেখুন, আমার কাজটা অতি জরুরী এবং গোপনীয়। আমি আজই মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

: সরি, আজ রাত্রে কোন কিছু করাই অসম্ভব। প্রতি লোকের মুখে 'সরি' কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেলো। আমি বিরক্তি বোধ করলুম। নিরাশ হৃদয়ে আমি বাড়ী ফিরে এলুম। ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। আমার পেছনে হয়তো সোভিয়েত পুলিশের গুপ্তচর ঘুরতে সুরু করেছে।

কিন্তু আনা আমার মতো মুষড়ে পড়লো না।

বললো : আবার কাল সকালে চেষ্টা করে দেখা যাবে।

কিন্তু সেই রাত্রে আমার ভালো ঘুম হলো না। আনা ও আন্দ্রেই ঘুমলো। আমি প্রায় জেগেই রইলুম। আমার মস্ত বড়ো দুশ্চিন্তা এবার কী করি, এতো মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র নিয়ে কোথায় যাই—আজ বাজারে কেউ এই কাগজ নিতে চাইছে না। এই কাগজের কোন দরকার নেই। পরদিন গেলুম ফরেন রেজিষ্ট্রেশন দপ্তরে। এইখানে বিদেশীদের কানাডিয়ান সিটিজেনশিপের জন্যে আবেদন করতে হয়।

বললুম: আমি কানাডিয়ান সিটিজেনশিপ চাই। ক'দিন লাগবে এই সিটিজেনশিপ পেতে?

: প্রায় একমাস। ছোট্ট জবাব এলো।

সর্বনাশ। এতোদিন আমি কী করবো। যদি কানাডিয়ান সরকার আমাকে ঠাঁই না দেয়, তাহলে আমাকে মস্কোর ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হবে। ডিফেকশনের শাস্তি হবে মৃত্যু।

কিন্তু ফরেন রেজিষ্ট্রেশনের এক বুড়ী ভদ্রমহিলা আমাদের প্রতি দয়া করলেন। আমাদের কথা শুনে বললেন: আমি তোমাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। তোমাদের এই মূল্যবান কাগজ সংবাদপত্রে প্রকাশ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ভদ্রমহিলা তার পরিচিত এক সাংবাদিককে টেলিফোন করলেন।

খানিকবাদে এক রিপোর্টার ছুটে এলো।

আমি মূল্যবান কাগজগুলোর খানিকটা অনুবাদ করে ওকে শোনালুম। কিন্তু রিপোর্টার আমাদের কাহিনী শুনে বললেন: অসম্ভব! এই ধরনের কাহিনী আমার পক্ষে প্রকাশ করা একেবারেই সম্ভব নয়। আপনারা গভর্ণমেণ্টের কাছে যান।

দুঃখে আনার চোখ দিয়ে জল বেয়ে পড়তে লাগলো।

আবার পুলিশ মন্ত্রীর দপ্তরে হানা দিলুম।

বললুম: আমার কাছে কতোগুলো মূল্যবান জরুরী কাগজ আছে। আমি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মন্ত্রীর সেক্রেটারী আমার সঙ্গে দু'চারটা কথা বলে ভেতরে চলে গেলেন। তারপর খানিক-বাদে ফিরে এসে বললেন: মন্ত্রী পার্লামেণ্টে গেছেন। আমার সঙ্গে পার্লামেণ্টে ওঁর দপ্তরে আসুন।

গেলুম পার্লামেণ্টে পুলিশ মন্ত্রীর দপ্তরে। সেক্রেটারী ভেতরে গিয়ে পুলিশ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, সরি, মন্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

আবার গেলুম সংবাদপত্রের দপ্তরে। কিন্তু আমার এই মূল্যবান কাগজ আজ কেউ চায় না। কেউ জানে না আমার এই কাগজের ভেতর কতো গোপন রহস্য লুকানো আছে।

বাড়ীতে ফিরে এলুম। আনা ও আমি পৃথক ভাবে। কাগজগুলো আনার কাছে রাখলুম। যদি আমি ধরা পড়ি তাহলে কাগজগুলো নিয়ে আনা পালাতে পারবে।

গভীর দুশ্চিন্তায় আমার শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। আমি ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিলুম। কিন্তু চিন্তা-ভাবনায় আমার ঘুম এলো না।

হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালুম। হয়তো সোভিয়েত পুলিশ আমার উপর নজর রাখছে।

আমার অনুমান মিথ্যে নয়।

আমার বাড়ীর অপর প্রান্তের পার্কে দু'টি লোক বসে বার বার আমার বাড়ীর পানে তাকাচ্ছিলো। ওরা যে গুপ্তচর তা'তে আমার সন্দেহ রইলো না। এবার আমার মৃত্যু অনিবার্য। আমার মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

আনা পাশের ফ্ল্যাটে ছিলো। আন্দ্রেই আনার কাছে চলে গেলো। আমি একাই ঘরে বসে রইলুম।

হঠাৎ সিড়িতে তিন-চারজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। তারপর দরজায় ধাক্কার শব্দ। গুজেনকো? বুঝতে পারলুম, এ হলো জাবোটীনের ড্রাইভারের গলা।

কিন্তু আমি কোন জবাব দিলুম না। ড্রাইভার খানিকক্ষণ ধরে আমাকে ডেকে চলে গেলো।

সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। এবার আমি মরীয়া হয়ে উঠলুম। আমাকে জীবন বাঁচাবার জন্যে দুঃসাহসিক একটা কিছু করতেই হবে।

আমার পাশের ফ্ল্যাটে রয়াল কেনাডিয়ান এয়ারফোর্সের সার্জেন্ট ম্যান থাকেন।

আমি সার্জেন্ট ম্যানের কাছে গেলুম। ওর কাছে সব কথা খুলে বললুম। বললুম: আমার জীবনের আশংকা করছি। হয়তো এন কে ভি ডি'র পুলিশ আমাকে আক্রমণ করবে।

সার্জেন্ট ম্যান আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন। তারপর বললেন, গুজেনকো তোমার বউ ও ছেলেকে নিয়ে এসো। আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি।

আমি নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গেলুম। আনা ও আন্দ্রেই তখন মিসেস এলিয়টের সঙ্গে কথা বলছেন। মিসেস এলিয়ট হলো আমাদের প্রতিবেশী।

মিসেস এলিয়ট বললেন: ইচ্ছে করলে তোমরা আমার সঙ্গেও থাকতে পারো।

ইতিমধ্যে সার্জেন্ট ম্যান দু'জন পুলিশ কনেষ্টবল নিয়ে এলো।

ওরা আমাকে খানিকক্ষণ জেরা করলো। তারপর আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললো: গুজেনকো ভয় পেও না। আমরা তোমার ধারেকাছেই থাকবো। দরকার হলে আমাদের ইশারা দিও। আমরা তক্ষুনি চলে আসবো।

আমরা ঠিক করলুম সেই রাত্রে মিসেস এলিয়েটের বাড়ীতে থাকবো।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমার ঘরে আবার দরজা ধাক্কার আওয়াজ শুনতে পেলুম।

এম্বাসীর কর্তারা আমার সন্ধানে এসেছেন। পাভলব, রজোভ, আঙ্গেলভ ও পাভলভের সাইফার ক্লার্ক।

: গুজেনকো! ওরা সবাই আমার নাম ধরে ডাকতে লাগলো।

এবার সার্জেন্ট ম্যান দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

: কাকে চাই ?

: গুজেনকোর সন্ধানে এসেছি।

: গুজেনকোরা চলে গেছে। সার্জেন্ট ম্যান জবাব দিলেন।

পাভলভ ও তার বন্ধুরা চলে গেলো। কিন্তু খানিকবাদে ওরা আবার ফিরে এলো।

পাভলভ আমার দরজা ভাঙবার চেষ্টা করলো। আমি এবার পুলিশ কনেষ্টবলদের ইশারা করলুম। দু'জন পুলিশ কনেষ্টবল সার্জেন্ট ওয়ালশ ও কনেষ্টবল ম্যাককুলক আমার ইশারা শুনে চলে এলো।

পুলিশ কনেষ্টবল পাভলভকে পাকড়াও করে বললো : তোমরা দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছো।

: এই বাড়ী হলো সোভিয়েট এম্বাসীর এক কর্মচারীর বাড়ী। সেই কর্মচারী এই বাড়ীতে এম্বাসীর কিছু মূল্যবান কাগজ রেখে গেছে। আমরা সেই কাগজগুলো সংগ্রহ করতে এসেছি।

: কোন বাড়ীর তালা ভাঙ্গা বেআইনী। পুলিশ কনেষ্টবল ওয়ালশ বললো।

: এই বাড়ীর জিনিসপত্র সোভিয়েত এম্বাসীর সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি নিয়ে আমারা যা খুশী তাই করতে পারি। কেনাডিয়ান সরকারের এই ব্যাপারে বলবার কোন অধিকার নেই। পাভলভ রুক্ষস্বরে বললো।

: তোমাদের আইডেন্টি কার্ড দেখতে চাই। সার্জেন্ট ম্যাককুলক বললো।

পাভলভ এবার রাগে গজরাতে লাগলো। বললো : আমি হলুম ডিপ্লোম্যাট। আমাকে অপমান করবার কোন অধিকারই তোমাদের নেই।

: বেশ আমাদের ইন্‌সপেক্টর না আসা পর্যন্ত আমরা তোমাকে কিছুই করতে দেবো না। ওয়ালশ বললো।

শেষ রাত্রির দিকে ইন্‌সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড এলেন। খানিকক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর পভলভ ও তার সঙ্গীরা ফিরে গেলো।

ভোরবেলা কেনাডিয়ান পুলিশ দপ্তরের কর্মচারীরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

আমি পুলিশ দপ্তরে গেলুম। আনা মিসেস এলিয়টের সঙ্গে রইলেন।

পুলিশ দপ্তরে সারাটা দিন ধরে আমাকে নানান ধরনের জেরা ও প্রশ্ন করা হলো। এবার আমার কাহিনীর সবই পুলিশের কর্তাদের কাছে খুলে বললুম। আমি যে প্রথম রাত্রিতে পুলিশের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাইনি সেই কথাও লুকলুম না।

পরে শুনতে পেলুম যে, আমি দ্বিতীয় দিনে যখন পুলিশ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম, তখন কেনাডিয়ান সরকার আমাকে নিয়ে কী করা যায় এই নিয়ে গবেষণা করছিলেন। পুলিশ মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেছিলেন। প্রধান মন্ত্রী হুকুম দিলেন যে, আমার পেছনে সদা-সর্বদাই কেনাডিয়ান পুলিশ ঘুরবে, যাতে কেউ আমার কোন অনিষ্ট না করতে পারে।

আমার এই মূল্যবান ডকুমেণ্টগুলি কী শুনতে চাও? এই ডকুমেণ্টের ভেতর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্পাই ক্লার্ডস ফুকস্, জুলিয়াস রজেনবার্গ, গ্রীণ্ গ্লাসের পুরো কীর্তিকলাপ লেখা ছিলো। আমার এই মূল্যবান ডকুমেণ্ট না পড়লে কেউই জানতে পারতো না যে, এরা সবাই ছিলেন সোভিয়েত স্পাই।

সেই হাসি

শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম

ফুল বাগানে লুকিয়ে পুপু
পাচ্ছে না কেউ সাড়া!
ছোড়দি তাকে খুঁজতে খুঁজতে
বেড়িয়ে এলো পাড়া।
লুকিয়ে এ সব দেখেই পুপু
ফিক্-ফিকিয়ে হাসে।
ফুলগুলি সব পাল্লা দিয়ে
হাসছে পুপুর পাশে!

সেই হাসি যেই ছাপিয়ে বাগান
ভরিয়ে দিলো পাড়া,
ছোড়দি তখন ফুল বাগানে
পুপুর পেলো সাড়া!
ফুল বাগানে আজকে পুপু
ফুলের পাশে ফুল!
ছোড়দিদি তা ভেবেই বুঝি
পায়না হেসে কুল!

গর্বিতা মা

জলযানের ইতিবৃত্ত

সুখরঞ্জন রায়

আদিম মানুষ প্রথম সাঁতার কাটতে শিখে পুকুর, খাল ও পরে ছোট ছোট নদী পর্যন্ত সাঁত্‌রে পার হয়ে যেতে সক্ষম হয়। মানুষ তখন ভাবতে থাকে নিজে এতটা আয়াস না করে জলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে কেমন করে ভেসে যাওয়া যায়। তারা লক্ষ্য করে কাঠ, বাঁশ, কলাগাছ এসব জিনিস জলে ভাসে। তারা তখন ঐসব জিনিস ধরে জলে ভেসে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে আরম্ভ করে।

কিন্তু এরূপভাবে ভেসে চলার অসুবিধা অনেক। এভাবে বেশিক্ষণ জলে থাকা যায় না। কাজেই বেশি দূরেও যাওয়া চলে না। নদীতে এভাবে ভেসে চলার বিপদও আছে। হঠাৎ কোন্ জলজন্তু এসে পা কামড়ে ধরে, অথবা পায়ে ধরে টেনে কোন্ অতলে নিয়ে চলে যায়, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আদিম মানুষ তাই বুদ্ধি খাটিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলো বাঁশ, কয়েকটা কলাগাছ কিংবা কয়েকটা কাঠ একত্রে বেঁধে ভেলা তৈরী করতে শিখল এবং বাঁশ দিয়ে ঠেলে ভেলা চালাবার কৌশল ও ক্রমে হালের সাহায্যে তার গতি নিয়ন্ত্রণ করার কায়দা-কানুনও তারা আয়ত্ত করে নিল। তখন তারা ঐ ভেলার ওপর চেপে জলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত আরম্ভ করল। এইরূপ কলাগাছ অথবা বাঁশে তৈরী ভেলাই হ'ল জলযানের আদিমতম রূপ।

১ ২ ৩ ৪ ৫

ছবিটিতে আদিমকালে কিভাবে জলযানের বিবর্তন ঘটে, তাই দেখান হয়েছে।
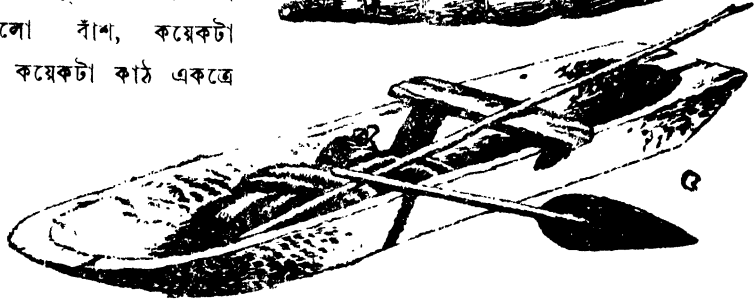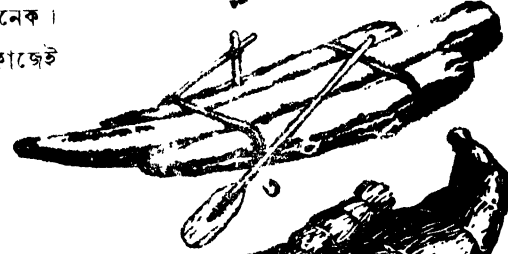
মানুষ ক্রমে বিজ্ঞ থেকে বিজ্ঞতর হয়। বিশেষ একদিকে চিন্তা ও কাজ করতে করতে ক্রমে সেইদিকে মানুষের বুদ্ধিও খুলে যায়। মানুষ দেখতে পেল বাঁশ, কলাগাছ এসব জিনিস জলে ভাসে, কিন্তু বড় বড় গাছ কেটে জলে ফেল্‌লে তা তো ভাসে না! এর কারণ কি? বাঁশ ফাঁপা, তাই হয়ত তা জলে ভাসে, আর বড় বড় গাছ নিরেট বলেই হয়ত তা ডুবে যায়! তারা ভেবে দেখল এই সব বড় বড় গাছকে যদি জলে ভাসানো যেত, তাহলে তাতে চড়ে অনেক নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে জলে যাতায়াত করা সম্ভব হ'ত। কিন্তু কেমন করে গাছকে জলে ভাসানো যায়? বাঁশের মত ফাঁপা করে নিলেই তো হয়! এইভাবে চিন্তা করেই আদিম মানুষ বড় বড় গাছের ভেতরটা কুঁদে ফেলে এবং একদিকের খোলটা কিছু ফেলে দিয়ে ভেতরে বসারও কিছু সুবিধা করে নেয়। এটাই হ'ল নৌকোর প্রথম রূপ, মানুষের নৌকো তৈরীর চেষ্টার প্রথম ফল। অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন অসভ্য ছিল তখনই তারা এই জিনিসটি নির্মাণ করতে শিখেছিল। তোমরা হয়ত শুনে অবাক হবে, হাজার হাজার বছর পরে আজও এই ধরনের নৌকোর প্রচলন আছে। পুর্ববঙ্গে এদের 'কুঁদ' বা 'কুঁন্দা নৌকা' বলে। বড় বড় গাছের ভেতরটা কুঁদে ফাঁপা করে তৈরী করা হয় বলেই এদের এই নামকরণ হয়েছে। এই একহারা আদিম জিনিসটি এখন চোখে পড়লে সকলের মুখেই হাসির রেখা ফুটে উঠবে সত্যি, কিন্তু এর ব্যবহার এখনো সম্পূর্ণ উঠে যায়নি।

মানুষ তারপর বড় বড় গাছ চিরে তক্তা তৈরী করতে শিখল। সেই তক্তা জোড়া দিয়ে দুই দিক উঁচু এবং ভেতরটা ন্যুব্জ রেখে কোনরকমে তখন সৃষ্টি হ'ল প্রথম নৌকো। বাঁশ দিয়ে ঠেলেই সেই নৌকো তখনও চালাতো তারা। তারা তখন ভাবতে লাগল, কেমন করে নিজেদের এই শ্রমের লাঘব করে নৌকোর গতিকে আরো বাড়ানো যায়। তারা দেখতে পেল বাতাসের ধাক্কা লাগলেই নৌকোর গতি যায় বেড়ে। তাদের সেই অভিজ্ঞতা থেকেই হ'ল পরে পালের আবিষ্কার।

মানুষের নৌকো-তৈরীর প্রথম চেষ্টার সেই অপরিণত জিনিসটিই ক্রমে উন্নত হয়ে আধুনিক নানা সংস্করণের নৌকোয় এসে আজ ঠেকেছে। দেশ ভেদে এই নৌকোরও অবশ্য প্রকার ভেদ হয়ে থাকে।

আজকালকার মত প্রাচীনকালেও ছোটবড় বহু আকারের নৌকোর প্রচলন ছিল। সেকালে জাহাজেরও যে প্রচলন ছিল এবং মিশর, গ্রীস, ক্রীট, রোম, ফিনিশিয়া প্রভৃতি দেশে নদী ও সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজও যে তৈরী হ'ত বিভিন্ন সূত্র থেকে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন আকার ও আয়তনের কাঠ পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে সম্মুখ ও পেছন দিকটা জল থেকে অনেক উঁচু এবং মাঝ-খানটা অবতল রেখে নির্মাণ করা হ'ত সে সব জাহাজ। এই জাহাজগুলো দাঁড়ে এবং প্রথমে একটি মাত্র মাস্তলে টাঙানো একটি চৌকো পালে চলত। দিনে দিনে এই মাস্তল ও পালের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং মাস্তল ও পালের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের কাঠামোরও হতে লাগল অনেক উন্নতি। এর পর জাহাজের পেছনে লাগানো হ'ল হাল, আবিষ্কৃত হ'ল চুম্বক দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, তৈরী হ'ল সমুদ্রের

নির্ভরযোগ্য মানচিত্র। এই সব সুবিধার জন্যে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার বিপদ অনেকটা কমে গেল। ক্রমে পালে চলা জাহাজ ধাপে ধাপে উৎকর্ষের দিকে আরো এগিয়ে গেল। গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান নিরূপণের জন্যে আবিষ্কৃত হ'ল তখন সেক্সট্যাণ্ট যন্ত্র, উদ্ভাবিত হ'ল দ্রাঘিমা নির্ণয়ের জন্যে সঠিক সময়-নিরূপক যন্ত্র ক্রনোমিটার, চাকাযুক্ত হালেরও অনেক উন্নতিসাধন হ'ল! জাহাজ হ'ল আরো নির্ভরযোগ্য। অনন্ত সমুদ্রবক্ষে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে, পৃথিবীর দিকে দিকে তখন অভিযান চালানো সম্ভব হয়ে উঠল।

শুধু অন্যান্য দেশে কেন, প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও, যে জাহাজের প্রচলন ছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সেকালে এদেশে স্থলপথে যাতায়াতের জন্য ভালো রাস্তাঘাট এবং উন্নত যানবাহনের ছিল একান্ত অভাব। স্থলপথ এবং জলযানই ছিল তাই পরিবহন ও যোগাযোগ রক্ষার কাজে প্রধান অবলম্বন। রাজাবাদশাদের আমলে এদেশে নৌশিল্পের তাই প্রভূত উন্নতিও হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের জাহাজ তখন তৈরী হ'ত এদেশে। অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যসামন্ত বহন করার জন্যে তৈরী হ'ত যুদ্ধজাহাজ। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে মালপত্র পরিবহন এবং যাতায়াতের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জাহাজ নির্মাণ করা হ'ত। তাছাড়া নবাব-বাদশা ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের আমোদস্ফূর্তির জন্যে জমকালো ময়ূরপঙ্খী ও বজরা নামে জলযানও তৈরী হ'ত সেকালে। সেকালে আজকালকার মত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়নি বলে এই সব জাহাজ পরিচালনা সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নাবিকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপরই তখন সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হ'ত।

চাঁদসদাগর শ্রীমন্ত সদাগরের মত বড় বড় ব্যবসায়ীরা তখনকার দিনে বাণিজ্যের জন্যে জাহাজে চড়ে দেশ-বিদেশে যেত। আজকালকার বড় বড় মহাজনী নৌকোগুলো দেখে প্রাচীনকালে ঐ সব জাহাজ কেমন ছিল তা কিছুটা অনুমান করা যায়। সে সব জাহাজ বড় বড় মহাজনী নৌকোর চেয়েও বহুগুণ বড় হ'ত এবং তাতে করে এদেশে উৎপন্ন নানা পণ্যসম্ভার দেশ-বিদেশে রপ্তানী হ'ত। তাদের পাছা এবং গলুই থাকত চ্যাপ্টা এবং কিনারগুলো থাকত খুব উঁচু। সমুদ্রের ঢেউ ঠেকাবার জন্যেই সেগুলি ঐভাবে নির্মাণ করা হ'ত। সেইসব জাহাজও দাঁড়ে এবং পালেই চলত। বাতাসের অভাব হলেই দাঁড়ের প্রয়োজন হ'ত বেশি। এদের দু'দিকেই থাকত অনেকগুলো করে দাঁড়। বহু-সংখ্যক দাঁড়ী সারি বেঁধে বসে, একসঙ্গে যখন দাঁড় ফেলে ও তুলে জাহাজ চালিয়ে যেত, তখন সৃষ্টি হ'ত এক অপূর্ব দৃশ্য। এই ধরনের দাঁড় ও পালে-চলা জাহাজ তখনকার দিনে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল।

এই দাঁড় ও পালে-চলা জাহাজের পরিবর্তে পরে বাষ্পীয় জাহাজের প্রচলন হয়। বাষ্পীয় জাহাজকেই বলে স্টীমার।

তোমরা জেম্স্ ওয়াটের নাম শুনে থাকবে। বাষ্প দিয়ে ইঞ্জিন চালাবার কৌশল প্রথম উদ্ভাবন করেন ঐ নামেই একজন ইংরেজ যুবক। আগুনের ওপর গরম জলের কেট্‌লির ঢাক্‌না

ক্ষণে ক্ষণে শূন্যে উঠে যাওয়া দেখেই তিনি বাষ্পের ক্ষমতার কথা উপলব্ধি করতে পারেন। জেম্‌স ওয়াটের উদ্ভাবিত-পথেই বাষ্পের ক্ষমতাকে ইঞ্জিন ও গাড়ির চাকায় প্রয়োগ করে স্থলপথে রেলগাড়ি চালানো আরম্ভ হয়। সেইরূপ ইঞ্জিনই পরে জাহাজে লাগিয়ে বাষ্প দিয়ে জাহাজও চালনা করা হয়। নৌকোয় ঝড়-তুফানের খুব বেশি ভয় ছিল, পালের জাহাজে তা কতকটা দূরীভূত হয়েছিল। বাষ্পের জাহাজে সেই ভয় আরো বিদূরিত হয়।

একটা জিনিস প্রথম উদ্ভাবিত হলে চিরকাল সেটি তার আদিম রূপেই থেকে যায় না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে নানাদিকে তার আরও উন্নতিসাধন করে থাকে। তাই সেই বাষ্পীয় জাহাজেরও ক্রমে নানাদিকে নানারকম উন্নতি হয়েছে ও হচ্ছে। প্রথমে কাঠের বদলে লৌহ ও পরে ইস্পাত জাহাজ নির্মাণের কাজে লাগানো হয়। ক্রমে প্রবর্তিত হয় উন্নত ধরনের বয়লার, কয়লার বদলে তেলের ব্যবহার, বাষ্পচালিত চাকা ও ডিজেল ইঞ্জিন। তাছাড়া নানা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহারও বাষ্পীয় জাহাজকে উন্নতির পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। পরিশেষে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আণবিক-শক্তি দিয়ে জাহাজ চালিয়ে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করা হয় জলযান-জগতে।

সমুদ্রের মধ্যে কূলকিনারা দেখা যায় না। এই অবস্থায় দিক্‌নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার। প্রাচীনকালে নাবিকেরা আকাশে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখে দিক ঠিক করত। আকাশে সমস্ত গ্রহনক্ষত্রেরই অবস্থানের পরিবর্তন হয়। একমাত্র ধ্রুবতারা সকল সময়ই স্থির থাকে। এজন্য অন্য গ্রহনক্ষত্রের চেয়ে ধ্রুবতারাই নাবিকদের গন্তব্যস্থানের দিক্‌নির্ণয়ে বেশি সাহায্য করে। কিন্তু আকাশ কুয়াশা কিংবা মেঘে আচ্ছন্ন থাকলে, নাবিকেরা গ্রহনক্ষত্র থেকে কোন সাহায্য পেত না। তখন তারা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ত। কিন্তু কম্পাস যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পর, সমুদ্রের মধ্যেও দিক্‌নির্ণয় খুব সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়ে। কম্পাসের কাঁটা সকল সময় উত্তর-দক্ষিণে থাকে বলে নাবিকদের এখন আর দিগ্‌ভ্রম হতে পারে না। তবে আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনা থেকেও বিপদের আশংকা থাকে প্রচুর! জাহাজে বাজ পড়লে কম্পাস-যন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়। তখন শব্দ-অনুসরণকারী এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে জলের গভীরতা মেপে, জলের নীচেকার মাটির প্রকৃতি পরীক্ষা দ্বারা সেখানে কি কি জলজ উদ্ভিদ ও জলজন্তু আছে তা নিরূপণ করে সমুদ্রের মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে জাহাজ কোন্ দিকে চলছে ঠিক বুঝতে পারা যায়। তাছাড়া পথ-নির্দেশের জন্যে স্থানে স্থানে থাকে আলোকস্তম্ভ। এই আলোকস্তম্ভগুলো কোথাও সমুদ্রের পাহাড়ের ওপর, কোথাও চড়ার ওপর, কোথাও সমুদ্রতীরবর্তী কোন উঁচু বাড়ির ওপর, আবার কোথাও বা নোঙর-করা বয়ার ওপর স্থাপিত থাকে। আলোকস্তম্ভের প্রধান প্রদীপটির আলোক বহুদূর থেকে দেখা যায়। আলো জালিয়ে-নিবিয়ে আলোকস্তম্ভ থেকে নাবিকদের উদ্দেশ্যে নানা অর্থপূর্ণ সংকেত পাঠানো হয়ে থাকে।

কুয়াশার জন্যে কখনও আলোর সংকেত দৃষ্টিগোচর না হলে, নাবিকদের সতর্ক করে দেবার জন্যে ডায়াফোন প্রভৃতি যন্ত্রের যাহায্যে প্রবল শব্দ সৃষ্টি করেও সংকেত পাঠানো হয়।

জাহাজ কূলকিনারাহীন অনন্ত সমুদ্রবক্ষে কোন্‌স্থানে অবস্থান করছে এ বিষয়ে ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সেক্‌সট্যাণ্ট যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য ও গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান এবং লোরান যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজের অবস্থান ঠিক করে নিকটে সুবিধা বা অসুবিধার স্থান কোথায় আছে না আছে এই সব চুলচেরা হিসেব করে ঠিক ঠিক মিলিয়ে দেওয়া যায়। চড়া ও জলের নীচেকার গুপ্ত পাহাড় থেকেই জাহাজের বিপদের আশংকা থাকে সব চাইতে বেশি। কঠিন বরফের পাহাড়ে ঠেকেও অনেক জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে সংকেত পাঠিয়ে এই ধরনের বাধা-বিপত্তিকে এখন এড়িয়ে চলা যেতে পারে।

জাহাজে কখনও কখনও আবার আগুনও লাগে। আগুন লাগলে সংকেতধ্বনি করা হয়। জাহাজের কর্মচারীরা তখন প্রত্যেকে আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যায়। নানারকম সতর্কতা সত্ত্বেও ঝড়ে, ঘূর্ণিবায়ু, গুপ্ত-পাহাড়, বরফের পাহাড় কিংবা আগুনের জন্যে বিপদ উপস্থিত হলে 'লাইফ বোট' দিয়ে যাত্রীদের বাঁচাবার ব্যবস্থাও আছে। বড় বড় জাহাজে দশ বারোটি কি তারো বেশি 'লাইফ বোট' থাকে। একেকটি লাইফ বোটে জন পঞ্চাশেকেরও বেশি যাত্রী যেতে পারে। 'লাইফ বোট' ছাড়া গোল গোল বয়া এবং কর্কে তৈরী একপ্রকার ভাসমান যন্ত্রও জীবনরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। সাহায্যের জন্যে বেতারে নিকটস্থ জাহাজে খবরও পাঠানো হয়ে থাকে।

এইসব বড বড় জাহাজে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত যেমন প্রচুর, আরামের ব্যবস্থাও তেমনি অঢেল, কোন দিক দিয়ে কোন কিছুরই অভাব নেই। সমুদ্রগামী বড় বড় যাত্রী জাহাজে শোবার ঘর, বসবার ঘর, খাবার ঘর, প্রার্থনার ঘর, বক্তৃতার জন্যে হলঘর, নাচের ঘর, পাঠাগার, সিনেমা, নানারকম জিনিসপত্রের দোকান, রেষ্টুরেষ্ট, চিঠিপত্র পাঠানো ও সংবাদপত্র পাঠের ব্যবস্থা এবং সাঁতারকাটা ও টেনিস প্রভৃতি খেলার জন্যেও সুবন্দোবস্ত থাকে। এই ধরনের জাহাজকে বিনা দ্বিধায় একটি 'সাগর-নগর' বলা যেতে পারে। এই 'সাগর-নগরে'র 'নাগরিকে'রা আধুনিক শহরের যাবতীয় সুখ-সুবিধা উপভোগের সুযোগ পেয়ে থাকেন সেখানে।

জলের ওপর দিয়ে পাখায় ভর করে উড়ে-চলা-নৌকো 'হাইড্রোফয়ল,' সমুদ্রের অতল গভীরে নেমে সেখানকার বিচিত্র জগৎ পর্যবেক্ষণ করার জন্যে 'ব্যাথিস্কেফ,' জলের তলায় লুকিয়ে থেকে শত্রু-জাহাজকে ঘায়েল করার জন্যে 'সাবমেরিন'--প্রভৃতি বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেও জলযান-জগৎ আজ দিকে দিকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জলযান-জগতেও কত দিকে যে কত উন্নতি হচ্ছে—তা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

মহাকাব্য

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

লিখছি আমি মহাকাব্য বসে ছাদের কোণে ;
মন্ত্রণা, দূত-প্রেরণ, যুদ্ধ—আসছে সবই মনে।
জমাচ্ছে ভিড় হাসি-কান্না, ভীষণ মনোহর,
আমার নায়ক সবার চেয়ে বীর জ্ঞানী সুন্দর।
সত্য ত্যাগের প্রতিমূর্তি, জানে না সে হার,
দূর করে সব অন্যায় ভয় মিথ্যা অহংকার।
অ্যাটম বোমায় মারে যত হিংসুটে শয়তান,
বেতার ফিল্মে রটে তারই বিশ্বজয়ের গান।
রকেট করে চাঁদের দেশে যায় সে সহজেই,
তার কাছে পর আপন বলে কোনো প্রভেদ নেই
পাহাড় নোয়ায় মাথা, নদী সরে, মরুভূমি,
শ্যামলিমায় উছলে ওঠে, বলে, 'ধন্য তুমি !'
দাদা বলে, 'মিঠু লেখে কি সব যে ছাইপাঁশ,'
বন্ধুরা সব হাসে, করে কতই উপহাস।
বাবাও দেখি বলেন, স্বরটা কেমন একটু কড়া,
'কাব্য ছেড়ে এবার কিছু কর স্কুলের পড়া।'
মা আর রাঙা পিসী শুধু আমায় কোলে ক'রে
বলে, 'মিঠুর যশে ভুবন যাবেই যাবে ভ'রে।'
যখন লোকে বুঝবে আমায়, রটবে মহাখ্যাতি
শোভাযাত্রা ক'রে যাব চ'ড়ে মস্ত হাতি।
দেবে লোকে টাকা ফুলের মালা, গাবে জয় :
দারুণ সাড়া প'ড়ে যাবে সারাটা দেশময়।
বাড়ি ফিরে বলব মা আর পিসীর কাছে গিয়ে,
'দেখ কবির পুরস্কারে কি এসেছি নিয়ে !'
প্রণাম করার জন্যে যেমন করব মাথা নীচু—
চমু খেয়ে বলবে, 'চাইনে এর বেশী আর কিছু।'

গোলমামা

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

ন্যাড়াই এসে খবরটা দেয়।

—দত্তদের বাগানের বটগাছে এই এ্যাত্তো হরিয়াল এসেছে। চল না তোর বন্দুকটা নিয়ে।

বন্দুক বলতে এয়ারগ্যান, অবশ্য ন্যাড়ার হাতেও হাতিয়ার রয়েছে। মটরের টিউব কাটা রবারের তৈরী মজবুত গুলতি। ন্যাড়াও ইতিমধ্যে শিকারে পাকা হয়ে উঠেছে। ওর লক্ষ্যবস্তু হ'ল কাঠবেড়ালী, কবুতর, শালিক ইত্যাদি। কবুতরের মাংসও নাকি খুব ভালো। তাছাড়া ন্যাড়া দু'একদিন লুকিয়ে মুরগীও চুরি করেছে। মাংসের গন্ধ শুঁকলে ন্যাড়ার নোলা শোঁক-শোঁক করে। তাই এসব খবর-টবর ও রাখে।

হরিয়াল পাখীগুলো দেখতে সুন্দর। সারা গায়ের রং সবুজ—ঘন সবুজ। চোখগুলো লালচে। আর তেমনি খেতেও চমৎকার। বিশেষ করে শীতকালের দিনে তো কথাই নেই। এসব ন্যাড়ারই অভিমত। আমি কোনদিন হরিয়ালের মাংস খাইনি। তবু শিকারী হবার সখেই চুপি চুপি এয়ারগ্যান নিয়ে বের হয়ে পড়লাম।

এদিকটায় বেশ ঘন ঝোপ-জঙ্গল আছে। এককালে দত্তবাবুরা যে নামকরা জমিদারই ছিল তা ওদের বিরাট বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখলেই বোঝা যায়। অনেকখানি এলাকা জুড়ে সেই বাড়ি-গুলো ধ্বসে পড়েছে। ওপাশে ছিল যেমন দিঘী, তেমনি সাজানো বাগান। আম, জাম, পেয়ারা, কামরাঙ্গা, নানা রকমের গাছ ভিড় করে আছে।

আজ সেখানে গজিয়েছে আশ্‌শেওড়া, রাংচিত্তির, ঘেঁটু প্রভৃতি নানা আগাছার জঙ্গল। ঢোকার পথ নেই। গোদালে লতা, আলোক লতার ঘন আবেষ্টনীতে গাছগুলো ঢাকা পড়ে গেছে।

দু'জনে জঙ্গল ঠেলে সাবধানে এগিয়ে চলেছি—আমি আর ন্যাড়া। অসাবধান হলেই বিপদ হতে পারে। সাপখোপ তো আছেই, তাছাড়া কোথাও বা রয়েছে খানাখন্দ।

তোড়জোড় করে কাছাকাছি পৌচেছি, এমন সময় হঠাৎ এই নির্জন বনের মধ্যে থেকে একটা বন্দুকের শব্দ ওঠে। সত্যিকার বন্দুকের শব্দ। নিস্তব্ধ দিগন্ত কেঁপে ওঠে ওই গুলির শব্দে। নীল আকাশে ঝটপট করে উড়ে গেল পাখীগুলো। হারিয়ে গেল তারা।

—ন্যাড়া! চমকে উঠি আমি। এত কষ্ট সব ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের আসবার আগেই কে খবর পেয়ে এসে হরিয়ালের ঝাঁককেই শেষ করেছে বোধ হয় ছররা দিয়ে।

জঙ্গল থেকে বের হয়ে সামনেই বটগাছের নীচে এক মূর্তি দাঁড়িয়ে। গোলগাল মোটা কুমড়োর মত চেহারা। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় সমান, পায়ের ডিমে সেপ্‌টে লেগে থাকা প্যাণ্টুল পরেছে, তাতে পট্টি জড়ানো, আর প্যাণ্টটা হাঁটুর উপর থেকে কোমর পর্যন্ত অনেকটা ফুলে রয়েছে। পাছার

কাছে ঢাউসের মত পেল্লায়—পেট আর পাছা প্রায় এক মাপেরই। উর্ধ্বাঙ্গে তোয়ালের মত কাপড়ের তৈরী হাফ-সার্ট। মোট্কা লোকটা গুলি করে একটা রুমাল দিয়ে ঘাড় মাথা মুচছে। বোধহয় পরিশ্রমে নেয়ে উঠেছে ঘেমে।

পরমুহূর্তে আমাদের দেখে বন্দুকের নলটা খুলে বারুদের ধোঁয়া উড়িয়ে দেবার জন্য ফুঁ দিতে থাকে ওর মধ্যে। হাপরের ভিতর থেকে যেন বাতাস বের হচ্ছে।

ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে দত্তবাড়ির পটলা। সে ইতিমধ্যে ঝোপঝাড়ে অনেক খুঁজেছে গুলি-লাগা ছিটকে-পড়া হরিয়ালের সন্ধানে। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বলে, কই গো মামা, একটাও তো পড়েনি, মরেও নি।

গোলাকার মামা নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, লেগেছে ঠিক, বাসায় গিয়ে ও মরবে। ছররার গুলি কিনা, একটু টাইম নেবে।

হঠাৎ আমাদের দেখে পটলা এগিয়ে আসে। ন্যাড়াও খুঁজতে লেগেছে যদি মরা পাখী মেলে। পটলাই পরিচয় করিয়ে দেয়।

—আমার মামা। জব্বর শিকারী। অনেক বাঘটাঘ মেরেছেন।

শিকারীর নমুনা দেখেছি, আর চেহারা দেখে মনে হয় বাঘে ওকে পেলে হয়। ওরাই তাকে শিকার করে পাঁচ সাতদিন আরামসে খাবে। গোলমামা আমার দিকে আপাদমস্তক দেখছে, তার বিরাট চেহারার তুলনায় আমি এইটুকু।

গোলমামা বলে, বুঝলি, ওই হরিয়াল ফাকৃতা, এসব খুদে শিকার করতে আমার বিশ্রী লাগে। বাঘ, ভালুক, কুমীর এই সব হয় কথা থাকে। তা যখন ধরেছিস একদিন বালিহাঁসই মেরে দোব গোটাকতক।

ন্যাড়া এতক্ষণ ধরে ঝোপ-ঝাড়ে মরা হরিয়াল খুঁজছিল। বালিহাঁসের নাম শুনে বলে, কাশীপুরের বিলে এই সময় অনেক নামে, সকাল বেলায় গেলেই—গোলমামা ওর দিকে চাইলো।

—তুই জানিস ?

—হিঃ হিঃ, কতো নেবেন !

বাগানে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পাখীগুলো কলরব করে বাসায় ফিরছে। এখানে ওই ঝোপের মধ্যে অন্ধকার ঘনতর হয়ে ওঠে। পথ নেই, ওই বনবাদাড় ও যজ্ঞিডুমুরের অন্ধকার গাছের নীচে দিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া ওই বটগাছের নীচে থমথম করছে আঁধার।

হঠাৎ কেওয়া ঝোপের মধ্যে খস্‌খস্ শব্দ ওঠে; দুটো নীল চোখ জ্বলছে।

হঠাৎ বিকট শব্দে গোলমামা দৌড়ে গিয়ে সামনের গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ে। ওই মোটা বিশাল দেহ নিয়ে এক নিমেষের মধ্যে এই কাণ্ড করবে তা ভাবিনি আমরা। জানি

এই জঙ্গলে শিয়াল ভামও থাকে। রাতের অন্ধকারে মানুষের পায়ের শব্দে ওদেরই কেউ দৌড়ে পালাচ্ছে; গোলমামা ঝুলছে সেই ডাল ধরে, নীচে একটা খেজুর গাছের ঝোপ।

—মামা! ওটা ভাম।

—হা য় না!... বন্দুকটা তুলে দে!

বন্দুকটাও অন্ধকারে কোন্ ঝোপে ছিট্‌কে পড়েছে। ওই জানোয়ারটা যেন ওঁর বন্দুকের গুলি খাবার জন্য বসে থাকবে! মামা দোদুল্যমান অবস্থায় হুকুক করে।

'গোলমামা দৌড়ে গিয়ে সামনের গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ে।'

—জলদি!... একটা বুলেট এক নম্বর দিয়ে দে।

আমরাও মামার এলেম দেখবার জন্যই বন্দুক খুঁজছি। এতেন সময় মড়মড় শব্দ ওঠে। অন্ধকারে মামা ওই যজ্ঞিডুমুরের ডাল ধরেই ঝুলে পড়েছে, জীর্ণ পল্‌কা ডালটা ওই দেহের গুরুভারে মড়মড় করছে। তারপরই একটা ভারী বস্তু পড়ার শব্দ ওঠে।

—মামা গো! পটলাও এত বড় মামাকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক দেয়। মামা তখন ডাল সমেত পড়েছে খানার মধ্যে সেই খেজুর গাছের উপর। ডালের ঘন পাতায় ঢেকে গেছে তার দেহটা।

—এই যে ! তোল আমাকে !…এ্যাই ইডিয়ট রাস্কেলের দল।

কোথায় বন্দুক, কোথায় মামা ! আমরা তিনজন শিশু ওই ঘটোৎকচের মত দেহটাকে শরশয্যা থেকে টেনে তুলছি। মামা গর্জায়—

—এ্যাই আস্তে ! মারবো এক লাথি। উঃ কি কাঁটা রে ! ন্যাষ্টি—এখানে শিকার করতে আসে !

প্যাণ্ট ফুটো হয়ে গেছে—ছড়ে গেছে হাত-পা। মামাকে ডালপালাওলা খেজুর-কাঁটা থেকে মুক্ত করতেই হিমসিম খেয়ে গেছি। বন্দুকটাও পাওয়া গেল কাছেই। মামাকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে আমরা বনবাদাড় থেকে বের হয়ে এলাম, পাড়ার অনেক লোক জুটে গেছে তখন।

ন্যাড়া তখন গোলমামার ভক্ত হয়ে গেছে। বলে, বুঝলি মস্ত শিকারী গোলমামা। সন্ধ্যাবেলায় যাস একবার।

আমার কিন্তু লোকটাকে ভালো লাগেনি। কেমন যেন বোকা-বোকা আর নিরেট। গ্রামের পথেও দেখেছি দু'একদিন। ঘুন্টিদা'র গিলেকরা পাঞ্জাবী আর কোচানো ধুতি পরে পামসু মচমচিয়ে চলে। পিছনে পিছনে রয়েছে পটলা। গোলমামা নাকি তাকে এবার সুন্দরবন থেকে শিকার করে এনে একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চামড়াই দেবে।

ন্যাড়াকে বলে—তোকে এবার ফিরে এসে একটা হরিণের চামড়া দেব। ন্যাড়া তো মহা খুশী।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় পটলার কাছে ইংরেজীর মানের বইটা আনতে গেছি, ন্যাড়ারও ক'দিন দেখা নেই। ইদানীং ন্যাড়াও আসা কমিয়ে দিয়েছে আমার কাছে। কি কাজে যেন ব্যস্ত।

পটলাদের ভাঙা বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। একটা তক্তপোষের উপর সেই গোলাকার গোলমামা উপুড় হয়ে পড়ে আছে, কোমরে এইটুকু কাপড় জড়ানো বাকী সারা গা অনাবৃত। কালো মুষকো চেহারা। ন্যাড়া ওই বিশাল দেহটার উপর হাঁটু গেড়ে বসে দলাইমলাই করে চলেছে। মাঝে মাঝে গর্জন করছে গোলমামা।

—জোরে ! আরও জোরে ! বুঝলি সেবার একটা গণ্ডারের হাতে পড়েছিলাম, ওরা তো পাহাড়ের মত। উপুড় হয়ে পড়লাম। নড়াতেই পারলো না ঠেলে। নাগালের মধ্যে আসতে বাছাধনকে পিছনের পা দিয়ে একটি লাথি কসলাম নাকের ডগে। খড়্গাটা মট্ করে ভেঙে গেল, আর বাছাধন চোঁচা দৌড়।

পটলাও পড়া ফেলে মামার গল্প শুনছিল। সে শুধোয়, কোথায় মামা ? তা সেই খড়্গাটা গেল কোথায় ?

—কাজিরাঙ্গা ফরেষ্টে। সিকিমের দোরজী খবর পেয়ে খড়্গাটা নেবার জন্য ঝুলোঝুলি। তা দিলাম শেষকালে। হাজার হোক বন্ধু লোক।

—জোরে, এ্যাই !

ন্যাড়া ওই বিশাল দেহটার উপর ব্যাঙাচির মত নাচানাচি সুরু করেছে। গোলমামা আমাকে দেখে মুখ তুললো।

—কি রে, ফড়িং !

ওটা আমার নাম নয়। পাতলা শরীর তাই মামা ওই নামকরণই করেছে। ওর হাতী মারার গল্প শুরু হয়ে গেছে এইবার।

—মাইশোরের কাকোনকোটের জঙ্গলে সেবার মহারাজার গেষ্ট হয়ে গেছি। পাগলা একটা হাতী খুব অত্যাচার করছে। নীলগিরির জঙ্গলও তেমনি। পাহাড় আর পাহাড়ের গায়ে ঘন বাঁশবন—সেগুন, শাল-এর রাজ্যি। মাঝে মাঝে চন্দন গাছও আছে। এখানেই হাতীটাকে মারতে হবে। টেরিফিক্ জব !

—জোরে। পটলা, একটু চা আন।

ন্যাড়া হাঁপিয়ে পড়েছে ওই বিরাট দেহ সামলাতে। পটলা দৌড়লো চা আনতে।

এতক্ষণে গোলমামার গায়ের ব্যাথা মরেছে। উঠে বসে তখন সেই হাতীর শিকার-কাহিনী সুরু করেছে চায়ে চুমুক দিতে দিতে। ন্যাড়াই কথাটা পাড়ে। তাহলে মামা, কাল ভোরেই যাচ্ছেন তো ? অনেক পাখী নামছে নদীর ধারে—ওই বিলে।

মামা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—হাতী, বাঘ, গণ্ডার ছেড়ে শেষকালে কিনা বালিহাঁস ! অলরাইট, তোরা যখন বলছিস চল ! কি হে ফড়িং, যাবে নাকি ? তবে আমার সঙ্গে হান্টিং-এ যেতে হলে শিকারের কোড মেনে চলতে হবে, নো টকিং, নো হুইস্‌পারিং—একেবারে মিলিটারী ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে।

আমার যাবার ইচ্ছে নেই। তবু পটলা আর ন্যাড়া বলে, ও যাবে মামা।

—অলরাইট। গোলমামা মুখ বোদা করে সায় দেয়।

ন্যাড়া যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। দু'জনে বের হয়ে এলাম ওদের বাড়ি থেকে। কাল ভোরেই বের হতে হবে। সূর্যোদয়ের সময়েই তিন কোশ পথ পার হয়ে ময়ূরাক্ষীর বালি-চড়া আর জল ভেঙে বিলে পৌঁছতে হবে। বালিহাঁসের দল নামে সকালেই। তখনই ফায়ার করার সুবিধে।

ন্যাড়া বলে, গোটা-আষ্টেক নির্ঘাৎ মারবে গোলমামা। কি এম্ ওর ! আর তেমনি পাকা শিকারী। কাল সন্ধ্যায় ক্লাবে বেশ একচোট ফিষ্ট হবে। আটটা বালিহাঁসের মাংসও কম হবে না, মুরগীর চেয়েও খেতে অনেক ভালো। দেখিস—

আমারও লোভ হয়নি তা নয়, বেশ জমবে সন্ধ্যাটা, শীতের দিন—মাংস আর ভাত। ভাবতেও ভালো লাগে।

ভোর বেলাতেই বের হয়েছি। গোলমামার পরনে সেই হান্টিং ব্রিচেস আর গোড়ালি ঢাকা জুতো, গায়ে একটা মোট্‌কা ফুলহাতা সবুজ রং-এর সোয়েটার। মাঝে মাঝে তাতে সাদা আর খয়েরী দাগ, মাথায় বারান্দাওয়ালা টুপি।

গোলমামা বলে, এটা বাঘ শিকার করার জামা। গাছের রং-এ মিলেয়ে যাবে কিনা, স্পেশালি অর্ডার দিয়ে তৈরী করানো। সেবার তরাই-এর জঙ্গলে—

জানি এ গল্প আগেই শুনেছি। তাতেই একটু মাত্রা চড়বে মাত্র। পিছনে পটলার কাঁধে ফ্ল্যাস্ক-এ চা, ওদের রাখালটার মাথায় টিফিন-বাস্কেট আর বন্দুক, ন্যাড়া আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। আমাকে এয়ারগান কাঁধে নিয়ে যেতে দেখে গোলমামা রসিকতা করে—তুই কি মারবি রে ফড়িং? টিকটিকি! তা টিকটিকিও তো ফড়িং খায় রে। টেক্‌ কেয়ার।

রাতের শিশির ঘাসের উপর ঝকঝক করছে। ধানের গাছগুলো এসে পড়েছে আলের উপর। পা আটকে যায়। হঠাৎ গোলমামা উঁচু পগারের উপর থেকে পা পিছলে পড়েছে নীচের ক্ষেতে। ন্যাড়া পাশেই ছিল, সে মামার শূন্যে উৎক্ষিপ্ত একটা হাত ধরে ফেলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিরাট ওই দেহের টান রাখতে না পেরে, ন্যাড়া বঁড়শির সুতো-গাঁথা ব্যাঙাচির টোপের মত আশমানে উৎক্ষিপ্ত হয়ে, দূরে ছিটকে পড়েছে আর গোলমামার ওই ঘটোৎকচের মত দেহটা সপাটে গিয়ে পড়েছে তার উপরেই। একেবারে চিড়ে-চ্যাপ্‌টা হয়ে ন্যাড়া বেদম চীৎকার করছে আর গোলমামা যতই ওঠবার চেষ্টা করছে, ততই ধানের গাছে জড়াজড়ি করে চেপে বসছে।

রাখালটা চীৎকার করে—মরে গেল যি গো! শিকার খেলা শেষে এই ধান মাঠেই হয়ে যাবে।—জব্বর শিকার!

ত্ব'জনে টেনেহিচড়ে মামাকে ওপাশে কাঠের গুঁড়ির মত চিৎ করে গড়িয়ে ন্যাড়া বের হয়ে আসে। গোলমামাও হাত-পা ছাড়া পেয়ে ধান গাছ ছিঁড়ে বের হয়ে এল। ন্যাড়া তখনও দম নিচ্ছে।

তবু চলেছি আমরা। মাঠ পার হয়ে সামনেই ময়ূরাক্ষীর দিকে এগিয়ে চলেছি। নদীর বালিয়াড়ি স্বরু হয়েছে। সকালের আভাস জেগেছে আকাশে। আলোর আভাস। ন্যাড়া তবু ওই বালিহাঁসের আনন্দে সব ভুলে এগিয়ে চলেছে। সামনে নদীর হাটুভোর জলধারা, সেটা বালিয়াড়ির বুক চিরে এঁকেবেঁকে গেছে। ত্ব'একটা আকন্দ গাছের ফুল-ভরা ডালগুলো বাতাসে নড়ছে। নদীর ধারে পলিতে চাষীরা চাষ করেছে সরষে, গমের। মাঝে মাঝে বেগুন, মুলোর ক্ষেত। এদিকের বড় বড় মুলো আমাদের গ্রামের হাটেও যায়। অন্য সময় হলে মুলো চুরিই হয়ে যেতো। ন্যাড়ার ওদিকে খেয়াল নেই, সে এখন বালিহাঁসের স্বপ্নে বিভোর। সব আঘাত ভুলে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ গোলমামা চনমন্ করে ওঠে। পাকা শিকারী। তার চোখই আলাদা। ঠিক বালিহাঁসের ঝাঁক দেখেছে সে। ইশারায় আমাদের ওই আকন্দ গাছের আড়ালে বসে পড়তে ব'লে, বন্দুকটা নিয়ে শিশির-ভেজা বালিয়াড়ির উপর দিয়ে ক্রল করে চলেছে। যেন একটা বিরাট পিপের মাথায় দড়ি বেঁধে কারা সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

উঁচু বালিয়াড়ির আড়াল থেকে সামনের জলধারার দিকে নজর পড়ে না। নড়াচড়াও নিষেধ। গোলমামার মিলিটারী কানুন, রেগে গেলে আমাদেরই গুলি করে দেবে বোধ হয়।

ন্যাড়া ও আমরা সবাই গোলমামার সেই বিশাল দেহের জিমন্যাস্টিক কসরত দেখছি। এত কৌশল ব্যর্থ হবে না। তাছাড়া এমন নিপুণ শিকারীর তাক্‌ও ফস্‌কাবে না। গ্রামের অনেকেই শুনেছে গোলমামার শিকারের কথা। এনিয়ে আলোচনাও হয়েছে অনেক। আমরা আজ তাকে 'ইন এ্যাকসন্' দেখছি। এতো কসরত আর কষ্ট না করলে শিকার করা যায় না। গোলমামা বালির উপর দিয়ে টেনে টেনে চলেছে। এইবার বন্দুক তাক করছে।

আমরা বিস্ময়ে হতবাক। স্তব্ধ চারিদিক। এইবার পাখীগুলো রক্তমাখা অবস্থায় ছিটকে পড়বে। নীরব এই শীতের দিগন্ত ভরে উঠবে ওদের চীৎকারে। পিয়ালী রঙের হাঁসগুলো ডানা ঝটপটিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ন্যাড়ার যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে উত্তেজনায়।

আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে বন্দুকের শব্দে। তীব্র চীৎকারে ঝাঁকবন্দী বালিহাঁসের দল কলরব করে আকাশে উঠে পড়েছে। শত শত পাখী—ওদের ডানার শব্দ ওঠে। সাঁই সাঁই শব্দ। মাথার উপর দিয়ে সারা আকাশ ছেয়ে চক্রাকারে তারা উড়ে চলেছে।

দৌড়ে যাই আমরা। গোলমামা ডবল ব্যারেলের দুটো গুলিই করেছে। ন্যাড়া বালিয়াড়ির উপর দৌড়ে চলেছে নীচে। নদীর সামান্য তিরতিরে জলের উপর পাখীগুলো বোধহয় গুলি খেয়ে ভাসছে, উঠছে-নড়ছে। এদিকে বালি সরে জল প্রায় কোমর ভোর। ন্যাড়ার কোনদিকে নজর নেই। উত্তেজনায় ওই উঁচু বালিয়াড়ি থেকে হড়বড়িয়ে গড়িয়ে ওই ঠাণ্ডা কনকনে জলে পড়ে পাখীগুলো ধরতে গিয়েই চমকে ওঠে,—ধ্যাত্তের!

আমরাও ততক্ষণে গিয়ে পৌঁচেছি। গোলমামাও। ওই তিরতিরে জলস্রোতে গুলি খেয়েও মাথা নাড়ছে সেগুলো। তাদের ভয়-ডর নেই। ওরা পাখী নয়। চাষীরা ভোর বেলায় ক্ষেত থেকে মুলো তুলে নিয়ে গেছে আর মুলোর পাতাসমেত ডগাগুলো কেটে ফেলে রেখে গেছে নদীর জলে। বালিতে বসে গিয়েছে সেগুলো, জলের উপর উঠে আছে তাদের বাঁকানো পাতাগুলো, স্রোতে কাঁপছে। সারা জায়গাতেই অমনি মুলোর মাথা সমেত পাতাগুলোকেই বালিহাঁস ভেবে গুলি করেছে আমাদের জবর শিকারী ওই গোলমামা। রাখালটা গজগজ করে,—এ্যাই শিকের, হ্যাগো বাবু ?

গোলমামা ধমকে ওঠে—সাট্ আপ্।

ফ্লাস্ক থেকে চা বের করে একাই গিলতে থাকে। শীতে ওই হিম-জলে গাড়োলের মত জামা চাদর সমেত ভিজে দাঁতে কত্তাল বাজছে ন্যাড়ার। হন্‌হন্ করে সে ফিরে চলেছে বাড়ির দিকে।

বৈকালে ন্যাড়ার বাড়ি গিয়ে দেখি প্রবল জ্বর। সেই চাপা পড়ে একটা হাতও মুচকে গেছে আর জলে ভিজে ঠাণ্ডায় জ্বর এসে গেছে। বালিহাঁসের মাংস আর জোটেনি।

ওই গোলমামাও সেইদিনই চলে গেছে। পটলাকে নাকি বলে গেছে—ওসব পাখী-টাখি ন্যাষ্টি গেম সে শিকার করে না। এবার তাকে একটা বাঘের চামড়াই পাঠাবে।

পটলাই বলে—ওসব গুল্! বুঝলি স্রেফ্ গুল্। ন্যাড়াকেই বধ করেছিল আজ। ও করবে শিকার!

আমি চুপ করে থাকলাম।

ইচ্ছার ফুলঝুরি

শ্রীরাণা বসু

বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা
বজ্র মানিক জ্বালি
দূর করতে ইচ্ছে জাগে
আঁধার ঘন কালি।
মনের তটে ঢেউ জাগানো
ভালোবাসার স্রোতে
দীক্ষা নিতে ইচ্ছে জাগে
বিশ্বপ্রেমের ব্রতে।

মহান্ যাহা চিত্তে জাগায়
সুরের অনুরণন
চিত্ত বীণায় সেই সুরেরই
করি অনুকরণ।
চাঁদের আলোয় স্বপ্ন দেখি
সূর্যালোকে জ্বলি
এই দুনিয়ার দীর্ঘ পথে
আমরা যেন চলি॥

ব্যাঙ্-কুমারী

শ্রীপ্রদোষচন্দ্র রায়চৌধুরী

এক গ্রামে এক জেলে ও জেলেনী থাকতো। কোনও সন্তান না হওয়াতে জেলেনী খুব কান্নাকাটি করতো। প্রায়ই গ্রামের মন্দিরে না খেয়ে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকতো। এই ভাবে দেবদেবীর অনেক পুজা করাতে বহুদিন পরে জেলেনীর ছেলে হবার সম্ভাবনা দেখা দিল এবং দু'জনে খুব খুশী হ'ল। কয় মাস পরে জেলেনীর ছেলে বা মেয়ে না জন্মে এক মেয়ে ব্যাঙ্ জন্মালে তাদের দুঃখের সীমা রইল না। কিন্তু সেই ব্যাঙ্ যখন সাতদিনের মধ্যে মানুষের মতন কথা বলতে লাগল, তখন তার বাবা, মা ও গ্রামের সকলে অবাক হয়ে গেল আর তাকে আদর করতে লাগল। সবাই আদর করে ওর নাম রাখল ব্যাঙ্-কুমারী।

বছর দুই পরে জেলেনী মারা গেলে জেলে এক বিধবাকে বিয়ে করল। সেই বিধবার আগের দুটি খুব কুৎসিৎ দেখতে মেয়ে ছিল। সৎমা ও সেই মেয়ে দুটি ব্যাঙ্-কুমারীকে মোটেই ভাল বাসত না বরং তাকে সর্বদা নানা ভাবে কষ্ট দিয়ে খুব মজা পেতো। তাকে দিয়ে বাড়ীর সব কাজ করাত আর নিজেরা সাজসজ্জা ও নানা রকমের আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাত।

একদিন সে দেশের রাজার ছোট ছেলে শহরে ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি পরের সপ্তাহে তাঁর কেশোৎসব করবেন। সেই উৎসবে শহরের সকল যুবতীদের নেমন্তন্ন করা হ'ল। উৎসব শেষে সেই যুবতীদের মধ্য থেকে একজনকে ছোট যুবরাণী বেছে নেওয়া হবে, তাও ঘোষণা করা হ'ল।

যেদিন কেশোৎসব হবে, সেদিন সকালে দুই সৎবোন স্নান করে সুন্দর পোশাক পরে প্রস্তুত হ'ল। ছোট রাজপুত্র তাদের একজনকে বেছে নেবে আশা করতে করতে তারা রাজপ্রসাদের দিকে রওনা হ'ল। ব্যাঙ্-কুমারী তাদের পেছন পেছন দৌড়তে দৌড়তে বলতে লাগল, "দিদিরা, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও।" তারা হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে বলল, "আরে আরে ব্যাঙ্টা আমাদের সঙ্গে আসতে চায়। নেমন্তন্ন তো মেয়েদের জন্য হয়েছে। ব্যাঙ্দের জন্য হয়নি। তুই চলে যা।" বলে তারা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ব্যাঙ্-কুমারী কিন্তু তাদের পেছন পেছন গেল। রাজপ্রসাদের ফটকে পৌছে তাকে সঙ্গে নেবার জন্য সে তাদের অনেক অনুরোধ করল। কিন্তু তারা বোনকে সঙ্গে নিয়ে গেল না। তখন ব্যাঙ্-কুমারী ফটকের প্রহরীদের সঙ্গে খুব মিষ্টি ভাষায় গল্প করতে আরম্ভ করল। একটি ব্যাঙকে কথা বলতে দেখে তারা খুব অবাক হ'ল। তার সঙ্গে গল্প করতে প্রহরীদের খুব ভাল লাগল। তার মিষ্টি ব্যবহারে খুব খুশী হয়ে প্রহরীরা তাকে ভিতরে যেতে দিল। ভিতরে ঢুকে সে দেখল যে রাজপ্রাসাদের পদ্মপুকুরের চারিদিকে শত শত সুন্দরীরা রয়েছে। তাদের সঙ্গে সেও রাজপুত্রের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ছোট রাজপুত্র তার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে এলেন। পুকুরে নেমে তাঁর চুল ভাল করে ধুতে লাগলেন। চুল ধোওয়া, মোছা ও সোনার চিরুনি দিয়ে সুন্দরভাবে আঁচড়ানোর পর রাজপুত্র বল্লেন যে, সেখানে যত মহিলা এসেছেন সকলেই এত সুন্দরী যে, তিনি কাকে যুবরাণী করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। সেই জন্য তিনি মল্লিকা ফুলের একটি মালা আকাশে ছুঁড়ে দেবেন, সেটা যার মাথায় পড়বে তাকেই তিনি যুবরাণী করবেন। সব যুবতীরা আকাশের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রাজপুত্র একটা বড় মল্লিকা ফুলের মালা খুব উঁচুতে ছুঁড়ে দিলেন। মালা গিয়ে পড়ল আমাদের ব্যাঙ্-কুমারীর মাথায়। সমস্ত যুবতীরা, বিশেষতঃ তার সৎবোনেরা ভীষণ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে গেল। রাজপুত্রও খুব দুঃখিত হলেন, কিন্তু তিনি কথা দিয়েছেন সুতরাং ব্যাঙ্-কুমারীকেই বিয়ে করলেন। ব্যাঙ্-কুমারী তখন ব্যাঙ্-রাজকুমারী হয়ে গেল। সবাই তাকে ছোট যুবরাণী বলে ডাকতে লাগল।

কয়েক মাস পরে বুড়ো রাজা চার ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। রাজপুত্ররা এলে সবাইকে আদর করে তাঁর সামনে বসিয়ে বললেন, "দেখ ছেলেরা, আমি এখন খুব বুড়ো হয়েছি। সেই জন্য ভাল করে কাজ করতে পারছি না। আমি এখন রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে বনে গিয়ে তপস্যা করতে চাই। তার আগে তোমাদের একজনকে আমার সিংহাসনে বসাতে হবে। কিন্তু তোমাদের সবাইকে আমি খুব ভালবাসি, তাই কাকে রাজা করব ঠিক করতে পারছি না। সেই জন্য আমি তোমাদের একটা কাজ করতে দেবো। যে সেটা খুব ভাল ভাবে করতে পারবে, তাকেই রাজা করব। কাজটি হচ্ছে, আজ থেকে সপ্তম দিনে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা সোনার হরিণ আমাকে এনে দিতে হবে।"

ছোট রাজপুত্র মনমরা হয়ে বাড়ী গিয়ে ছোট যুবরাণীকে ঐ কাজের কথা জানালে সে মুচকে হেসে বলল, "মোটে একটা সোনার হরিণ! রাজপুত্র, তুমি নিশ্চিন্ত মনে খাও, বেড়াও, আমোদ কর। ঠিক সময়ে তোমাকে সোনার হরিণ এনে দেবো!" রাজপুত্র হরিণের খোঁজে কোথাও না গিয়ে বাড়ীতেই রইলেন। তার দাদারা সোনার হরিণ আনার জন্য শিকারে গেলেন। সাত দিনের ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগেই ছোট যুবরাণী ছোট রাজপুত্রের ঘুম ভাঙিয়ে বলল, "রাজপুত্র, তোমার সোনার হরিণ এসে গেছে, রাজার কাছে নিয়ে যাও।" রাজপুত্র চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে দেখলেন সত্যি, যুবরাণী সোনার শেকলে বাঁধা এক সোনার হরিণ ধরে দাড়িয়ে আছে।

সেই সোনার হরিণ রাজার কাছে নিয়ে গেলে রাজা খুবই খুশী হলেন। তার দাদারা সোনার হরিণ আনতে পারেনি দেখে ছোট ছেলেকেই রাজা করবেন জানালেন। বড় রাজপুত্ররা খুবই বিরক্ত হলেন। তাঁদের আর একবার সুবিধা দেবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। রাজা খুবই আপত্তি ও বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "আচ্ছা বেশ। এবারের কাজ হচ্ছে যে, আজ থেকে

সাতদিনের সূর্য ওঠার আগে, আমাকে এমন ভাত এনে দেবে যা কখনও বাসি হবে না, আর এমন রান্না করা মাংস আনবে যা সর্বদা টাটকা থাকবে, বিস্বাদ হবে না।"

ছোট রাজপুত্র খুব গম্ভীর মুখে বাড়ী গিয়ে ব্যাঙ্-রাজকুমারীকে নতুন কাজের কথা বললেন। শুনে সে হাসিমুখে বলল, "রাজপুত্র, তুমি এর জন্য ভেবো না। গত-বারের মতন খাও, বেড়াও, ঘুমাও। সেদিন সূর্য ওঠার আগেই ভাত ও মাংস যোগাড় করে দেবো।"

'মহারাজ, ছোট রাজপুত্রের হয়ে আমি উত্তর দি, আমিই তাঁর সুন্দরী মহিলা।' পৃঃ ৩৫৩

ছোট রাজপুত্র যুবরাণীর কথা মতই সাতদিন নিশ্চিন্ত মনে কাটালেন। কিন্তু তার তিন দাদা ঐ বিশেষ গুণের ভাত ও মাংসের খোঁজে বিদেশে রওনা দিলেন।

সাতদিনের সূর্য ওঠার আগেই ব্যাঙ্-রাজকুমারী তার স্বামীর ঘুম ভাঙিয়ে, খুব সুগন্ধি ভাত ও মাংস দিল। ছোট রাজপুত্র সেই অপূর্ব ভাত ও মাংস নিয়ে রাজার কাছে গেলেন। তার তিন দাদাও খুব সুন্দরভাবে রান্না করা ভাত ও মাংস নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ছোট রাজপুত্রের আনা ভাত ও মাংসর মতন কোনটাই না হওয়াতে রাজা জানালেন যে, এবারও ছোট রাজপুত্র জিতেছে। সুতরাং সেই রাজা হবে। বড় তিন রাজপুত্র আরও একবার সুবিধা দেবার জন্য রাজাকে বার বার

অনুরোধ করল। রাজা খুব রেগে উঠলেন এবং বিরক্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, "এই শেষ কাজ। আর সুবিধা দেব না। আজ থেকে সপ্তম দিনে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সব চেয়ে পরমাসুন্দরী মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।"

বড় তিন রাজপুত্র খুব খুশী হয়ে হাসতে লাগলেন। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, "বাঃ! বাঃ! এবার ছোট রাজপুত্র খুব জব্দ হয়ে যাবে। এবার আমাদের মধ্যে একজন জিতবই! হতভাগা ছোট কখনই সুন্দরী মেয়ে পাবে না। তার বৌ তো একটা হতকুৎসিৎ ব্যাঙ্।" এসব শুনে ছোট রাজপুত্রের মন ও মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। সত্যি তো তাঁর বৌ একটা কুৎসিৎ দেখতে ব্যাঙ্। আস্তে আস্তে বাড়ী পৌঁছেই ব্যাঙ্-রাজকুমারীকে ডেকে তিনি বললেন, "ছোট যুবরাণী, এবার আমাকে বিদেশ যেতে হবে, এবং সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে খুঁজে আনতে হবে। দাদারা এবার কিছু খোঁজ করবে না। বৌদিরা দু'জনে সত্যি খুব সুন্দরী। সেই জন্য আমাকেই বেশী খোঁজ করতে হবে।" ব্যাঙ্-রাজকুমারী খুব হাসতে হাসতে বলল, "রাজকুমার, তুমি মোটেই চিন্তা করো না। এখন যেমন খাও-দাও-বেড়াও, নিশ্চিন্ত মনে তেমনি খাও, বেড়াও আর ঘুমাও। ঠিক সময়ে তুমি আমাকে রাজার কাছে নিয়ে যেও। রাজা নিশ্চয়ই আমাকে সব চেয়ে সুন্দরী বলবেন।"

রাজপুত্র অবাক হয়ে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু ব্যাঙ্-রাজকুমারীকে খুব ভালবাসেন, তাই তার মনে কোনও দুঃখ দিতে ইচ্ছা হলো না। শুধু বললেন, "আচ্ছা রাজকুমারী সেদিন তোমাকেই আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

সপ্তম দিনে ভোরবেলা রাজপুত্রের ঘুম ভাঙিয়ে ব্যাঙ্-রাজকুমারী বলল, "রাজকুমার, আমি প্রসাধন করে ভাল কাপড় পরি যাতে খুব সুন্দরী দেখায়। তুমি ঘরের বাইরে গিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। যাবার সময় হলে আমাকে ডাক দিও।" রাজপুত্র কোনও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় হলে রাজকুমারীকে ডাক দিলেন। ভিতর থেকে উত্তর এলো, "আর একটু অপেক্ষা কর। মুখটা ঠিক করেনি।" কিছুক্ষণ পর রাজপুত্র আবার ডাক দিলেন, "এবার বের না হলে দেরি হয়ে যাবে।" ব্যাঙ্-রাজকুমারী ঘরের ভিতর থেকে বলল, "আচ্ছা, এখন দরজাটা খুলে দাও। আমি বের হব।"

রাজপুত্র ভাবছিলেন যে, ব্যাঙ্-রাজকুমারী যখন সোনার হরিণ ও সুগন্ধি ভাত আর সুস্বাদু মাংস যোগাড় করতে পেরেছে, তখন সে নিশ্চয়ই নিজেকে পরমাসুন্দরী করতে পেরেছে। এই ভেবে তিনি খুবই আশার সঙ্গে দরজা খুললেন। কিন্তু সেই আগের মতন কুৎসিৎ চেহারার ব্যাঙ্ দাড়িয়ে আছে দেখে তাঁর মন ভেঙে গেল। রাজকুমারীর মনে দুঃখ দিতে তাঁর মন চায় না, সেই জন্য একটাও কথা না বলে তাকে নিয়ে রাজার কাছে গেলেন। রাজসভাতে ঢুকে দেখলেন, তাঁর

দাদারা তাদের সুন্দরী স্ত্রীদের নিয়ে এসেছেন! রাজা ব্যাঙ্-কুমারীকে দেখে খুব অবাক হয়ে ছোট রাজপুত্রকে জিগ্যেস করলেন, "কৈ, তোমার সুন্দরী মহিলা কোথায়?"

ব্যাঙ্-রাজকুমারী রাজাকে প্রণাম করে বলল, "মহারাজ, ছোট রাজপুত্রের হয়ে আমি উত্তর দি। আমিই তাঁর সুন্দরী মহিলা।" বলেই তার ব্যাঙের পোশাক খুলে ফেলল। সবাই অবাক হয়ে দেখল, সূর্যের মতন ঝলমল্ করা সুন্দর সিল্কের সাজে সজ্জিতা পরমাসুন্দরী এক পরীরাণী! রাজা তাকে দেখেই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে পরমাসুন্দরী বলে স্বীকার করলেন এবং ছোট রাজ-পুত্রকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

ছোট রাজপুত্র ব্যাঙের কুৎসিৎ খোলসটা ব্যবহার করতে নিষেধ করলে, যুবরাণী রাজী হয়ে খোলসটা আগুনে পুড়িয়ে দিল।

শতবর্ষের আলোয়

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

তুমি বলেছিলে, মন থেকে ঘৃণা বিদ্বেষ দূর হোক
হৃদয়ে হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হোক মৈত্রীর শুভ শ্লোক।
সমাজ-রাষ্ট্র-শোষণে যাদের জীবন না-মঞ্জুর,
মানুষের পুরো মর্যাদা পাক মেথর ও মজদুর।
তুমি চেয়েছিলে অহিংসা দিয়ে হিংসার হোক লয়—
অহিংসা ধরে অমিত শক্তি—ক্লীবতা কখনও নয়।
হত্যা বাড়ায় হত্যা সতত, লোভ ডেকে আনে লোভ,
অহিংসা সেরা হাতিয়ার, যাতে স্থির সব বিক্ষোভ।
তুমি দেখেছিলে সত্যের পথ সরল তীরের মতো,
সব বাধা, সব সংশয় হয় যেখানেতে প্রতিহত।
আফ্রিকা থেকে ভারত হৃদয়-দেবতার নির্দেশে,
একলা-চলার পথে গেলে তুমি মানুষকে ভালবেসে।
চূড়ান্ত কথা বলেছ—তোমার জীবনই তোমার বাণী,
শতবর্ষের অমল আলোয় কতোটুকু তার মানি!

ঘটনাটা সত্যিই, তবে ব্যাপারটা বড্ড গম্ভীর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

তোমাদের কারুর মুদ্রাদোষ আছে নাকি? একটা কথা প্রত্যেক কথার শেষে বলা? আমার অমৃত জ্যাঠা কথায় কথায় বলতেন, 'তোমার গে'—সব কথায় সেই কথা—'তোমার গে, ওরে তোরা কেমন আছিস?' অমৃত জ্যাঠা আমাদের বাড়ী এলে আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে চোখে চোখে কথা হয়ে যেত, ছোটখাটো একটা হইচই, ফিসফিসানি, চাপাহাসি। তাছাড়া অমৃত জ্যাঠা এত পান খেতেন আর এত অসাবধান ছিলেন যে, দু' কষ বেয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়তো, তাঁর হুঁস থাকত না। এত বিশ্রী দেখাতো যে, কত সময় আমরা নকল করেছি অমৃত জ্যাঠা সেজে।

এক মাসতুতো দাদার মুদ্রাদোষ ছিল 'ইতিমধ্যে' বলা। সব কথায় মানে হোক আর না হোক 'ইতিমধ্যে'টি ঠিক আছে।

আর ছিল পান্নুকাকার মুদ্রাদোষ—'ড্যাম ইট'। ছোট বেলা থেকেই সব কথায় 'ড্যাম ইট।' ঠাকুমাকে বলতে শুনেছি: কি এক কথা শিখেছিস পান্নু, কি কথার ছিরি তোর? কিন্তু ঠাকুমা বললে কি হয়, ও অভ্যাস কি যাবার? পান্নুকাকা মোচার ঘণ্ট খেতে ভালবাসেন—ঠাকুমা নিরামিষ ঘর থেকে নারকোল কোরা মাখা মোচার ঘণ্ট এনে পাতে দিলেন। কাকা খুসী হয়ে বলে উঠলেন, 'ড্যাম ইট'। ঠাকুমা ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, ঐ অভ্যাসটা কি তোর যাবে না পান্নু?

তখন আমরা বেস একটু বড় হয়েছি, ভাইবোনেরা আড়ালে-আবডালে একটু আলোচনা করি। কে কি রকম কথা বলে, কি করে হাঁ করে, মুখের ভিতর কতটা দেখা যায়, অতল গহ্বর যেন, কার কি মুদ্রাদোষ, খাবোনা-খাবোনা করে কে থালাসুদ্ধ খাবার সাবাড় করে, দত্ত বাড়ীর জ্যাঠাইমা কি রকম নথ নেড়ে কথা বলেন, কালীঘাটের মাসীমা কি রকম ভালোবাসেন—কেমন চেহারাটা ভালবাসায় মাখা, যখন আসেন কত খাবারদাবার আনেন, কত পুতুল খেলনা কালীঘাটের, দাদারা কি মজা করে—কিন্তু অত সুন্দর মাসীমা যখন কথা বলেন, কেবল বৌমার অখ্যাতি—এটা আমাদের ছোট মনে বড্ড রেখাপাত করতো।

পান্নুকাকার মুদ্রাদোষ প্রায় পুরোনো গা-সহা হয়ে এসেছে—তখন চলছে খোকনদা'র 'ইংলিশ'। সব কথায় বেশ বড় জিনিস বা পছন্দসই বস্তুকে বোঝাতে হলে বলতো 'ইংলিশ'। শেষে সব কথার মাঝেই ঐ কথা মুদ্রাদোষে দাঁড়ালো। এই সময় একদিন হঠাৎ ছোটদাদু, অর্থাৎ পান্নুকা'র বাবা মারা গেলেন। পান্নুকাকাই একমাত্র ছেলে। খবর শুনে কত লোক এলেন, এলেন দিল্লী থেকে ন' খুড়ীমা, পান্নুকাকাকে প্রায় ছোট থেকে মানুষ করেছেন বললেই হয়—বললেন: ওমা পেনো, মা কবে গেছেন, বাবাও গেলেন বৌ নাত্তির মুখ দেখলেন না!

এই রকম দুঃখের কথা কত লোক জানিয়ে গেল। এইসব কথা শুনে পানুকাকার চোখের কোণ চিকচিক করছিল বটে, কিন্তু মুখে সেই এক কথা 'ড্যাম ইট'।

পানুকাকার চেহারা আর মনের অবস্থা দেখে আমাদের খুব খারাপ লাগতো, কম্বলের আসন, এটা-ওটা এগিয়ে দিতে তৎপর থাকতাম। কেমন যেন চুপসে গেছেন পানুকাকা। অমন ফিটফাট বাবুলাট চেহারা যেন একেবারে অন্য রকম! মাথার চুল শুকনো উড়ছে, আধময়লা পাতলা চাদরটায় গা-ঢাকা—যেন ভিখিরীর চেহারা। পানুকাকার জন্য আমাদের মনে দুঃখের যেন অন্ত নেই।

কিন্তু সেদিন শ্রাদ্ধের দিন। শ্রাদ্ধবাসরে কত কি সাজানো হয়েছে। খাট, বিছানা, ছাতা, জুতো, চাল ডাল সবজী, বাসনপত্র—কিছু বাদ নেই। বাড়ীতে কত লোক গিসগিস করছে। লুচি ভাজার গন্ধ আসছে, কুমড়োর ছক্কা, কপির ডালনা, বেগুন ভাজা প্রভৃতি কত কি রান্নার সুবাস, আবার অন্যদিকে থরে থরে মিষ্টি খাবার। সেদিকে লোভ জাগলেও আমরা সেই শ্রাদ্ধের জায়গাটিতে বসে পুজা দেখছিলাম। পিণ্ডিগুলো নিয়ে মন্ত্র পড়ে নিবেদন করতে হয়। সেইসব নাকি যাঁদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তাঁরা এসে গ্রহণ করেন—সে সব চোখে আমরা দেখতে পাই না। পুরোহিত তিল মাখা ভাতের পিণ্ডি পানুকাকার হাতে তুলে দিলেন, দিয়ে মন্ত্র পড়াতে লাগলেন, মন্ত্র শেষ হলে চোখ বুঁজে তাঁকে মনে করে সামনে রাখা পাত্রে দিয়ে দিতে হবে শ্রদ্ধাভরে।

পানুকাকা মন্ত্র শেষে পিণ্ডদান করেই বলে উঠলেন: 'ড্যাম ইট'। আমরা যেন ছোটদাদুকে সামনে দেখার মত চমকে উঠলাম। পুরোহিতের মুখটা অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে গেল, কপাল কুঁচকে উঠলো, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বাবা কেবল আস্তে আস্তে বলে উঠলেন: ইস্, পানু যে কী করে! অমৃত জ্যাঠা গুনগুনিয়ে উঠলেন: ঠিক বলেছ, তোমার গে, এটা কি ঠিক হলো!

আমরা ছোটর দল আর সেখানে থাকতে পারলুম না, ছুটে চলে এলাম।

এই রকম মুদ্রাদোষে কত যে বিশ্রী পরিস্থিতি হয় তা আরো কয়েকবার দেখেছি। মুদ্রাদোষটা ত্যাগ করাই ভাল। দাদুর বন্ধু প্রমথদাদু কিছু কাজে মন দিলেই জিবটা বার করে বাঁ দিকে বাঁকিয়ে নিতেন—মাঝে মাঝে জোর দিয়ে ফেলে নিজেই আহা-উহু করতেন। আমরা কত সময় জিব ভেঙ্গাতে গিয়ে বকুনি খাবার ভয়ে সামলে নিয়ে বলেছি, 'প্রমথদাদু হয়েছি।'

তাই মুদ্রাদোষ ত্যাগ করাই ভাল, না হলে সন্তুর মত অবস্থা হলে আর রক্ষে নেই! সব কথায় সনৎ বা সন্তু বলতো, 'সত্যি বলছি'। ক্লাসে এমন এমন ঘটনার পর 'সত্যি বলছি' বলতো যে, অর্থটা অন্যরকম দাঁড়িয়ে যেতো। তাছাড়া সন্তুর নামকরণই হয়ে গিয়েছিল, 'সত্যি বলছি'। মাষ্টার-মশাইরা কতদিন কতবার বারণ করেছেন, সংশোধন করে নিতে বলেছেন, কিন্তু কি জানি কেন তা হয়নি। সন্তু কোন্ কথাটা কখন সত্যি বলছে মিথ্যে বলছে তা বুঝতে খুবই অসুবিধা হতো! কিন্তু তবু এই 'সত্যি বলছি' বলা তার গেল না।

তখন কিন্তু স্কুলে বেশ শাস্তি দেওয়া হতো। কান ধরে কোণে দাঁড়ান, বকুনি, চড়-চাপড় বা বেত খেতে হতো। ছোটখাট শাস্তি কত যে সন্তুকে ভোগ করতে হয়েছে তার হিসেব নেই!

হারাধন যেমন ছিল পড়াশুনোয় অমনোযোগী, তেমনি ছিল তার হাত-সাফাই। পেনসিল, কলম, খাতা এটা-ওটা, পয়সা কেমন করে যে নিয়ে নিতো আর ধরা যেতো না তাকে। অবশেষে একদিন ধরা পড়েছিল। আর সব দিন সে বেমালুম উতরে গিয়েছিল।

সেদিন শোভন স্কুলের মাহিনা এনেছে, টিফিনের পর গিয়ে জমা দিয়ে আসবে, কিন্তু দেখা গেল টাকা নেই। শোভনের পাশে বসতো সন্তু। অনেক খোঁজাখুজির পর যখন পাওয়া গেল না, তখন টিফিনের পরে ক্লাস-টীচারকে জানানো হলো এবং আবার একদফা খোঁজাখুজি চললো। শোভন নাকি একবার একটুখানি বেরিয়েছিল বাথরুমে, কিন্তু আর সবাই তো আছে। ক্লাস-টীচার নতুন, বিশেষ কাউকে চেনেন না, তাই প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করলেন। না, না, না সবাই সমস্বরে বলছে। টিফিন সেরে সন্তু যেই ক্লাসে ঢুকেছে—তিনি বললেন: সনৎ তুমি তো শোভনের পাশে বসেছিলে তুমি জানো নিশ্চয় ওর টাকা কি হয়েছে?

আগাগোড়া ঘটনাটা সন্তু জানতো না, সে বললে: টাকা, কিসের টাকা—সত্যি বলছি।—

তার 'সত্যি বলছি'টা এমনভাবে শোনালো—কোনো জিনিস নিয়ে অস্বীকার করলে যেমন হয়—তেমনি।

কঠিন কণ্ঠে মাষ্টারমশাই বললেন: কোথায় রেখেছ দাও, এমন চোর ছেলে তুমি, কাল থেকে আর স্কুলে আসবে না। তোমরা দেখতো ওর বই খাতা সব।—

হারাধন আগে এগিয়ে এসে জ্যামিতির বক্সটা খুলেই বললো—এই যে স্যার, এর মধ্যে!

আসলে ওটা হারাধনের হাতেই ছিল। কিন্তু দশচক্রে ভগবান ভূত হয়ে পড়লো।

ক্লাসের সব ছেলেরা সন্তুকে জানে, সে কখনও এমন করবে না, কিন্তু মাষ্টারমশাই এত রেগে গেছেন যে তারা কিছু বলার সাহসই পাচ্ছে না।

অবশেষে সন্তুকে কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন তিনি অফিস-ঘরে। হারাধন পিছনে পিছনে চললো আর সব ছেলেরা হতবাক হয়ে বসে রইল, আর একটি মিথ্যে ঘটনায় সন্তুর পড়ার জন্য তাদের দুঃখের সীমা রইল না।

কিছুক্ষণ পরে হারাধন এসে বললে: খুব শাস্তি হচ্ছে—ওকে পুলিশে দেওয়া হবে। ও যে নিয়েছে তা স্বীকার করছে। হেড স্যার যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিয়েছিলে সত্যি বলো! ও বললে: সত্যি বলছি।

সেদিন আর ক্লাসে সন্তু এলো না। ছুটির পর তাকে দেখাও গেলো না। শোভন, অসীম

আর মলয় সন্ধ্যা বেলায় তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। গিয়ে দেখলো হেডমাষ্টার মশাই ও সন্তুর বাবা কথা বলছেন—

আমার ছেলে কখনও একাজ করতে পারে না। আপনি ক্লাসের অন্য ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন না কেন?

—যথেষ্ট প্রমাণ পেয়ে তবে বলছি—আপনি ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিন, তাছাড়া কেন ও কথা বলছেন—ও তো নিজেই বলছে সত্যি কথা।

'মাষ্টারমশাই বললেন: যথেষ্ট প্রমাণ পেয়ে তবে বলছি'—

শোভন আর স্থির থাকতে না পেরে সামনে গিয়ে বললে, আমায় ক্ষমা করবেন স্যার আমরা জানি সন্তু টাকা নেয়নি, যে বার করেছিল, অনেকক্ষণ আগেই তার হাতে টাকা আমরা দেখেছি। আর সন্তু কি স্বীকার করেছে চুরি করেছে বলে?

—হ্যাঁ, ও তো আগেই বলছে 'সত্যি কথা' বলছে।

সন্তুকে ডাকা হলো, সে বললে: টাকা? সত্যি বলছি—

বাধা দিয়ে হেডমাষ্টার মশাই বললেন: সত্যি বলছো তো টাকা নিয়েছিলে?

সন্তুর বাবা বললেন: সত্যিই বলছে ও যে টাকা নেয়নি—'সত্যি বলছি' বলা ওর অভ্যাস।

—তাহলে কে টাকা নিয়েছিল, জানো?

—টাকা? সত্যি বলছি, হারুর কাছে দেখেছি, সত্যি বলছি···।

—আর তোমায় সত্যি বলতে হবে না—ব'লে চেয়ার ছেড়ে উঠে নেমে পড়লেন হেডমাষ্টার মশাই।

শোভন রেগে গিয়ে বললে: 'সত্যি বলছি' যদি বলা না ছাড়তে পারিস—জেলে গিয়ে পচে মরগে যা!
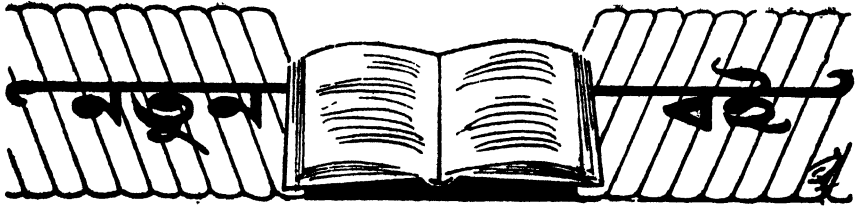
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

শহীদের রক্তে রাঙা—শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য। ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৫৭-সি কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১'৭৫

যে-কোন দেশেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধাদের স্থান সবার উপরে, তাঁরা জাতির শ্রদ্ধার পাত্র, নমস্ত, চিরস্মরণীয়। আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদিকাল থেকে, জাতীয় শহীদের নিয়ে গল্পচ্ছলে এই সুন্দর বইখানি ছোটদের জন্য রচনা করেছেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য। ভারী সুন্দর রচনার ভঙ্গীটি। দেশের ছেলেমেয়েদের এ বই পড়া অবশ্য কর্তব্য এবং এটি স্কুলের পাঠ্য হলেও তারা উপকৃত হবে। কয়েকখানি ছবিও আছে বইখানির মধ্যে। উপরের প্রচ্ছদপটটিও ভারী সুন্দর।

পিঁপড়ে হাতি—শ্রীবলরাম বসাক। ক্রান্তিক প্রকাশন, ১০।২৫ডি। ২এ, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা ৩৩। মূল্য ২'৫০

ছোট ছেলেদের জন্যে মিষ্টি করে লেখা দশটি মজাদার গল্পের সচিত্র বই। প্রত্যেকটি গল্পই পড়লে ছোটরা আনন্দ পাবে। লেখকের নাম শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুব পরিচিত না হলেও, এই লেখায় তিনি অনেক খ্যাতিমানকেও হার মানিয়েছেন। উডকাট বা লিনোকাট ধরনের পাতাভরা ছবি ক'খানিও অভিনব। শিল্পী প্রণবেশ মাইতির আঁকা রঙদার প্রচ্ছদপটটিও মনোরম।

মণিমাণিক—শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত। লেখাপড়া, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১'৫০

কবি ও সাহিত্য সমালোচক হিসাবে সুশীলকুমার গুপ্ত খ্যাতিবান। তিনি যে ছোটদের জন্যে সুন্দর ছড়াও লিখতে পারেন, এ বইখানি তারই নিদর্শন। বাইশটি কবিতা বা ছড়া আছে এই বইয়ে এবং এর প্রত্যেকটি পড়েই তোমরা খুশি হবে এই জন্যে যে, সবগুলিই হাসির ও মজার। এই ছড়াগুলির সজে আবার শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীর ছবিগুলি যাকে বলে সোনায় সোহাগা হয়েছে। বইখানি দু'রঙে ছাপা, কাগজও ভাল আর মলাটের ছবিখানি ভারী সুন্দর।

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০'৬০ পয়সা
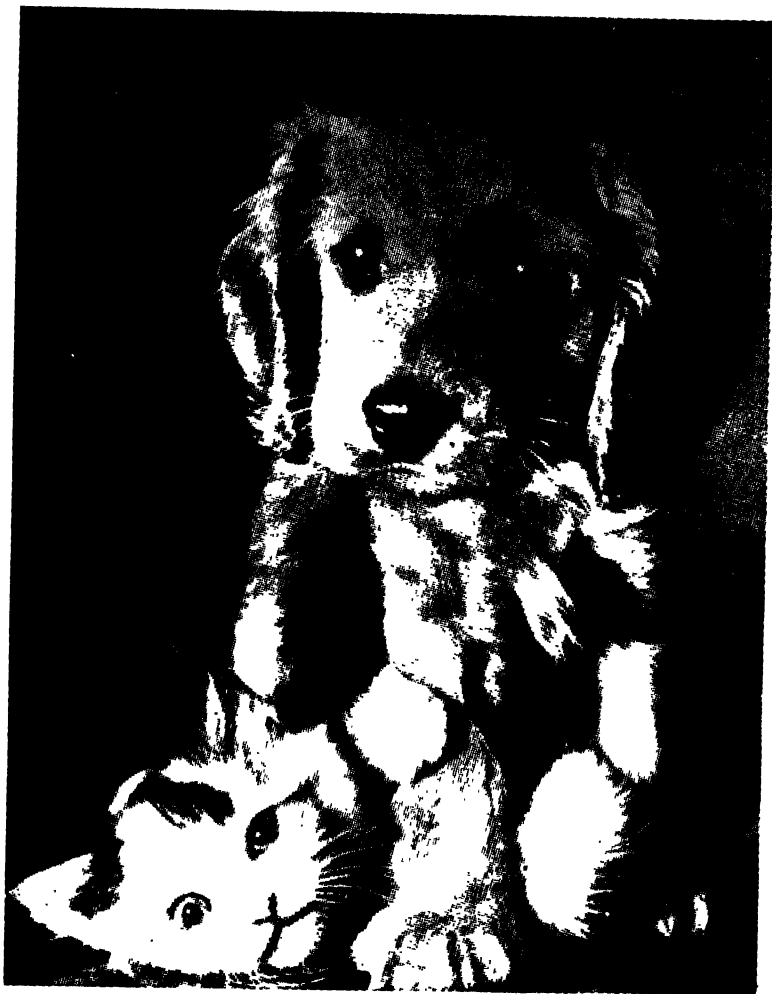
দুই বন্ধু

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্র *

৫০শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৭৬ [৮ম সংখ্যা

খুকুর বিদ্রোহ

শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

খুকুমণি চড়া গলায়
বলল মাকে,—
কেন গো মা, সবাই মিলে
আমায় বকে ?
আমি নাকি নোংরা বুড়ি ?
আমি নাকি কাগজ ছিঁড়ি ?
জিনিসপত্র ভাঙ্গিচুরি,
নষ্ট করি ?
ঘরের মধ্যে খেলনাপাতি ছড়িয়ে রাখি ?
দেওয়ালেতে ছবি আঁকি।
ওসব কাজ কি নোংরা নাকি ?
কি আশ্চর্য !
ছবি আঁকা নোংরা কার্য ?

শুনিনি মা, এমন কথা এ জীবনে
স্বষ্টিছাড়া— !
খেলাধুলা করলে কেবা
বলে কবে লক্ষ্মীছাড়া ?
আর বড়োরা, সবাই যখন যুক্তি ক'রে
মোড়ে মোড়ে জঞ্জালেরি পাহাড় করে ?
দেয়ালেতে কাগজ মারে ?
কালি দিয়ে লেখে যাতা-ই ?
বুলিয়ে চলে আলকাতরাই ?
নোংরা ছড়ায়, গন্ধে ভরায় শহরটাকে,
তখন তাকে
কি কাজ তুমি বলবে শুনি ?
ও মা-মণি— ?
নিজেই সাফা নয়কো যারা
পরকে বকা ? কেমন ধারা
আইন এটা ?
পরকে শুধু লাঠি পেটা—
নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি,
পরের বেলায় দাঁতকপাটি—!

॥ ছড়াছড়ি ॥

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভজহরি মান্না
ব্যামো তাঁর কান্না,
নিরামিষ রান্না
একটুও খান না।
দিদি তাঁর—আন্না।

রাখোমণি খান্না—
মামাবাড়ী যান না,
বিস্কুট পান না,
চকোলেট চান না।
চান চুনি, পান্না ॥

যদুমাষ্টারের পাঠশালা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ষষ্ঠীচরণের বৈঠকখানায় সন্ধ্যের আড্ডা বসেছে। রোজ বসে। বয়স সবার বাট্‌-সত্তরের মধ্যে। দু'একজন কম-বেশিরও আছে। চা-পাঁপার, হুঁকো-গড়গড়ার সঙ্গে গল্প। নতুনও কিছু কিছু হয়, নিত্য যা ঘটেছে আর নিত্য রেডিও আর খবরের কাগজগুলো যা রটাচ্ছে। তবে, পুরনোই বেশি; নতুন তেমনি তাজা আর চমক-লাগা না হ'লেই, নয়তো থাক্‌, ভাবটা এই। পুরনো কালটাকে আটকে রাখবার জন্যেই হুঁকো আর গড়গড়া; নইলে ও-জিনিস আর কেথোয়? তোমরা হয়তো দেখোও নি অনেকে।

গল্প বলছিলেন ঘনশ্যাম বাবু। কাঁচাপাকা দাড়ি, পাকাই বেশি; ঐরকম বড় বড় চুল। বেশি না হলেও একটু মোটার দিকেই। সব মিলিয়ে অনেকটা ঐ বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন ছিলেন। বাইরে বাইরে ঘনশ্যাম ছিলেন গম্ভীর, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যাকে বলা যায় রগুড়ে। উনি কাজ করতেন স্কুল-ইনস্‌পেক্‌টারের। আরম্ভ করেন গোড়া থেকেই; প্রথমে গুরুমশাইয়ের পাঠশালা পরিদর্শন, সেগুলোকে গুছিয়ে-গাছিয়ে প্রাইমারী স্কুল করা হয়, তার সঙ্গে মিড্‌ল্‌ স্কুল, সেখান থেকে ছেলেরা সকালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিত। ব্যবস্থাটা আজকালকার সঙ্গে ঠিক মেলে না। একেবারে শেষের দিকে কিছুদিন হাই-স্কুলেরও ইনস্‌পেকটার হয়েছিলেন। ওঁদের আমলে ও-চাকরি সাহেবদেরই একরকম একচেটে ছিল।

সায়েবরা প্রায় দু'শো বছর ধরে এই সেদিন পর্যন্ত যে আমাদের ওপর রাজত্ব করে গেছে, এটা বোধ হয় তোমাদের অনেকের কাছে এখন গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভালোই। অনেক ভুগিয়েছিল। এবার তোমরা ঘনশ্যামের গল্পটা শোন।

ওঁর গল্পটা শুরু হোল তামাক খাওয়া নিয়ে। আড্ডায় চাকর কলকে সেজে নিয়ে এসে ওঁর হুঁকোয় বসিয়ে দিতে. দুটো টান দিয়েই কাশতে কাশতে ব'লে উঠলেন, "বাবা, এ যে সেই—যদুমাষ্টারের পাঠশালার শিরপোড়োকে ডাকতে হয়…"

সবাই ধ'রে বসল, গল্পটা বলতে হবে। উনি কাশি খানিকটা সামলে নিয়ে আরম্ভ করলেন—

"আমি যখন কাজে ঢুকি সে-সময় গাঁয়ের পাঠশালাগুলোকে সোদরাবার চেষ্টা হচ্ছে। খুব কঠিন কাজ; কেন না তখন লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা গাঁয়ে খুবই কম, যায় জন্যে পাঠশালার গুরুমশায়েরা, পেটে যেটুকু বিদ্যে আছে তাই দিয়েই খুব প্রতিপত্তি জমিয়ে রাখত। তারা যা খুশি করছে, গবর্মেণ্ট হাতে নিলে কতকগুলো

নিয়মের মধ্যে ফেলে দেবে, হিসেব রাখতে হবে, ইনস্পেকটার আসবে মাঝে মাঝে তদারক করতে—এসব তারা তো পছন্দ করতে পারে না, নানা রকমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। পাঠশালা থেকে প্রাইমারী স্কুলে মর্যাদা দিলে সরকার টাকা দিত, বেশি শিক্ষক রাখত যাতে ভালোভাবে চলে। টাকা দিতে হোত বলেই আবার সে পাঠশালাগুলো ভালোভাবে চলছিল, গুরুমশাইয়ের সুনাম ছিল, তাদের ছেড়েও দিত, প্রথম দিকে। চলছে তো চলুক।

আর এক ধরণের গুরুমশাই ছিল যাদের নিয়ে সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে সে সময়। এরা পাঠশালাকে স্কুল করিয়ে নিয়ে সরকারের কাছ থেকে টাকাও নিত, আবার বাইরে বাইরে সেই পাঠশালার ঠাট বজায় রেখে ছেলেদের কাছ থেকেও মাইনে ব'লে, পার্বণী ব'লে যা আদায় করবার করত। শহর থেকে খুব দূরের গ্রামগুলিতেই এই রকম হোত বেশি। তখন ভালো রাস্তা, বাস এসব তো ছিল না। রেলও কম। গিয়ে দেখেশুনে ঠিকঠিক খবর নিয়ে আসা খুব শক্তই ছিল। গুরুমশাইরা নিজেদের রাজত্ব চালিয়ে যেত।

এর মধ্যে বাকলা-গোপালপুরের যদুমাষ্টার ছিল সব চেয়ে নামকর। তাকে কোনমতেই শায়েস্তা করা যাচ্ছিল না। আর, এমনি কপাল, নতুন চাকরি নেওয়ার সঙ্গেই আমার ওপর হুকুম হোল বাকলা-গোপালপুরেই গিয়ে যদুমাষ্টার কি করছে-না-করছে স্বচক্ষে দেখে এসে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। এদিকে, আমি ছেলেবেলা থেকেই কলকাতায় মানুষ, গুরুমশায়ের পাঠশালার নামই শুনেছি, কিন্তু কী যে জিনিস মোটেই জানি না। রীতিমত ফ্যাসাদে পড়া গেল।

কিন্তু সেকালে লাল মুখের হুকুম একবার বেরিয়ে গেলে তার আর কাটান্-ছাড়ান্ ছিল না। এখনকার মতন শ্বশুরবাড়ি যাবে তাও ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে ছুটি কি পঁচিশ বছর আগে-মরা দিদিমার মৃত্যুশয্যার নামে ছুটি—এসব চলত না। না পার, চাকরি ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বোস—এই ছিল সোজা কথা।

নতুন চাকরির মায়া, রাজী হয়ে গেলাম।

যখন হলাম রাজী তখন আবার বেশ উৎসাহের সঙ্গে লেগেও গেলাম। নতুন বয়েস, গায়ে শক্তি আছে, ভাবলাম, গোড়াতেই একটা শক্ত কাজে উৎরে যেতে পারি তো—একবার সায়েবের নজরে পড়ে গেলে তরতর ক'রে এগিয়ে যাব।

তা, বেশ শক্ত কাজই।

প্রথম তো শুধু দূরই নয়, পথও দুর্গম। আদ্দেকের বেশি ছই-ওলা গোরুর গাড়ি,

তারপর কোশ-তিনেক পায়ে হাঁটা মেঠো পথ, তারপর নৌকো। এর চেয়েও যা শক্ত তা হচ্ছে, এইভাবে গিয়েও ঠিক ঠিক অবস্থার পাত্তা পাওয়া। অতি ধূর্ত যত্নমাষ্টার, যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেল যে কেউ ইনস্‌পেক্‌শন করতে আসছে তো সব ঠিকঠাক ক'রে ফেলে এমন সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখত যে, তাকে ধরাছোঁয়াই যেত না। রিপোর্ট ভালই দিতে হোত, গ্র্যাণ্টের টাকাও যেত। আবার মাঝে মাঝে বেনামী চিঠিও আসত, যত্নমাষ্টার দু'হাতেই টাকা লুটছে। বৃথা জেনে সব ইনস্‌পেকটাররাই খানিকটা পথ থেকে ফিরেই এসে মিথ্যে রিপোর্ট দাখিল করত। বাকলা-গোপালপুর একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শিক্ষাবিভাগের কাছে।

যখন নিরুপায় হয়ে নামতেই হোল, উৎসাহের সঙ্গেই নামলাম। তারপর আবার সে উৎসাহটা বেড়ে গেল, যখন যাওয়ার আগের দিন সায়েব আপিসে ডেকে আমার পিঠ চাপড়ে বলল,—"ইয়ং ম্যান, আমি যদি বুঝি তুমি সেখানে গিয়ে সত্যিই একেবারে পাকা খবর নিয়ে এসেছ তো তোমার কথা ভুলব না।"

—বাংলায় যার মানে হয়, উন্নতির জন্যে আর আমায় ভাবতে হবে না। খুব ভরসার কথা নয়?

অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, চোরের ওপর বাটপাড় হ'তে না পারলে যত্নমাষ্টারকে কায়দায় আনা যাবে না। একেবারে নতুন রাস্তা ধরলাম। প্রথমত আমি যে ইনস্‌পেকশনে যাচ্ছি আপিস থেকে এ ধরণের খবর দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলাম, সায়েবকে জানিয়েই। তারপর, যেটা কাউকেই জানালাম না, সেটা হচ্ছে আমি ছদ্মবেশে একেবারে হঠাৎ গিয়ে পড়ব, যাকে সারপ্রাইজ ভিজিট (Surprise visit) বলে। এই মতলবটা ঠিক ক'রে ফেলতে আর একটা সুবিধে এই হোল যে, যে-কাজটাকে আগাগোড়া নেহাৎ শুকনো নিরস মনে হচ্ছিল, সেটাই আবার টক-ঝাল-মিষ্টিতে বেশ সরস হয়ে উঠল। কষ্ট থাক, তার মধ্যে আবার একটা রগড়ও তো; কে হারে কে জেতে নিয়ে বেশ খানিকটা উত্তেজনাই। একটা এ্যাড্‌ভেন্‌চার (Adventure)। শারদীয়া কাগজগুলোর ভাষায় একেবারে "রোমাঞ্চকর!" না হলেও মন্দ কি?

মাথা খুলে গেছে, আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া গেল।

দুপুরের খানিকটা পরে বেরিয়ে আমি তার পরদিন যখন বাকলা নদীর এপারে গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন সবে ভোর হয়েছে। প্রথম ছই-ওলা গোরুর গাড়িটা সন্ধ্যার খানিকটা আগে ছেড়ে দিয়ে, ক্রোশখানেক মেঠো পথ ভেঙে, অন্য একটা নদী পেরিয়ে, এপারে আর একটা গাড়ি গ্রাম থেকে ভাড়া করি। সমস্ত রাত বেশ ঘুমুতে ঘুমুতে এসেছি, নদীর তীরে ভোরের হাওয়ায় বেশ

তাজা বোধ হচ্ছিল, আর তাইতেই মাথাটা গেল খুলে। নদীর ধার থেকে গ্রামটা কোশখানেকের মধ্যেই, মাঝে আর একটা ছোট গ্রাম, নদীর নামে তারও নামটা বাকলা-মাঝেরপাড়া। খেয়া-ঘাটের মাঝির একটা ছেলেও আমাদের সঙ্গ নিল, এমনি পারাপার করবার আনন্দেই। ছেলেমানুষ, বছর এগারো-বারোর মধ্যে বয়েস, কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কোমর বেঁধে কাপড়-পরা। বিশেষ করে স্বাস্থ্যটি ঢলঢল করছে। আমার শহুরের চোখ ব'লেই বারে বারে গিয়ে পড়ছিল ছেলেটির ওপর, একসময় চমৎকার একটি বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। এদিকে তো আমি আধ-ময়লা কাপড় পরে একটা ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই চাপিয়ে বেশ পাড়াগেঁয়ে গেরস্তর মতন সাজ ক'রে নিয়েছি, কিন্তু কি ব'লে যদুমাষ্টারের পাঠশালায় গিয়ে উঠব তার একটা স্পষ্ট ধারণা ক'রে ওটা হয়নি। ছেলেটার দিকে চাইতে চাইতে মতলবটা এসে গেল মাথায়। মাঝিকে বললাম—আমি নতুন মানুষ, গোপালপুরে যদুমাষ্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাব, পথ জানা নেই, তোমার ছেলেটিকে যদি সঙ্গে দাও তো বড় উপকার হয়। আবার ঘণ্টা দুয়েক পরে আমার সঙ্গেই ফিরে আসবে, যদি চায় তো আগেও চলে আসতে পারে; এর জন্যে যা চায় দোব।

একটা টাকা চাইল। সেকালে এক টাকার অনেক দাম। তবু রাজী হয়ে গেলাম। তারপর খেয়া পেরিয়ে হাঁটা-পথে যেতে যেতে আসল মতলবটা বললাম ছেলেটাকে। নামটা যেন রাখাল, কি, এইরকম একটা কিছু, অনেক দিনের কথা ঠিক মনে পড়ছে না।

বললাম—আমি গিয়ে বলব এ আমার ভাগনে, একে পাঠশালায় ভর্তি করাতে নিয়ে এসেছি, সে যেন চুপ করে বসে থাকে।

ভর্তি হওয়ার নামে তো ছেলেটা আঁৎকে দাঁড়িয়ে পড়ল—"আমায় পাঠশালে দেবে !!"—যেন ফাঁসিতে ঝোলাতে নিয়ে যাওয়া হবে !

পালাবে, এইভাবে একটু বেঁকেও দাঁড়িয়েছে, আমি পিঠে হাত দিয়ে বললাম—"পাগল ?—তা কখনও পারি ? তুই কে, আমি কে। শুধু বলব ঐ কথাটা ; একটা নতুন লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, কিছু একটা না বললে চলবে কেন ? এই নে একটা সিকি নে, ফিরে আসবার সময় আর একটা দোব, দুটো মিলিয়ে আট আনা হবে তোর। বিড়ি টানতে শিখেচিস তো ?"

ঘাড় কাৎ করে জানাল, শিখেছে, বাপকে জানাতে বারণ করল।

বললাম—"পাগল ? তা কখনও বলি ? আর তুইও এই যে দুটো সিকি পাচ্ছিস তার কথাও তোর বাবাকে বলবি নে। চল্।"

নদীতেই মুখ হাত ধুয়ে নিয়েছিলাম। মাঝেরপাড়ায় রাস্তার ধারে একটা তেলেভাজার দোকানে ছেলেটাকে খাইয়ে দিলাম, নিজেও খানকয়েক তেলেভাজা জিলিপি খেয়ে জল খেয়ে নিলাম।

তারপর গ্রামে ঢুকতে-না-ঢুকতে যদুমাষ্টারের দাপটের এক নমুনা !!

বেলা তখন প্রায় আটটা হয়েছে। আমরা একটা ডোবার এপারে। ওপারে একটু দূরে একটা ঝোপঝাড়ের আড়ালে মনে হোল যেন কুড়ি-পঁচিশ জন ছেলের গলায় আজকালকার ছেলেদের মতন কি একটা শ্লোগান উঠছে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। তারপরেই, সেটা থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চড়বড়-চড়বড় করে সেও এক কানে তালা-লাগানো শব্দ। দু'টোতে মিলিয়ে বাড়িতে নতুন ছেলেমেয়ে হ'লে কুলো বাজিয়ে যে আটকৌড়ে হয়, কতকটা সেই রকম। তবে আটকৌড়ে হয় সন্ধ্যের সময়, আর এ সকালবেলা। সেই জন্যে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম —"হ্যারে, আটকৌড়ে কি তোদের এদিকে সকলেই হয় নাকি ?"

ছেলেটা মুখ তুলে প্রশ্ন করল—"কনে দেখলে ?"—অর্থাৎ কোথায় দেখলে ?

বললাম—"কেন, ঐ তো কি বললে আর তার সঙ্গে চড়বড় করে আওয়াজ। ঐ—ঐ।"

ছেলেমানুষরা বড়দের বোকার মতন কথায় যে আমোদ পায়, সেই ভাবে একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বলল—"ও তো পাঠশালার পাব্বণী আদায়। ওরা তো ঘরে ঘরে যাবে, অত খোকাখুকি কমনে পাবে তারা ?"

ওদিকে ও আমার কথায় আশ্চর্য হয়ে উঠেছে, ঘরে ঘরে এত খোকাখুকি থাকা সম্ভব নয়, এ সামান্য কথাটা বুঝি না ; এদিকে আমি আশ্চর্য হচ্ছি পাঠশালার পার্বণী আদায়টা কি ? আদায়টা করেই বা কে ?

জিজ্ঞেস করে জানলাম, যদুমাষ্টারের পাঠশালার জন্যে পার্বণী আদায় করতে বেরিয়েছে ছেলেরা। বলল, বছরে চার-পাঁচবার আদায় করতে বেরোয় এমনি করে কয়েকটা পার্বণে। বাড়ির পাশ দিয়েই রাস্তা, ততক্ষণে এসেও পড়েছি আমরা। দেখি প্রায় ত্রিশ-পঁত্রিশটা ছেলে দু'হাতে দু'টো কাটি নিয়ে বাজাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ঐরকম কি বলে চিৎকার ক'রে উঠছে। আরও ছেলেমেয়ের ভিড় জমেছে, বাড়ির লোকেরাও দরজায় এসে জমা হয়েছে।

আমি শহুরে মানুষ, একেবারে নতুন চাকরিও, এসব কিছুই জানা ছিল না ; কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গেছি। দাঁড়িয়েও পড়েছি, পাশে একজন চাষাভূষো গোছের লোক দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞেস করতে বলল—সব পাঠশালাতেই এই রেওয়াজ ছিল, বাড়ি-বাড়ি চাল, ডাল, দু'ছটাক ঘি, একটা সিকি দক্ষিণে—এদানি 'নিস্‌পেক্‌টার' এসে এসে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। শুধু যদুমাষ্টারের পাঠশালায় পারেনি এখনও।

যাক্, যদুমাষ্টারের অনেক কীর্তির একটা তাহলে নজরে পড়ল।

জিজ্ঞেস করলাম—"পারেনি কেন?"

লোকটা রাখালের চেয়েও আরও আশ্চর্য হয়ে চোখ কপালে তুলে আমার পানে চাইল। জিজ্ঞেস করল—"কনে থেকে আসতেচ আপনি কত্তা? যদুমাষ্টারের পাব্বণী বন্ধ করবে হেন নিস্‌পিকটার এখনও জন্মেচে নাকি!"

বললাম—"তা তো জন্মায় নি বলেই মনে হচ্ছে। তবে আর কোন পাঠশালায় যখন দেয় না পার্বণী, তখন যদুমাষ্টারের পাঠশালাতেই বা দিচ্ছে কেন লোকে?"

আশ্চর্য হয়ে চোখ কপালেই তুলে রেখেছে, বলল—"যদুমাষ্টারের পাঠশালা আর অন্য সব গুরুমশায়ের পাঠশালা এক হোল?"

আরও কয়েকজন ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাদের দিকে চেয়ে বলল—"ঐ নাও, কি বলেন শোন!"

আমি বললাম—"আমি বাইরের লোক, জানিনে কিনা, তাই সুদোচ্ছি।"

বলল—"যদুমাষ্টার ছেলে নয় হীরের টুকরো বের করছে বছর-বছর, তার সামনে অন্য-কেউ দাঁড়াবে? কী বোলবোলাও, কী জমজমাট কারখানা একবার দু'পা এগিয়ে দেখুনই না যেয়ে। হুঁঃ, বলে কিনা দেয় কেন!"

বললাম—"কিন্তু ছেলেরা তো পার্বণী আদায় করতে বেরিয়েছে দেখছি। পাঠশালা বন্ধ থাকবে তো?"

বলল—"গোয়ালের হেলে বলদগুলোই না হয় চাষে গেল, তাইতেই গোয়াল খালি হয়ে যাবে?"

আবার ওদের দিকে চেয়ে সেইরকম হেসে বলল—"নাও, বোঝাও ওনাকে!"

তা উপমাটা ভালোই দিয়েছে ওদের মেঠো ভাষায়। গিয়ে দেখি, সেই যে কথায় আছে 'হরি ঘোষের গোয়াল,' একেবারে তাই। একটা ঝাঁকড়া পাকুড় গাছের তলায় একটা লম্বা দোচালা গোলপাতায় ছাওয়া ঘর। তিন দিকে খোলা এক দিকে ছাঁচা-বেড়া, তবে তারই মধ্যে তিন ভাগে ভাগ করা। একেবারে শেষেরটায় একটা দোকান। চাল, ডাল, মুড়ি, মুড়কি, পাঁপড়, বেগুনি, ফুলুরি থেকে নিয়ে আলু, কুমড়ো, ঝাঁটাকাঠি, চেলা-কাঠ—কী যে নেই বলা যায় না। তার এদিকে, মাঝখানে কোনরকম পর্দা না থাকলেও দুটো নড়বড়ে চেয়ার আর দুটো ব্ল্যাক বোর্ড দেখে মনে হোল দুটো পাশাপাশি ক্লাস-রুম, তখনকার প্রাইমারী স্কুলের নিয়মে। বেঞ্চও পাতা রয়েছে। ছেলে এত রয়েছে যে ওরকম আরও গোটা কয়েক পার্বণী-আদায়ের দল বের করা যায়, তবে কোন ক্লাসেই কোন মাষ্টার নেই, আর হট্টগোল যা হচ্ছে তা ঐ যে বললাম, হরি ঘোষের গোয়ালকেও হার মানায়। তবে দেখলাম বেশ তালিম দেওয়া আছে। আমি রাখালকে নিয়ে ওপরে গিয়ে উঠতেই দুটো বেশ ডাগড়া ডাগড়া ছেলে ছুটে গিয়ে—'এই চুপ!

এই চুপ !"—ব'লে টেবিলে বেত আছড়াতেই একেবারে যে যেখানে ছিল, হুড়োমুড়ি করে বেঞ্চে এসে বসে চুপচাপ। সবার চোখ শুধু আমার দিকে ফেরানো। জিজ্ঞেস করলাম—"যত্নমাষ্টার মশাই আছেন ?"

পাঠশালা থেকে শ' দুয়েক হাত দূরে একটা বাড়ি, আমি জিজ্ঞেস করতেই সবার নজর সেই দিকে গিয়ে পড়ল। আমিও তাদের দেখাদেখি সেইদিকে চাইতে দেখি, একজন মাঝ-বয়সী রোগা টিঙটিঙে গোছের লোক গায়ে একটা মেরজাই আঁটতে আঁটতে একটু যেন হন্তদন্ত হয়েই এগিয়ে আসছে। পেছনে জন চারেক ছেলে, বুঝলাম আমায় নতুন লোক দেখে এরা কখন ছুটে খবর দিতে গেছে। আমি আসবার সময় আপিসে দেখে আসি, এখান থেকে একটু দূরের একটা প্রাইমারী স্কুলে ইনস্‌পেকটার আসবে বলে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছিল দিন-পাঁচেক আগে। বুঝলাম তাইতে সতর্ক রয়েছে যত্নমাষ্টার। আমার সাজগোজ দেখে সে ভয় কেটে গিয়ে যেন একটু সামলে নিয়ে উঠে এসে নমস্কার ক'রে জিজ্ঞেস করল—"কোথা থেকে আসচেন, কি প্রয়োজন ?"

সঙ্গে সঙ্গে একটা হাঁক দিয়ে ক্লাসের দিকে চেয়ে বলল—"তোরা চুপ করলি যে! পড়, পড়ছিসনে কেন ?"

ইতিমধ্যে যে দুটো ছেলে বেত আছড়ে ছিল, তাদের মধ্যে একজন কোথা থেকে একটা মোড়া এনে রেখেছে আমার পেছনে, আমি বসতে বসতে বললাম—"এসেছি মাঝেরপাড়া থেকে, আমার এই ভাগনেটিকে ভর্তি করতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে যত্নমাষ্টারের মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। লিকলিকে শরীর যতটা সম্ভব ভারী করে নিয়ে, এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে বলল—"তা বেশ তো, উত্তম কথা।"—গলাটাও বেশ গম্ভীর করে নিয়েছে। এক জোড়া মোটা গোঁফ, সেটাও ফুলিয়ে নিয়েছে।

আমিও বেশ সমীহ ক'রে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—"গাঁয়ে আছে পাঠশালা, তবে আপনার পাঠশালার নামডাক শুনে বললাম—"নাঃ, পড়াতে হয় তো যদুপণ্ডিতের পাঠশালাতেই দোব।"

বেশ একটু গদগদই হয়ে গেছে, তারই মাঝে গম্ভীর হ'য়ে বলল—"আজ্ঞে, এটা হোল প্রাইমারী স্কুল, পাঠশালা বললে এর অপমান করা হয়। এখানে রীতিমতো ইনস্‌পেকটারকে বিজিট করতে হয়। কড়াক্কড় নিয়ম।"

মনে-মনেই হেসে বললাম—"সে যম তোমার সামনেই বসে।" ওকে বললাম—"হ্যাঁ, পাঠশালা—ওটা মুখ-ফসকে বেরিয়ে গেছে ; দেখতেই পাচ্ছি কিরকম কড়া নিয়ম। একলা এই এতগুলো ছেলে সামলানো চাড্ডিখানি কথা ?"

একটু যেন থতমত খেয়ে গেল। আমার শোনা ছিল দু'জন মাষ্টারের নাম ক'রে নিজেই

নাকি সব মাইনেটা নেয় যদুমাষ্টার। তবে ধূর্ত লোক, ও-ভাবটা সামলে নিয়ে বলল—"একা কেন হবে? গুরুমশাইয়ের পাঠশালা নয় তো, দু'জন রয়েছি।"

সঙ্গে সঙ্গে গলা উঁচিয়ে বলল—"তোদের সেকেন্ মাষ্টার বল্লভ দাঁ কেমন আছেন রে যতা?"

সেই বেত-আছড়ানো ছেলের একজন দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"আজ পত্যি করেচেন দেখে এলুম।"

বোঝা গেল, তিনি সারা বছর এমনি পথ্যিই করেন। তবে সে কথা বলবার জন্যে তো আসিনি, উল্টে আরও বাড়িয়ে দিয়েই বললাম—"তা তো জানি। প্রাইমারী স্কুল যখন দু'জন থাকবেনই। আমি বলছিলাম—একা কিরকম দাপটে রেখেছেন, মনে হয় যেন একটা হাই-স্কুলের ক্লাসে বসে আছি।"

এই সময়, আমার বলবার মাঝেই একটা ব্যাপার হোল। একজন মেয়ে খদ্দের দোকানে এসে ডাকল—"কোথায় গো, একবার এদিকে এসবে নি?"

কী রকম ধূর্ত যদুমাষ্টার তার আর একটা নমুনা পাওয়া গেল। এবার মোটেই থতমত না খেয়ে চেয়ার থেকেই স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস করল সে কি নিতে চায়। সে, পোটাক বিউলীর ডাল আর তিন-চারটে কিসের নাম করতে হেঁকে বলল—"গোবরা! সব হিসেব ক'রে দিয়ে আমায় বলবি।"

ঐ দিক থেকে একটা বড় গোছের ছেলে উঠে গেল।

আমি একেবারে অবাক মেরে গেছি। ভেবেছিলাম ওদিকটা বুঝি কাউকে দোকানের জন্যে ভাড়া দেওয়া। একটু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি, যদুমাষ্টার একটু হেসে বলল—"আপনি হাই-স্কুলের কথা বললেন। ধাঁচাটা তাই রেখেছি, তার সঙ্গে ঐ ওটুকু কিণ্ডারগার্ডেন জুড়ে দিয়েছি, হাতে-কলমে শিখছে ছেলেরা। কি রকম বুঝছেন?"

বললাম—"চমৎকার! ভাবতেই পারিনি। এখন বুঝছি, আপনার স্কুলের কেন এত নাম।"

খুব ফুলে গেছে। জিজ্ঞেস করল—"তামাক ইচ্ছে করেন?"

বললাম—"তা—একটু হোলে মন্দ হোত না।"

এবার হুকুম করতে দোকান থেকেই তামাক নিয়ে একটা ছেলে টিকে ধরিয়ে, একটা কলকেয় সেজে, আমার জাতটা জিজ্ঞেস ক'রে নিয়ে, দুটো কড়ি-বাঁধা একটা হুঁকোয় বসিয়ে আমায় দিলে। একটা টান দিতে-না-দিতে কেশে উঠেছি, যদুমাষ্টার বললে—"বুঝেছি, আপনারা হলেন শহুরে মানুষ।…যতে!"

সেই তাগড়া ছেলেটা যেন চেয়েই ছিল, এগিয়ে আসতে বলল—"ভালো করে সেজে নিয়ে

আয় শীগ্‌গির।" আমায় পরিচয় দিল—"এটি হচ্চে, আমার শির-পোড়ো।"—বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই।

যতে নিয়ে ছাঁচাবেড়ার আড়লে চলে গেল। একটু পরেই শুধু তামাকের গন্ধ নয়, ছ্যাঁচাবেড়া ভেদ ক'রে ধোঁয়াও গ'লে আসতে বুঝলাম, ভালো ক'রে সেজে আনবার মানেটা কি। দু'টো মিনিটও লাগেনি তার, যখন এসে কলকেটা বসিয়ে দিল হুঁকোর মাথায়, টেনে দেখি, যেন সে তামাকই নয়, একেবারে জাত বদলে দিয়েছে ঐ গোটাকতক টানে। বুঝতে পারলাম—কেন সে লোকটা তখন হীরের টুকরো তোয়ের হচ্ছে বলেছিল।

একটা ছেলে টিকে ধরিয়ে নিয়ে এল কলকেয় সেজে—

তারপরেই আরও দেখলাম ; এবার একসঙ্গে অনেকগুলি।

তামাক খেতে খেতে আমাদের গল্প দিব্যি জমে উঠেছে, আমি প্রশংসায় প্রশংসায় গাছে চড়িয়ে দিচ্ছি, যদুমাষ্টারও ফুলে ফুলে উঠছে, এমন সময় খানিকটা দূরে একটা তুমুল হৈচৈ। এবার পার্বণী আদায়ের মতন থেকে-থেকে নয়, একটানা। কোন ছড়াও নয়, মেঠো পাড়া-গেঁয়ে গালাগাল—খানিকটা অস্পষ্ট, তবে তার মধ্যে একজনের গলা যেন বেশি স্পষ্ট। একেবারে তাক্ লেগে চেয়ে আছি, তারপরেই রাস্তার একটা মোড় ঘুরতেই সমস্ত ব্যাপারটা নজরে পড়ে গেল। একটা ছেলেকে দশ-বারোজন ছেলে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসছে। কয়েকজন ধরেছে তার হাত, কয়েকজন পা, কয়েকজন পিঠ আর কোমর, ছেলেটা তারই মধ্যে হাত ছুঁড়ছে, পা ছুঁড়ছে আর কান্নাকাটির সঙ্গে ঐরকম গালাগালের তুবড়ি ফুটিয়ে যাচ্ছে। এদিকে যারা ধরে নিয়ে আসছে, তাদের হাসি-হুল্লোড়, পাল্টা গালাগাল। তাদের ঘেরে আরও কয়েকজন ছেলে হুল্লোড়টাকে বাড়িয়ে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে গেছি। হুঁকোটা তখন্ যদুমাষ্টারের হাতে; যেন কিছুই হয়নি এইভাবে চেয়ে দেখছিল তামাক টানতে-টানতে, একটু গর্বের হাসি হেসে আমার দিকে চেয়ে বলল—"ঐ নিন আর এক নমুনো। স্কুল-পালানে ছেলেকে কি ক'রে শায়েস্তা করা হয়, স্বচক্ষেই দেখে যান।" নিশ্চিন্দি হয়ে লিখিয়ে দিয়ে যান ভাগ্নের নাম।...ও রে যতে, নাম লেখাবার খাতাটা বের কর!"

কিন্তু কার নাম লেখা হবে?

ওরা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এদিকে চালাটার মধ্যেও একটা গোলমাল এসে পড়েছে, একটা তামাসাই তো, ছেলেরা কতক্ষণ নিজেদের রুখে রাখতে পারে? রাখাল আমার পেছনে একটা বেঞ্চে বসেছিল। ঘুরে জায়গাটা খালি দেখে বাইরে চেয়ে দেখি, কখন্ গোলমালের মধ্যে উঠে প'ড়ে, যে পথে এসেছি সেই পথ ধ'রে পাঁই পাঁই ক'রে ছুটে পালাচ্ছে পড়ি-তো-মরি ক'রে।

যদুমাষ্টার মোটা গোঁফজোড়া একটু ফুলিয়ে, হুঁকোয় বেশ নির্বিকারভাবে তামাক টানতে টানতেই বললে—"বলেন তো এই দলটাকে ওর পেছনে ছেড়ে দিই, চ্যাংদোলা ক'রে ধ'রে নিয়ে আসুক।..."

অভ্যেসের দোষে একটা গালাগালও বেরিয়ে আসছিল, সামলে নিলে।

বললাম—"আজ থাক। আর একদিন ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আসব।"

ফিরে এসে সমস্ত খুঁটিনাটি দিয়ে এক লম্বা রিপোর্ট দাখিল করি সায়েবের কাছে। খুব কড়া চিঠি যায়—অমুক দিন, অমুক সময় আমাদের একজন ইনস্‌পেকটার এই রকম বেশে তোমার স্কুলের সব কাণ্ডকারখানা নিজের চোখে দেখে এসেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

খুব চোখ-রাঙিয়ে কড়া করেই। তবে, তাতে যে যদুমাষ্টারের পাঠশালার পার্বণী-আদায়, কি, পালানে-ছেলে ধরা, কি শিরপোড়ো যতের কড়া তামাক টানের চোটে নরম ক'রে আনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এ বিশ্বাস আমার নেই।

আশা

।। শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস ।।

সূর্য বলে, "কত সূত্রে বজ্রমুষ্টি তুলি'—
এত যে-ভৎর্সনা করি,—তবু সব ভুলি',
থাকে নর নির্বিকার,—কি তার প্রত্যাশা?"
উত্তরে পৃথিবী বলে,—"এতটুকু আশা!"

মূল ইতালীয় লেখক

এলভিও বারলেত্তানি

অনুবাদ করেছেন

শ্রীপ্রণতা দে
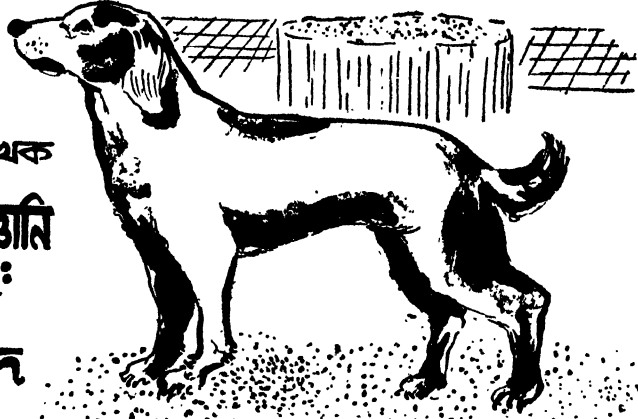
ভবঘুরে কুকুর ল্যাম্পো

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

খুবই ভারাক্রান্ত মনে আমি মোটরে ষ্টার্ট দিলাম। পথে আবার মির্ণা কাঁদতে শুরু করল : "ল্যাম্পো একা-একা পথ খুঁজে পাবে না। এই পাহাড়েই একদিন ও মরে যাবে।"

এটাও যথেষ্ট নয়, এবার আমার স্ত্রীর শোক উথলে উঠল। তিনি বললেন, "বেচারা কুকুরটাকে এমন করে ছেড়ে যাওয়া মোটেও উচিত কাজ হ'ল না আমাদের।"

আমি আর রাগ দমন করতে পারলাম না। গাড়ী থামিয়ে পাগলের মত চীৎকার শুরু করে দিলাম, "বটে, এই কথা ? আমি ব'লে চেয়েছিলাম ক'দিন তাজা হওয়ায় একটু শাস্তিতে, আরামে দিন কাটাবো, তা নয় ; ঐ হতভাগা কুকুরটার জন্য ক'দিন যেন নরকবাস হ'ল ! যেদিন থেকে ঐ কুকুরটাকে দেখেছি, যদি কখনও একটু শান্তি পেয়ে থাকি ! আফসোস হচ্ছে কেন ওটাকে দেখেছিলাম।"

আমার স্ত্রী আমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে আমি আরও চেঁচাতে লাগলাম, "আমরা ওকে খুবই ভালভাবে ক'মাস রেখেছিলাম, যথেষ্ট যত্ন করেছি। ও যা, চায়, যাতে ভাল থাকে, সেই ভাবেই আমরা ওকে রেখেছি। তার পরিণতি যদি শেষ পর্যন্ত এই হয়, তো আমি কী করতে পারি ?"

দম নেবার জন্য একটু থেমে আবার বলি, "যত নষ্টের গোড়া ঐ রক্ষক-ব্যাটা ! ও কেন কুকুরটাকে তাড়া করে গির্জা থেকে বের করে দিল ?"

আমার স্ত্রী শুধু বললেন, "কুকুরদের তো গির্জায় যাবার কথা নয়।"

"কেন? কুকুরও তো কেষ্টর জীব।" আমি উত্তর দিই, "ও যদি দেব-মন্দিরে যেতে চায়, সেটা এমন কী অনুচিত?"

স্ত্রী পাল্টা উত্তর দেন, "গির্জাগুলো তৈরী হয়েছে খ্রীশ্চানদের জন্য, কুকুরদের জন্য নয়।"

আমি আর কিছু বললাম না। আবার গাড়ী চালাতে লাগলাম। অনেকক্ষণ আমাদের চুপচাপ কাটল। কেবল মাঝে মাঝে মেয়ের ফোঁপানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

পাহাড় থেকে নেমে ঠিক যে রাস্তায় আমরা যাবো তার মোড়ের মাথায় আসতেই মনে হ'ল, একটু দূরে একটা জানোয়ারের মত যেন কিছু রয়েছে। আমরা সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ, বেচারা আমাদেরই ল্যাম্পো। একেবারে স্থানুবৎ হয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে দেখছিল, যে গাড়ীটা আসছে সেটা আমাদেরই কিনা। যে মুহূর্তে নিশ্চিত বুঝে ফেলল, সেই মুহূর্তেই ও আমাদের দিকে ছুটে এল। আমি তাড়াতাড়ি ব্রেক ক'যে দিলাম। গাড়ীটা আচমকা যেই থেমে গেল, তার পরের দৃশ্য বড়ই করুণ। ল্যাম্পোর কাতরধ্বনি যা কান্নারই নামান্তর, আর আমার মেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু-জলে সিক্ত হয়ে যে অস্ফুটোক্তি করলে, তা আনন্দেরই উল্লাসধ্বনি। যে স্বাগত সম্ভাষণ মির্ণা তাকে জানালো, এবং আমরাও সবাই জানালাম—তা বর্ণনাতীত।

এরপর আমরা ওকে কিছু বিস্কুট দিলাম। ও গোগ্রাসে সেগুলো গিলে ফেলল। আমরা আবার গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। ল্যাম্পো লাফিয়ে উঠে মির্ণার কোলে বসল। মহানন্দে আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু। ল্যাম্পো তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। বেশ বোঝা গেল ওর বিনিদ্রায় কেটেছে অনেকক্ষণ।

মাইলোমিটার দেখে আমি এটুকু বুঝতে পারলাম যে, ল্যাম্পো পনেরো মাইলের ওপর হেঁটে এসেছে। সেটা এমনিতে খুব বেশী নয়, কিন্তু ঠিক রাস্তাটি খুঁজে বের করবার জন্য হয়ত ওকে অনেক দূর ঘুরে ঘুরে হয়রান হতে হয়েছে ভুল পথে—যে রাস্তাগুলো সিয়েনা এবং অন্যান্য শহরে যায়। কী করে ও ঠিক পথ খুঁজে বের করল, সেকথা কেমন করে জানব যদি ও নিজে না বলে? কিন্তু ও যে অবলা। আমাদের গাড়ী এগিয়ে চলল। আমি বার বার আয়নায় ভেতর দিয়ে পেছনটা দেখছিলাম। দেখলাম, ল্যাম্পো অঘোরে ঘুমুচ্ছে আর আমার মেয়ে হাসিমুখে বসে আছে। মির্ণা তার ছোট্ট হাত দিয়ে কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। ল্যাম্পোর জন্য আমাদের কী দুশ্চিন্তায় কেটেছে সেসব কথা ভুলে গিয়ে, আমি শিস্ দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে গাড়ী নিয়ে এগিয়ে চল্লাম এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, যেভাবেই হোক ঠিক রাস্তা খুঁজে ল্যাম্পিনো আমাদের কাছে ঠিক পৌছতই।

কতক্ষণে, কীভাবে পৌছত, তা আমি জানি না। মোটকথা রেলওয়ের গন্ধ যদি কোথাও ও পায় তাহলে যেখানেই হোক সেখান থেকে ক্যাম্পিগলিয়ায় এবং তারপরে পিওম্বিনোতে পৌছন তো ওর পক্ষে অতি সহজ—ছেলেখেলা।

॥ প্রথম ভ্রমণ ॥

ল্যাম্পো ক্যাম্পিগলিয়াতে যেরকম জীবনযাপন করছিল, অন্য কোন কুকুর হলে তাইতেই সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু ল্যাম্পো যেহেতু অনন্যসাধারণ, তাই এতে ও সন্তুষ্ট থাকল না। অন্যান্য কুকুরের চেয়ে বিশেষ একটি নিজস্ব ঢং-এ ও জীবনযাপন করতে চেয়েছিল।

ক'দিন হ'ল ল্যাম্পো আর ঘরের কোণায় পড়ে পড়ে ঘুমোয় না। বড্ড যেন ছটফটে হয়েছে। দেখা গেল, ষ্টেশনে যে গাড়ীই আসে—মালগাড়ী ছাড়া, সবগুলোতেই ওর গভীর কৌতূহল। প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়ে টুকটুক্ করে চলবে। এঞ্জিন থেকে শেষ কোচটা পর্যন্ত ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে যাবে। তারপর ফিরে আসবে। ফিরতি পথে হঠাৎ মাঝের কোচের উল্টো দিকে থমকে গিয়ে, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যেসব যাত্রী বসে থাকে, তাদের দেখবে ভাল করে মন দিয়ে। এরপর হঠাৎ লাফ দিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়বে এবং গাড়ীটা যেই নড়তে শুরু করবে, তক্ষুনি লাফিয়ে নেমে পড়বে। তারপর চলন্ত গাড়ীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে, যতক্ষণ না গাড়ীটা ওর দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। ও যে বিশেষ একটা কিছুর গবেষণা করছে, সেটা সহজেই বোঝা যায়। গাড়ীগুলোর আশ্চর্য রকম বৈশিষ্ট্যের ভেতর ও বৈচিত্র্যের কোন সন্ধান পেয়েছিল বলেই মনে হয়।

শীতের মাঝামাঝি বুঝতে পারলাম আমাদের আন্দাজ সত্য। সে সময় যদিও আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং সূর্যের আলো ছিল স্বচ্ছ, তবুও শীতটা ছিল প্রচণ্ড। যাত্রীরা ওভারকোট মুড়ি দিয়ে প্ল্যাটফরমের ওপর পায়চারী করছিল, আর গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিল। পা ঠুকে, হাত ঘ'ষে শরীর গরম রাখবার চেষ্টা করছিল ওরা। ল্যাম্পো ঐ প্ল্যাটফরমেরই একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল এবং যাত্রীদের দিকে নিরুৎসুক দৃষ্টিতে দেখছিল। রোম-জেনোয়া এক্সপ্রেস ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে ২নং লাইনে দাঁড়ালো। যাত্রীরা যারা নামবার তারা নামল। যারা ওঠবার তারা উঠল। গাড়ী ছাড়বার সিগন্যাল দিলো। গাড়ী চলে গেল। আগত যাত্রীরা মাল গাদা করা ঠেলা-গাড়ীসুদ্ধ কুলির পেছন-পেছনে তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফরমের বাইরে চলে গেল।

দু'নম্বর প্ল্যাটফরম জনহীন। আমার আগে থেকে কেমন যেন মনে হয়েছিল। আমি ল্যাম্পোকে খুঁজলাম, পেলাম না। বুঝলাম, ট্রেনে চড়ে সটকেছে। তবুও মনকে শান্ত করবার

জন্য ওকে সবরকম সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় ঢুড়লাম। মনে মনে কিন্তু বুঝেছিলাম, বৃথাই এ অন্বেষণ। এও জানতাম, ওকে ট্রেনে উঠতে বাধা দেওয়া বৃথা হোত। যেনতেনপ্রকারেণ, যখনই হোক, ঐ চালাক জন্তুটি ঠিক নিজের সাধ পূর্ণ করতে ট্রেনে উঠে পালাতো।

সহস্ররকম চিন্তা মনের মধ্যে জটলা করে এল। যে এক্সপ্রেসে ও উঠল, সেটা লেগহর্নের আগে থামবে না। অর্থাৎ ক্যাম্পিগলিয়া থেকে ৪৪ মাইল দূরে। লেগহর্নের পরে এবং জেনোয়ার আগে মাঝে কেবল দুটো ষ্টেশন, পিসা ও স্পেজিয়া। কী করে ল্যাম্পো ক্যাম্পিগলিয়াতে ফেরবার গাড়ী জেনে নেবে ?

এক্সপ্রেস ট্রেনটি যে যে ষ্টেশনে থামবার কথা, সেই সমস্ত ষ্টেশনের আপিসের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জানালাম, যদি তারা কেউ ল্যাম্পোকে দেখতে পায়, ঘাড়টি ধরে ক্যাম্পিগলিয়া-মুখী পরবর্তী কোন গাড়ীতে যেন অবশ্যই যেন পাঠিয়ে দেয়। দুঃখের বিষয় ওকে গার্ডের হাতে সমর্পণ করতে হবে এবং সে তাকে কুকুরের খাঁচায় ভরে লাগেজ-ভ্যানে পাঠাবে।

ঘণ্টা কয়েক কেটে গেল। কোন কোন জায়গা থেকে ফোন এ'ল ; কিন্তু সবই নেতিবাচক, ল্যাম্পোর কোন খবর নেই। সন্ধ্যে এল ঘনিয়ে, ঘন কুয়াশার আচ্ছাদনে বাড়ীগুলো ঢেকে গেল। ষ্টেশনের ভেতরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। এদিক-ওদিকে কেবল অস্বচ্ছ সিগন্যালের আলো এবং দাঁড়িয়ে থাকা ইঞ্জিনগুলোর হেড-লাইটটুকু কোনমতে বোঝা যাচ্ছে। ষ্টেশনের ভেতরে গাড়ীর বাঁশীর তীক্ষ্নস্বর আর দৈত্যের মত তেড়ে আসা শান্টিং-এর গাড়ীগুলোর আলো বার বার যেন তালে তালে একবার করে এগুচ্ছিল ও পিছু হটছিল।

শেষ পর্যন্ত ট্রেনে ওঠবার আগে ষ্টেশনে যে অফিসারটি ডিউটিতে ছিলেন তাঁকে বলে এলাম, "যদি ল্যাম্পো আসে, তবে তক্ষুনি আমাকে পিওম্বিনোতে একটা ফোন করে দেবেন দয়া করে।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন।" বলে তিনি চকচকে প্যালেটটি তুলে ড্রাইভারকে গাড়ী ছাড়বার সিগন্যাল দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমার মেজাজটা খুবই খারাপ ছিল। বাড়ীতে কারুকেই ল্যাম্পোর অন্তর্ধানের কথা জানাই নি। যতবারই মির্ণা আমাকে ল্যাম্পোর কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

পরদিন সকালে আমি যখন স্নানের ঘরে, শুনলাম আমার স্ত্রী রান্নাঘর থেকে বলছেন, "নামো শীগগির। তুমি বেশ জানো ল্যাম্পো যে, আরাম-চেয়ারের ওপরে তোমার ওরকম লাফালাফি করবার কথা নয়।"

দুই চোখ ঠিক্‌রে বের করে, স্নানের ঘর থেকে বে'রিয়ে, রান্নাঘরে ছুটে এলাম। এক গাদা টুথপেষ্ট-ভরা মুখে প্রশ্ন করি, "কী হয়েছে? ও কতক্ষণ এসেছে?"

"সেই আটটা থেকে—ওর যথা নিয়মে।—কেন?" একটু যেন অবাক হয়ে বলেন আমার স্ত্রী, "ও এসে ওর স্বাভাবিক নিয়মে সামনের দরজার কাছে অপেক্ষা করছিল, মির্ণার সঙ্গে স্কুলে যাবে বলে। এটা এমনি কী আশ্চর্যের ব্যাপার?"

"আমি আশ্চর্য হচ্ছি এ জন্যে যে, আমাদের গুণধর বন্ধুটি কাল এক্সপ্রেস ট্রেনে বসে কে-জানে কোন্ চুলোয় চলে গিয়েছিল।" এরপর একটু রেগেই বলি, "বুঝতেই পারছি না, শয়তানটা ফিরল কেমন করে?" আমি টুথব্রাশটা ওর দিকে দেখিয়ে কথা বলছিলাম। ল্যাম্পো মাথাটি মেঝের ওপরে রেখে আমার দিকে তাকালো। এদিকে লেজটি মৃদু মৃদু নাড়ছেন।

চারিদিক পরিষ্কার হয়ে সেদিন বিকেলটি ছিল সুন্দর উজ্জ্বল। ঠিক করলাম সপরিবারে বেরুবো। যেই গ্যারাজের দরজা বন্ধ করছি, দেখি আমার দিকে আর্ত দৃষ্টি মেলে ক'ফিট দূরেই ল্যাম্পো। গাড়ীর দরজা খুলে খুশী মনেই বলি, "উঠে পড়্, শয়তান।" আমি একটু অভিবাদনের ভঙ্গীতে নীচু হই। ও আর দ্বিতীয়বার অনুরোধের অপেক্ষা রাখে না। একলাফে আমার স্ত্রী হাঁটুর উপর দিয়ে মেয়ের কাছে চলে যায়। সে তার জন্যে ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছিল।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "ও এক্সপ্রেস গাড়ী করে কতদূর গিয়েছিল?"

"আমি কেমন করে জানব? ষ্টেশন থেকে আমাকে যা জানিয়েছে, তা'তে এইটুকু জেনেছি যে, সকাল সাড়ে সাতটার সময় ওকে একটা ফার্ষ্ট লোকাল গাড়ী থেকে নামতে দেখা গেছে। তারপরেই ও ছুটেছে পিওম্বিনোর গাড়ী ধরতে।"

"তার মানে, মির্ণার সঙ্গে কিন্‌ডারগারটেন স্কুলে যাবার ঠিক সময়ে এসেছে।" স্ত্রী বললেন।

গাড়ী চালাতে চালাতে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কেমন অদ্ভুত মনে হ'ল। বোঝা গেল মির্ণার সঙ্গে স্কুলে যেতে হবে বলেই ওকে যাত্রাভঙ্গ করতে হয়েছে।

"বাপি, এইখানে—এইখানে গাড়ী থামাও। কী সুন্দর পাইনের বন দেখ!" মির্ণা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। আমি গাড়ীর গতি কমিয়ে রাস্তার একপাশে এনে গাড়ী থামালুম। মির্ণা নেমে পড়ল, আর তক্ষুনি ছুটতে শুরু করে দিল। তার পেছনে ল্যাম্পো। বড় সুন্দর বিকেলটি ছিল। প্রাণ-ভরে সেবন করলাম রজনের গন্ধে আমোদিত সমীরণ, প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ কেমন মাঝে মাঝে ব্যাহত হচ্ছিল মির্ণার আনন্দোল্লাসের কণ্ঠস্বরে, ল্যাম্পোর গর্জনে ও তীরের ওপরে আছড়ে-পড়া তরঙ্গমালার ধ্বনিতে।　　(ক্রমশঃ)

নাগ-স্বামী

(উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপকথা)

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক বুড়ীর দুই মেয়ে। বড়ো মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দর, কিন্তু ভালো কাপড় বুনতে পারে না ব'লে কেউ তাকে পছন্দ করে না। বুড়ীর ছোটো মেয়েটি দেখতে ততো ভালো না হলেও নানারকম নক্সা তুলে চমৎকার কাপড় বোনে, পাড়ায় তার খুব আদর। বড়ো মেয়ে মোটা কাপড় বোনে, দেখে লোকে হাসে। সে দেশে যে মেয়ে ভালো কাপড় বুনতে পারে না তার কোনো দাম নেই। একদিন বুড়ীর বড়ো মেয়েকে কাপড় বোনা নিয়ে কা'রা যেন কথা শুনিয়েছে, তার মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। সারাদিন নাইলে না, খেলে না, চুপ ক'রে ঘরে ব'সে রইল। সন্ধ্যাবেলা আর সময় কাটে না দেখে নদীতে গেল স্নান করতে। জলে নেমে একটা ডুব দিয়ে গা ঘষছে গামছাতে, এমন সময় তার পাশেই জলের ভেতর থেকে একটা বিরাট সাপ ভেসে উঠল। মেয়েটি ভয়ে-ময়ে চীৎকার ক'রে জল থেকে উঠে ছুটতে আরম্ভ করলে। ততক্ষণে সাপটা একটি সুন্দর যুবা পুরুষ হয়ে গেছে, সেও জল থেকে উঠে এসে বললে, "তুমি আমাকে দেখে ভয় পেলে কেন?"

মেয়েটি বললে, "ভয় পাব না? আমি ভেবেছিলুম তুমি একটা অজগর সাপ।" ছেলেটি বললে, "না, আমি ঠিক সাধারণ সাপ নই, আমি নাগ। জলের তলায় থাকি, ইচ্ছে মতো মানুষের রূপ এবং সাপের রূপ ধরতে পারি। আমার তোমাকে ভালো লেগেছে।"

মেয়েটিরও ছেলেটিকে দেখে, তার মিষ্টি কথা শুনে, খুব ভালো লাগল। তারপর থেকে তাদের প্রায়ই দেখা হ'ত সেইখানে নদীর ধারে নিরিবিলিতে। রাত্রে ছেলেটি যেদিন আসত সেদিন মানুষের রূপেই আসত, কিন্তু ভোর হলেই সে সাপ হয়ে যেত, আর জলের তলায় নিজের বাড়ীতে ফিরে যেত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখা হতে মেয়েটি ছেলেটির সঙ্গে কোনো কথা বললে না। সেদিন ভালো কাপড় বুনতে পারে না বলে কারা তাকে ঠাট্টা করেছে, তার খুব মন খারাপ। অনেক পীড়াপীড়ির পর সে ছেলেটির কাছে তার দুর্ভাগ্যের কথা স্বীকার করলে। ছেলেটি বললে, "ওর জন্য ভেবো না। সকালবেলা আমি আমার সব চেয়ে সুন্দর চামড়াটা গায়ে দিয়ে আসব, তুমি আমাকে তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁতে বসবে, আর গায়ের যে কারুকার্য দেখবে, তাই রঙিন সুতো দিয়ে নকল করতে পারবে। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব, রঙবেরঙের সুতো দেব।"

ছেলেটি তখনই সাপ হয়ে জলের তলায় চলে গেল। মেয়েটি সারারাত নদীর ধারে

একা বসে রইল। ভোর না হতেই ছেলেটি একটি অপরূপ সুন্দর সাপ হয়ে ফিরে এল. তার গায়ের চামড়ায় বিচিত্র রঙের ছাপছোপ, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মেয়েটি চুপিচুপি সাপটাকে কোলে করে তার তাঁত-ঘরে গিয়ে ঢুকল। আশ্চর্য ব্যাপার. তার গায়ের কাজ নিজের বোনা কাপড়ে তুলতে মেয়েটির আর এখন আটকালো না। পাড়ার অন্য কয়েকটি মেয়ে তাকে তাঁত বুনতে দেখে মজা করতে এসেছিল, কিন্তু মেয়েটির

'এবার আমি তোমায় বিয়ে করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাব।'

কোলে এক বিরাট সাপ শুয়ে আছে দেখে, সবাই ভয়ে পালিয়ে গেল। মেয়েটি শুধু সেদিন নয়, তারপর থেকে রোজই সাপটিকে জলের ধার থেকে কোলে তুলে নিয়ে আসত আর তাঁত বোনা শেষ হলে তাকে নদীতে ছেড়ে দিয়ে আসত। গাঁয়ের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর কাপড় বোনার জন্য তার সবাই সুখ্যাতি করতে লাগল। সে তিনখানি খুব সুন্দর কাপড় বুনে একটি তার বোনকে দিলে, একটি পাড়ার মেয়েদের দিলে, আর একটি নিজের জন্য রেখে দিলে।

এমনি করে ক'দিন যায়, একদিন সাপ বললে, "আর এভাবে চলে না। এবার আমি তোমায় বিয়ে করে আমার নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাব।"

মেয়েটি বললে, "কিন্তু আমি তো জলের মধ্যে থাকতে পারব না, হাঁপিয়ে মরে যাব।"

সাপ বললে, "কোনো ভয় নেই। আমি নাগ, আমাকে বিয়ে করলে তুমি নাগিনী হয়ে

যাবে, জলের তলায় থাকতে তোমার কোনো কষ্ট হবে না। আমি বরযাত্রীর দল নিয়ে অনেক বাজনা-বাদ্যি করে আসব, তারপর তোমাকে বিয়ে করে ফিরে যাব। তুমি খুব সুখে থাকবে সেখানে। পরদিন মেয়েটি তার মাকে বললে, "মা আমার বিয়ে হবে, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব বরের সঙ্গে। তার মা তো অবাক্। মা বললে, "তোর আবার বর কে ?"

"সেই যে সাপ আমাকে কাপড় বুনতে শিখিয়েছে, সেই আমার বর।"

"সর্বনাশ সে যে তোকে মেরে ফেলবে। সাপকে বিশ্বাস আছে ?" মা মেয়েকে অনেক বোঝালে, অনেক বকলে, কিছুতেই কিছু হ'ল না, মেয়ে সেই সাপকেই বিয়ে করবে। তার মত বদলাল না।

দু'দিন পরে অনেক ভেরী-তুরী, বাঁশি-কাঁসি, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে বর এল। গাঁয়ের লোক দেখলে দলে দলে সাপ আসছে, মেয়েটি দেখলে সুন্দর সুপুরুষ সবাই, তার বরের তো রূপের তুলনাই হয় না। বিয়ের পরে যাবার সময় মেয়েটি তার মাকে বললে, "মা, আমি যাচ্ছি। যদি কখনো খুব বিপদে পড়ো, তা'হলে নদীর ধারে গিয়ে আমাকে ডেকো, আমি তোমাকে সাধ্য মতো সাহায্য করব।"

বর এবং বরযাত্রীরা, শোভাযাত্রা করে কনে নিয়ে নদীর মধ্যে ডুবে গেল। জলের তলায় সোনার রাজবাড়ী, মেয়েটির বর সেখানে নাগেদের রাজা। মেয়েটি সুখে-স্বচ্ছন্দে রইল সেখানে স্বামীর সঙ্গে। ক্রমে তার অনেক ছেলেমেয়েও হ'ল।

মেয়েটির ছোট বোনের এদিকে একা ঘরে মন টেঁকে না। সে একদিন তার মা'কে বললে, "দিদি যখন সাপকে বিয়ে করেছে তখন আমিও করব। সে নদীর ধারে গিয়ে একটা সাপের গর্ত খুঁজে তার পাশে শুয়ে রইল। সেই গর্তে থাকত একটা কালকেউটে, গর্ত থেকে বেরিয়ে সে মেয়েটিকে ছোবল দিতেই মারা গেল বেচারী।

তখন তাদের বুড়ী মা'র দুঃখের অবধি রইল না। মেয়েরা কাপড় বুনে কিছু উপার্জন করত, কিছু ফসল ফলাত। বুড়ী কিছুই করতে পারে না। ঘরের শেষ চালের খুদটুকু যখন ফুরিয়ে গেল তখন উপোষ আরম্ভ হ'ল। নিরুপায় হয়ে বুড়ী নদীর ধারে গিয়ে মেয়েকে ডাক দিল। ডাকতে ডাকতে রাত্তির হ'ল, তার মেয়ে জল থেকে উঠে এসে বললে, "মা, তুমি আমার সঙ্গে এস।" বুড়ী কিছুতেই যাবে না জলের তলায়, মেয়ে তার চোখে কাপড় বেঁধে টানতে টানতে নদীর জলে নামলে। সেখানে সোনার রাজপুরী আর মেয়ে-জামাইয়ের ঐশ্বর্য দেখে বুড়ীর চক্ষুস্থির! যেমন রাজভোগে থাকা, তেমনি আদর-যত্ন। কিন্তু মুস্কিল হ'ল তার নাতি-নাতনীদের নিয়ে। তারা সারাক্ষণ "দিদিমা, দিদিমা" ক'রে তার আদর কাড়াতে আসে, ফুটফুটে ছেলেমেয়ের রূপ ধরে তার কোলে-পিঠে চ'ড়ে বসে, আবার পরক্ষণেই সাপের মূর্তি ধরে

তার হাতে-পায়ে পাক দেয়, হিস্‌হিস্ করে। বুড়ীর নাতি-নাতনীরা ভাবে দিদিমার সঙ্গে খেলা করছে, কিন্তু দিদিমার প্রাণ ভয়ে ওষ্ঠাগত। সে সাপগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আর হাঁউমাউ ক'রে চীৎকার করে। শেষে সে অতিষ্ঠ হয়ে মেয়েকে বললে, "আমার বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে, আমায় ডাঙায় পাঠিয়ে দে। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।" মেয়েও বুঝল মা'কে আর রাখা চলবে না।

মেয়েটির নাগ-স্বামী শাশুড়ী চলে যাবেন শুনে তার হাতে একটি পুটলি দিয়ে বললে, "এটা রাস্তায় খুলবেন না। বাড়ী গিয়ে এর মধ্যে যা রইল প্রত্যেকটি জিনিস খুব বড়ো বড়ো ধামায় ঢাকা দিয়ে রেখে দেবেন। এক সপ্তাহ পরে খুলে দেখবেন। যা পাবেন তাতে আপনার অন্নবস্ত্রের কষ্ট ঘুচে যাবে।" নাগ-জামাই বুড়ীকে নদীর ধারে ডাঙায় তুলে দিয়ে গেল।

নাগ চলে যাবার পর বুড়ীর মনে হ'ল, রাজা জামাই কি দিয়েছে একবার দেখিই না! সে পুঁটলি খুলে দেখে এক টুকরো দড়ি, এক টুকরো কাপড়, একগাদা বালি, এক মুঠো শস্য, আর ক'ড়ে আঙুলের মাপের এক টুকরো কাঠ। দেখে তো বুড়ী রেগে অস্থির।" "দুঃখী পেয়ে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে? সাপ রাজা হলে কি হয়, তার খলতা যায়!" বুড়ী নদীর ধারে সব দূর করে ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে বাড়ীর পথ ধরলে।

খানিক দূর গিয়ে বুড়ীর হঠাৎ মনে হ'ল, "আচ্ছা, জামাই তো আমার মায়াধর, হয়তো সত্যিই ঐ সামান্য জিনিসগুলোর মধ্যে কিছু জাদু করে দিয়েছিল। ফেলে দিয়ে আসা ঠিক হ'ল না। কুড়িয়ে নিয়ে আসি না হয়, এক সপ্তাহ পরে কি হয় দেখাই যাক না?"

বুড়ী আবার নদীর ধারে ফিরে গেল, কিন্তু যা ফেলেছিল তা আর পেলে না। বালি বা শস্য অর্ধেকও মিলল না, অন্য সবকিছুই কমে গেছে। যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে এসে বুড়ী কিছুটা বিশ্বাসে কিছুটা অবিশ্বাসে কয়েকটা ছোটো ছোটো ঝুড়িতে ঢাকা দিয়ে রেখে দিলে। এক সপ্তাহ পরে খুলে দেখে, কাঠের টুকরোটা হয়েছে একঝুড়ি শুঁটকি মাছ, দড়ির টুকরো হয়েছে শুকনো মাংস, বালিটা হয়েছে একঝুড়ি চাল, ন্যাকড়ার ফালিটা হয়েছে একঝুড়ি কাপড় আর শস্যগুলো হয়েছে বীজ-ধান। যদি নদীর ধারে ছড়িয়ে না ফেলত, আর যদি বড়ো বড়ো ধামায় রেখে দিত, তা'হলে আরও কত বেশি জিনিস পেত ভেবে বুড়ীর আফসোসের অন্ত রইল না। কিন্তু তখন আর ভেবে কি হবে? যাই হোক, যা পেয়েছিল, তাতেই বুড়ীর বাকী জীবনটা ভালোভাবেই কেটে গেল, মেয়ে-জামাইয়ের কল্যাণে তাকে আর অন্নবস্ত্রের কষ্ট পেতে হয়নি।*

*ভেরিয়ের এলউইনের সংগ্রহ থেকে গৃহীত

মানুষের চাঁদে যাওয়ার গল্প

শ্রীঅধীরকুমার রাহা

এই তো সেদিন হৈহৈ কাণ্ড। কি, না মানুষ চাঁদে গেছে।

ভাবতে পার, দু'জন মানুষকে এক দিনের জন্য চাঁদে পাঠাতে মানুষের লেগেছে প্রায় তিন হাজার বছর। কি, তারও বেশী!

সেই গল্পই বলি!

এখন তো তোমরা সবাই জান, পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। এমনি রয়েছে তার আরও আটটি গ্রহ। সবাই ঘুরছে সূর্যকে ঘিরে। চাঁদ হ'ল পৃথিবীর একটি গ্রহ। পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে গড়ে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে থেকে! আর চাঁদও হ'ল পৃথিবীর মতই একটা জগৎ। তবে বিচিত্র তার দুনিয়া। এখানে পাহাড়, পর্বত, 'সাগর' গহ্বর, নদী খাত আছে। নেই জল হাওয়া, গাছপালা আর মানুষজন!

এসব খবর জানবার পরই না মানুষ সত্যি সত্যি চাঁদে যাবার কথা চিন্তা করতে পেরেছে।

এসব খবর কি বার করেছে কোনও বিশেষ এক দেশের মানুষ? পৃথিবীর সব দেশের মানুষই কোন না কোনও ভাবে সাহায্য করে গেছে এই তিন হাজার বছরে সৌরজগতের সত্যিকারের রূপটি তুলে ধরতে, চাঁদের দুনিয়ার খবর আনতে, বিজ্ঞানের মৌল তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করতে। অনেকের জীবন বিপন্ন হয়েছে এ কাজে। অনেকে সত্যি সত্যি মারা গেছেন এ কাজ করতে গিয়ে।

রোজ সকালে সূর্য ওঠে। রাতে ওঠে চাঁদ। অগণ্য তারা। তাদের কতকগুলি আবার আকাশের গায়ে চলে-ফিরে বেড়ায়। কি ওরা, কেন ওরা? কেন দেখা দেয় নিত্য আকাশ পটে?

আদি মানুষ, এর জবাব দিয়েছিল: ওরা দেবতা। মানুষের মঙ্গলের জন্যই দেখা দেয় আকাশে। যার কোন ব্যাখ্যা করতে পারা যায় না, তার পিছনে রয়েছে দেবতা—দেবতার লীলা। এমনি ছিল তাদের জাগতিক ঘটনা ব্যাখ্যার রীতি।

এমনি অযৌক্তিক ব্যাখ্যায় মানুষের মন ভরল না চিরদিন। তাই আকাশে এদের গতি-বিধি লক্ষ্য করে চেষ্টা চলতে লাগল এদের চলাফেরার পিছনে কোনও নিয়ম শৃঙ্খলা আছে কিনা বার করবার। তা ছাড়া ধর্মকর্ম আর কৃষির কাজের সময় নির্ঘণ্ট বার করতেও দরকার ছিল আকাশ-পটে এদের চলাচল লক্ষ্য করা। চাঁদের কলা বাড়া ও কলা ক্ষয়ের মধ্যে মানুষ পেয়েছিল চমৎকার একটি আকাশ-ঘড়ি। সময়ের হিসাব রাখবার কাজটা দেশে দেশে করতেন ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতরা।

এই ভাবে ভারতে, চীনে, ব্যাবিলনে, মিশরে গড়ে ওঠে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান।

যুগ যুগ ধরে ভারতীয়, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় পণ্ডিতেরা পরম ধৈর্য ও নিষ্ঠায় আকাশ পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে সব তত্ত্ব বার করেছিলেন তার পরিমাণ অনেক।

এ সব তত্ত্বের ভিত্তিতে খৃষ্ট জন্মের পাঁচশো বছর আগে গ্রীক পণ্ডিতেরা চেষ্টা করতে লাগলেন সূর্য, গ্রহ, চাঁদের প্রকৃতি বার করতে, এদের চলার পথের ঢংটা ধরতে। এদের ধারণা ছিল গোলকই ঈশ্বরের সেরা সৃষ্টির নমুনা। যেহেতু চাঁদ, পৃথিবী ও গ্রহগণ ঈশ্বরের সেরা সৃষ্টি, অতএব এদের আকৃতিও গোলাকার। ব্যাখ্যাটা নিছক দার্শনিক। পিথাগোরাস পরে চাঁদের গোলকত্ব প্রমাণ দিতে দেখালেন, গ্রহণের সময় সূর্যের উপর চাঁদের যে ছায়া পড়ে তা বৃত্ত চাপের মত। ব্যাপারটা প্রমাণ করছে চাঁদের গোলকত্ব। অন্য গ্রীক পণ্ডিতেরা বললেন, চাঁদের নিজস্ব কোনও প্রভা নেই। জ্বলন্ত এক অগ্নিপিণ্ডরূপে যার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন অ্যাশকসাগোরাস, তার আলোতেই চাঁদ আলোকিত!

চাঁদ, সূর্য, গ্রহরা কেন আকাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় অমন? (সূর্য তখনও মানুষের কাছে পৃথিবীর একটা গ্রহ। তাকে ঘিরেই সবাই ঘুরছে—আকাশ-পটে দেখা অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাই তখনও চলছে!)

ইউডোকসাস বললেন, চাঁদ, সূর্য গ্রহগণ এক একটি স্বচ্ছ গোলকের গায়ে বসান। গোলক-গলি বিভিন্ন দূরত্বে থেকে ঘুরছে, তা থেকেই আকাশ-পটে এদের অমনি চলাচল। ব্যাখ্যাটা অন্যান্য গ্রীক পণ্ডিতদের বেশ মনে ধরল। এ তত্ত্বকে তাঁরা আরও বিস্তৃত করে চললেন। পরে মহাপণ্ডিত অ্যারিস্টটলের হাতে এটা পেল স্বীকৃতি। পরে, এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমি গ্রহদের চলার পথের একটা নকশা দিলেন। দেখালেন, কি ভাবে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য, গ্রহ ও চন্দ্র ঘুরছে।

টলেমির গ্রহ-জগতের এ নকশা চলেছিল হাজার বছর। খৃষ্টধর্মও এ ব্যাখ্যা মানত। তাদের শিক্ষায় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যমণি হ'ল পৃথিবী।

মুসকিল বাধালেন নাবিকেরা। সীমাহীন সাগরের মাঝে দিক স্থির করতে হত তাঁদের আকাশের বিভিন্ন তারার দলের মাঝে গ্রহ চন্দ্র সূর্যের চলাচল দেখে। দেখলেন, টলেমির গণনা অনুযায়ী তাদের জায়গা মত পাওয়া যায় না। মাঝ দরিয়ায় দিক ভুল হয়।

কথাটা কানে এল কোপারনিকাসের। পোলাণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী দেখলেন, পৃথিবীকে মধ্যমণি ধরাটাই গণনায় ভুল। মধ্যমণি হওয়া উচিত সূর্যের। ধর্মের বিচারে একথা বলা যে পাপ। পড়লেন দোটানায়। শেষ পর্যন্ত শিষ্যদের পরামর্শে নিজের মতটা ছেপে প্রকাশ করলেন।

তবু ধর্মবিরোধী মত প্রকাশের জন্য তাকে শাস্তি পেতে হয়নি। বইখানা ছেপে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা যান। নির্যাতন ভোগ করেন তার শিষ্যরা। এক শিষ্য ব্রুনোর বিচারে প্রাণদণ্ড হয়।

সূর্যের চারদিকে গ্রহরা ঘুরছে, আর চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ—এ কথা বলেও কিন্তু কোপারনিকাশ গ্রহ-জগতের সম্পূর্ণ রূপটি উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। তার মতে গ্রহগণ ঘুরছে বৃত্তাকার পথে। কাজেই এতেও হিসাব ঠিক ঠিক মিলল না।

গরমিলের কারণটা দেখিয়ে দিলেন জার্মান কেপলার। ডেনমার্কের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী টিকো ব্রাহের নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে তিনি বার করলেন: গ্রহগুলি ঘুরছে বৃত্ত-পথে নয়, উপবৃত্ত পথে। চাঁদও পৃথিবীকে ঘিরে এমনি বৃত্ত-পথেই ঘুরছে।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে জার্মানীতে এসে সৌরজগতের নকশাটি পূর্ণাঙ্গ হ'ল। ১৫০ খৃষ্টাব্দে টলেমি যা শুরু করেছিলেন সতেরো শতকে, কেপলার তা শেষ করলেন।

চাঁদের চলার পথের সন্ধান পাওয়া গেল! কিন্তু কেন চাঁদ অমন উপবৃত্ত পথে ঘুরছে?

এর উত্তর দিলেন নিউটন। জানলেন পৃথিবীর মহাকর্ষ, আর নিজের ছুটের বেগ, এ দুয়ের টানা-পোড়েনের মাঝে পড়ে চাঁদ ঘুরছে। যে ভাবে সুতোয় বাঁধা ঢিল আঙুলের টানে ঘোরে বনবন করে।

চাঁদ গ্রহ ও সূর্য সম্বন্ধে এত সব কথা জানা গেলেও, তখনও কিন্তু আসল কথাটাই জানা যায় নি। যার উপর নির্ভর করছে চাঁদে যাওয়া!

চাঁদ কি পৃথিবীর মতই একটা দুনিয়া, যেখানে যাওয়া ও চলাফেরা করা চলবে?

হাজার বছর আগে সিরিয়ার লুকিয়েন, সতেরো শতকে কেপলার, বিশপ গডউইন, লিখেছিলেন চাঁদে যাবার গল্প। তাঁরা কিন্তু কেউই জানতেন না চাঁদ জায়গাটা কেমন। কল্পনায় চাঁদের দুনিয়া একটা খাড়া করে নিয়েছিলেন।

চাঁদের দুনিয়ার সত্যিকার পরিচয় এনে দিলেন ইতালীর গ্যালিলিও। ওলন্দাজ চশমা বিক্রেতা হানস লিপারসে একটা দূরবীন তৈরী করেন। তাঁর দেখাদেখি গ্যালিলিও বানান আর একটা।

দূরবীন চোখে গ্যালিলিও দেখলেন একটা আশ্চর্য ব্যাপার। চাঁদেও রয়েছে পাহাড়-পর্বত, জ্বালামুখ 'সাগর'! এ যে এক বিচিত্র দুনিয়া! অসংখ্য জ্বালামুখে ভর্তি, বসন্ত রোগীর মত কুৎসিত যেন চাঁদের মুখ! সুন্দরী চাঁদের সঙ্গে কত তফাত তার।

আঁকলেন তিনি চাঁদের মানচিত্র। মাপলেন পাহাড়-পর্বতের উচ্চতা।

গ্যালিলির দূরবীন ছিল ছোট্ট! আরও বড় দূরবীন নিয়ে আরও ভাল ভাবে চাঁদের পাহাড়

পর্বত সাগর গহ্বর পরীক্ষা করতে, মানচিত্র আঁকতে এরপর এগিয়ে এলেন হল্যাণ্ডের হেভেলিয়াস, ইতালির রেকিকওলি, জার্মানীর শ্রোয়েটার, লোরম্যান। সব শেষে এলেন বীয়র ও ম্যাডলার।

জার্মান শ্রোয়েটার সারাজীবন কাটিয়েছিলেন চাঁদ পরীক্ষা করে। কত অসংখ্য মানচিত্র আঁকেন তিনি চাঁদের পাহাড় পর্বতের, গহ্বরের। চাঁদে যে রয়েছে বড় বড় ফাটল। একথা তিনিই প্রথম জানান। তার হাতেই চন্দ্র-ভূবিজ্ঞানের জন্ম। এই চন্দ্র-ভূবিজ্ঞানের শেষ কথা বললেন অন্য দু'জন জার্মান। দুই বন্ধু বীয়র ও ম্যাডলার। দশ বছর ধরে চাঁদ পরীক্ষা করে তাঁরা লিখলেন তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ, 'ডের মণ্ড' (চাঁদ)। প্রকাশ করলেন চাঁদের ভূদৃশ্যের নিখুঁত একখানা মানচিত্র।

বইখানা পড়ে মানুষ জানতে পারল : চাঁদে জল হাওয়া বা গাছপালা নেই। পৃথিবীর মত চাঁদের গর্ভে নেই গলিত লৌহ সীসক। তাই জীবন্ত আগ্নেয়গিরি এখানে দেখতে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ চাঁদ বিশাল এক মরা পাথরের পিণ্ড মাত্র। ওদের এ মতটা চলেছিল বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত!

তবু মানুষ চাঁদে যেতে চেয়েছে।

যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়? যাবার রথ কৈ? কি ভাবে তৈরি করা যাবে? আর চাঁদ থেকে পৃথিবী—এই যে মহাশূন্য, এ জায়গাটা কেমন?

ততদিনে নিউটনের তত্ত্ব থেকে বোঝা গিয়েছিল চাঁদে যাবার পথের বাধা হ'ল মহাকর্ষ। এর টান কাটাতে চাই ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে ছোটবার রথ! আবার চাঁদে যাবার রথ চলতে পারে কোন মন্ত্রে, তারও হদিশ দিয়ে যান নিউটনই তার গতি-সূত্র তিনটিতে। যার একটিতে বলে, প্রতিক্রিয়ারই আছে সমান ও বিপরীত বিক্রিয়া!

পৃথিবীতে তখনও ঘোড়ার গাড়ীর যুগ। ঘণ্টায় যা বড় জোর ছুটতে পারে দশ বারো মাইল। তাও মাটির উপর। ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল! সে তো কবি-কল্পনা!

গ্যালিলও চাঁদের দুনিয়ার খবরই দেননি। পত্তন করেছিলেন নতুন বিজ্ঞানের, যার মূল কথা হ'ল, পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের দ্বারা যা সমর্থিত নয়, বিজ্ঞানে তা গ্রাহ্যও নয়।

গ্যালিলিও এই বীজমন্ত্র ইউরোপে এনেছিল বিজ্ঞন-সাধনার নতুন জোয়ার। তা থেকে দেখা দিল ইংরাজ জেমস্ ওয়াট ও স্টিভেনসনের বাষ্পীয় এঞ্জিন। দেখা দিল ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব। সে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল মূলধন নিয়োগের। কাঁচামাল সংগ্রহের। মাস্কট, উন্নততর কামান ও জাহাজের বলে বলীয়ান ইংরাজ ভারতের মত দুর্বল ও অনুন্নত অস্ত্রধারী দেশকে লুঠ করে সংগ্রহ করে এ মূলধন। পরে ইউরোপের লোভ ও লুটের

শিকার হয় আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া! কলকারখানায় ফেঁপে ফুলে ওঠে ইউরোপ—অর্থে, সম্পদে অবসরে জেগে ওঠে নতুন শিক্ষিত বিজ্ঞান-মগ্ন মানুষের দল।

বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে চললেন এরা, মার্কিন বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিন, ইতালির ভোল্টা, ফরাসী অ্যাম্পীয়ার, জার্মান ওহম্, ইংরাজ ফ্যারাডে।

এই সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, শারীর বিদ্যায় অনেকগুলি বড় বড় আবিষ্কার হ'ল। গ্যাসের ধর্ম জানালেন ইতালির টরিসেল্লি, আয়র্ল্যাণ্ডের রর্বাট বয়েল, ইংলণ্ডের কেভেনডিস্। ফ্রান্সের লোভয়সিয়ঁ। তাপের রহস্য জানালেন ইংরাজ বেঞ্জামিন টমসন, আলোর রহস্য ফরাসী লিও ফুঁকো, মার্কিন মিচেলসন। পদার্থের ভিত্তি যে অণু তার মর্মোদ্ঘাটন করলেন ইংরাজ ডালটন, রুশ মেণ্ডেলেফ।

অসুর নাশে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল দেবতাদের বিন্দু বিন্দু তেজ নিয়ে মহামায়ার শক্তি! পৃথিবীর বাঁধন কাটাতে দরকার যে জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শক্তি, তার ভিত্তি স্থাপন করে গেল এমনি ভাবে নানা দেশের বিজ্ঞানী মনীষার তিল তিল সাধনা।

শুধু কি পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা? ভারতের চরক শুশ্রুত থেকে যার শুরু হয়েছিন, গ্রীক হিপোক্রিট, মধ্য-এসিয়ার গ্যালেন, ইংরাজ উইলিয়াম হার্ভে, ফরাসী পাস্তরের হাতে তা পরিণতি পেল। মানুষ জানতে পারল জীবদেহের রহস্য। বুঝতে পারল পৃথিবীর বাইরে যেখানে জল-বাতাস ও সহনশীল তাপমাত্রা নেই, সেখানে বাঁচতে পারে না মানুষ!

উনিশ শতকে বিজ্ঞান যখন বেশ উন্নত, তখন থেকে চাঁদে যাবার চেষ্টা যে বিজ্ঞানের পক্ষে সাধ্য, এ ধারণা চালু হয়। ফরাসী জুল ভার্ণ লিখলেন, কামানের গোলায় চেপে চাঁদের চারপাশে মানুষের পাক খাওয়ার বিস্ময়কর কাহিনী। যা সত্যি বলেই মনে হয়েছিল তখনকার মানুষের। তাঁর লেখা থেকেই বোঝা গেল, যে যানে চেপে মানুষ চাঁদে যাবে, তার উপর পৃথিবী থেকে নজর রাখা ও পরিচালনারও দরকার হবে!

সত্যি মনে হলেও এভাবে চাঁদে যাওয়া সম্ভব নয়। কি ভাবে সম্ভব হবে আঁকজোক ক'ষে তার হিসাব দিলেন বিশ শতকের প্রথমে বধির গণিত-শিক্ষক রুশ ৎজিওলকভস্কি। বললেন, মহাকাশের ঘর্ষণহীন স্থানে আপন ক্রিয়ার বিক্রিয়ায় চলে যে রকেট, তাই নিয়ে যাবে মানুষকে চাঁদে। তবে এর জন্য তৈরি করতে হবে তরল জ্বালানীর রকেট। চন্দ্রযানে থাকবে অকসিজেন উৎপাদন ও শোধন ব্যবস্থা।

রুমানিয়ার হারমান ও বার্থ, জার্মানীর গ্রহান্তর যাত্রী সমিতির ভন ব্রন ও তার সঙ্গীরা, আমেরিকার গডার্ড তরল জ্বালানী দিয়ে, তৈরি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁদের এ চেষ্টাও সফল হ'ত না, যদি না ছোঁড়বার পর মাটি থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে রকেটকে লক্ষ্যপথে চালান সম্ভব না হ'ত।

জার্মান বিজ্ঞানী হার্ৎস যে বিদ্যুৎ তরঙ্গের রহস্য উদ্ধার করতে পারেন নি, তা থেকেই পরে আবিষ্কার করলেন ভারতের জগদীশচন্দ্র ও ইতালির মার্কনী বেতার-তরঙ্গ।

এই বেতার তরঙ্গ কাজে লাগিয়েই হিটলারের প্রতিহিংসা অস্ত্র উড়ন্ত বোমা ভি-টুকে মাটি থেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলেন ভি-টু আবিষ্কারক জার্মান ভন ব্রন ও ড্রোন বার্জার। ভি-টুর মধ্যেই মানুষ পেল গ্রহান্তর যাত্রী রকেটের মডেল। যে সাটার্ন-৫ রকেটে চেপে সেদিন দু'জন মানুষ চাঁদে গেছে, তারও নকশা তৈরি এই তো ভন ব্রনের হাতে—যিনি ছিলেন তোমাদেরই মত কিশোর বয়সে জার্মান গ্রহান্তর-যাত্রী সমিতির উৎসাহী সভ্য!

যান তৈরির পথ না হয় হ'ল, তা'বলে চট্ করে চাঁদের পথে পা-বাড়ান চলেনি। এ শতকের প্রথম দিকে কোদাই কানালের মানমন্দির থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জানাল একটা মারাত্মক খবর। মাঝে মাঝে সূর্যি ঠাকুরের মাথাটা দপদপ করে জ্বলে ওঠে। দেখা দেয় সৌর কলঙ্ক। এ সময় বিকিরণের মাত্রা বাড়ে। দেহ বেশী পরিমাণ বিকরণ শুষলে নির্ঘাত মৃত্যু!

সৌর কলঙ্ক, সৌর বিকিরণ নিয়ে শুরু হয় দেশে দেশে পরীক্ষা, গবেষণা। এ তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের কাজ হয়েছে প্রথম দিকে কিছুটা কলকাতার বসু-বিজ্ঞান মন্দিরেও। সৌর কলঙ্ক দেখা দেবার সময় নির্ঘণ্ট ধরবার পরই ভরসা পাওয়া গিয়েছিল শান্ত সূর্যের সময়ে চাঁদে মানুষ পাঠানোর!

গত দশকের প্রথমে মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এমন অবস্থায় এসেছে, যখন মানুষের পক্ষে রকেটে চেপে চাঁদে যাওয়া সম্ভব। তবে তার জন্য চাই দেশের শিল্প উৎপাদন ক্ষমতার বিরাট অংশ কাজে লাগানো। পুঁজিবাদী দেশে এ ক্ষমতা নিযুক্ত মুনাফা লুটতে। চাঁদে যাবার মত বে-মুনাফার কাজে কেন তা লাগানো হবে?

এই সময়ই একটা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড করলো রুশরা। শান্তির কাজে ভূ-প্রকৃতি, আবহমণ্ডলের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজে শিল্পশক্তি নিয়োগের নিদর্শন হিসাবে তারা উৎক্ষেপ করলেন 'স্পুটনিক' (মানুষের বিশ্বস্ত সঙ্গী) ১৯৫৭ সালে। তিন বছর পরে মহাকাশে বিচরণ করল প্রথম মানুষ গ্যাগ্যারিন।

কিছুটা ভয়ে, কিছুটা আহত আত্মাভিমানের পুনর্বাসনে আমেরিকাকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হ'ল মহাকাশ জয়ের সাধনায় মত নিছক মুনাফাহীন কর্মকাণ্ডে। এর জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণায় গত দশ বছরে তারা নিয়োগ করেছে কয়েক হাজার কোটি টাকা!

তারই পরিণতিতে দু'জন মানুষ ১৯৬৯-এর জুলাইতে চাঁদে নেমেছে, আবার এই দ্বিতীয়বার এই নভেম্বরে দু'জন মানুষ চাঁদের বুকে অবতরণ করলেন—মানুষের তিন হাজার বছরের সার্থক রূপ দিয়ে।

অথ টুনটুনি কথা

সাত মহলা রাজবাড়ী। লোকজন দাসদাসী গমগম করছে। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী-কোটাল। মস্ত বড় রাজা। তার ঠাটঠমকের কমতি নেই। রাজা নিত্যি দুধপুকুরে চান করেন, মুখে লোধ্ররেণু মাখেন। সোনার থালায় আহার করেন, সোনার আসনে বসেন, সোনার পালঙ্কে শয়ন করেন। অপ্সরী-কিন্নরীর মত রাণী রূপ-লাবণ্যের ছটায় ঘর আলো করে, মণি-মাণিক্যে ঝলমল করা সাড়ী পরে, আলতা পরা পায়ে দাঁড়িয়ে দাসীদের ময়ূরপঙ্খী পাখার হাওয়া খান। অগুরু-চন্দনের গন্ধে ঘর ভরপুর হয়ে উঠে। রাজা আরামে নিদ্রা যান। এমন যে রাজা, যার রাজ্যে দুঃখ নেই, ক্লেশ নেই, আনন্দের ঘাটতি নেই, তাঁরও মনের শান্তি একদিন বিঘ্নিত হলো।

রাজার শয়ন ঘরের পাশে ফুলের বাগান। গোলাপ, চামেলী, বেলী, কাঞ্চন, রজনীগন্ধা, শেফালী, মালতী, মল্লিকা, চাঁপা, রঙ্গন, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া—কত রঙের আর ঢঙের ফুলগাছ সেখানে, গুণে শেষ করা যায় না! ফুলের বাহার দেখে দেখে আশ মেটে না! রাজার অবসর-বিনোদনের অন্যতম লীলানিকেতন এটি।

সেখানে রাজা কি করেন? তিনি বিকেলে একা-একা ঘুরে বেড়ান এই বাগানে। মল্লিকার ছায়ায় বিশ্রাম করেন। চাঁপা গাছের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছ সখী? তোমার ভ্রমর কই? রাজা শোনেন চাঁপা অভিমানের সুরে বলে, ভ্রমর ওই হোথা মালতীর সঙ্গে বিশ্রাম্ভালাপে রত আছে, আজ কয়দিন ধরেই এমনটি চলছে, কত সুরে গান গাইছে। আমি ফুল ফুটিয়ে, গন্ধ ঢেলে, বাতাস মাতাল ক'রে কত রকমে আহ্বান করছি, একবার আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। এসব কথা শুধু রাজাই শোনেন এবং বোঝেন। রাজা বলেন, দুঃখ করো না সখী, দিন কি সবার সমান যায়, শীতের পরেই বসন্ত আসে, ধৈর্য ধর। মল্লিকার পাতা নেড়ে, ডাল দুলিয়ে, সোঁ সোঁ করে এক-ঝাপটা বাতাস বয়ে যায়। রাজার কথায় সায় দিয়ে সে মাথা নত করে সম্মতি জানায়। সেই প্রতীক্ষাতেই সে দিন কাটাচ্ছে।

রাজা এবার ওঠেন, গুনগুন ক'রে গান ক'রে এগোন। বাগানের মধ্যিখানে পদ্মদীঘিতে শত শত পদ্ম ফোটে। পদ্মদীঘির কাল জলে পা রেখে রাজা শান-বাঁধানো ঘাটে বসেন। এদিক-ওদিক দেখেন। কোথা থেকে টুং টুং শব্দ ভেসে আসছে। ভারী মিষ্টি তো! ওমা! ওই যে দীঘির পারে রঙ্গন গাছের ডালে বাসা বেঁধেছে টুনটুনি ও টুনটুনি-বউ। নেচে নেচে এ-ডাল থেকে ও-ডালে যাচ্ছে আর মিষ্টি মধুর সুরে গেয়ে চলেছে। রাজার গানের সুর থেমে

যায়। টুনি আর টুনি-বউকে তাঁর বড্ড ভাল লেগে যায়। ছেড়ে যেতে মন চায় না। রাত হয় তবু সেখানেই বসে থাকেন। রাজার বয়স্য শ্রীকণ্ঠ আসেন। রহস্য করে বলেন, মহারাজ, আজ কার চিন্তায় বিভোর, কে এমন নির্মম ভাবে আপনার মন কেড়ে নিয়ে নিশ্চল করে আপনাকে এখানে বসিয়ে রেখেছে? রাজা উদাসভাবে তার দিকে তাকান, কোন কথা না বলে শ্রীকণ্ঠকে নিয়ে আপন ঘরে ফিরে আসেন।

'রাজার হাতে তরা বসে।'—পৃঃ ৩৯১

পরদিন সকাল কাটে রাজ কাজে। দুপুরটা হাসি-ঠাট্টা আর গল্প করে কাটান। কিন্তু সবকিছুই কেমন নীরস ঠেকে। বিকেলে আবার ফিরে আসেন পূর্বদিনের কথা মনে করে সেই ঘাটে। টুনি আর টুনি-বউ আজও টুং টুং করে নেচে নেচে এ-ডাল ও-ডাল করে বেড়াচ্ছে। রাজা হাত বাড়িয়ে ধরতে যান, তারা ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়। রাজা হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। মন্ত্রীকে ডাকেন, কোটালকে ডাকেন। বলেন, টুনি আর টুনি-বউকে আমার চাই। সোনার খাঁচা তৈরী করান। টুনি আর টুনি-বউকে তাতে রেখে, খাঁচাটি আমার ঘরের বারান্দায় রাখুন। আমি রোজ এদের নাচ দেখব,

গান শুনব। রাজার লোক জাল পেতে টুনিকে ধরল, টুনি-বউকে ধরল। মন্ত্রী দেখেন, এ-হাত থেকে ও-হাতে নেন। কোটাল দেখেন। তাঁরা একবাক্যে বলেন, বা বেশ সুন্দর পাখী তো! ওমা! হয়েছে কি, এ ভাবে এ-হাত ও-হাত ঘুরাতে গিয়ে কোন এক সময় টুনি-দম্পতি ফুড়ুং করে উড়ে যায়। আবার গিয়ে রঙ্গন গাছে বসে থাকে। মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র-মিত্র সবাই প্রমাদ গণেন, এবার না জানি কার গর্দান যায়।

রাজা খুব রাগ করেন, কিন্তু কাকেও কিছু বলেন না। এবার নিজেই গিয়ে টুনি ও টুনি-বউকে আদর করে বলেন, তোমাদের সোনার খাঁচায় রাখব, পেট ভরে খেতে দোব, যখন চাইবে মুক্তি দোব, চল আমার কাছে। টুনি আর টুনি-বউ রাজার অন্তরের কথা বুঝতে পারে। জালে ধরা পড়ে পালিয়ে এসেও, এবার তারা স্বেচ্ছায় ধরা দেয়। রাজার হাতে তারা বসে। রাজা চায় টুনি আর টুনি-বউয়ের দিকে। টুনি আর টুনি-বউ চায় রাজার দিকে।

পরদিন থেকে টুনি আর টুনি-বউয়ের বাসা ভাঙলো। সোনার খাঁচাই হলো তাদের নতুন বাসা। এখন যখন-তখন টুং টুং শব্দ করে গান করে, নাচে, লাফায়। মুক্ত বাতাস, মুক্ত আলো এসব কথা ভুলেই যায়। খাঁচাই তাদের বাসা, এর স্বল্প-পরিসরই তাদের আকাশ। অভাব যা কিছু থাকে সেটা রাজার স্নেহ-মমতাই পূরণ করে দেয়। রাজা রোজ দু'বেলা টুনিদের খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ান। নিজের হাতে খাওয়ান, আদর করেন। বেশ আছে তারা।

এমনি করে দিন যায়, সূর্যি উঠে পাটে যায়, রাত হয়, আবার দিনের আলো ফুটে উঠে। তবে চিরদিন তো আর সবার সমান যায় না, রাজারও যায় না। সেবার সারাটা বছর বৃষ্টি হলো না। মাঠ-ঘাট খাঁ খাঁ করছে। শস্যও নেই, দানাও নেই। থাকবে কোত্থেকে। জল নেই পুকুরে, নেই কুয়োতে, নদীও শুকোবে-শুকোবে করছে। রাজ্যের লোক অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। প্রজারা দলে দলে এসে প্রাসাদে ভিড় করছে। রাজা ভাণ্ডার উজাড় করে দু'হাতে খাদ্য বিলোচ্ছেন।

এমন দিনে কোথা রইলো টুনি আর কোথা রইলো পদ্মদীঘি, ফুল বাগান। রাজা দিনরাত ভাবেন আর ভাবেন। কি করে প্রজাদের দুঃখ দূর করবেন, দেশে শান্তি আসবে, মাঠ ফসলে ভরে উঠবে। অন্নাভাব থাকবে না, আবার ঘরে ঘরে হবে বার মাসে তের পার্বণ। প্রজার সুখে রাজাও সুখী হবেন। বৃষ্টি কিন্তু হয় না। ফসল তো দূরের কথা, ঘাসও গজায় না মাঠে। হাহাকার বাড়ে বই কমে না!

আর টুনি ও টুনি-বউ কি করে। এরা চেয়ে চেয়ে দেখে। বোঝে প্রজার দুঃখ, আর রাজার ব্যথা। দেখে দেখে অস্থির হয়। একদিন রাজার ভৃত্য সোনার খাঁচার দুয়ার খুলে

সরে দাঁড়ায়। খাঁচাটি ঝকঝকে তকতকে করে দুয়ার বন্ধ করে চলে যায় সে। টুনি আর টুনি-বউ স্বস্থানে ফিরে আসে। আজও ভৃত্য দুয়ার খুলে পরিষ্কার করার সময় এরা একপাশে সরে দাঁড়ায়। কিন্তু তারপর হঠাৎ ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে যায়। ভৃত্য এ-পাশ চায় ও-পাশ চায়। সদরের দিকে দৌড়ে যায়। মুখে বলে, গেল গেল! এদিকে আর কেউ বুঝবার আগেই টুনি আর টুনি-বউ দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

রাজা ছোটে, প্রজা ছেটে, পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী-কোটাল সবাই ছোটে। কেউ তাদের দেখা পায় না, হতাশ হয়। রাজার রাগ পড়ে না। রাজা ভৃত্যের গর্দান নেন। একে ধমকান, ওকে বকেন। কিন্তু কাকস্যপরিবেদনা—টুনটুনিদের আর মেলে না!

এদিকে টুনি আর টুনি-বউ চলেছে তো চলেইছে। কত নগর-বন্দর, মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড়, বাড়ী-ঘর পেরিয়ে চলেছে। নাম-না-জানা এক বিশাল প্রান্তর পেরিয়ে এক গভীর বনে তারা পৌছে গেল। সেখানে চাঁদ-সুরজের দেখা নেই। দিনের আলো পৌছতে ভয়। দিন-দুপুরে মনে হয় রাত-দুপুর। যাক্ অনেক দেশ-দেশান্তর পেরিয়ে এসেছে তারা, আর যেতে পারে না, বড় ক্লান্ত। এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে বসে ছোট্ট একটি গাছের সরু ডালে। টুনি চোখ বুজে ঢুলছিল, তার তন্দ্রা মত এসেছে। এমন সময় হলো কি, টুনি-বউ দেখে; দূরে শ্বেতশুভ্র একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তার শনের মত চুল, দুধে-আলতা রঙ, দুধের মত সাদা জামা গায় ও পরনে তেমনি সাদা ধুতি! লোকটি দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো টুনি-বউয়ের দিকে। টুনি-বউয়ের চোখ জুড়িয়ে যায়, দৃষ্টি হয় বিহ্বল। টুনির পায়ে ঠোঁটের চিমটি কাটে। টুনি ধড়ফড় করে চোখ মেলে চায়। সামনে দেখে টুনি-বউয়ের দেখা সেই বৃদ্ধ লোকটিকে। তারা চেয়ে আছে তো আছেই। ওমা একি! লোকটি গেল কোথায়? লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখে, যেখানে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, সেখানে রয়েছে একটি ধান গাছ। শিষের ভারে গাছটি নুয়ে পড়েছে। টুনি আর টুনি-বউ তার দুটি দানা কেটে নিয়ে আবার ফিরে চলল রাজবাড়ীর দিকে।

সেই মাঠ-ঘাট, বন-প্রান্তর পেছনে ফেলে, দিনরাত্তির চলে, ফিরে এল রাজবাড়ী। রাজা দৌড়ে এসে টুনি আর টুনি-বউকে আদর করে হাতে বসিয়ে নাচাতে লাগলেন। নিরানন্দের সংসারে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। রাজা-প্রজা, পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী-কোটাল সবারই আনন্দ। টুনি আর টুনি-বউ রাজার হাতে ঠোঁট থেকে বের করে ধানের দু'টি দানা দিল। রাজা ভাবলেন, এগুলি তার ভালবাসার প্রতিদান। নিজের পালঙ্কের এক কোণে সযত্নে দানা দু'টি তিনি রেখে দিলেন।

টুনি আর টুনি-বউ আবার সোনার খাঁচা আলো করে বসে থাকে। এদিকে হয়েছে কি, পরদিন চাকরাণী এসে রাজার বিছানাপত্র পরিপাটি করে বিছিয়ে দিয়ে যায়, আর সেই সময় ধান দুটি কোন ফাঁকে মেজেতে পড়ে যায়। সে মেজে ঝাঁট দিয়ে সেটি বাইরে ফেলে দেয়। বিকেলে আবার ঝাড়ুদার এসে সব ময়লা বাড়ীর পেছনের মাঠে ফেলে দিয়ে আসে।

রাজা ধান দুটি খুঁজে পান না। পরে খোঁজ করে জানলেন, ময়লার সঙ্গে সেগুলি মাঠে ফেলা হয়ে গেছে। তিনি দুঃখিত হন। কিন্তু দুটো ধান তো আর মাঠ থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়!

সে বছর বর্ষা না পড়তেই আকাশ কাল করে মেঘ এলো। যত গর্জালো তার দ্বিগুণ বর্ষণ হলো। আর এদিকে মাঠ ভরে গেল ফসলে। রাজা তো অবাক। ধান তো বোনা হয়নি, মাঠে তবে এই ফসলের সমারোহ হ'ল কোত্থেকে!

মনে পড়ে তাই তো টুনি আর টুনি-বউয়ের দেওয়া ধান দুটোই তো ফেলা হয়েছিল ঐ মাঠে। আর সেই ধানেই এত ফসল!

টুনি আর টুনি-বউয়ের আদর দেখে কে! এখন শুধু রাজা নয়, রাজা প্রজা সবারই পরম আদরের টুনটুনি আর তার বউ।

যাবে তোমরা অচিনপুরের রাজবাড়ীতে? নাম-না-জানা প্রান্তর পেরিয়ে, সেখানে গিয়ে আজও দেখবে টুনি আর টুনি-বউয়ের ছবি টাঙানো রয়েছে রাজার শয়ন-ঘরের দেওয়ালে।

"আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো।'

গান্ধী-গীতি

(সুর : হাম্বীর মিশ্র, তাল : একতালা)

সত্যবান

হায় গান্ধীজী সত্য কি তুমি
জাতির জনক ছিলে।
তোমার সত্য কই তবে কই
জাতির জীবনে মিলে॥
তোমার সাধনা শিক্ষা যা যত
সবি তো হতেছে ধূলিতলে গত
চক্রের চাপে চরকা তোমার
ভেঙে পড়ে তিলে তিলে॥

শুধু তোমারে তো গুলি ক'রে মেরে
ক্ষান্ত হয়নি তারা।
হেলায় লুপ্ত করিছে সবাই
তোমার জীবন-ধারা॥
সত্যাগ্রহ-মন্ত্রে যে তব
মিথ্যার ভার জমে নব নব
তোমার মিলন-প্রার্থনা এ কি
বিদ্বেষে ফেলে গিলে॥
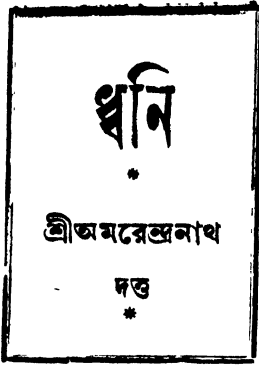
আমরা দিনরাত সারাক্ষণ যেন ধ্বনির সমুদ্রে বাস করছি।

ঘরে একা চুপটি করে বসে আছ, খেয়াল কর, চারদিক থেকে কত বিচিত্র, কত অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে আসছে তোমার কানে। টিকটিকি ঘরের কোণে টিক্‌টিক্ করছে, পাখির কিচিরমিচির, শিশুর কান্না, লোকজনের কথাবার্তা, হুইচই চেঁচামেচি, মাইকের চেঁচানি, কুকুরের ঘেউঘেউ, রিক্সার টুং টাং, মোটরের হর্ণ, ট্রামের ঘড়ঘড়, ট্রেনের হুইসিল, এরোপ্লেনের গর্জন। এ ছাড়াও শুনতে পাবে ঠাস্ ঠাস্, দ্রুম্‌দ্রাম্, সাঁইসাঁই, সন্‌সন্, হুড়মুড়, ধুপধাপ, ঘাঁচ্‌ঘোঁচ ইত্যাদি নানান কিসিমের আওয়াজ—যার তালিকা আছে সুকুমার রায়ের ঐ শব্দকল্পদ্রুম কবিতাটায়।

আদিম যুগে পৃথিবীতে ছিল ধ্বনির তরঙ্গ। ক্রমে জীবজন্তুর সৃষ্টি হ'ল, তাদের মুখে রা এল। মানুষের মুখে ফুটল কথা।

ধ্বনি বা শব্দ আমাদের জীবনযাত্রার একটা অঙ্গ। ধ্বনি আছে বলেই পৃথিবীটা সুন্দর। শব্দের লীলায় এই জগৎ মুগ্ধ।

কথিত আছে, কবি রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, যদি চোখে দেখা আর কানে শোনা এ দুয়ের একটাকে ছাড়তে হয় তবে তিনি দেখাটা ছাড়তে রাজি, শোনা নয়। এতে বোঝা যায় তিনি শব্দকে বেশি মূল্য দিয়েছেন।

এমন অনেক ধ্বনি আছে যাতে আমরা আনন্দ পাই, মন ঢোলের বাদ্যি. সানাইয়ের করুণ মধুর ধ্বনি, পাখির কলরব, পোকা-মাকড়ের বিচিত্র আওয়াজ, গাছের পাতার ঝিরঝির শব্দ, নদীর জলের কলকল ধ্বনি ইত্যাদি। গান-বাজনার আওয়াজ যদি শোনা না যেত, এমনকি কেউ শিষ দিলে যদি আওয়াজ না বের হ'ত—জীবনটা তবে নেহাৎ দুঃখের বিষাদের হ'ত না কি? গা কিরকম শিরশির করত, ভয় ভয় করত মনে।

পৃথিবীটা যদি একেবারে নীরব হ'ত, কোথাও কোনো সাড়াশব্দ যদি পাওয়া না যেত, তবে ব্যাপারটা কেমন হ'ত ভেবে দেখেছ কেউ? খোকাখুকুদের কান্নার শব্দ নেই, লোকজনের হুইচই নেই, লোকে টুঁ শব্দটি না করে পথ চলছে, কারো পকেট থেকে পয়সাকড়ি ফুটপাতে পড়ল অথচ ঝনঝন আওয়াজ হ'ল না, মোটরকারের হর্ণ বাজছে না, ব্রেক কষার শব্দ হচ্ছে না, মালপত্র ওঠানামা হচ্ছে দুমদাম শব্দ হচ্ছে না, ট্রাম ট্রেন চলছে নিঃশব্দে—কল্পনা করত ব্যাপারটা?

মানুষের কথা বলার শক্তি যদি না থাকত? হয়ত তখন লোকে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করত আকারে-ইঙ্গিতে; যেমন করে থাকে বোবা-কালা লোকরা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা বা

ইশারায়। কিন্তু সেটা কাছাকাছি বা সামনাসামনিতেই সম্ভব। দূর থেকে এমন কি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে কিংবা এক ফুটপাথ থেকে অন্য ফুটপাথেও তা অচল। আর স্কুল-কলেজে সভা-সমিতিতে ইশারার ব্যবস্থা তো চলবেই না। দূর দূর অঞ্চলে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে তা হলে টেলিফোন আর রেডিওর আবিষ্কারই হ'ত না।

আর, শব্দের অভাবে পৃথিবীতে বিপদ এড়ানও কঠিন হ'ত। এই দেখ না, শিশুর কান্নার শব্দে মা যেমন ত্রস্ত হয়ে ছুটে এসে কোলে তুলে নেয়, শান্ত করে ওকে; 'ওগো কে কোথায় আছ, রক্ষা কর', এই ধরণের করুণ চীৎকার শুনে চারদিক থেকে লোকজন ছুটে আসে বিপদ থেকে রক্ষা করতে; রেলওয়ে ক্রসিং-এ শুনতে পাবে ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইসিল বিপদ-সংকেত; কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্রে জাহাজ এগোয় ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করতে করতে। তবেই দেখ, বিপদ-আপদও এড়ানো যায় ধ্বনির সাহায্যে।

কোন বস্তুর কাঁপুনি বা তরঙ্গ দ্বারা ধ্বনির সৃষ্টি। ঐ কম্পন বা আগুপিছু চলাচল ব্যাপারটা অবশ্য চোখে দেখা যায় না, ধরা-ছোঁয়া যায় না; কিন্তু শোনা যায়, বাতাস তা পৌঁছে দেয় আমাদের কানে।

সোজা কথায় বায়ু শব্দ-বহ বায়ু তরঙ্গে শব্দ বাহিত হয়, শব্দ ভেসে আসে বাতাসে। অতএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ সেখানে শব্দ অস্পষ্ট হতে পারে।

কেবল বাতাস কেন? ধ্বনি আরো ভাল চালিত হয় বাষ্পীয় পদার্থ কিংবা শক্ত নিরেট বস্তুর মধ্য দিয়ে। তোমার টেবিলের উপর থেকে সমস্ত বইপত্র কাগজ কলম সরিয়ে ফেল; তারপর টেবিলের এক প্রান্তে একটি হাতঘড়ি রেখে অপর প্রান্তে কান পেতে থাক—ঘড়ির টিক টিক শব্দটি তুমি ঠিক শুনতে পাবে। পরখ করে দেখতে পার। নয়ত দুটি খণ্ড পাথর হাতে নিয়ে জলে নেমে পড়। জলে ডুব দিয়ে দু'হাতে ঐ পাথর খণ্ড দুটোতে, খুব ঠোকাঠুকি কর—তুমি অবাক হয়ে যাবে বিরাট আওয়াজ শুনে।

পূর্বে বলেছি কোন জিনিসের মধ্যে দিয়ে ঢেউ-এর মত শব্দ বাহিত হয়। দুটো চোঙা ফুটো করে তাতে বেশ লম্বা শক্ত সুতো বেঁধে নাও। ভাইকে বল, একটা চোঙা সে তার কানের কাছে ধরুক, অন্য চোঙাটা নিয়ে তুমি দূরে গিয়ে দাঁড়াও, সুতোটা যেন টান থাকে। এখন চোঙাটায় মুখ রেখে তুমি কথা বল—তোমার ভাই তা স্পষ্ট শুনতে পাবে।

ঢেউ-বিহীন স্থির জলে শব্দতরঙ্গ ভেঙে ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে না; তাই নদীর এপার থেকে ডাকলে ওপারে শোনা যায়।

যে ধ্বনি প্রতিফলিত হয়, তাকে বলে প্রতিধ্বনি। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি দুয়েরই লক্ষণ প্রায় এক প্রকার। নির্জন স্থানে দাঁড়িয়ে দূরের দেয়াল বা পাহাড় লক্ষ্য করে জোর গলায় নিজের নাম ধরে ডাকো, দেখবে তোমার কাছেই ফিরে এসেছে তোমার নামটা।

সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফুট যায়। মানুষের কণ্ঠস্বর কতদূর যায় আমার জানা নেই।

মেঠুড়ে

ক্রিকেট

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারত ও নিউজিল্যাণ্ড দলের প্রথম টেস্টে ভারত ৬০ রানে জয়ী হয়। যদিও নিউজিল্যাণ্ডের ক্রিকেট শক্তি মাঝারিয়ানার মধ্যে বাঁধা, দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় বয়সে তরুণ, তবু তিনজন নতুন খেলোয়াড় (ওপেনিং ব্যাটসম্যান চেতন চৌহান, ওপেনিং বোলার অজিত পাই এবং অশোক মানকড়) নিয়ে গড়া ভারতীয় দলের জয় একদিকে যেমন আত্ম-বিশ্বাস উজ্জীবিত হবার সহায়ক, অন্যদিকে তেমন শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আসন্ন টেস্ট খেলাগুলোর আগে বাড়তি প্রেরণার খোরাক।

বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে কেউ সেঞ্চুরি করতে পারেন নি, হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন দু'দলের দু'জন—নিউজিল্যাণ্ডের বিভান কংডন এবং ভারতের নবাব পাতৌদি। বোলিং-এ কেউ অসাধারণ দক্ষতা দেখতে পারেন নি, একমাত্র বিষেন সিং বেদী ছাড়া। তাও শেষ দিকের টার্নিং উইকেটে। কিন্তু খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ কখনো কমেনি। দু'দলই আশা-নিরাশার দোলার মধ্যে ব্যাট-বলের লড়াই চালিয়েছেন। প্রথমে মাত্র ১৫৬ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ। ব্যাটের ওপর বলের প্রাধান্য। নিউজিল্যাণ্ডের বোলারদের বলের বিক্রমে ভারতের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থ ভূমিকা। শুধু অজিত ওয়াদেকারের কিছুটা আত্মবিশ্বাসী খেলা। পরে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে ২২৯ রান। এখানেও প্রধানত বোলারদের প্রাধান্য। তবে নিউজিল্যাণ্ডের বিভান কংডন এবং অধিনায়ক ডাউলিং প্রশংসনীয় খেলা খেলেন।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ৭৫ রানে পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ২৬০ রান প্রধানত পাতৌদির অধিনায়কোচিত ব্যাটিং-এর ফল। তবু জয়ের জন্যে নিউজিল্যাণ্ডের যেখানে প্রয়োজন মাত্র ১৮৮ রানের, সেখানে ১২৭ রান করে ৬০ রানে তাদের পরাজয় স্বীকার কিছুটা অপ্রত্যাশিত। ভারতের দুই স্পিন বোলার বিষেন সিং বেদী এবং প্রসন্নর প্রশংসনীয় বোলিংই নিউজিল্যাণ্ড দলের পরাজয়ের প্রধান কারণ। দু'জনই টার্নিং উইকেটের পুরো সুযোগ নিয়েছেন। অধিনায়ক ডাউলিং এবং কিছুটা ভেল হেডলী ছাড়া নিউজিল্যাণ্ডের আর কোনো

ব্যাটসম্যান বেদী ও প্রসন্নর বল আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারেন নি। প্রসন্ন পেয়েছেন ৭৪ রানে চারটে এবং বেদী পেয়েছেন ৪৬ রানে ছ'টা উইকেট।

* * *

বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্টে ৬০ রানে পরাজয়ের পর নাগপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতকে ১৬০ রানে পরাজিত করে নিউজিল্যাণ্ড দল ভারতের মাটিতে প্রথম টেস্ট জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বিদেশের মাটিতে নিউজিল্যাণ্ডের এটা দ্বিতীয় টেস্ট জয়। প্রথম জয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। নাগপুরে নিউজিল্যাণ্ড দলের জয়ের মূলে স্থচনা থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং সর্ববিভাগের প্রাধান্য। অবশ্য ভারতের প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ড দলের ফিল্ডিংয়ে কিছু ভুলচুক ছিল। না হলে তাদের জয় হ'ত আরও আনায়াসসাধ্য।

নাগপুরে ব্যাটিং-এ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নিউজিল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং, মার্ক বার্জেস, বিভান কংগুন ও গ্লেন টার্ণার। বোলিং-এ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন হেডলী হাওয়ার্থ, ভিক্টর পোলার্ড ও মার্ক বার্জেস। হাওয়ার্থের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। দু'ইনিংসে মাত্র একশ রান দিয়ে তিনি পেয়েছেন ন-টা উইকেট।

বোলিং-এ ভারতের বেঙ্কটরাঘবনের কৃতিত্বও কম নয়। দু'ইনিংসে তিনিও দখল করেন ন-টা উইকেট। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে আবিদ আলী, অম্বর রায়, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখিয়ে নিউজিল্যাণ্ড দলের প্রথম ইনিংসের ৩১৯ রানের সঙ্গে পাল্লা টেনে খেলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে পাতৌদির নবাব ও অজিত ওয়াদেকার ছাড়া কেউই বেশীক্ষণ ব্যাট ধরে দাঁড়াতে পারেন নি।

টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার স্পিন বোলারের সহায়ক উইকেটে খুব বড় কথা। নিউজিল্যাণ্ড দল সেই স্থযোগ পুরোপুরি কাজে লাগান এবং খেলার স্থচনা থেকে নজর দেন রান তোলার দিকে। তবু এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে, নিউজিল্যাণ্ড দলের স্পিন বোলিং এমন কিছু মারাত্মক ছিল না যাতে ১০৯ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হতে পারে।

বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে অম্বর রায় তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টে খুবই ভালো খেলেছেন। তাঁর ৪৮ রানের মধ্যে ৪০টা রান ছিল চারের মারে। কিন্তু অশোক মানকড় এ টেস্টে তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে জানাই—১৯৫৫-৫৬ সালে মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্টে এই নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম উইকেটে ভিনু মানকড় ও পঙ্কজ রায় তুলেছিলেন ৪১৩ রান যা টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে বিশ্ব রেকর্ড হয়ে আছে।

* * *

দু'দেশের একটা করে টেস্ট জয়ের পর হায়দরাবাদে বৃষ্টির জন্যে তৃতীয় এবং শেষ টেস্টের ফলাফল মীমাংসিত না হওয়ায় ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট সিরিজও অমীমাংসিত থেকে

গেছে। ভারতীয় দলের যখন চরম সংকট, নিউজিল্যাণ্ড দলের সামনে প্রথম রাবার জয়ের সুবর্ণ সুযোগ তখন বৃষ্টির জন্যে ভারত শোচনীয় পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। খেলার শেষ দিন লাঞ্চের এক ঘণ্টা পরে যখন জোর বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ হয়ে যায়, তখন ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৭৬ রান, ঘাটতি ১৯১ রানের। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রাবার লাভের জন্য নিউজিল্যাণ্ডের দরকার মাত্র শেষ দিকের তিনটে উইকেট।

হায়দরাবাদে ভারতীয় দল ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সবেতেই চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। খেলাটার সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ডই বলে দেবে ভারতের চরম ব্যর্থতার কথা।

নিউজিল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস ১৮১ রান (মারে ৮০, ডাউলিং ৪২; প্রসন্ন ৫১ রানে ৫ উইকেট, বেদী ৫২ রানে ২ উইকেট)।

ভারত—প্রথম ইনিংস ৮৯ (বেঙ্কটরাঘবন ১৫ [নট আউট]; হেডলী ৩০ রানে ৪ উইকেট, কানিস ১২ রানে ৩ উইকেট)।

নিউজিল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ১৭৫ [৮ উইকেটে ডিক্লে:] (ডাউলিং ৬০, মারে ২৬; আবিদ আলী ৪৭ রানে ৩ উইকেট, প্রসন্ন ১৮ রানে ৩ উইকেট, বেদী ৪০ রানে ২ উইকেট)।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস ৭৬ [৭ উইকেট] (গান্দোত্রা ১৫; কানিস ১২ রানে ৩ উইকেট, হেডলী ৩১ রানে ৩ উইকেট)।

ফুটবল

বাংলা দেশ যেমন ভারতের প্রধান ফুটবল কেন্দ্র, তেমন ভারতীয় ফুটবলে বাংলার পর্যাপ্ত প্রাধান্যের কথাও সর্বজনস্বীকৃত। ছাব্বিশ বারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্যে কুড়ি বার ফাইনাল খেলা এবং বারো বার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করার মধ্যে এই প্রাধান্য প্রমাণিত।

এবার বাংলার প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বাঙ্গালী দল ফুটবলের উন্নত কলা-কৌশল দেখিয়ে বিজয়ীর সম্মান 'সন্তোষ ট্রফি' নিয়ে ঘরে ফিরেছে। এমন বিক্রম কোনো বছর কোনো দলই জাতীয় ফুটবলে দেখাতে পারেনি। এমন কি অন্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় নিয়ে গড়া বাংলা দলও এর আগে আর কখনো এতো ভালো খেলেনি। মোট পাঁচটা খেলায় আটাশটা গোল, বিপক্ষে মাত্র দুটো। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে গোয়ার বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জয়। যে গোয়া কেরলকে হারিয়েছিল ৭-১ গোলে। কোয়ার্টার ফাইনালে মাদ্রাজের বিরুদ্ধে ৮-০ গোলে জয়। সেমি-ফাইনালে ডাবল লেগের খেলায় শক্তিশালী অন্ধ্র ৪-১ ও ৬-০ গোলে বাংলার কাছে পরাজিত। যে অন্ধ্র দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় রাজস্থানকে হারিয়েছিল ৮-০ গোলে। ফাইনালে সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধেও বাংলার ৬-১ গোলে জয় জাতীয় ফুটবল ফাইনালে বেশী গোলে জয়ের নতুন রেকর্ড।

বাংলার খেলোয়াড়দের পরিবেশ, যোগাযোগ এবং কলা-নৈপুণ্যের কাছে সব দলই

প্রত্যেকটা খেলায় পর্যুদস্ত হয়েছে। বাংলা দলের খেলোয়াড় হাবিব মাদ্রাজের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক, ফাইনালে সার্ভিস দলের বিরুদ্ধে ৬-টা গোলের ভেতর হ্যাটট্রিকের কৃতিত্ব সমেত একাই করেছেন পাঁচটা গোল।

১৯৬২-৬৩ সালে মহীশূরকে হারিয়ে বাংলা শেষবার সন্তোষ ট্রফি জয় করে। ছ'বছর পরে আবার সন্তোষ ট্রফি বাংলায় ফিরে এলো।

সাঁতার

দিল্লীর জাতীয় সাঁতারকে এবার রেকর্ড ভাঙা-গড়ার সাঁতার বলা যায়। পুরুষদের চোদ্দটা বিষয়ের মধ্যে রেকর্ড হয়েছে এগারটা বিষয়ে, বালকদের আটটা বিষয়ের মধ্যে তিনটেতে। মেয়েদের মধ্যে বালিকা বিভাগের পাঁচটা ইভেন্টেই নতুন রেকর্ড হয়েছে, কিন্তু মহিলাদের আটটা বিষয়ের মধ্যে একটাতেও নতুন রেকর্ড হয়নি, যদিও মহারাষ্ট্রের মেয়ে মিলকা অ্যাস্প্রাজি একা ছ-টা বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। মহিলাদের মধ্যে যেমন মিলকা, পুরুষদের মধ্যে তেমন সার্ভিস দলের উনিশ বছর বয়স্ক ফ্রি-স্টাইলের সাঁতারু মহীন্দার সিং রাণার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সব রকমের খেলাধূলায় সার্ভিসের যে প্রাধান্য সাঁতারেও তার ব্যতিক্রম নেই। সার্ভিসের সাঁতারুরা যেখানে ১৫০ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী হয়েছেন, সেখানে বাংলার সাঁতারুরা মাত্র ৪৮ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এ থেকেই প্রমাণ হয়, সাঁতারেও সামরিক সাঁতারুদের কত প্রাধান্য।
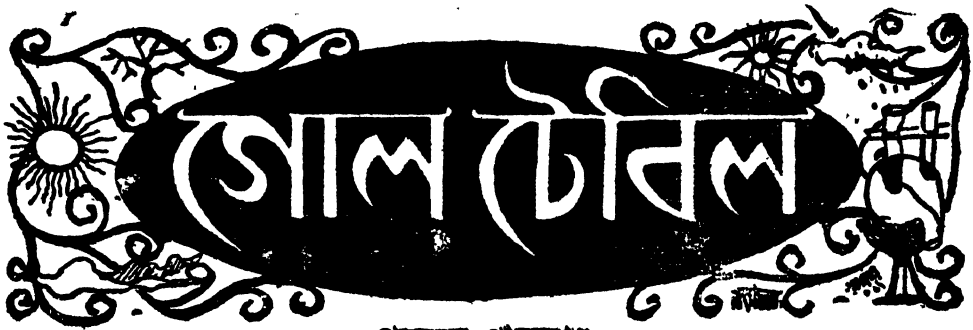
পদব্রজে গ্রীনল্যাণ্ড

চন্দ্রাভিযানের যুগে পদব্রজে গ্রীনল্যাণ্ড অভিযান সাড়া না জাগালেও দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নেই। এই অভিযান চালাবেন পাঁচজন জার্মান। এঁরা পশ্চিম থেকে পূর্বে গ্রীনল্যাণ্ড অতিক্রম করবেন। অভিযানে যেসব জিনিস দরকার যেমন, তাঁবু, ঘুমের থলে, কাঁটা লাগানো জুতো, দড়ি, স্কি, ছবি তোলার মালমশলা ও রান্নার বাসনপত্তর সবকিছুই এদের বিনামূল্যে যোগাবে জার্মানীর একটি বৃহৎ বিভাগীয় বিপণি। এছাড়া শুষ্ক খাদ্য, রেডিও ও আলোক সংকেতের যন্ত্রপাতি দিচ্ছেন জার্মান ফৌজী বিভাগ। দিনে পনের থেকে কুড়ি কিলোমিটার পথ অতিক্রম কোরে মোট পাঁচশো পঞ্চাশ কিলোমিটার এঁরা পাঁচ সপ্তাহে হেঁটে শেষ করতে চান। এপথে অনেক চড়াই-উত্‌রাই আছে আর আছে তুষার-ভল্লুকের ভয়। কিন্তু দুনিয়াটাকে জানার উৎসাহে এই দুঃসাহসী পাঁচজন জার্মান এসব ভয়কে মোটেই আমল দিতে রাজী নয়। অভিযানের পথে এঁরা নিয়মিত গ্রীনল্যাণ্ডের তাপ ও বাতাসের হিসেব রাখবেন।

আরো হাসপাতাল চাই

বৈজ্ঞানিকদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আমাদের বংশধরেরা ১০০ থেকে ১২০ বছর বাঁচবে। এই দীর্ঘজীবনে তাদের অসুখবিসুখ বেশি হবে, সুতরাং বেশি হাসপাতাল দরকার হবে। সাবেক কালের চেয়ে এখনই অনেক বেশি লোক হাসপাতালে যায়, ভবিষ্যতে আরও যাবে। সুতরাং হাসপাতালের সংখ্যা এখন থেকে বাড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

দরজা ছাড়াই শব্দ বন্ধ

হামবুর্গ বিমানবন্দরে যে বাড়িটায় বিমানের ইঞ্জিন ও জেট ইঞ্জিনের কলকব্জা চালিয়ে পরীক্ষা করা হয়, সেই বাড়িতে কোন দরজা নেই, অথচ এতোটুকু শব্দ বাইরে যায় না। বাড়িটা তৈরি করার পেছনে ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়াররা। তৈরি করতে খরচ পড়েছে নয় মিলিয়ন মার্ক। এই বাড়ির অগ্নিরোধক ব্যবস্থাও অতুলনীয়।

ঘুম ও স্বপ্ন দেখা

তোমরা হয়ত জান না, ঘুমিয়ে পড়ার চল্লিশ মিনিট পরে তোমাদের সবচেয়ে গাঢ় ঘুম হয়। তখন শব্দ, আলো, ঠাণ্ডা, স্পর্শ কিছুই তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। এই অবস্থা থাকে ঘণ্টাখানেক। তারপর নিয়মিত তিন থেকে বার ছয়েক স্বপ্ন দেখ তোমরা। তাই যারা বলে যে, তারা কখনও স্বপ্ন দেখে না, তারা ভুল বলে। এনসেফোলোগ্রাফ নামে যে যন্ত্র আছে তাতে দেখা যায় যে, গাঢ় ঘুমের সময় পেরিয়ে গেলেই মস্তিষ্কে যথেষ্ট ক্রিয়া শুরু হয়, চোখ নড়াচড়া করে এবং নিদ্রিত ব্যক্তি প্রথম স্বপ্নে তার অসমাপ্ত কাজ সম্বন্ধে চিন্তা করে। এই হাল্‌কা ঘুমের ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মানুষ আবার স্বপ্নহীন ঘুমের অবস্থায় চলে যায়। সারারাত পাঁচ ছ-বার এই ব্যাপার চলে এবং প্রত্যেকবার স্বপ্ন হতে থাকে দীর্ঘ এবং ব্যাপক। আশ্চর্যের কথা যে, কেবল শেষ স্বপ্নের কথাই মানুষের জেগে ওঠার পর মনে থাকে এবং তাও আবার দেড়ঘণ্টা পরে মন থেকে মুছে যায়। প্রথম রাত্রে 'স্বপ্ন জগতে যাত্রায়' মানুষের স্বপ্ন দশ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় না, কিন্তু ভোরের স্বপ্ন একঘণ্টা পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।

সুশীল ও নিরুবালা প্রতিযোগিতার
ফলাফল

॥ *প্রথম* ॥

শ্রীআশুতোষ কুণ্ডু, এগরা ঝাঁটুলাল হাইস্কুল
পোঃ এগরা, জেলা ঃ মেদিনীপুর

॥ *দ্বিতীয়* ॥

শ্রীঅরুন্ধতী শাসমল
গ্রাম ঃ শয়লা, পোঃ সোনাখালি
জেলা ঃ মেদিনীপুর

॥ *তৃতীয়* ॥

শ্রীআশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
জি ১৮১।১, এ্যাকাউণ্টস্‌ কলোনী
চক্রধরপুর

(১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার যথাক্রমে ১৫'০০, ১০'০০ ও ৫'০০ টাকা)
পুরস্কারপ্রাপ্তদের এই টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

খোয়াই

মলিন গেরুয়া ঢাকা তুমি যে খোয়াই
ধূসর আকাশ মাঝে
তুমি যে রিক্ত সাজে
তোমার দুয়ারে এসে, নিজেই হারাই।

তাল গাছ দাঁড়িয়েছে প্রহরীস্বরূপ
শাল বনে ভরে আছে প্রকৃতির রূপ।
বৃষ্টি ভরেছে তুলে
ছোট ছোট খাদ
কুড়োতে পাথর নুড়ি
মনে হয় সাধ।
যতদূর চোখ যায় গেরুয়া খোয়াই
তারপরে মনে হয়, আর কিছু নাই।

প্রকৃতি উদার হাতে করেছে যে দান
সেথা গেলে পাষাণেরও
জেগে ওঠে প্রাণ।

শ্রীসুদীপ্ত হাজরা

বাপুজী

ওগো প্রেমের পূজারী—
প্রেম দিয়ে তুমি সবারে জিনিলে
মারণ-অস্ত্র ছাড়ি!

আজকে শতজন্ম-বরষে
তোমায় নমস্কার,
ওগো মাহাত্মা তোমার নামটি
নয় যে গো ভুলিবার!

প্রেমের সাগর তোমার বক্ষে
সবারে ভাবিলে জ্ঞাতি,
কোথায় জৈন, কোথায় পার্শী,
ভুলে গিয়ে সব জাতি!

তুমি হে মহান্, জাতির জনক—
সত্য প্রেমের পূজারী;
প্রেম দিয়ে তুমি সবারে জিনিলে
মরাণ-অস্ত্র ছাড়ি!

শ্রীজয় ভট্টাচার্য

শেয়াল মামার বিয়ে

শেয়াল মামার বিয়ে—
বৃষ্টি এলো এমন সময়
আজকে অসময়ে।
বজ্র জোরে উঠলো বাজি
বিজলী-রাণী উঠলো সাজি
আকাশ থেকে মেঘের রাজি।
উঠলো কথা ক'য়ে।
হচ্ছে বিয়ে গহন-বনে
পিঁড়ির পরে বসে ক'নে,
বরের কানে পুরুত তখন
মন্ত্র পড়ে চলে;
বরটা বেবাক কানে কালা।
তাই তো কনে দিল মালা—
পুরোহিতের গলে।
এমন বিয়ে কেউ দেখেনি,
জন্মে কোনকালে!

শ্রীত্রিদিবকুমার রায়

ভুলিতে পারিনা তাকে

আজীর কোঠায় এসে জীবনের সীমা শেষে
দাঁড়ায়েছি মৃত্যুর পারে,
ভুলিতে পারিনা তাকে যৌবনের সাথীটাকে
'মৌচাকে'রে খালি মনে পড়ে।
'মৌচাক' শিশুদের 'মৌচাক' যুবাদের
'মৌচাক' বুড়াদেরও তরে,
বাবা, মা ও ভাই-বোন দিয়ে সবে এক মন
বসে বসে 'মৌচাক' পড়ে।
নরেন-এর ধাঁধাগুলি চারুদা'র রঙ তুলি
তাকে কি রে ভোলা যায় কভু ?
সব কিছু মুছে যাবে শুধু উহা মনে রবে
আমার স্মৃতির পাতায়।
মরণ শিয়রে আজ তবু দেই আশীর্বাদ,
যৌবনের সাথী 'মৌচাক',
ছেলে-বুড়ো সবাকার নিয়ে প্রেম প্রীতি আর
মধুময় হয়ে বেঁচে থাক ॥

শ্রীশৈবাল দত্ত

বাতাস

বাতাস কি দেখেছ ?
বাতাসেতে গাছে গাছে,
পাতারা খুশিতে নীচে,
তখন কি বাতাসের—.
হিসাব কি রেখেছ ?
বাতাস কি দেখেছ ?
গাছগুলো সারে সারে,
মাথা নাড়ে বারে বারে
তখন কি বাতাসের—
চেহারাটা এঁকেছ ?
বাতাস কি দেখেছ ?*

সৈয়দ আহসান জমিল

*C. Rossotti-র The Wind কবিতাকে সামনে রেখে।

পথ

পথ !
পায়ে চলা ছোট একখানি পথ,
অরণ্য-বনানীর মাঝে—
পাহাড়ের গা ঘেঁষে
চলিয়াছে এঁকে-বেঁকে একখানি পথ।
ছোট নদীটির ধার দিয়ে—
বড়-ছোট কত গ্রাম বেয়ে
চলে গেছে একাকী যে ছোট এই পথ।
যার 'পরে চলে সদা অগণন জীব
সহ্য যার অসীম অপার
—তার নাম পথ।
আছে পড়ে সেই পথ পথিকের পদরজ মাখি,
গেছে চলে দূর থেকে দূরান্তরে—
ছোট গ্রাম্য একখানি পথ।

শ্রীআশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক শব্দের শৃঙ্খল

শ্রীজ্যোতির্ময় হুই

ছোট্ট বন্ধুরা তোমাদের জন্য বৈজ্ঞানিক শব্দের এই শৃঙ্খলটি দেওয়া হলো। তোমরা ভালো-ভাবে ভেবে এর সমাধানের চেষ্টা করো—সমাধান করতে পারলে বিজ্ঞানের অনেক অজানা তথ্য এবং কয়েকজন আবিষ্কারকের নাম তোমরা জানতে পারবে।

সূত্র

উপর থেকে নীচে :—

১। রঙীন বৈদ্যুতিক আলোর জন্য ব্যবহৃত গ্যাস,

২। বায়ুচাপমান যন্ত্রের আবিষ্কার করেন।

৩। শরীরের যে অংশ ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার সহিত তুলনীয়।

৪। টেলিগ্রাফের সাহায্যে দূরাগত সংবাদের স্বয়ংক্রিয় লিখন-যন্ত্র।

৫। বালির রাসায়নিক নাম।

৬। দৈর্ঘ্য মাপার একক।

৭। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম ভারতীয় বৈজ্ঞানিক।

৮। ষ্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন।

পাশাপাশি :—

১। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক।

৬। হাজার ভাগের একভাগ।

৮। দেশলাই আবিষ্কার করেন।

৯। ঘুমের ওষুধ।

১০। মিশরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী যিনি প্রচার করেছিলেন এই ভ্রান্ত মতবাদ যে, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে এবং বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডে পৃথিবী স্থির ও অচঞ্চল।

(সমাধান আগামী মাসে প্রকাশিত হবে)

।। গত আশ্বিনের ধাঁধার উত্তর ।।

১। ৫৪টি ২। চিঠি ৩। মাস, বৎসর ৪। কলাগাছে কলার কাঁদি ৫। Eye.
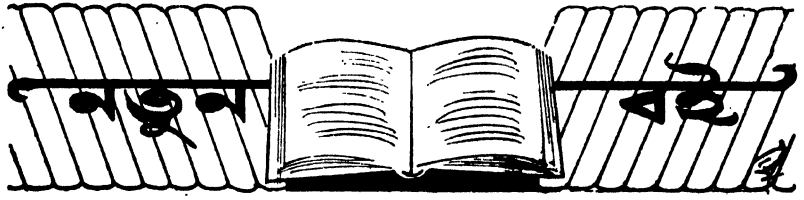
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

ছড়ায় জীবনী—শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। মূল্য ১.২৫

'ছড়ায় জীবনী' সুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে ছড়ায় লেখা কয়েক জন বাঙালী মনীষীর জীবনী। এঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, সত্যেন দত্ত, গোবিন্দ দাস, কাজী নজরুল, দেশবন্ধু, নেতাজী, আশুতোষ, পি. সি. রায়, জগদীশ-চন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, সমাজ-সংস্কারক ও সাধক ব্যক্তিরা আছেন। সম্পূর্ণ পাতায় দু'রঙের একটি করে ছবি আছে এঁদের। ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ভারী সুন্দর ও সহজভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। এ থেকে ছোটরা অনুপ্রাণিত হবে। ছাপা ও ছবিগুলি মনোরম।

ছোটদের সেরাগল্প—শ্রীবিশ্বনাথ দে সম্পাদিত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। মূল্য ৩.০০

ছোটদের উপযোগী উনিশটি গল্পের সংকলন। লিখেছেন উনিশ জন লেখক। এঁদের মধ্যে নামকরাও যেমন আছেন শিশু-সাহিত্যের কয়েকজন, তেমনি এমন কয়েকজন আছেন, যাঁদের শিশু-সাহিত্যে তেমন নাম নেই। মোটের উপর সব গল্পগুলিই সুখপাঠ্য এবং ছোটরা পড়ে আনন্দ পাবে। তবে ছোটদের এই গল্প-গুলির একটি করে 'হেড্‌পীস' অথবা ভিতরে একটি করে ছবি দিলে সংকলনটি আরও আকর্ষণীয় হ'ত। প্রচ্ছদপটটি অবশ্য কম আকর্ষণীয় নয়।

আকাশ-প্রদীপ—শ্রীমতী তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়। পথিকৃৎ প্রকাশনী, ১।১-এ ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা ৪। মূল্য ৩.০০

আজকাল বড়দের নাটকের খুবই চাহিদা দেখা যায়, কিন্তু ছোটদের অভিনয় করার উপযোগী ছোট নাটক বা নাটিকা তেমন দেখা যায় না। যেগুলি আছে, সেগুলির অধিকাংশই ছোটরা অভিনয় করে বা দেখে তেমন আনন্দ পায় না। শ্রীমতী তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটিকাটি যেমন অভিনব, তেমনি উপভোগ্য। এতে পৃথিবীর কর্মরত মানুষ, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী, চাষী প্রভৃতি যেমন আছে, তেমনি রাজপুত্র এবং ছোট্টপরীও আছে। এ নাটিকা অভিনয় করে ছোটরা দর্শকদের খুবই আনন্দ দিতে পারবে। গানগুলির স্বরলিপি করে দেওয়া আছে। বইখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর। উপরের কভারটিও মনোরম।

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

গান্ধীজি

চারু রায় অঙ্কিত

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্র *

৫০শ বর্ষ] পৌষ : ১৩৭৬ [৯ম সংখ্যা

শ্রীদেড়কড়ি শর্মা

*

শশধর সিকদার—
শাশারামে বাড়ি তার।
শশী তার ছোট ভাই,
শুধু বলে—শশা খাই।
শেষে ঠেসে খায় বেল,
শাঁসে ভরা নারিকেল।
শুষে খায় তাল-শাঁস,
খেয়ে করে হাঁস ফাঁস।
সুষনি শাকের আঁটি
খায় খুব পরিপাটি।
শুশুক, শালিখ পোষে,
শিস্ দেয় খুব ক'ষে।

ভাগ্‌নেটি, নাম বিশু—
শান্ত সুশীল শিশু।
শিশি-শিশি চকোলেট
চুষে সে ভরায় পেট।
পেন্সিল ঘষে ঘষে
সীস্‌ ভাঙে বসে বসে।
শাসানো কঠিন বড়—
চেঁচিয়ে করবে জড়
মোটা মোটা শত শত
দু'পাশের লোক যত।
দুই মামা তাই ভোরে
ভাগ্‌নেরে কোলে ক'রে
একদিন নিয়ে যায়
সের শা-র বাগিচায়।
শশী বলে—মেরে 'সের'
ইতিহাসে নাম এর।

* *
*

'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক' রাজপথ
সের শা-রই কেরামত।
ইহার সময় থেকে
ঘোড়ারা ডাক্‌তে শেখে।
বিশু বলে—ছোট মামা,
কোলে থেকে মোরে নামা।
সের শা র কত ঘোড়া ?
ছিল বুঝি জোড়া জোড়া ?
তারা আগে ডাক্‌তো না ?
গলা বুঝি ছিল খোনা ?
তাদের রকম দেখে
শশধর বলে হেঁকে—
ঘোড়াগুলো চার পাশে
তোদের কথায় হাসে।
তাই বলি—কথা থামা,
ওরে বিশু, শশী-মামা !

* *
*

লাভের বেলায় ঘণ্টা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

ঘাটশিলার শান্তিঠাকুর বলেছিলেন আমায় গল্পটা···ভারী মজার গল্প।

দারুণ এক দুরন্ত ছেলের কাহিনী···

যত রাজ্যের দুষ্টবুদ্ধি খেলত ওর মাথায়। মুক্তিপদ ছিল তার নাম, আর দুষ্টুমিরাও যেন পদে পদে মুক্তি পেত ওর থেকে। আর হাতে হাতে ঘটত যত অঘটন!

এই রকম অযথা হস্তক্ষেপ আর পদক্ষেপের ফলে একদিন যা একটা কাণ্ড ঘটল···

গাঁয়ের শিবমন্দিরের ঘণ্টাটার ওপর ওর লোভ ছিল অনেক দিনের।

শিবঠাকুরের মাথার ওপর ঘণ্টাটা থাকত ঝোলানো। শিবরাত্রির দিন ওটাতে দড়ি বেঁধে দেওয়া হোত। ভক্তরা সেই দড়ি ধরে টান মেরে একবার করে বাজিয়ে যেতো ঘণ্টাটা।

কী মিষ্টি যে ছিল তার আওয়াজ!

শিবরাত্রির পর্ব ছাড়া আর কোনদিন ওটা বাজানো হোত না কিন্তু।

শিবঠাকুরের পাশেই ছিলেন পার্বতী দেবী। তাঁর মাথায় ঝকমক করত সোনার মুকুট। কিন্তু সেদিকে মুক্তিপদর মোটেই নজর ছিল না।

মুক্তিপদ তক্কে তক্কে থাকত কি করে ঘণ্টাটা হাতানো যায়।

একদিন সে দেখল পূজারী ঠাকুর কোথায় যেন বেরিয়েছে, মন্দির ফাঁকা পড়ে। চারধারে কেউ কোথথাও নেই।

সুবর্ণসুযোগ জ্ঞান করে সে মন্দিরের ভেতরে গিয়ে সেঁধুলো।

কিন্তু হাত বাড়িয়ে ছ্যাখে যে ঘণ্টাটা তার নাগালের বাইরে। যদ্দুর তার হাত যায়, তার থেকেও এক হাত ছাড়িয়ে ওপরে রয়েছে ঘণ্টাটা।

ওটাকে পাড়ার জন্য সে তাই শিবলিঙ্গের মাথার ওপরে খাড়া হ'ল।

কিন্তু তখনো সেটাকে হাত দিয়ে পাকড়ানো যায় না, আঙুলে ঠেকে, কিন্তু মুঠোর মধ্যে আনা যায় না ঘণ্টাটাকে!

ভারী মুস্কিল তো! কিন্তু এ কী···! শিবের মাথায় চড়ে দাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল সেই অঘটনাটা!

স্বয়ং শিবঠাকুর তার সম্মুখে আবির্ভূত! মুক্তিপদর পদক্ষেপেই দেবাদিদেব মুক্তি পেলেন নাকি?

'বৎস, তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা করো।'

'অ্যাঁ?' হকচকিয়ে গেছে মুক্তিপদ।

'ভয় খেয়ো না। তুমি কি আমায় চিনতে পারছো না ?'

'চিনব না কেন ? তুমি শিবঠাকুর। দেখেই টের পেয়েছি। পটে দেখেছি তো। পটের সঙ্গে বেশ মিলে যায়।'

'তোর মতন ভক্ত আর হয় না।' শিবঠাকুর বলেন, 'লোকে আমার মাথায় ফুল বেলপাতা চড়ায়, তুই নিজেকেই আমার ওপর চড়িয়েছিস। তোর সবটাই দিয়েছিস আমায়। তোর মতন ভক্ত আমি দেখিনি। এখন বল্ তুই কী চাস ?

'কী আবার চাইব !' থতমত খেয়ে সে বলে।'

'রাজা হতে চাস তুই ?'

'রাজা !'

'অনেক লোক-লস্কর নিয়ে বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হবার বাসনা আছে তোর ?'

মুক্তিপদ ভাবতে থাকে।

'সে ভারী ঝামেলা !' ভেবে-চিন্তে সে জানায় : 'রাজা হতে আমার প্রাণ চায় না। রাজ্যি চালানো আমার কম্মো নয়। কি করে রাজ্য চালায় তাই আমি জানিনে !'

'তাহলে কী চাস বল ? পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যে ?'

'রাজকন্যে নিয়ে আমি কী করব ?'

'কেন, বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না করবি ? আবার কী ?'

'বিয়ে ! এখনই আমি বিয়ে করব কি ! আমার গোঁফ বেরোয় নি এখনো। তুমি বলছো কি ঠাকুর ?'

'তাহলে হাতী ঘোড়া কী চাস বল্ তুই !' বর দিতে এসে এমন বিড়ম্বনা শিবঠাকুরের বুঝি কখনো হয়নি।—'আমি তোকে বর দিতে চাই। বর না দিয়ে আমি ছাড়ব না।'

'হাতী ঘোড়া কি কেউ চায় নাকি আবার ?'

'টাকাকড়ি ধনদৌলত ?'

'রাখব কোথায় ? বাবা টের পেলে মারবে না ? একবার বাবার একটা টাকা সরিয়েছিলাম, তাইতেই এমন একখানা চড় খেয়েছিলাম যে !···এখনো আমার মনে আছে বেশ। না, টাকাকড়ি আমার চাইনে।'

'তোর দেখছি কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি নেই। মুক্তপুরুষ মনে হচ্ছে। তাহলে তুই কি চাস—ভক্তি, মুক্তি ?'

'সে তো আমার পাওয়া গো। আমার নামই মুক্তি। আর আমার বাবার নাম ভক্তিপদ। ভক্তি মুক্তি তো না-চাইতেই পেয়ে গেছি।'

'তাহলে তুই হয়ত চাস, মনে হচ্ছে—ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা—'

'সে তো বিবেকানন্দরা চায়। পড়েছি বইয়ে। আমি বিবেকানন্দ হতে চাই না।'

'ভাল ফ্যাসাদ হ'ল দেখছি!' মহাদেব নিজের জটাজুট চুলকোন। ছেলেরা কী চাইতে পারে, কী তাদের চাওয়ানো যায়, কিছুই তিনি ভেবে পান না।

'আমি বিবেকানন্দ হতে চাই না।'

নিজের ছেলেবেলায় কী সাধ ছিল তাঁর? তাও কিছু তাঁর স্মরণ নেই এখন। সেই সুদূর অতীত বাল্যকালের কথা তাঁর মনেই পড়ে না আর! কবে যে তিনি দুগ্ধপোষ্য বালক ছিলেন, আদৌ ছিলেন কিনা কখনো—কিছুই তাঁর ঠাওর হয় না।

কী চাইতে পারে ছেলেটা? কী পছন্দ হতে পারে ছেলেটার? তিনি খতিয়ে দেখতে যান তাঁর আর তাঁর টান সমান হবার কথা নয়। আদ্যিকালের তিনি, আর সেদিনকার এই

ছোঁড়ার রুচি কি এক হবে ? যে বস্তু তাঁর প্রিয়, ওর কাছে হয়ত তা মূল্যহীন। ছেলেটা এই বয়সেই চোখে ধুঁতরো ফুল দেখতে রাজি হবে কি ? বিল্বফলের জন্যেও সাধ করে হাত বাড়াবে না নিশ্চয় ?

মাথায় হাত দিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন। কূল-কিনারা পান না কিছু।

হঠাৎ নিজের কপালের চাঁদে তাঁর হাত ঠেকে যায়। হাতে যেন চাঁদ পান তখন।

'এই চাঁদ ?' তিনি উচ্ছ্বসিত হন—'এই চাঁদখানা তুমি পেতে চাও নিশ্চয় ? এমন চাঁদ পাবার সাধ হয় না তোমার ?'

প্রস্তাবটা শুনে মুক্তিপদ নাক সিঁটকোয়। চাঁদ নিয়ে সে কী করবে ? মা যেমন খোঁপায় চুলদের আটকে রাখার জন্য চিরুনি লাগান, শিবঠাকুর তেমনি নিজের জটাজুট সামলাতে ঐ চাঁদটাকে লাগিয়েছেন।

মুক্তিপদর তো ঝাকড়া চুলের বালাই নেই, দিব্য ব্যাক-ব্রাশ চুল তার। চাঁদকে মাথায় করে রাখবার সখ নেইকো মোটেই। চাঁদ না হয়ে চন্দ্রপুলি হলে না হয় দেখা যেত।

'ও তো আধখানা চাঁদ, ও নিয়ে আমি কী করব ? আপনি বুঝি আমায় আর্ধচন্দ্র দিচ্ছেন ? ঘুরিয়ে অপমান করছেন আমার ?' ফোঁস করে ওঠে সে—'আপনি সোজাসুজিই বলতে পারতেন আমার মন্দির থেকে বেরিয়ে যাও।'

'না না। তা বলব কেন ? তা কি বলতে আছে ? শিবঠাকুর শশব্যস্ত হন—'এত বড়ো ভক্ত তুমি আমার। তোমাকে আমি অমন কথা বলতে পারি কখনো ? ভক্তাধীন ভোলানাথ, শোনোনি নাকি কথাটা ?'

'তাই বলুন !'

'আমি ভাবছিলাম চাঁদের টুকরোটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে তুমি দেখতে যদি একবারটি। আর যদি তোমার পছন্দ হ'ত…'

'চাঁদে হাত দিতে যাব কেন আমি ? আমি কি বামন নাকি যে…? বামনরাই তো চাঁদের দিকে হাত বাড়ায়। আমি বেশ ঢ্যাঙা, দেখছ না ? এর মধ্যেই পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। বাবা বলছেন, আরো আমি ঢ্যাঙা হব। আমাদের বংশে সবাই নাকি তালগাছ !'

'তাহলে তো তুমি এমনিতেই চাঁদ পাবে। তালগাছের মাথাতেও চাঁদ থাকে। দেখা যায় প্রায়। দ্যাখে নি তুমি ?'

'পুকুরের জলের মধ্যেও দেখেছি। ডোবার মধ্যেও আবার।'

'চাঁদের সঙ্গে আমাকেও তুমি ডোবালে দেখছি ! ভারী ফ্যাসাদে ফেললে আমায়। বর দেব বলে কথা দিয়েছি, অথচ কিছুই তোমায় দিতে পারছি না। কিছুই তুমি চাও না।

অথচ দিতেই হবে আমায় কিছু। না দিয়ে উপায় নেই। নইলে আমার কথাটা মিথ্যে হয়ে যায়। মিথ্যে কথা আমি বলি না আবার। কী মুস্কিলে যে পড়লাম। আচ্ছা, তুমি কি কিছু খেতে চাও?'

খাবারের কথায় তার উৎসাহ দেখা দেয়—'কী খাওয়াবেন বলুন?'

'কী খাওয়ানো যায় তোমায় ভাবছি তাই।' শিবঠাকুর বলেন—'সত্যি বলতে, আমাকেই সবাই ভোগ দেয়, আমি কখনো কাউকে ভোগ দিইনি কোনো। এমন কি, তোমার ওই পার্বতী ঠাকরুণকেও না। তোমার ভোগে কী লাগতে পারে ভেবে দেখি এখন,...তিনি ভাবতে থাকেন।

'তারকেশ্বরের ডাব?' হাতের কাছে প্রথমেই তিনি ডাবটা পান, সেটাই পাড়েন সবার আগে।

'ডাব? ডাব কেন? আপনার সঙ্গে আমার তো আড়ি হয়নি যে ডাব দিয়ে ভাব পাতাতে হবে?'

'তাহলে বৈদ্যনাথ ধামের প্যাড়া?...কাশীর মালাই-লচ্ছি? কৈলাসের ভাং?'

'ভাংটা কী জিনিস?' জানতে চায় মুক্তিপদ।

কিন্তু মহাদেব ওর বেশি ভাঙতে যান না। ছোট্ট ছেলের কাছে নেশার কথা পাড়াটা ঠিক হবে না তাঁর মনে হয়।—'নন্দী ভৃঙ্গী ঘোঁটে, তারাই বানায়, তারাই জানে কী জিনিস। আমি খাই কেবল। মানে, আমি পান করি মাত্র।'

তারপর ঘুরিয়ে বলেন কথাটা—'ভাং মানে এই, সিদ্ধি আর কি—শুদ্ধ ভাষায়। তুমি কি সিদ্ধিলাভ করতে চাও?'

'একদম্ না। ও তো সাধক লোকেরা চায়? আমি কি সাধক? যোগী ঋষি আমি? তাহলেও শুনি তো।'

'খেতে কেমন? সিরাপের মতন কি? আখের রস যেমন ধারা হয়ে থাকে? খেতে মিষ্টি হলে দিতে পারেন আমায়।'

'না, তা খেয়ে তোমার কাজ নেই। পানীয় তো আর খাদ্য নয়। ওতে পেট ভরে না। তোমাকে আর কী দেওয়া যায় দেখছি'...মনে মনে তিনি দিগ্বিদিক ঘোরেন, যে খাবারগুলি তাঁর দিব্যনেত্রে দেখতে পান আউড়ে যান...

'মালদহের খাজা খাবে? কেষ্টনগরের সরভাজা? বর্ধমানের মিহিদানা? রানাঘাটের ছানার জিলিপি? জনাইয়ের মনোহরা? পাঁশকুড়োর অমৃতি? নাটোরের দেদোমণ্ডা...?'

'গণ্ডা গণ্ডা?' মুক্তিপদ বাধা দিয়ে জানতে চায়।

'যতো চাও! বাগবাজারের রসগোল্লা? ভীমনাগের সন্দেশ?'...শিবঠাকুরের ফিরিস্তি আর ফুরোয় না: 'চাই তোমার? কোনটা চাই বলো আমায়? না, সবগুলোই চাও তুমি?'

'আমার জন্তে হয়রান হয়ে ঘুরে ঘুরে আপনি যোগাড় করবেন তা আমি চাই না। আপনার হাতের কাছে যা আছে তাই আমায় দিন।'

'হাতের কাছে? পার্বতী দেবীর ঐ স্বর্ণমুকুটটা চাও বুঝি?' তিনি দেবীর দিকে হাত বাড়ান।

'না না। সোনার মুকুট নিয়ে আমি কী করবো? ওটা তো পরাও যাবে না। পরতে গেলে লাগবে আমার মাথায়। তাছাড়া মুকুট পরে বেরুলে পাড়ার ছেলেরাই বা বলবে কী?'

'তাহলে কী তোমার চাই বলো তাই।'

'আপনার মাথার ওপরে ঐ যে ঘণ্টা! ওটাই আমি চাই—ঐটে আমায় পেড়ে দিন!'

'বাঁচালে!' বলে হাঁফ ছেড়ে মহাদেব ওর হাতে ঘণ্টাটা তুলে দেন। দিয়েই অন্তর্ধান হন।

মুক্তিও ঘণ্টা নিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে আসে।

ঘণ্টাটা তাকে কষ্ট করে বাজাতেও হয় না। ওর লাফ-ঝাঁপের দাপটে সেটা আপনিই বাজতে থাকে।

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

'সাক্ষী মশাই, সাক্ষী মশাই',—উকিলবাবু বলেন ডেকে,
'হুজুরের কাছে বলুন আপনি দেখেছেন যা নিজের চোখে।
আপনিই তো সাক্ষী প্রধান বলুন ভেবে নেইকো তাড়া,
ন্যায়-বিচারের মর্যাদা দিন, দোষী যেন পায় না ছাড়া।
এ মামলাতে আপনি শুধু হাজির ছিলেন অকুস্থলে,
হলপ্ করে হক-কথা কন—এখনও চাঁদ সূর্যি জ্বলে।
আজে-বাজে ছেড়ে দিয়ে যা খাঁটি, তা বলুন, যাতে
আদালতের সহায় হউন সত্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতে।
সমাজ হয়ে যায়নি তো বন, যার জোর তার মুলুক তো নয়-
আইন আছে, শাসন আছে, এখানে তার দিন্ পরিচয়।
পঞ্চু মুদী বাঁকু, তেলির কে দোষী সব জানুক লোকে,
নির্ভয়েতে বলুন সেদিন কি দেখেছেন নিজের চোখে?'
'নিজের চোখে কি দেখেছি?'—বললে হারু শপথ নিয়ে,
'চোখে কিছুই দেখিনি, স্যর, দেখেছিলাম চশমা দিয়ে।'

*

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

মৌমাছি, ভ্রমর, ঝিঁঝি পোকা ইত্যাদি কীটপতঙ্গেরা যখন শব্দ করে, তখন আমরা বলি ওরা বাজনা বাজাচ্ছে। কীটপতঙ্গের বাদ্য-বাদনের কথা শুনে তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে,—ওদের বাজনা কি ওরা নিজেরা শুনতে পায়? ওদের কি শ্রবণ-শক্তি আছে?

আমাদের মত ওদের কান দেখতে পাও না ব'লে এমন প্রশ্ন তোমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। হাঁ, ওদেরও কান আছে; তবে কানের যেখানে থাকবার কথা, ওদের কিন্তু তা থাকে না। কানেরও রকমারি আছে। আমরা ইচ্ছামত আমাদের কান নাড়াতে-চাড়াতে পারি না। কুকুর-বিড়াল প্রভৃতি কিন্তু তা পারে। দূ'র থেকে কোন শব্দ আসছে জানলে কুকুর সে দিকে কান খাড়া ক'রে থাকে। গরু, হাতী তাদের কান নেড়ে মশা-মাছিও তাড়ায়।

ব্যাংয়ের কান তার চোখে, আর মাছ শুনতে পায় তার কান্‌কো দিয়ে।

কীটপতঙ্গের কান আরও মজার। পঙ্গপালের কান তাদের পিছনের পায়ে। ফড়িং আর ঝিঁঝি পোকার কান তাদের সম্মুখের পায়ে! বিভিন্ন মাছির কান হচ্ছে ওদের শুঁড়ের মাথায়। কুকুরের গায়ে একটা ডাঁশ এসে বসেছে। আমি তার কিছুটা দূরে খেলনা-বন্দুকের শব্দ করে দেখেছি, ডাঁশটা উড়ে যায়।

বাতাসে তরঙ্গ সৃষ্টি করেই হয় শব্দ। মাছিদের শুঁড়ের মাথায় যদি কোন রকম সূক্ষ্মতম শব্দও হয়, তবে সে শব্দ ওরা বুঝতে পারে।

কীট-পতঙ্গের চোখ সহজেই দেখা যায়। ওরা চোখে দেখে তা বুঝতে কষ্ট নেই। কিন্তু ওরা আমাদের রং চেনে কি?

বিজ্ঞানীরা বলেন, কীটপতঙ্গের বর্ণজ্ঞান আছে। আমরাও দেখতে পাই, যেখানে সরষের ফুল হলুদ রং নিয়ে ফুটে আছে, মৌমাছি সোজা উড়ে চ'লে যাবে সেখানে। ওদের দৃষ্টিশক্তি মানুষের দৃষ্টিশক্তির চেয়েও প্রখর।

রংয়ের সঙ্গে সূর্যের আলোর ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আছে। রাত্রি বেলায় অন্যান্য রং চোখে পড়ে না; কিন্তু সাদা রং রাত্রিতে ভালো দেখা যায়। রাত্রি বেলায় সাদা রংয়ের ফুল দেখে কীটপতঙ্গ তার উপর উড়ে পড়ে। সমস্ত কীটপতঙ্গই কোন্‌টা নীল, কোন্‌টা হলুদ, কোন্‌টা সাদা বেশ বুঝতে পারে।

তোমরা ভাবতে পার, পিঁপড়ের মত গন্ধ পেয়েই বুঝি কীটপতঙ্গ ফুলের উপর উড়ে পড়ে। হাঁ, আমের মুকুলের গন্ধে মৌমাছি ছুটে আসে একথা সত্যি; কিন্তু ছুটে এসে সোজা মুকুলের উপর পড়ে কেন? নিশ্চয়ই ওরা রং চিনতে পারে। তা' না হ'লে তো ওরা এলোমেলো এখানে-সেখানে পাতার উপরও বসতে পারত এসে। তাছাড়া সব ফুলের তো গন্ধ নেই, তবু পতঙ্গগুলি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় কি করে? ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ফুলে মাছি এসে বসে নিশ্চয় রংয়ের আকর্ষণেই। ভোর বেলায় পেয়ারা ফুলে দলে দলে ভ্রমর এসে বসে। তারা ফুল দেখেই ছুসে আসে।

কৃষ্ণনগরের মৎ-শিল্প বিখ্যাত। মাটি দিয়ে তৈরী একফালি পাকা তরমুজের উপর—নতুন রং করবার পাঁচ-সাতদিন পরেও, মাছি উড়ে এসে পড়ছে, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

বাড়ীর মতই

শ্রীতমাল চট্টোপাধ্যায়

আরে আরে যাবেন কোথা! বলি শুনুন মশাই,
ওই হোটেলে? সেরেছে রে—ও তো ব্যাটা কশাই!
দেখুন না স্যার আমার হোটেল, নিজে কি আর বলি.
লাভের কথা ভাবিই নাক', সেবা ক'রেই চলি।
এই তো সেদিন নামকরা সব প্লেয়ার এসে কত,
কাটিয়ে গেল দশ বার দিন খেয়াল-খুশী মত।
হোটেল আমার ব্যবসা তো নয়, আসলে এ 'হবি,'
নইলে কি আর পেতেন মশাই বাড়ীর মত সবই?
আরে আরে শুনুন না ছাই! চল্লেন যে হেসে—
বলেন কি স্যার! থাকাটা তো বৃথাই হবে শেষে!
সারা জীবন বাড়ীর থেকে পেলেন শুধু জ্বালা-ই,
হোটেলও সেই বাড়ীর মত, তাই বলছেন 'পালাই'!

অন্ধকারের পর আলো

শ্রীরমণীমোহন পাল

উপন্যাস

১

গঙ্গার ধারে বাঁধান ঘাটে বসে আছে এক মুণ্ডিত-মস্তক কিশোর। তার পরিধানে ধুতি ও সার্ট আর পায়ে তালতলার চটি। তার দেহ গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ, চোখ দুটো বড় ও টানা। কিন্তু সমস্ত মুখ যেন কিসের বেদনায় বিমর্ষ।

কিশোর গভীর চিন্তায় মগ্ন।

ক্রমে সূর্যাস্তের রক্তিম আভা দিগন্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে চারিদিকে সৌন্দর্য বিস্তার করতে লাগলো। পাখীরা তাদের কল-কাকলিতে নদী তীর মুখরিত করতে করতে বাসার দিকে ফিরে চললো। তারপর সন্ধ্যা সামাগমে পূব-আকাশে মাথার ওপর শুক্লা একাদশীর চাঁদ শুভ্র কিরণ ছড়িয়ে নদীবক্ষে ও নদী তীরের সর্বত্র যেন অপরূপ মায়ালোক সৃষ্টি করলো।

কত লোক বায়ু সেবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ঘাটে এসে বসলো। তারপর খানিকক্ষণ গল্প-গুজোব করে চলে গেল।

কিছু দূরে একটা বাদাম গাছ থেকে একদল বাদুড়ের ঝটাপট শব্দ ও কিচ্‌কিচ্‌ আওয়াজ ভেসে আসছিল। ঢেউগুলো ঘাটে আঘাত পেয়ে অবিরাম ছল-ছল-ছলাৎ শব্দে একটা মাদকতার সৃষ্টি করছিল। ঘাটের কাছেই একটা আধ-শুকনো শিমুল

গাছে শকুনের বাসায় তার বাচ্ছাগুলো হঠাৎ কচি ছেলের মত ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডেকে উঠে চুপ করে গেল।

আমাদের কিশোরটির কিন্তু কোন দিকে খেয়াল নেই। সে যেন তার সমস্যার মীমাংসায় চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল। হঠাৎ সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললে, 'ভগবান, আমায় এ কী বিপদে ফেললে ?'

তার বেদনাকাতর কণ্ঠধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যাবার পূর্বেই ঘাটের ওপর খড়মের বিশ্রী আওয়াজ শোনা গেল। আগন্তুক রুক্ষস্বরে বলতে বলতে এগিয়ে এলেন, 'রজত, এখানে বসে দিব্বি গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছ, আর আমি তোমার খোঁজে ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছি।'

কিশোরটির নাম রজত। হঠাৎ তার নাম কানে যাওয়ার সে চমকে উঠলো। তারপর সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'না পিসেমশাই হাওয়া খাবার মত মনের অবস্থা কি আছে ? বসে বসে ভাবছিলুম।'

পিসেমশাই বললেন, 'যা ভাববার পরে ভেব। আজ তিনদিন হ'ল শ্রাদ্ধ চুকে গেছে, অথচ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছে তোমার নেই। তোমায় আমি আর থাকতে দিতে পারবো না।'

রজত কাতর স্বরে বললে, 'আপনার ছুটি পায়ে পড়ি পিসেমশাই, আমায় দয়া করে আর কিছুদিন আপনার আশ্রয়ে রাখুন। তার বদলে আপনার কাজ করে দোব। তারপর পরীক্ষার ফল বার হলেই আমি চলে যাব।'

পিসেমশাই ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'বটে, এই দু'মাস ধরে তোমায় বাড়ীতে রেখে দোব! ও সব হবে-টবে না বাপু। নিজের পথ দেখ। আজ শেষ বার বলছি, কাল সকালে তোমায় ও বাড়ীতে দেখতে পেলে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দোব।' এই বলে তিনি খড়মের খটাশ্ খটাশ্ শব্দ করতে করতে চলে গেলেন।

দুঃখ সহে সহে রজতের বুকখানা পাথর হয়ে গিয়েছিল। তাই সে তার পিসেমশাই-এর কথায় বিশেষ বিচলিত হ'ল না। সে বুঝলে, যে বাড়ীতে সে তার এই সতেরটা বছর কাটিয়ে এসেছে, যাকে সে তার জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে কখনও ভাবতে শেখেনি, আজ ভাগ্যের কঠোর পরিহাসে তাকে সে বাড়ী ত্যাগ করে চলে যেতে হবে!

সে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে আলো জেলে ঘরগুলো সব দেখতে লাগলো। প্রত্যেক অংশই তার কাছে কত মধুর স্মৃতি জাগিয়ে তুললো। কয়েকদিন আগেও তার বাপ, মা আর বোন লীলা আনন্দ-কোলাহলে এই বাড়ীকেই মুখর করে রেখেছিল। আর আজ!

সে আর ভাবতে পারলে না। যে ঘরে তারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল, সেখানে সে অবসন্ন ভাবে বসে পড়লো। তার পিতামাতার সুখময় স্মৃতি তার মনকে আলোড়িত করতে লাগলো।

অতীত দিনের কথা চিন্তা করতে করতে তার মনে হ'ল যেন তার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবে কি সে পাগল হয়ে যাবে? তার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছিল, কেন, কেন তারা তাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে ফেলে রেখে গেল? তাকেও কেন সঙ্গে নিয়ে গেল না? একবার সে ভাবলে, আত্মহত্যা করে এ জীবন শেষ করে দিই, কিন্তু পরক্ষণেই তার পিতার অন্তিম উপদেশের কথা মনে পড়লো। তিনি মরবার কিছু পূর্বে বলেছিলেন, 'বাবা রজত, বড্ড তাড়াতাড়ি চললুম, দুঃখ কর না। জীবনে যত বিপদই আসুক, অধীর হয়ো না। ভগবানে বিশ্বাস রেখে সহ্য করতে পারলে সব বিপদই কেটে যাবে। মনে রেখ, এ পৃথিবী একটা বিরাট পরীক্ষাস্থল। এখানে ভগবান বিপদের কষ্টিপাথরে সকলকে যাচাই করে নিচ্ছেন। এতে জয়ী হওয়াই পুরুষকারের লক্ষণ।'

কথাগুলো মনে পড়তেই রজত তার সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে বলে উঠলো, 'ভগবান, যত বিপদই আসুক, ভয়ে যেন পেছিয়ে না পড়ি, তোমার এই দয়াটুকু যেন থাকে।'

এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বেজে গেল। সে তার শেষ সম্বল অল্প কিছু অর্থ সঙ্গে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। কয়েক পা যাবার পর সে একবার বাড়ীর দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারলো না। সে সময়ে পশ্চিমাকাশে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিল। অস্পষ্ট আলোতে এতদিনের পরিচিত বাড়ীখানা নজরে পড়তেই তার বুকের পাঁজর ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তারপর,—তারপর তার চেহারাটা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

২

রজত ট্রেনে করে ভোরের দিকে হাওড়ায় পৌঁছল। সে সময়ে গঙ্গার ওপর কাঠের ভাসমান সেতু ছিল। কলকাতায় যাবার উদ্দেশ্যে সে তার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো।

নিজেকে গড়ে তোলবার চিন্তা তাকেই যে করতে হবে এ কথা আগে সে ভাবতে পারেনি। এতকাল তার বাবা ও মা তার ভবিষ্যতের চিন্তা করে আসছিলেন।

এখন তাকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, নিরাশ্রয় অবস্থা থেকে নিজের ভবিষ্যৎ নিজেকেই গড়ে তুলতে হবে। সে দিশাহারা হয়ে পোলের একপাশে সরে গিয়ে রেলিং ধরে ভাবতে লাগলো।

সকালের স্নিগ্ধ বাতাস তার সারা দেহে মনে শান্তির প্রলেপ মাখিয়ে দিচ্ছে। তার মনে হ'ল, তার বাপ-মা যেন অদৃশ্য থেকে তাঁদের অসহায় সন্তানকে আশীর্বাদ করছেন। তার বিক্ষুব্ধ মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। সে স্থির করলে, ভবিষ্যতের চিন্তা পরে করলে চলবে। এখন তার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা আগে দরকার। তাই তাকে যে কোন প্রকার কাজ জুটিয়ে নিয়ে এ অভাব দূর করতে হবে।

ক্লাইভ ষ্ট্রীট (বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড), ডালহাউসি স্কোয়ার প্রভৃতি যে সকল স্থান আফিসবহুল, সেখানে চাকরীর উমেদার হয়ে সে অনেক ঘোরাঘুরি করলে। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাশ পর্যন্ত পড়া থাকলে চাকরীর কোন ভাবনা ছিল না। কাজেই রজতের মনে যে কোন একটা চাকরী পাওয়ার আশা ছিল। কিন্তু বড়বাবুদের কাছে নিজের দুঃখপূর্ণ কাহিনী শুনিয়ে চাকরীর প্রার্থনা জানাতে তাঁরা কেউই তাকে সুনজরে দেখলেন না। আর তাঁদেরই বা দোষ কি? তাঁরা তাঁদের সাধারণ বিদ্যা নিয়ে এতদিন সাহেবদের মন জুগিয়ে আসছেন। এই সদ্য এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া রজতকে তাই তাঁরা কেউই সহানুভূতি দেখালেন না। চাকরী দিলে সেই হয়তো সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়বে। কাজেই কে আর খাল কেটে কুমীর ডেকে আনতে যাবে? আর তা ছাড়া সকলেরই তো আত্মীয়-কুটুম্ব আছে। তাদের বাদ দিয়ে একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে চাকরী দেবার মত মনের উদারতা তাঁদের নেই। তাই তারা বাজে ওজর দেখিয়ে তাকে সরিয়ে দিলে। ফলে কোথাও আশার বাণী শুনতে পেলে না রজত।

ট্রেন ভাড়া দেবার পর তার কাছে আর বেশী পয়সা ছিল না। সকালে একটা হোটেলে সে ভাত খেয়েছিল। সারাদিন যখনই ক্ষিধে পেয়েছে তখনই রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে পেট ভরিয়েছে। সন্ধ্যার সময় অবশিষ্ট দু'পয়সা দিয়ে মুড়ি কিনে তাই চিবিয়ে এক পেট জল খেয়ে নিলে। এইবার সে যায় কোথায়? সামনে রাত্রি। রাজধানী কলকাতা নগরীতে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ও একাকী সে। জীবনে আজ প্রথম রজত বুঝতে পারলে, সে এখন কতদূর অসহায়। চারিদিকের আলোকোজ্জ্বল, সুসজ্জিত দোকান ও অট্টালিকাগুলো তাকে যেন বিদ্রূপ করছিল, সেখানে তার আশ্রয় মিলবে না। সে তখন ধীরে ধীরে ডালহাউসি স্কোয়ারে প্রবেশ করে একটা বেঞ্চের ওপর তার ক্লান্ত দেহখানা বিছিয়ে দিলে।

সারা দিনের ব্যর্থতার মধ্যে সে যে সব তাচ্ছিল্য ভোগ করেছিল, সেগুলো এখন সময় বুঝে একে একে তার মনে ভেসে উঠতে লাগলো। কোথাও কে তাকে চাকরী দেবার ছল করে বৃথাই অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিল, আবার কোথাও বা তাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করার পর বিদায় করে দিয়েছিল। তাদের হৃদয়হীন ব্যবহার তাকে মর্মপীড়িত করছিল। কত দোকানে খাওয়া-পরা-থাকার পরিবর্তে সে কাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সম্প্রতি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছে শুনেই তারা স্পষ্ট বলেছিল, 'না বাপু, বেশী লেখাপড়া জানা লোক দিয়ে আমাদের কাজ চলবে না। তারা দু'দিন কাজ করার পর অন্য জায়গায় কাজ জুটিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। এতে আমাদের কাজের খুব ক্ষতি হয়। তুমি বাপু অন্য জায়গায় চেষ্টা কর।' লেখাপড়ার কথা গোপন করেও কোন সুবিধা হয়নি। কেন না, অপরিচিত লোক দোকানে আশ্রয় দেবে কে? তারা খাওয়া-পরা এমন কি হাত-খরচের মত কিছু অর্থ দিতেও রাজি, কিন্তু রাত্রে থাকা? সে অসম্ভব। এদিকে রজত রাত্রে থাকে কোথায়? তার যে এই বিস্তৃত পৃথিবীর মাঝে আশ্রয় বলতে আর কিছু নেই। সে কথা জানাতে তারা আরও বিরূপ হয়ে বলেছিল, 'যার চাল-চুলো নেই, তাকে আমরা থাকতে দিতে পারি না। তারপর কিছু নিয়ে সরে পড়লেই হ'ল!'

জীবিকাঅর্জনের বাস্তব এই রূঢ়তার বিষয় রজতের জানা ছিল না। একটা দিনের অভিজ্ঞতা তার পক্ষে মর্মান্তিক হলেও সে স্থির করলে, তাকে হতাশ হলে চলবে না।

এমন সময়ে সে নৈশ-আকাশের বুকে অগণিত নক্ষত্ররাজির মধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখতে পেলে। তার মনে পড়ে গেল, কতদিন রাত্রে পড়ার শেষে সে আর তার বোন লীলা সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাহায্যে ধ্রুবতারা বার করার প্রতিযোগিতা করেছে। নিজের অজ্ঞাতে অভ্যাসের বশে তার দৃষ্টি ধ্রুবতারার ওপর গিয়ে পড়লো। আগের মতই ধ্রুবতারা স্বস্থানে রয়েছে। কিন্তু আজ লীলা কোথায়? তার সঙ্গে একবার শেষ দেখাও তার হ'ল না। লীলার কথা মনে হতেই একটা মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস তার হৃদয় বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল, লীলার মৃত্যু-সংবাদ জানবার কথা আর সেই সঙ্গে তার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।

রজত এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্যে কলিকাতায় এসেছে। বাড়ী থেকে রোজ এসে পরীক্ষা দেওয়ার অসুবিধা হবে বলে কলেজ ষ্ট্রীটের কাছে একটা মেস বাড়ীতে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথম দিকে তার বাবা রোজ এসে তার সংবাদ নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রায় পাঁচ দিন হ'ল তিনি না আসায় তার মনটা চঞ্চল হচ্ছিল।

সেদিন তার শেষ পরীক্ষা। কতক্ষণে সে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে এই আশায় সে তার প্রশ্নের উত্তরগুলো দ্রুত লিখে চলেছিল। এমন সময়ে পরীক্ষা হলের মধ্যে 'অফিসার ইন চার্জ' একখানা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে এসে বললেন, 'রজত রায় কার নাম ?'

রজত তার 'সিট' থেকে উঠে দাঁড়াতে সকলের দৃষ্টি তার দিকে পড়ল।

তাঁর আহ্বানে রজত কাছে যেতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাবার নাম কি ?'

সে বিস্মিত হয়ে জানিয়েছিল, 'শ্রীযুক্ত তপনকুমার রায়।'

তিনি তার বাড়ীর ঠিকানা জানাতে চাইলে সে বলেছিল,'হুগলী জেলায় ত্রিবেণীতে।'

তিনি তার হাতে একখানা কাগজ দিয়ে বললেন, 'তোমার নামে এই টেলিগ্রামখানা এসেছে, পড়।'

টেলিগ্রামের নাম শুনেই তার মন আশঙ্কায় ভরে গিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল,—'লীলা এক্সপায়র্ড। মাদার সিরিয়াস্‌লি ইল। কাম ইমিডিয়েটলি।' নীচে তার বাবার নাম রয়েছে।

রজত নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। এই তো মাত্র দশ দিন হ'ল সে বাড়ী ছেড়ে এসেছে। এর মধ্যেই লীলা, সেই চঞ্চল লীলা আর নেই! তার মারও অসুখ। এও কি সম্ভব। সত্যই কি ঐ কথাগুলো লেখা আছে? সে বার তিন-চার করে লেখাটা পড়লে। তারপর লেখার অর্থ সম্বন্ধে তার মনে যখন আর কোন সন্দেহ রইল না, তখন সে অস্ফুট আর্তনাদ করে, জ্ঞান হারিয়ে, পড়ে গেল।

'অফিসার ইন চার্জ' তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। তাকে পড়ে যেতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ধরে না ফেললে আঘাত পেত। অল্প শুশ্রূষা করার পর তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। প্রথমটায় তার কাছে এ সব দুঃস্বপ্ন বলে বোধ হয়েছিল। কিন্তু হাতের টেলিগ্রামখানার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে উঠে বসলো। (ক্রমশঃ)

॥ দুঃখ ॥

"প্রতিদিন আমি এত দুঃখ, কষ্ট ও নৈরাশ্য দেখি যে, আমি যদি আমার মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব না করতে পারতাম, তবে এতদিনে আমি বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হতাম এবং গঙ্গায় ঝাঁপ দিতাম।"

—মহাত্মা গান্ধী

ফেলে আসা দিনগুলি

(৪)

শ্রীসমর দে

ভাবলে অবাক লাগে! যে লিটনের ছবি এঁকে লাভ হ'ল না আমার। কিছুই আগে—সেই লিটনের ছবি এঁকে যে ছেলেটি এল চাটগা থেকে, তার দ্বারা হল আমার মহা উপকার।

তাই যে রাতে ছাদে বসে কি উপায়ে হোষ্টেলের খরচ চালিয়ে বাকী পাঁচ বৎসরের পড়া শেষ করব, এই ভাবনায় যেখানে ছিলাম আমি দিশেহারা—ঠিক তার পরদিনই যে ৺রাজশেখর বসুর কথাগুলো বেদবাক্যের মত ফলে যাবে, সে ঘটনাও কি কম বিস্ময়ের।

—"তোমার উদ্যম আছে, চোখে কল্পনা আছে, তুমি পারবে নতুন পার্টি তৈরী করে নিতে।" 'রদফেন'-এর দ্বিতীয় কাজটি না দিয়ে, শুধু এই উপদেশ সেদিন নির্মম শোনালেও—এ ভরসাও যে আমার কত কাজে লেগেছে, দেখেছি জীবনভোর।

নইলে, যে আর্ট স্কুলে আসার জন্যে কত কাট খড় পোড়ানো আর পদে পদে বাঁধা, সেখানে এমন করে ধরা দেয় এক নতুন পার্টি! শুধু তাই নয়! সেখান থেকে আমাকে যাঁরা ডেকে ডেকে নিতে লাগলেন, সেই সব মহৎপ্রাণদের সহায়তাও তো আমার কাছে অমূল্য পাথেয়।

যাই হোক, স্কুলে ভর্তি হবার দিন, ছুটির পর অমর দাসগুপ্তকে যে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলাম—তেতলার সেই ফাইভ সিটেড্ ঘরের সবাই ছিল আমাদের সহপাঠী। তাই আমি যখন বললাম, এ এসেছে চট্টগ্রাম থেকে বাঙলার গভর্ণর লিটনের ছবি এঁকে স্কলারশিপ পেয়ে, তখন এক মুহূর্তেই সে বন্ধু হয়ে গেল সবার।

সেদিন সে ঘরের মণি রায়চৌধুরী এসেছিল বহরমপুর থেকে। বিনয় সেন শান্তিপুর থেকে। কালী ভট্টাচার্য নবদ্বীপ থেকে। আর ননী দাশগুপ্ত এসেছিল কানপুর থেকে।

এবার ওদের জমজমাট আসরে, ডাক পড়ে আমারও। কিন্তু আমি যে এসেছি কি উপায়ে আর কি সম্বলে, তা তো ওরা জানে না। কাজেই সে আড্ডায় না ঘেঁষে, নিত্য আমাকে ঘুরতে হয় ছোট্ট ক্যামেরা নিয়ে পয়সা রোজগারের আশায়।

দেখতে না দেখতে কয়েকটি মাস কবার হয়। দেশ থেকে পরিচিত বন্ধু ও প্রতিবেশীদের ফটো তুলে সংগ্রহ করা পয়সা ফুরিয়ে আসে—চিন্তা বাড়ে। কিন্তু, তখনকার দিনে ঐ-টুকু সাইজের ফটো, পয়সা দিয়ে তোলার কেউ গরজই করে না এখানে।

তবুও চেষ্টা করি। কোন কোন দিন সফল হলে, চলে যাই ওদের সঙ্গে সোজা করপোরেশন ষ্ট্রীট ধরে—রাণী রাসমণির বাড়ী ছাড়িয়ে, বোর্ণ সেফার্ড ও হোয়াইট-

ওয়ে লেডলর দোকান পার হয়ে—ইডেন গার্ডেনের অপূর্ব পরিবেশে, মনে টনিকের কাজ করা ব্যাণ্ড শোনার আকর্ষণে।

সত্যি বলতে কি, সন্ধ্যারাতের সেই ইডেন-উদ্যানে স্বপ্নময় মনোরম তার স্থানটি ঘিরে, আলো-ঝলমল উঁচু গোল বেদীটার ওপরে শুভ্র পোশাকে সজ্জিত ব্যাণ্ড-কণ্ডাক্টার সাহেবের হাতের ছড়িখানা যখন নানা ছন্দময় মৃদু ও দ্রুততালে নাচত—তখন তার চারিদিকে গোল হয়ে সারিসারি দাঁড়ানো প্রতি বাদকের হাতে হাতে ধরা ঝকমকে রকমারী বাদ্যযন্ত্রগুলো কি মধুর উন্মাদনা সুরেই না বাজত!

হয়ত, ব্যাণ্ড শোনার সেই আনন্দেই অমর দাশগুপ্ত আমাকে বললে, "সমর, ব্যাণ্ড বাজায় ঐ সাহেবদের ভেতর ঐ যে বুড়ো সাহেব বেহালা বাজায়—এসো তাকে ধরে আমরা বেহালা শিখি।"

হঠাৎ সে কথার উত্তর দিতে না পারায় কিংবা আমার কোন গরজ না দেখায়, সে একাই সাহেবটির সম্মুখীন হয়ে, তার কাছে বাজনা শেখার আগ্রহ দেখালে। আর সেই থেকে নিয়মিত তার বাড়ী গিয়ে এবং হোষ্টেলে ফিরে এসে, বেশ কিছুদিন সকলের কান ঝালাপালা করে—কত সুর-বেসুরো বাজিয়ে—তার বাজাবার হাত ঠিক করে ছাড়লে।

আর স্কুলে? সেখানে তার দারুণ খাতির। মাষ্টার মশাইদের সে অতি প্রিয়। রঙ তুলি কাগজ আর পেনসিল তাকে স্কুল যোগায়। তার উপরে ক্লাসে সে ফার্ষ্ট বয়। কাজে আলস্য নেই, আড্ডায় মোহ নেই, এছাড়া স্কুল কামাই করে না সে একদিনও।

তাই ওকে দেখে কে না খুশী! বিশেষ করে, রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর, ছাদের এক কোণে বসে যখন একমনে সে বেহালা বাজাত তখন ভাবতাম এই তো জীবন!

মনে পড়ত···আমাদের গোপাল মামার কথা। যাঁর স্নেহ ও শেখানোর গরজে, ফটো তোলার কত কিছু আমি জেনেছিলাম। তিনিও রাত্রি হলে, তাঁর বেহালা বাজাতেন। সে মধুর বাজনা, যা আজও আমার কানে ভাসে—তা আমাদের বাড়ী পর্যন্ত ভেসে গিয়ে, সুখ ও আনন্দে ঠাসা সে দিনগুলিতে, মনে কি স্বপ্নই না দেখাত···কিন্তু থাক সে কথা।

স্কুলের ভাইস-প্রিনসিপ্যাল, শ্রদ্ধেয় যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর তখন খুব নাম! সাহেব প্রিনসিপ্যাল, পার্সি ব্রাউনের মতই তাঁর সম্মান। মার্জিত আদব-কায়দা, শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজাত্যের সে চেহারাখানি প্রথম বিস্ময়! তারপরে পেইনটিং-এ দারুণ হাত। তুলনায় তাঁর সমকালীন যে কোন বিখ্যাত ইউরোপীয়ান আর্টিষ্টের সমতুল্য। সুতরাং রাজা-মহারাজা রাণী-মহারাণী ও সাহেব-মেমদের লাইফ সাইজ সব অয়েল পেইনটিং—আর কাঞ্চনজঙ্ঘা ও মানসসরোবরের অপূর্ব সব ল্যাণ্ডস্কেপ ক'রে—তাঁর প্রচুর অর্থাগম!

তাই সে যুগের প্রতিটি ছাত্রের মুখে মুখে ছড়াত—ভাইস-প্রিনসিপ্যাল যামিনী

গাঙ্গুলীর নাম। কিন্তু কাজের বেলায় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে, শিক্ষায় উন্নত, রুচিতে মার্জিত ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র শ্রীযুক্ত অতুল বসু ছাড়া সে নিষ্ঠা নিয়ে এগুতে পারেনি দ্বিতীয় আর কেউ!

শেষে, এহেন পেইন্ট্যার ছাত্রদের থাকা ও অবসর বিনোদনে—তাস পাশা আর টপ্পা, হিন্দী ও বাঙলা গানে মুখরিত সে যুগের হোষ্টেলের পরিবেশটি গেল একদম পালটে! মাত্র দুটি মানুষ, ফণী গুপ্ত (যিনি তাঁর পাঠ্যাবস্থাতেই 'শিশুসাথী'র ছবি আঁকতেন) ও মণি দাশগুপ্ত (যিনি তাঁর পাঠ্যাবস্থাতেই 'খোকাখুকু'র ছবি আঁকতেন) তাঁদের আগমনে।

সেই দৌলতে, আমরা যারা পর পর এলাম, তারা পেলাম নতুনত্বের স্বাদ! পেলাম কতকালের ভাঙাচোরা আলো-হীন ভুতুড়ে বাড়ী মেরামত হয়ে—নবা সাজে সজ্জিত আলো ঝলমল প্রাণবন্ত বাড়ী।

দেখতে লাগলাম, বহু হাতে, কাঁচের ওপরে কাগজ ভিজিয়ে, রঙের ওপর রঙ চাপিয়ে, বার বার তা ওয়াস করে করে—ইণ্ডিয়ান আর্ট আঁকার পদ্ধতি।

শুনতে লাগলাম, কত মুখে রবীন্দ্র-সংগীত। চাক্ষুস করতে লাগলাম, আর্টের নানা বই ও মাসিক পত্র। সাক্ষাৎ পেতে লাগলাম, কত শিল্পী, কবি-সাহিত্যিকদের।

ফলে, আমাদের ছাত্রযুগে শুধু স্কুলের ভাইস-প্রিনসিপ্যাল যামিনী গাঙ্গুলীর স্তুতি ও মহিমা কীর্তন নয়! সেই দুটি আশ্চর্য ও মহৎ মানুষের উৎসাহ দানেই—দেখতে শিখলাম ও শ্রদ্ধা জানাতে শিখলাম, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ থেকে নন্দলাল বসুকেও। আবদুল রহমান চাঘতাই, যামিনী রায়, অসিত হালদার থেকে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকেও। আবার পরশুরামের গল্পের ছবি এঁকে বিখ্যাত শ্রদ্ধেয় যতীন সেন, স্টেটসম্যান কাগজের জাঁদরেল আর্টিষ্ট পি. ঘোষ থেকে 'ষ্টেইজ' এ পরিকল্পনা দেন, 'কার এণ্ড মাহালানবীশের' ছবি আঁকেন বিখ্যাত শিল্পী চারু রায়কেও।

তাই বার বার মনে হত, সামনে যার এত মানুষের জয়গান! ও জয়যাত্রা! সেখানে এগিয়ে চলার কি প্রশস্ত পথ··

···যে কথাটি বলতে চেয়েছিলাম—সেই হতাশার ঠিক পরদিন, বেহালার তার কিনতে অমর দাশগুপ্ত আমাকে নিয়ে গেল ধর্মতলার বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা এম. এল. সাহার দোকানে।

তাদের ক্যাটালগটি আমার হাতে পড়তেই দেখলাম, সেকেলে পি. এম. বাকচীর পঞ্জিকার পাতায় ছাপা, খেলো উডকাট্ ছবির মত বাদ্যযন্ত্রগুলো।

দেখে, অমর দাশগুপ্ত শুধু হাসল। কিন্তু আমার মনে জিদ চাপল, সেগুলো সুন্দর করে এঁকে নিয়ে অভিযান এখানে আমার চালাতেই হবে। যেহেতু সেকেণ্ড ইয়ারের পারস্পেকৃটিভ্ ও মডেল ড্রইং ক্লাসের আমি তখন ছাত্র।

ভাষাবিদ শঙ্কর

শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়

অল্পদিনের মধ্যেই ভাষাবিদ বলে আমাদের শঙ্করের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

ব্যাপারটা কেমন করে ঘটল তাহলে বলি। অনেক দিন পরে সেদিন খোকনদা'র দেখা তালদীঘির ধারে। খোকনদা মাছ ধরতে এসেছিলেন। মাছ না পেয়ে দুটো কোলা ব্যাঙ বড়্শীতে গেঁথে বাড়ি ফিরছেন। আগামীকাল নাকি টোপ হিসাবে কাজে লাগাবেন। কাল অমাবস্যা ব্যাঙ ধরতে নেই।

আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, হ্যাঁ রে ফেলা, আমাদের শঙ্কর নাকি চীনে ভাষা শিখে এসেছে? আমি বললাম, দারুণ শিখেছে। সেদিন চীনে ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল।

: কী করে শিখল বলতো?

: ছুটিতে কলকাতায় মামার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। সেই যে সে সময় চৌ-এন-লাই কলকাতায় এলেন। শঙ্কর ময়দানে গিয়ে চৌ-এর বক্তৃতা শুনে অর্ধেক চীনা ওখানেই শিখে ফেলল। বাকীটা চৌ-এর এক বডিগার্ডকে ম্যানেজ করে দু'দিনেই শিখে গিয়েছে।

কলকাতায় তো কত চীনাই আছে। কিন্তু শঙ্কর বলে, দূর, দূর, ওরা কি আর এখন চীনে আছে নাকি! আরশোলা খেলেই কি আর চীনে হওয়া যায়। ওরা আসলে ভেতো বাঙালী হয়ে গিয়েছে। তাই চীনে যদি শিখতে হয় আসল চীনাম্যানের কাছেই শিখাব।

খোকনদা দু'বার নাক চুলকে বললেন, সেকি হে, তাহলে ব্যাপারটা সত্যি, শঙ্কর কারফারমা বাণী বিদ্যাদায়িনী স্কুলের থারড ক্লাসের লাসট বয় কিনা ভাষাবিদ হয়ে উঠল। সত্যি বলছিস তো?

আমি বললাম, সত্যি না বললে শঙ্করই আমাকে গাঁট্টা মেরে টাক ফুটো করে দেবে না?

বিশ্বাস না হয় তো চলুন। শঙ্কর বলেছে, অনর্গল চীনা ভাষায় চৌ-এন-লাইয়ের বক্তৃতা দিয়ে যাবে, কেউ ভুল ধরুক দিকি।

সারা গাঁয়েতে একথা রটে গেল শঙ্কর চীনে ভাষা শিখে এসেছে। গাঁয়ের লোক এতে দু'দলে ভাগ হয়ে গেল। কেউ বলল, শঙ্করকে এজন্য একটা অভিনন্দন দেওয়া উচিত। আর একদল বলল, অভিনন্দন না ছাই দেবে। ব্যাটা গুল মারবার জায়গা পায় না। তারা দাবি করল, এবার পুজোতে যে বিচিত্রানুষ্ঠান হবে, তাতে শঙ্কর পাঁচমিনিট চীনাভাষাতে বক্তৃতা দেবে। পরে নিজেই তার বাঙলা করে দেবে। সভাপতি

হিসাবে আনা হবে অধ্যাপক রামলোচন পাকড়াশীকে। চীনাদের ওপর বই লিখে অধ্যাপক পাকড়াশী ডক্টর উপাধি পেয়েছেন।

দেখতে দেখতে সেই দিনটা এগিয়ে এল। বারোয়ারি মণ্ডপে লোক আর ধরে না। সভাপতি রামলোচন চুনোট করা ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি পরে বরের মত সভা আলো করে বসে আছেন। যথারীতি ধুনুচি-নৃত্য ও যন্ত্র-সংগীত শেষ হয়ে গেল, শঙ্কর চীনা ভাষায় চৌ-এন-লাইয়ের মত বক্তৃতা আরম্ভ করল।

'লিং পে, চিং হুয়াং, তিং স্থং উয়া হুয়া।'

তারপর নিজেই অনুবাদ করে শঙ্কর বাংলায় বলল, বন্ধুগণ, আপনাদের মাঝখানে এসে আমি যারপরনাই আনন্দিত।

'স্থং, লিং, চাঙ্গ হোয়া, চিং ফা।'

ভারত ও চীন দীর্ঘ শতাব্দী ধরে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ।

এমন করে পাচমিনিট ধরে ঝাড়া বক্তৃতা দেবার পর দর্শকদের সেকী হাততালি! সবাই বলল, সাবাস! খোকনদা করলেন কী, ট্রেনে ওঠবার সময় অধ্যাপক পাকড়াশীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, স্যার, আমাদের শঙ্কর কি সত্যিই চীনে ভাষায় কথা বলল, না, গুল-তাপ্পি মেরে চলে গেল?

অধ্যাপক পাকড়াশী বললেন, ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা দিয়েছে?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: তাহলে বলি শোন, এতক্ষণ বলার জো ছিল না। শঙ্কর বেনামী চিঠি দিয়ে শাসিয়েছিল, খবরদার মুখ খুলবেন না। তা এখন খুলছি। চীনে বাজারের কতগুলো জুতোর দোকান আর রেস্তোরাঁর নাম ও পর পর বলে গেল। তোমরা ভাবলে আহা চীন ভাষায় কী বক্তৃতাই না করে গেল।

পাকড়াশী আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমি আর খোকনদা খুব একচোট হেসে নিলাম। আমাদের হাসি দেখে একটা বাচ্চা ছেলে তার বাবাকে বলল, বাবা ছাখ দুটো পাগল।

এমন সময় শঙ্কর এসে পড়াতে আমরা খুব গম্ভীর হয়ে গেলাম।

শঙ্কর বলল, এই পাকড়াশী কী বলে গেল রে?

খোকনদা বললেন, বলে গেল শঙ্করকে 'ভাষাবিদ' উপাধি দেওয়া দরকার।

তা সেই থেকে চাউর হয়ে গেল 'ভাষাবিদ শঙ্কর'। সবাই সেই নামেই ডাকতে আরম্ভ করল তাকে।

শঙ্কর আমাদের ক্লাসে পড়ত। সংস্কৃত একদম পারত না। পণ্ডিতের ক্লাসে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। কিন্তু একদিন তাকে ধরে ফেললেন বিধান পণ্ডিত। বিধান পণ্ডিতের চেহারা বেঁটে মোটা। রঙ কাকের মত কালো। বিঘতখানেক টিকি। খালি গায়ের ওপর চাদর। তার ভেতর থেকে ভুঁড়ি দেখা যায়। মনে হয় কেষ্টনগরের তৈরি গোপাল ঠাকুর।

বিধান পণ্ডিতের বেতকে আমরা দারুণ ভয় পাই। কিন্তু সেদিন কেন জানি না শঙ্কর ক্লাসেই ছিল। পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, এই শঙ্কর, তুই তো আবার ভাষাবিদ চৈনিক সম্রাট, বলতো সিংহাসনম্ কোন সমাস?

শঙ্কর অম্লান বদনে জবাব দিল, ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

বিধান পণ্ডিত বেত উঁচিয়ে বললেন, এটা কি বলতো?

শঙ্কর মুচকি হেসে বলল, যষ্ঠি তৎপুরুষ।

বিধান পণ্ডিত বললেন, তাই নাকি? তাহলে তোর পিঠেই এটাকে ভাঙি।

ওটা আত্মনেপদী করে নিন স্যর, ব'লে ভাষাবিদ শঙ্কর ক্লাস থেকে দৌড় মারল। আমরা এত অবাক হয়ে গেলাম যে, এটা কিসের ক্লাস তাও ভুলে গেলাম। বিধান পণ্ডিত রেগেমেগে উপক্রমণিকা বগলে করে ঠিচারস্ রুমে চলে গেলেন।

তারপর থেকে শুনলাম শঙ্কর আর সংস্কৃত পড়বে না। সে বলে বেড়াতে লাগল, সংস্কৃত হ'ল মৃত ভাষা। মরে কবে ভূত হয়ে গেছে। সে জ্যান্ত ভাষা উর্দু পড়বে। এ ভাষা সে আগেই জানে। তবে কিছুদিন অভ্যেস না থাকায় একটু ভুলে গেছে। ঝালিয়ে নিলেই আবার হবে।

সত্যি-সত্যিই উর্দু ক্লাসে ভরতি হ'ল শঙ্কর। খেলার মাঠের দিকে এককোণে যে অন্ধকার একখানা ঘর আছে, সেখানে উর্দুর ক্লাস হ'ত। ক্লাস এইটে কোন উর্দু ছাত্র নেই বলে মৌলবি সাহেবের আপসোস ছিল। তিনি শঙ্করকে পেয়ে তো আহ্লাদে আটখানা।

শঙ্কর বললো, আমার উর্দু খুব ভাল লাগে মৌলবি সাহেব।

মৌলবি বললেন, আহা, উর্দু হ'ল রাজভাষা। মতিলালের ছেলে জহরলালও উর্দু বলত। তাহলে কাল থেকেই ক্লাস কর শঙ্কর।

শঙ্কর বলল, করব স্যার, করব। এত ব্যস্ত হওয়ার কিছুই নেই। চীনে ভাষা যদি শিখতে পারি, উর্দু শিখতে পারব না?

শঙ্কর বোধহয় সাকুল্যে তিন-চারটে ক্লাস করেছে। অ্যানুয়াল এগজামিনের আগে মৌলবি জিজ্ঞাসা করলেন, ও শঙ্কর, সারা বছর কিছুই তো পড়লে না। কী পরীক্ষা দেবে বুঝতে পারছি না।

শঙ্কর বলল, ও আপনি দেখে নেবেন স্যার।—আচ্ছা স্যার, সমস্ত প্রশ্ন যদি লিখি তাহলে কত নম্বর দেবেন ?

মৌলবি বললেন, উর্দুতে ভাল নম্বর ওঠে হে। অন্ততঃ আশী তো পাবেই।

: ঠিক বলছেন ?

: ঠিক ঠিক। ব'লে মৌলবি দাঁড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন।

তারপর সংস্কৃত পরীক্ষার দিন আমাদের তো কোশ্চেন দেখে মাথা ঘুরে গেল। কেউ ঘনঘন জল খাচ্ছে, কেউ কান চুলকোচ্ছে। আমার তো ইচ্ছে হ'ল বাথরুমে গিয়ে একচোট কেঁদে আসি।

'মৌলবী বললেন, আহা, উর্দু হ'ল রাজভাষা।'

কিন্তু একটু দূরে শঙ্কর বসে আপন মনে লিখেই চলেছে, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে ফিকফিক করে হাসছে। দেখে তো তাজ্জব বনে গেলাম।

ওমা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শঙ্কর খাতা দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল। আমাদের গার্ড ছিলেন কালী স্যার। তিনি শঙ্করের খাতা খুলে দেখলেন উর্ধ্ব লেখায় একেবারে পাতাটা ঠাসা।

তারপর ?

তারপর আর কি ? রেজাল্ট বার হতে গিয়ে দেখা গেল আমরা যেখানে সংস্কৃতে পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ পেয়েছি, সেখানে শঙ্কর উর্দুতে পেয়েছে একেবারে আশী। পণ্ডিতের মুখ শুকিয়ে আমসী। সারা স্কুল তো শঙ্করের কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক ! হ্যাঁ, ভাষাবিদ শঙ্করই বটে !

কিন্তু শঙ্কর পরের ক্লাসেই উর্দু ছেড়ে দিল। বলল, মাথা খারাপ, ঐ বিদকুটে ভাষা পড়ে কি কোন লাভ আছে ? সংস্কৃত হ'ল দেবভাষা। বিধান পণ্ডিতকে দেখাবার জন্য জোর করে উর্দু নিয়েছিলাম। দেখলি তো উর্দু পারি কিনা !

খোকনদা সেই বছর টেস্ট দিয়েছেন। আমাদের জুনিয়রদের মুরুব্বি। আমাকে খোকনদা বললেন, ফেলা, কোথায় একটা গণ্ডগোল আছে। শঙ্কর আশী পেতেই পারে না।

আমি বললাম, আরে আমি যে নিজে দেখেছি, খাতা বোঝাই করে লিখেছে।

: উর্দু্তে ?

: পুরো উর্দু্। কালী স্যারও দেখেছেন। না খোকনদা, শঙ্কর সত্যিই ভাষাবিদ।

খোকনদা বললেন, কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে। শোন, এ্যানুয়াল পরীক্ষার সব খাতা স্কুল থেকে সের দরে ছিদাম মুদিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। চল, শঙ্করের উর্দু্ খাতাখানা উদ্ধার করা যায় কিনা দেখি।

তিনটাকা কবুল করতেই শঙ্করের উর্দু্ খাতাখানা উদ্ধার করা গেল। ছিদাম বলল, আর খাতা চাই খোকা বাবুরা? কম করে দেব। খাতা প্রতি দু'টাকা। কিন্তু অন্য খাতা দিয়ে আমাদের কি হবে? আমরা চাই 'শঙ্করের খাতা'।

খাতাখানা উলটে-পালটে দেখলাম। সত্যি সারা খাতা উর্দু্ লেখায় ভরতি। এমনকি চারটে অতিরিক্ত পাতাও নিয়েছে শঙ্কর। সত্যি তালেবর ছেলে বটে!

কিন্তু খোকনদা ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বললেন, উঁহু, কি লিখেছে সেটা একবার কাউকে না দেখিয়ে আমি শঙ্করকে ভাষাবিদ বলে মানতে রাজি নই।

: কী করবে ?

: হাবড়া স্কুলের মৌলবি আমার কাকার বন্ধু, তাকে দেখাব।

হাবড়া স্কুলের মৌলবি, আক্রাম খাঁ শঙ্করের খাতা দেখে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, শোভালাল্লা!

কেন কী হ'ল মৌলবি চাচা ?

মৌলবি মুচকি হেসে বললেন, তোমাদের শঙ্করের মগজ খুব সাফ আছে। গোটা কোশ্চেন পেপারটা দেখে দেখে কপি করে দিয়েছে।

শুনে আমাদের ভিরমি খাবার যোগাড়। তাহলে গোটা খাতাটার সব লেখাই কি ?...

মৌলবি বললেন, জী হঁা, পুরোটাই কোশ্চেন পেপারের নকল।

আমাদের স্কুলের মৌলবি সাহেবকে ধরা হ'ল। তাঁর মুখ শুকিয়ে আমসি।

বললেন, কী করব, শঙ্কর বলেছিল ফাঁস হয়ে গেলে মেরে পিঠের চামড়া খুলে নেবে। তাই ওকে আশী নম্বর দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

দোহাই তোমাদের একথা যেন জানাজানি না হয়ে যায়!

আর ভাষাবিদ শঙ্কর ?

শুনলাম, সে আমাদের স্কুল ছেড়ে দিয়ে গাইঘাটা স্কুলে ভরতি হয়েছে। আর সেখানকার ছেলেদের চীনা ভাষায় বক্তৃতা শোনাচ্ছে।

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

টেলিফোনের ঘন্টি বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলে নিই—"হ্যাঁ, কে ?"

"ক্যাম্পিগলিয়া ?"

"হ্যাঁ। ক্যাম্পিগলিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের আপিস।" আলস্যভরে উত্তর দিই।

"আপনার কুকুর—মানে বুঝতে পারছেন, আজ সকালবেলায় এখানে—ক্যাভিটাভিচ্চিয়াতে উপস্থিত হয়েছে। পরের গাড়ীতে পাঠিয়ে দেব কী ?"

"ধন্যবাদ। সেজন্য আপনি মাথা ঘামাবেন না। ওর যখন ইচ্ছে, মানে মতলব হবে ও আসবে। ও কারো সাহায্যের ধার ধারে না। যাই হোক, ধন্যবাদ।" হাসতে হাসতে উত্তর দিয়ে ফোন রাখলাম।

এতদিনে আমি এই ধরনের টেলিফোনে রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। একেবারেই ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। এমন একটি দিন যায় না যেদিন আমি ফোন না-পাই যে ল্যাম্পো আজ অমুক ষ্টেশনে, কাল অমুক ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছে। এমন কি, যদি এমন খবরও পাই যে ল্যাম্পোকে উত্তর মেরুতে বরফের ওপরে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে—তাহলেও অত্যধিক কিছু আশ্চর্য হব না।

ক্যাম্পিগলিয়ার চারদিকে দুশো মাইলের পরিধির মধ্যে ল্যাম্পো প্রায় সব রেলওয়ে ষ্টেশন-গুলিতেই বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। আসল কথা রেল এবং রেলযাত্রায় ল্যাম্পো যেন মোহগ্রস্ত

হয়ে পড়েছে। প্রথম প্রথম কাছাকাছি যেতো, তারপর দূরের পথে পাড়ি দেওয়া শুরু করল। ফাষ্ট´, লোক্যাল বা এক্সপ্রেস, যে-কোন গাড়ী হোক ওর আপত্তি নেই, শুধু মালগাড়ী বা যে ফাষ্ট´ গাড়ী ক্যাম্পিগলিয়াতে থামে না, এই দুটির সঙ্গে ওর কোন কারবার ছিল না।

যেমন, একদিন ওকে দেখলাম একটা অভিজ্ঞ পর্যটকের মত খুবই বে-তকল্লুফ জেনো-রোম এক্সপ্রেসে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

ঘণ্টাকয়েক বাদে ওর রোম পৌছবার খবর পেলাম। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা দেখলাম ও রোম টুরিন এক্সপ্রেস থেকে ক্যাম্পিগলিয়া ষ্টেশনে নামছে। আড়মোড়া ভাঙ্গল, তারপর অপেক্ষা করল গাড়ীটা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবার। এবারে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে বেশ সপ্রতিভ ভাবে লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে, আমার আপিসে এসে নাক দিয়ে দরজা খুলে ঢুকল। ঘরে এসে আমার দিকে বিনম্রচোখে তাকিয়ে থাকল, লেজ নাড়ল এবং আমি ওর পিঠ চাপড়াবো সেই অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর আবার বেরিয়ে গেল অন্যান্য আপিসে, সকলের সঙ্গে দেখা করতে। তাদেরও তো জানাতে হবে যে ও রোমে চলে গিয়েছিল, কিন্তু আবার ক্যাম্পিগলিয়াতে ফিরে এসেছে।

ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ষ্টেশনের যত লোক, ষ্টেশনমাষ্টার থেকে কুলি-মজুর, এঞ্জিন ড্রাইভার থেকে ব্রেকম্যান, পয়েণ্টস্‌ম্যান থেকে পুলিশ, 'বার'-এর দোকানদার থেকে মোটা কাগজওয়ালাটি পর্যন্ত সকলের মুখেই খালি ল্যাম্পো ও তার কীর্তি-কাহিনী। কেউ কিছু বলে, আর একজন আর কিছু। কিন্তু কেউই ল্যাম্পোর ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন সঠিক যুক্তিযুক্ত বিবরণ দিতে পারত না। এটা সকলের কাছেই রহস্যাবৃত ছিল যে, ল্যাম্পো কী করে ঠিক ট্রেনটি বেছে নিতে পারে ক্যাম্পিগলিয়ায় পৌছবার জন্য। এতএব অল্পদিনের মধ্যেই এই নিয়ে মজার মজার গল্প আর মন্তব্য চলতে থাকল।

কেউ বলল, গাড়ীতে 'রোম-টুরিন' বা 'রোম-জেনোয়া' লেখা যে বোর্ডগুলো থাকে, ল্যাম্পো সেগুলো পড়তে পারে। কেউ মজা করে বলল, ও ইন্‌ফরমেশন আপিসে গিয়ে খোঁজ নেয়। কেউ বা বললে, ও পড়তে জানে অথবা গুণতে জানে,তাই যখন লাউড-স্পীকারে বলে, অমুক গাড়ী এবার অমুক প্ল্যাটফরম থেকে ছাড়বে, তখন সহজেই ও সেই শুনে নিজের ট্রেনটি বেছে নেয়। আমি তো নিজের মস্তিষ্কটিকে বিপর্যস্ত করে ফেল্লাম ওর আশ্চর্য দিকনির্ণয় বোধ এবং সেই বিষয় ওর অন্তর্দৃষ্টি কী করে সম্ভব তারই চিন্তায়।

এই সাব্যস্ত করলাম যে, রোম ষ্টেশন থেকে সারাদিন গাড়ীগুলি বিভিন্ন দিকে যায়। কাজেকাজেই বলা যায় ল্যাম্পোর প্রথমবার রোম থেকে ফেরাটা একটা আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র। এরপর ভাবলাম যে, যাবার সময় যে মুখে গাড়ী যায়, ফিরতে হলে ঠিক তার বিপরীত-

মুখী গাড়ীতে ও বসে পড়ে। কিন্তু আমার সুন্দর ধারণাগুলি সবই ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল যখন আরও ভাল করে লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, ল্যাম্পো ফ্লোরেন্স থেকে আগত কোন গাড়ী থেকে নামছে। আবার কখনও জানা গিয়েছে ও কোন একটা ছোট বা সাধারণ ষ্টেশন থেকে উঠেছে। মোট সিদ্ধান্ত এই যে, ক্যাম্পিগলিয়ার মেন-লাইনের সঙ্গে অন্য কোন ব্রাঞ্চ লাইনের যে-কোন গাড়ীর যোগাযোগ ল্যাম্পো বুঝতে পারে।

যথা, একবার ল্যাম্পো পিসাতে পৌঁছে গেল। পিসা খুবই বিশিষ্ট ষ্টেশন। সেখান থেকে অনেকগুলি বিভিন্নমুখী লাইন বিভিন্ন দিকে গিয়েছে। সেখান থেকে ও ফ্লোরেন্স পৌঁছবার জন্য পিসাফ্লোরেন্স গাড়ীতে উঠে পড়ে। ক্যাম্পিগলিয়াতে পৌঁছতে হলে ও জানে পিসাতে পৌঁছতে হবে এবং সেখান থেকে কোন ট্রেনে বসলে তবে ও ক্যাম্পিগলিয়ায় পৌঁছবে।

এই অদ্ভুত কুকুরটা আমাদের অমীমাংসিত সমস্যা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা না করে দিব্য ঘন ঘন রেলযাত্রা করে বেড়াতো। আমাদের সমস্যা আরও জটিল ও রহস্যময় হয়ে পড়ল। বেড়াবার নেশা যেন ওর উত্তরোত্তর বেড়ে গেল। কিন্তু ফিরে আসবার লক্ষ্যস্থল ওর ক্যাম্পিগলিয়াই থাকল।

এমনই সুনিপুণ ও অভিজ্ঞ যাত্রী ও হয়ে পড়ল যে, যে-কোন গাড়ী—মালগাড়ী ছাড়া, এলেই ও তাতে উঠে পড়বে। গাড়ীটা হয়ত দক্ষিণমুখে গিয়েছিল, কিন্তু পরে দেখি কি, ও ক্যাম্পিগলিয়াতে নামছে, একটা উত্তর দিক থেকে আগত গাড়ী থেকে। আমি ও আমার সহকর্মীরা অবশ্য সহজেই এর সমাধান করেছি। একটা দক্ষিণমুখী কোন গাড়ীতে চড়েও হয়ত গ্রসেটো, কিভিটা-ভেস্তয়া বা রোম কোথাও পৌঁছে গিয়েছিল। ফিরতি পথে ও না জেনে এমন কোন এক্সপ্রেসে উঠেছিল, যেটা ক্যাম্পিগলিয়াতে না থেমে সোজা লেগহর্ণ চলে গিয়েছিল। অতএব ও ফের লেগহর্ণ থেকে কোন গাড়ী ধরে আমাদের ষ্টেশনে পৌঁচেছে। (ক্রমশঃ)

॥ ঈশ্বর ॥

"ঈশ্বর নররূপ গ্রহণ করেছেন। মানুষও আবার ঈশ্বরের রূপ পরিগ্রহ করবে। তাই তোমার নিজের প্রতি যদি বিশ্বাস না থাকে, তবে ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস আসতে পারে না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

অ্যাপোলো-১২ অভিযান

শ্রীপারমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

"এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কাজ করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়—বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে খোশামোদে,—তিনি উলটি-পালটি খাইয়াছেন।...কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য-কুঞ্জে লীলা খেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই।" ("চন্দ্রালোক"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

ছাড়াছাড়ি যে আর নেই সে তা বোঝাই যাচ্ছে। গত জুলাই থেকে নভেম্বরের মধ্যে অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২ অভিযানে বিজ্ঞানের চরেরা দু'দুবার চাঁদ থেকে ঘুরে এল। বিজ্ঞানীরা আজ চাঁদের বুক চিরে তার ভেতরকার সব খবর আদায় করে নিতে বদ্ধপরিকর।

গত ১৬ই নভেম্বর রাত্রি ৯'৫২ মিনিটে মার্কিন মহাকাশচারী চার্লস কনরাড, রিচার্ড গর্ডন ও অ্যালান বীন অ্যাপোলো-১২ অভিযান শুরু করেন। দশদিনব্যাপী মহাশূন্যে তাঁদের এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল চাঁদ সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা।

১৯৬৭ সালের ১৯ এপ্রিল সার্ভেয়ার-৩ নামে একটি মার্কিন মহাকাশযান চাঁদের ঝটিকা সাগরে নামে। আড়াই বছর পর সেটি কি রকম অবস্থায় আছে, তার কোনও রূপ পরিবর্তন হয়েছে কিনা—তা নির্ধারণ করা চন্দ্রাভিযাত্রীদের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। এই জন্যে চাঁদের ঝটিকা সাগরে ঠিক এই যানটির অতি কাছাকাছি একটি জায়গায় তাঁরা নামেন। কেপ কেনেডি থেকে এর দূরত্ব হল ২৩০,০০০ মাইল। এতদূর থেকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট ক'রে ঠিক সেইখানেই নামা মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এক অতি আশ্চর্য ঘটনা।

কনরাড ও বীন ৩১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট চাঁদের মাটিতে ছিলেন। এই সময়ে তাঁদের অপর সঙ্গী গর্ডন ৬৯ মাইল ওপরে মূলযানটিতে করে চাঁদের কক্ষপথে ১৯ বার ঘুরতে থাকেন। সব মিলিয়ে তাঁদের এই যাত্রা ছিল প্রায় ২৪৪ ঘণ্টার মত। এর আগে গত জুলাই মাসে অ্যাপোলো ১১ অভিযানের যাত্রী আর্মষ্ট্রং ও অ্যালড্রিন চাঁদে অতিবাহিত করেন ২১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট ১৭ সেকেণ্ড। তাঁদের সবসুদ্ধ সময় লেগেছিল ১৯৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ২১ সেকেণ্ড। তাঁরা নেমেছিলেন চাঁদের প্রশান্তি সাগরে। ঝটিকা সাগর থেকে এর দূরত্ব ৮৩০ মাইল।

কনরাড ও বীন চাঁদের মাটিতে দু'বার সাড়ে তিন ঘণ্টা করে ছিলেন। আর্মষ্ট্রং ও অ্যালড্রিন একবারে ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিটের মধ্যে সেখানে যাবতীয় কাজ সারেন। তাঁদের দু'বার নামার দরকার হয়নি। তাছাড়া, মহাকাশ থেকে তাঁরা যে সব টেলিভিশন চিত্র পৃথিবীতে পাঠান সেগুলি সবই সাদা-কালো। অ্যাপোলো-১২ অভিযানের রঙিন টেলিভিশন চিত্র পাওয়া গিয়েছে। কনরাড ও বীন এবার আগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ চাঁদের শিলা ও মাটির নমুনা এনেছেন। এসবের ওজন হবে প্রায় ৯০ পাউণ্ড বা ৪৬ কিলোগ্রাম। অ্যাপোলো-১১ অভিযানে মূল মহাকাশযানটির নাম দেওয়া হয় "কলম্বিয়া"। চন্দ্রযানটি ছিল "ঈগল"। অ্যাপোলো-১২ অভিযানে "ইয়াঙ্কি ক্লিপার" হ'ল মূলযান, আর "ইনট্রেপিড" চন্দ্রযান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কনরাড, ও বীনকে ধরে মহাশূন্যে মানুষ এপর্যন্ত সাঁইত্রিশ বার পাড়ি দেন। মার্কিন মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এঁরা হলেন দ্বাবিংশ অভিযাত্রী। রাশিয়া এপর্যন্ত মোট পনেরো বার মহাশূন্যে মানুষ পাঠিয়েছে।

বিশ্বাস করা কঠিন যে, চাঁদে কনরাড ও বীন একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ক'রে এসেছেন। তাতে উন্নত ধরনের পাঁচটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আছে। এগুলি চাঁদ সম্বন্ধে নানা তথ্য এক বছর ধরে পৃথিবীতে পাঠাবে। সিস্‌মোমিটার হ'ল এগুলির মধ্যে একটি। এর সাহায্যে চন্দ্রকম্পন ধরা পড়বে। চাঁদের ভেতরে কোনও চুম্বকধর্মী পদার্থ আছে কিনা তা পরীক্ষা করার যন্ত্রও নভচারীদের সঙ্গে ছিল। গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা এরই মধ্যে চাঁদের অভ্যন্তরে চুম্বকক্ষেত্রের (magnetic field) অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন।

অ্যাপোলো-১২ অভিযানের যাত্রীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সার্ভেয়ার-৩ মহাকাশযানটিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা। এই প্রথম মানুষ অন্য গ্রহে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র পরিদর্শন করে। চাঁদের প্রতিকূল পরিবেশে থেকে যানটির কি পরিবর্তন হয়েছে তাঁরা তা নির্ধারণের চেষ্টা করেন। পৃথিবীতে কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘকালের জন্যে এরকম পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা যায় না। তাঁরা বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্যে যানটির নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশ খুলে এনেছেন।

সার্ভেয়ার-৩ থেকে টেলিভিশনের তারের কিছু অংশ কনরাড কেটে নিয়ে এসেছেন। যানটিকে যখন পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হয়, তখন এই তারটির মধ্যে অসংখ্য জীবাণু (micro-organism) রেখে দেওয়া হয়েছিল। চাঁদে পৃথিবীর এই সব জীবাণু

বেঁচে থেকে বংশবৃদ্ধি করতে পারে কিনা এবারে তা বোঝা যাবে। কনরাড একটি কাঁচের চকচকে ছোট টিউব খুলে আনেন। এটির সাহায্যে চাঁদের ওপর কিভাবে নানা রকম উল্কা পাত হয়, সে বিষয়ে পরীক্ষা চালানো হবে। একত্রিশ মাসে যানটির কি ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছে তাও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখবেন। ফলে, ভবিষ্যতে বিচার-বিবেচনা করে চাঁদে হাওয়ার উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈরী করা যেতে পারে।

কনরাড ও বীন মূল মহাকাশযানে গর্ডনের সঙ্গে মিলিত হয়ে চন্দ্রযানটিকে চাঁদের মাটিতে সজোরে নিক্ষেপ করেন। এতে সেখানে চন্দ্রকম্পন ঘটে। সাড়ে পাঁচ মিনিট পরে তাঁরা তা অনুভব করেন। এই কম্পনের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ৫৫ মিনিট-ধরে এর প্রতিধ্বনি চলতে থাকে। একটা ঘণ্টা বাজালে যেমন বহুক্ষণ ধরে তার অনুরণন চলে, এও অনেকটা সেইরকম বলে মনে হয়। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এর থেকে তাঁরা চাঁদ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাবেন। তাঁদের মতে চাঁদের আভ্যন্তরিক কাঠামোটা খুব দৃঢ়বদ্ধ নাও হতে পারে।

"ইয়াঙ্কি ক্লিপারে" ফিরে এসেই অভিযাত্রীরা পৃথিবীর উদ্দেশে যাত্রা করেন নি। তাঁরা সম্পূর্ণ একদিন ছিলেন চাঁদের কক্ষপথে। ভবিষ্যতে চাঁদে কোথায় কোথায় নামা যেতে পারে এমন কতকগুলি জায়গার আলোকচিত্র তাঁরা নেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত চাঁদে পর পর আরও সাতটি অভিযান চালানো হবে।

অ্যাপেলো-১২ অভিযানের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, মহাকাশ থেকে পৃথিবীর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দান। হিউষ্টনের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র থেকে সাংবাদিকদের প্রশ্নগুলি মহাকাশচারীদের কাছে পাঠানো হয়। তাঁরা মহাশূন্য থেকে সেগুলির উত্তর দেন। ১০০,০০০ মাইল দূরের এই ঘটনা কোনও কোনও টেলিভিশনে দেখেছেন।

গত ২৪শে নভেম্বর রাত্রি ২.২৮ মিনিটে কনরাড, গর্ডন ও বীন প্রশান্ত মহাসাগরে এসে নামেন। মহাকাশ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের ক্ষেত্রে এই অভিযান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

॥ যন্ত্র ॥

"পুরাকাহিনীতে আছে রাবণের দশ মাথা ও একশ' হাত ছিল। আমাদের যুগে যন্ত্রও মানুষকে দশ মাথা ও একশ' হাত দিয়েছে।"

—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

মহাকাশচারীদের অভিযানের তালিকা

মহাকাশযান	দেশ	তারিখ	মহাকাশচারী	সময়	অভিযানের বৈশিষ্ট্য
ভোস্টক ১	রাশিয়া	১২ এপ্রিল, ১৯৬১	ইউরি গ্যাগারিন	১ ঘণ্টা ৪৮ মিঃ	মহাকাশে প্রথম মানুষ
ফ্রিডম ৭	আমেরিকা	৫ মে, ১৯৬১	শেপার্ড	১৫ মিনিট	মহাকাশে প্রথম মার্কিন অভিযাত্রী
লিবার্টিবেল ৭	আমেরিকা	২১ জুলাই, ১৯৬১	গ্রিসম	১৬ মিনিট	প্রশান্ত মহাসাগরে নামার পরে এই মহাকাশযানটি ডুবে যায়
ভোস্টক ২	রাশিয়া	৬-৭ অগাস্ট, ১৯৬১	টিটভ	২৫ ঘঃ ১৮ মিঃ	একদিনের বেশী সময় মহাকাশে অবস্থান
ফ্রেণ্ডশিপ ৭	আমেরিকা	২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২	গ্লেন	৪ ঘঃ ৫৫ মিঃ	কক্ষপথে প্রথম মার্কিন মহাকাশচারী
অরোরা ৭	আমেরিকা	২৪ মে, ১৯৬২	কারপেনটার	৪ ঘঃ ৫৬ মিঃ	গ্লেনের অনুরূপ কাজ
ভোস্টক ৩	রাশিয়া	১১-১৫ অগাস্ট, ১৯৬২	নিকলায়েভ	৯৪ ঘঃ ২২ মিঃ	প্রথম টেলিভিশনে ছবি পাঠান
ভোস্টক ৪	রাশিয়া	১২-১৫ অগাস্ট, ১৯৬২	পোপভিচ	৭০ ঘঃ ৫৭ মিঃ	আগের যানটির তিন মাইলের মধ্যে আসে
সিগমা ৭	আমেরিকা	৩ অক্টোবর, ১৯৬২	শিরা	৯ ঘঃ ১৩ মিঃ	আগের চেয়ে দ্বিগুণ সময় মহাকাশে থাকেন
ফেথ ৭	আমেরিকা	১৫-১৬ মে, ১৯৬৩	কুপার	৩৪ ঘঃ ২০ মিঃ	প্রথম দীর্ঘ সময়ের মার্কিন অভিযান
ভোস্টক ৫	রাশিয়া	১৪-১৯ জুন, ১৯৬৩	বাইকভস্কি	১১৯ ঘঃ ৬ মিঃ	সবচেয়ে বেশী সময়ের মহাকাশ অভিযান
ভোস্টক ৬	রাশিয়া	১৬-১৯ জুন, ১৯৬৩	ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা	৭০ ঘঃ ৫০ মিঃ	বিশ্বের প্রথম মহিলা মহাকাশচারিণী
ভোস্কড ১	রাশিয়া	১২-১৩ অক্টো, ১৯৬৪	ফেওটিসটভ, কোমরভ, ইয়েগোরভ	২৪ ঘঃ ১৭ মিঃ	মহাকাশে প্রথম তিনজন মানুষ

মহাকাশযান	দেশ	তারিখ	মহাকাশচারী	সময়	অভিযানের বৈশিষ্ট্য
ভোস্কভ ২	রাশিয়া	১৮-১৯ মার্চ, ১৯৬৫	বেলায়েভ, লিওনভ	২৬ ঘ: ২ মি:	লিওনভ মহাকাশে পাঁচ মিনিট চলা-ফেরা করেন
জেমিনি ৩	আমেরিকা	২৩ মার্চ, ১৯৬৫	গ্রিসম্, ইয়ং	৪ ঘ: ৫৩ মি:	প্রথম মার্কিন মহাকাশযানে দুইজন যাত্রী
জেমিনি ৪	আমেরিকা	৩-৭ জুন, ১৯৬৫	ম্যাকডিভিট, হোয়াইট	৯৭ ঘ: ৫৬ মি:	হোয়াইট ২১ মিনিট মহাকাশে চলে বেড়ান
জেমিনি ৫	আমেরিকা	২১-২৯ অগাস্ট, ১৯৬৫	কুপার, কনরাড	১৯০ ঘ: ৫৬ মি:	ভারশূন্য অবস্থায় মানুষের পরীক্ষা
জেমিনি ৭	আমেরিকা	৪-১৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৫	বোরম্যান, লোভেল	৩৩০ ঘ: ৩৫ মি:	দীর্ঘ সময়ের পাড়ি
জেমিনি ৬	আমেরিকা	১৫-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৫	শিরা, স্ট্যাফোর্ড	২৫ ঘ: ৫১ মি:	আগের মহাকাশযানটির এক ফুটের মধ্যে আসে
জেমিনি ৮	আমেরিকা	১৬ মার্চ, ১৯৬৬	আমষ্ট্রং, স্কট	১০ ঘ: ৪২ মি:	মহাকাশে মিলনের চেষ্টা
জেমিনি ৯	আমেরিকা	৩-৬ জুন, ১৯৬৬	স্ট্যাফোর্ড, সারন্যাল	৭২ ঘ: ২১ মি:	মহাকাশে চলে বেড়ান
জেমিনি ১০	আমেরিকা	১৮-২১ জুলাই, ১৯৬৬	ইয়ং, কলিন্স	৭০ ঘ: ৪৭ মি:	নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা
জেমিনি ১১	আমেরিকা	১২-১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬	কনরাড, গর্ডন	৭১ ঘ: ১৭ মি:	মহাকাশে মিলন সম্পর্কে পরীক্ষা
জেমিনি ১২	আমেরিকা	১১-১৫ নভেম্বর, ১৯৬৬	লোভেল, অ্যালড্রিন	৯৪ ঘ: ৩৫ মি:	অ্যালড্রিন ১২৯ মিনিট মহাকাশে চলা ফেরা করেন
সোয়ুজ ১	রাশিয়া	২২-২৩ এপ্রিল, ১৯৬৭	কোমরভ	২৬ ঘ: ৪৫ মি:	এই মহাকাশযানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় ধ্বংস হয় এবং কোমরভ নিহত হন
অ্যাপোলো-৭	আমেরিকা	১১-১২ অক্টো, ১৯৬৮	শিরা, ইজল, কানিংহাম	২৬০ ঘ: ৯ মি:	প্রথম মার্কিনযানে তিন মহাকাশচারী

মহাকাশযান	দেশ	তারিখ	মহাকাশচারী	সময়	অভিযানের বৈশিষ্ট্য
সোয়ুজ-৩	রাশিয়া	২৬-৩০ অক্টোবর, ১৯৬৮	বেরোগাভয়	৯৪ ঘঃ ৫১ মিঃ	মানুষবিহীন মহাকাশযান সোয়ুজ-২-এর সঙ্গে মিলন
অ্যাপোলো ৮	আমেরিকা	২৬-২৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৮	বোরম্যান, লোভেল, অ্যানডার্স	১৪৭ ঘণ্টা	মানুষ প্রথম চাঁদের কক্ষপথে যায়। মহাকাশচারীগণ চাঁদের ৭০ মাইলের মধ্যে যান
সোয়ুজ ৪	রাশিয়া	১৪-১৭ জানু, ১৯৬৯	খ্রুনভ, সাটালভ, ইলিসিয়েভ	৭১ ঘঃ ১৪ মিঃ	মহাকাশে সোয়ুজ-৪ ও সোয়ুজ-৫-এর মিলন ও যাত্রী বিনিময়
সোয়ুজ ৫	রাশিয়া	১৫-১৮ জানু, ১৯৬৯	খ্রুনভ, ভলিনভ, ইলিসিয়েভ	৭২ ঘঃ ৪৬ মিঃ	
অ্যাপোলো ৯	আমেরিকা	৩-১৩ মার্চ, ১৯৬৯	ম্যাকডিভিট, স্কট সোয়েকার্ট	২৪১ ঘঃ ১ মিঃ	মহাকাশে চন্দ্রযানের পরীক্ষা
অ্যাপোলো ১০	আমেরিকা	১৮-২৬ মে, ১৯৬৯	স্ট্যাফোর্ড, ইয়ং, সারন্যান	১৯২ ঘঃ ৩ মিঃ	ইয়ং মহাকাশে থাকেন। স্ট্যাফোর্ড ও সারন্যাল চন্দ্রযানে চড়ে চাঁদের ৯ মাইলের মধ্যে যান
অ্যাপোলো ১১	আমেরিকা	১৬-২৪ জুলাই, ১৯৬৯	আমষ্ট্রং, কলিন্স, অ্যালড্রিন	১৯৫ ঘঃ ১৮ মিঃ	আর্মষ্ট্রং ও অ্যালড্রিন ২১শে জুলাই চাঁদে পৌছান
সোয়ুজ ৬	রাশিয়া	১১ অক্টোবর, ১৯৬৯	শোনিন, কুবাসভ		
সোয়ুজ ৭	রাশিয়া	১২ অক্টোবর, ১৯৬৯	জের্বাটকো, ফিলিপচেন্‌কো		
সোয়ুজ ৮	রাশিয়া	১৩ অক্টোবর, ১৯৬৯	ভোলকভ সাটালভ, ইলিসিভেয়		
অ্যাপোলো ১২	আমেরিকা	১৪-২৪ নভে, ১৯৬৯	কনরাড, গর্ডন, বীন		দ্বিতীয়বার মানুষ চাঁদের বুকে নামে

মেঠুড়ে

ক্রিকেট (ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট)

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল সরকারীভাবে চতুর্থবার ভারতে খেলতে এসেছেন। তাঁরা বোম্বাইয়ে ভারতের সঙ্গে প্রথম টেস্ট খেলেন এবং ভারত প্রথম টেস্টে পরাজিত হয়। প্রথম দিনের খেলার ধারা অনুযায়ী আশা করা গিয়েছিল, খেলায় জয়-পরাজয় যদি হয়ই সেটা হবে নাটকীয় পরিবেশে, আকর্ষণীয় অবস্থায়। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্যয়ই ৮ উইকেটে পরাজয়ের প্রধান কারণ।

ফাস্ট বোলিং-এ ভারতের দুর্বলতার কথাও সর্বজনবিদিত। কিন্তু বোম্বাইয়ের পরাজয়ের মূলে শুধু অষ্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলিং-ই হারার কারণ নয়, স্পিন বোলিং-এর বিরুদ্ধেও ভারতের খেলোয়াড়রা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

৪ নভেম্বর ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে টসে জিতে ভারত প্রথম ব্যাটিং শুরু করে। মাত্র ৪২ রানের মধ্যে সারদেশাই, ইঞ্জিনিয়ার ও বোরদে আউট হয়ে যান। চতুর্থ উইকেটে অধিনায়ক পতৌদি ও অশোক মানকড়ের দৃঢ়তায় খেলায় পরিবর্তন ঘটে। দুজনের আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের ফলে চতুর্থ উইকেটে ১২৬ রান যোগ হবার পর ১৮৮ রানের মাথায় মানকড় আউট হয়ে যান। মোট ২২৬ মিনিটে সাতটা বাউণ্ডারী সহযোগে মানকড় ৭৪ রান তোলেন। দিনের শেষে ভারতের ৪ উইকেটে ২০২ রান ওঠে। পাতৌদি ৭৩ ও ওয়াদেকার ১ রান করে নট আউট থাকেন। প্রথম দিনে যে চারটি উইকেট পড়ে, সেগুলো সবই দখল করেন অষ্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি।

দ্বিতীয় দিন মাত্র ৬৯ রানে ভারতের বাকী ছ'টা উইকেট পড়ে যায়। মাত্র পাঁচ রানের জন্যে পাতৌদি সেঞ্চুরি করতে পারেন না। ভারতের প্রথম ইনিংস ২৭১ রানে শেষ হবার পর দ্বিতীয় দিনের শেষে অষ্ট্রেলিয়া ১ উইকেটে ১৩ রান তোলে।

একদিন বিরতির পর তৃতীয় দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দল ৭ উইকেটে ৩২২ রান তোলে।

এর ভেতর কিথ স্ট্যাকপোলের ১০৩, রেডপাথের ৭৭ এবং ওয়াল্টার্সের ৪৮ রান উল্লেখ্য। ভারতের মাটিতে প্রথম টেস্টেই ওপেনিং ব্যাটসম্যান স্ট্যাকপোল সেঞ্চুরি করেন।

চতুর্থ দিন ৩৪৫ রানে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত. ব্যাটিংয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। গ্লীসনের বলে ঘন ঘন উইকেট পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত রান সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ উইকেটে ১২৫।

শেষ দিনের খেলা নিয়মরক্ষার নামান্তর মাত্র হয়। ১৩৭ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হবার পর, জয়ের প্রয়োজনীয় রান ২ উইকেটের বিনিময়ে সংগ্রহ করে অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী হয়।

॥ ২ ॥

বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী হবার পর কানপুরে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটা ড্র হয়েছে। কানপুরে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ক্রিকেট দক্ষতা বোম্বাইয়ের ব্যর্থতা বহু পরিমাণে ঢেকে দিয়েছে। দ্বিতীয় টেস্ট দলে ছিলেন অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড়। তার মধ্যে একজন মহীশূরের একুশ বছর বয়সী খেলোয়াড় জি. বিশ্বনাথ টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে পৃথিবীর চৌত্রিশতম এবং ভারতের ষষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট খেলতে নেমেই সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেছেন।

কানপুরের গ্রীন পার্কের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতীয় ক্রিকেট রসিকদের এক সুখস্মৃতি। নয় বছর আগে এই গ্রীন পার্কে রিচি বেনোর প্রায় অজেয় অষ্ট্রেলিয়া দলকে ভারত ১১৯ রানে পরাজিত করেছিল এবং সেটাই ছিল টেস্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম জয়। এবার জয়ী হতে না পারলেও তরুণ বিশ্বনাথ তাঁর প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল ক্রিকেটে ভারতীয় দর্শক ও সমর্থকদের মনে আর এক মধুর স্মৃতির আমেজ এনে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের অধিনায়ক টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নেন। প্রথম দিন ভারতের ৫ উইকেটে ২৩৭ রানের মধ্যে দুজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ও অশোক মানকড়ের খেলা চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটের এক বিরল দৃষ্টান্ত। মাত্র ১১০ মিনিটে ১১১ রান। অষ্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ইঞ্জিনিয়ার ও মানকড় ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার স্মৃতি বহুকাল দর্শক-মনে আঁকা থাকবে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতীয় দলের তরুণ খেলোয়াড় সোলকার ৬৪ রানের মধ্যে আটটা বাউণ্ডারী মেরে দর্শক-মনে আনন্দরস সৃষ্টি করেন। ৩২০ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর, অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক বিল লরি, সহ-অধিনায়ক ইয়ান

চ্যাপেল এবং ওপেনিং ব্যাটসম্যান কিথ স্ট্যাকপোলের উইকেট হারিয়ে দিনের শেষে ১০৫ রান সংগ্রহ করে।

একদিন বিরতির পর তৃতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ৩৪৮ রানে ইংনিস শেষ হয়। প্রথম ইনিংসের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ২৮ রানে এগিয়ে যাবার একটা কারণ যেমন পল শিহান ও ইয়ান রেডপাথের পঞ্চম উইকেট জুটির ১৩১ রান, শিহানের সেঞ্চুরি, আর একটা কারণ তেমনি ভারতের ক্রটিপূর্ণ ফিল্ডিং। ভারতের ফিল্ডাররা চারটে ক্যাচের সুযোগ নিতে পারলে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে এগিয়ে যেতে পারত না এবং ব্যাটসম্যানের সহায়ক উইকেটেও শেষ দিকের খেলায় উত্তেজনা সঞ্চার হতে পারত। এই দিন পল শিহান যেমন জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরির অধিকারী হন, তেমন ভারতের সুব্রত গুহ পান জীবনের প্রথম টেস্ট উইকেট। সুব্রত দুটো উইকেট পান। ক্যাচ মিস না হলে এবং পাতৌদি তাঁকে বল করার আর একটু সুযোগ দিলে, তিনি হয়তো আরও বেশী উইকেট পেতে পারতেন।

চতুর্থ দিন দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় ভারতের স্বভাবতই ভয় ছিল। বিশেষ করে যখন ১৪৭ রানের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল পাতৌদি, ওয়াদেকার, ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখের পাঁচটা উইকেট। কিন্তু আবার দুই তরুণ—মানকড় ও বিশ্বনাথ বিপর্যয়ের মুখে রুখে দাঁড়ান। দিনের শেষে ভারতের ওই পাঁচ উইকেটেই ওঠে ২০৪ রান। বিশ্বনাথ ৬৯ রানে নট আউট থাকেন। ওই ৬৯ রানের মধ্যে ৬০ রানই বিশ্বনাথ তুলেছিলেন বাউণ্ডারী মেরে।

বিশ্বনাথ সেঞ্চুরি করতে পারেন কিনা এটাই ছিল শেষ দিনের খেলার বড় আকর্ষণ। ১৯৬৭-৬৮ সালে রণজি ট্রফিতে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েই যিনি অন্ধ্রের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি (২৩০ রান) করেছিলেন, তিনি টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগেও সেঞ্চুরি করেন। ২৬৮ মিনিটে চব্বিশটা বাউণ্ডারী সহযোগে তাঁর ১৩৭ রান টেস্ট খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় অবদান হিসাবে লেখা থাকবে।

সাত উইকেটে ৩১২ রান নিয়ে ভারতের অধিনায়ক পাতৌদি দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর বাকি সময়ের খেলা নিয়মরক্ষার ব্যাপারে দাঁড়ায়। অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৯৫ রান তুললে খেলায় যবনিকা পড়ে।

॥ ৩ ॥

দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে তৃতীয় টেস্টে ভারত তীব্র উত্তেজনা এবং উদ্দীপনার মধ্যে সাত উইকেটে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে। অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতের এই নিয়ে তৃতীয় জয়লাভ।

প্রথম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের সাতটা উইকেট হারিয়ে ২৬১ রান তোলে। প্রথম দিনের খেলায় টেবার ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২৯৬ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন ভারত প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৩ রান তুলেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন অশোক মানকড় (৮৯ রান) এবং পাতৌদি।

তৃতীয় দিন ভারতের প্রথম ইনিংসে ২২৩ রানে শেষ হলে অষ্ট্রেলিয়া ৭৩ রানে এগিয়ে থাকে। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইংসের খেলায় এগিয়ে থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। মাত্র ১০৭ রানের মাথায় তাঁদের দশম উইকেট পড়ে যায়।

চতুর্থ দিন ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৩ রানের মাথায় প্রথম, ১৮ রানের মাথায় দ্বিতীয় এবং ৬১ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট পড়েছিল। জয়লাভের জন্যে তখনও ১২০ রানের দরকার ছিল। বেদী এবং ওয়াদেকার তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ৪৩ রান এবং ওয়াদেকার ও বিশ্বনাথের অসমাপ্ত চতুর্থ উইকেটের জুটিতে দলের ১২০ রান উঠে যায়। অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা অনেক চেষ্টা করেও ওয়াদেকার এবং বিশ্বনাথের চতুর্থ ইউকেটের জুটি ভাঙতে পারেন নি। বিশ্বনাথ ৪৪ রান এবং ওয়াদেকার ৯৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। লাঞ্চের পর চতুর্থ উইকেট জুটি ওয়াদেকার এবং বিশ্বনাথ আক্রমণাত্মক খেলায় রান তুলে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেন। ভারতের জয়সূচক এক রানটি সংগ্রহ করেন বিশ্বনাথ। চা-পানের ঠিক দু'মিনিট আগে খেলা শেষ হয়।

॥ 8 ॥

১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্ণে সব জল্পনা-কল্পনা, আশা-নিরাশার শেষ হ'ল যখন অষ্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্টে দশ উইকেটে জয়ী হয়ে, 'রাবার'-এর ২-১ খেলায় এগিয়ে রইল। ওয়াদেকারের সুন্দর ৬২ রান এবং সোলকার ও অম্বর রায়ের অবদান সত্ত্বেও, ফ্রিম্যান ও কনোলীর সুইং ও সীম বলে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে করল মাত্র ১৬১ রান। জয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ৩৯ রান অষ্ট্রেলিয়া করল অনায়াসে—হাতে তখনো পুরো একদিন।

ভারতের এ পরাজয় অত্যন্ত মর্মান্তিক। বিশ্বনাথ ফ্রিম্যানের বলে 'ইয়রকড' হন, ওয়াদেকার এবং কিছু অংশে সোলকার ও অম্বর রায় ছাড়া বাকী ব্যাটসম্যানরা সুইং ও সীম বোলিংয়ের বিরুদ্ধে হলেন যেন দিশেহারা, কিন্তু এ ধরনের ব্যাটিংয়ের জন্যে মাঠের কোনো দর্শকই প্রস্তুত ছিলেন না।

অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক টসে জিতে ভারতকে প্রথম ব্যাট করার জন্যে আমন্ত্রণ জানাবার পিছনে ছিল বহুদিন বাদে ইডেনের স্পোর্টিং উইকেট এবং অষ্ট্রেলিয়া দলের দুর্ধর্ষ

পেস বোলার ম্যাকেঞ্জি। সিদ্ধান্তের সাফল্য প্রমাণিত হয় যখন প্রথম দিনের খেলার শেষে বিশ্বনাথেব মনোরম ৫৪ রান এবং সোলকারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অপরাজিত ৪১ রান সত্বেও সাতটা উইকেটের বিনিময়ে ভারতের রান সংখ্যা হয় মাত্র ১৭৬।

শুধু স্পোর্টিং উইকেট নয়, ভারী আবহাওয়া, মেঘলা দিনের অস্পষ্ট আলো, সবই সুইং ও সীম বোলারদের সহায়ক। নাটকীয়ভাবে ম্যাকেঞ্জি ভারতের শূন্যের কোটায় ইঞ্জিনিয়ার এবং ওয়াদেকারকে ফিরিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে অশোক মানকড়কেও। স্কোর বোর্ডে তখন মাত্র ২২ রান। এই ভরাডুবি থেকে আংশিকভাবে বাঁচালেন বিশ্বনাথ ও পতৌদি। জাত ব্যাটসম্যান বিশ্বনাথ—মারের বহরে বোঝা যায়, কিন্তু ম্যালেটের জোর বলে ঠকে গেলেন। নতুন বলে সুইংয়ের মাথায় খেলা বারণ, তবু এ অঘটন হরদম হয়ে থাকে—ইঞ্জিনিয়ার ও ওয়াদেকারের কাল হ'ল। এদিন লরির অধিনায়কত্ব উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। দলের ম্যাচ ধরাও প্রথম শ্রেণীর, যার ভেতর দর্শনযোগ্য হয়েছিল স্ট্যাকপোলের বেঙ্কটরাঘবনের ক্যাচ ধরা।

দ্বিতীয় দিন ম্যাকেঞ্জির বলে হুক করতে গিয়ে সোলকার আউট হলেও, প্রসন্ন ২৬ রানের সাহায্যে ৮০ মিনিট ব্যাট করে ভারতের রান সংখ্যা হয় ২১২। অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসের ব্যাট করতে নেমে ২ উইকেটের বিনিময়ে ৯৫ রান তোলে। স্ট্যাকপোল এমন জাতের ব্যাটসম্যান, যিনি খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। তিনি যতক্ষণ ছিলেন দ্রুতগতিতে রান ওঠে, সে হিসেবে মানকড়ের তাঁকে রান আউট করা ভারতের পক্ষে অমূল্য বলা চলে। লরি একটা ওভার বাউণ্ডারী মারলেও তাঁর খেলা খুব মনোরম হয়নি। চ্যাপেল ও ওয়ালটারস বড় ব্যাটসম্যান, কিন্তু তাঁদের শুরু থেকে প্রসন্ন ও বেদীর বলে দু-একবার নাজেহাল হতে দেখা গেছে। ৩—২৫ মিনিটে আলো ঠিক ছিল না। খেলোয়াড়রা আবেদন জানালে আম্পায়ারদ্বয় রাজী হন। খেলা সেদিনের মতো বন্ধ থাকে।

তৃতীয় দিন বেদী দুর্দান্ত বোলিং করে ৯৮ রানে সাতটা উইকেট নেওয়া সত্ত্বেও, প্রায় সারাদিন ব্যাট করে চ্যাপেলের সুন্দর ৯৯ রান, ওয়ালটারসের ৫৬ রানের সাহায্যে অষ্ট্রেলিয়ার মোট রানসংখ্যা হয় ৩৩৫—অর্থাৎ প্রথম ইনিংসে তারা ভারতের থেকে ১২৩ রানে এগিয়ে থাকে। প্রসন্ন ভালো বল করেও একটাও উইকেট পাননি। চ্যাপেল, ওয়ালটারসের ব্যাটিং খুবই উচ্চাঙ্গের হয়। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১২ রান তোলে।

চতুর্থ দিন মানকড় ও ইঞ্জিনিয়ার আউট হলেন। মাত্র ৪০ রানে তিনটে উইকেট পড়ার পর সোলকার এগিয়ে এসে ওয়াদেকারের সঙ্গে জুটিতে ৫০ রান করলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের দশ মিনিট আগে কনোলীর বলে সোলকার লেগ বিফোর হলেন। অবস্থা শোচনীয় হ'ল যখন

মধ্যাহ্ন ভোজের পরই ম্যালেটের বলে পতৌদি আউট হলেন। ওয়াদেকার একদিকে খেলছিলেন উচ্চাঙ্গের খেলা, অপর দিকে উইকেট পড়ছে হরদম। অম্বর রায়-ওয়াদেকার জুটিতে রান ওঠে ৪৮। কিন্তু অম্বর রায় কনোলীর বলের স্পীড না বুঝতে পেরে আগে খেলে ক্যাচ তুললেন কভারে, শিহান ঝাপিয়ে পড়ে ধরলেন সে ক্যাচ। শেষ পর্যন্ত ওয়াদেকার ফ্রিম্যানের বলে লেগ-বিফোর হ'ন। সত্যি কথা, ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে খেলার মতো খেলা একমাত্র খেলেছিলেন ওয়াদেকারই।

১৬১ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর জয়ের প্রয়োজনীয় ৩৯ রান করার জন্যে অষ্ট্রেলিয়া দল ৫৫ মিনিট সময় পান। বিল লরি ও স্ট্যাকপোল মাত্র ১৭ মিনিটে ৫ ওভার বল খেলে ৪২ রান সংগ্রহ করেন। ৪২ রানের মধ্যে ৩৬ রানই সংগৃহীত হয় ন'টা বাউণ্ডারি থেকে।

ক্রিকেট (পাক-নিউজিল্যাণ্ড টেস্ট)

ভারতে শেষ টেস্টের শেষ দিনে বৃষ্টির জন্যে 'রাবার' লাভে বঞ্চিত নিউজিল্যাণ্ড দল পাকিস্তান দলকে টেস্ট খেলায় হারিয়ে সর্বপ্রথম 'রাবার' পেয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটা নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম রাবার এবং নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বছরে তাদের এই রাবারের গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

পাকিস্তানে তিনটে টেস্টের মধ্যে করাচীর প্রথম টেস্টে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। লাহোরের দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড পাঁচ উইকেটে জয়ী হয়। ঢাকার তৃতীয় টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে।

পাকিস্তানে এই টেস্ট খেলাগুলো ছিল চারদিনের। প্রতি টেস্টেই দেখা গেছে নাটকীয় দ্বন্দ্ব এবং জয়-পরাজয়ের আশা-নিরাশার দোলা।

টেনিস (ভারত-স্পেন টেস্ট)

কলকাতার সাউথ ক্লাবের হারড কোরটে ভারত ও স্পেনের বে-সরকারী টেনিস টেস্ট উপলক্ষে মনোরম আসর বসেছিল। দু'দিনব্যাপী আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন ১৯৬৬ সালের উইম্বলডন বিজয়ী এবং বর্তমান অ্যামেচার টেনিসের সুখ্যাত খেলোয়াড় ম্যানুয়েল সান্তানা। এবং তিনি টেনিসের সব রকমের মার এবং সুক্ষ্ম কলাকৌশল দেখিয়ে দর্শকদের প্রত্যাশিত আশা পরিতৃপ্ত করে গেছেন।

বে-সরকারী টেনিস টেস্টের পাঁচটা খেলায় স্পেন ৩-২ খেলায় ভারতকে পরাজিত করে। প্রথম দিনের দুটো সিঙ্গলসের ভেতর সান্তনা ১০-৮ ও ৬-২ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় সিঙ্গিলসে প্রেমজিতলাল ৬-৩ ও ৬-২ গেমে লুই আরিলার বিরুদ্ধে বিজয়ী হন।

এই খেলার শেষে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক টেনিস মান থেকে ভারত অনেক পিছিয়ে পড়েছে। আজ ভারতে এমন কোনো টেনিস খেলোয়াড় নেই, যিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের সঙ্গে সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে পারেন।

হাতে-গড়া নৌকায় অতলান্তিক পাড়ি

দুই ভাই রল্‌ফ্ আর গেরহার্ট কাজিবেক। তিন বছর খেটে ভাঙাচোরা জাহাজের অংশ জুড়ে একটা সাঁইত্রিশ ফুট নৌকো বানিয়ে তারা ও তাদের দুজন বন্ধু মিলে জেনোয়া বন্দর থেকে ছেড়ে অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে পৌছে আবার সেখান থেকে ফিরে এসেছে। এই পরিক্রমায় তারা বাইরে থেকে কিনেছিল একটা শর্টওয়েভ ট্রান্‌সমিটার ও একটা ত্রিশ ঘোড়ার ইঞ্জিন। ৯,১০০ সামুদ্রিক মাইল পাড়ি দিতে তাদের দেড় বছর লেগেছে।
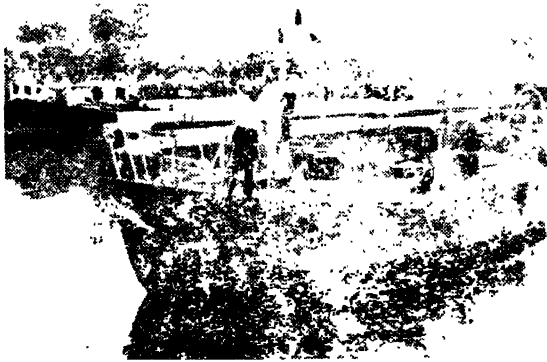
যাযাবর ভূত

অটো সিলভারহর্নের বয়স পঞ্চাশ, জাতে জার্মান, পেশায় স্বর্ণকার। বেশ কয়েক বছর ধরে সে সারা দুনিয়ায় যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ লণ্ডন, কাল প্যারিস, কখনো ইটালী, কখনো স্পেন। বহু ছবিতে সে যাযাবরের ভূমিকায় পার্ট করেছে। দরকার হলে

রাখাল, জেলে, মালীগিরি কোরে পয়সা রোজকার করে। দেশ-বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে সিলভারহর্ন গোটা ছয়েক ভাষা শিখে ফেলেছে। কিছুদিন আগে সে যখন তার গ্রাম দেখতে এসেছিল, তখন সবাই তাকে দেখে আঁতকে উঠেছিল, কারণ সরকারী নথিপত্রে সে তার 'দেশবাসী ও পিতৃভূমির জন্য' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে বলেই রেকর্ড হয়ে গিয়েছিল।

ঠোঙায় ভরা কবিতা

পশ্চিম জার্মানীর সাহিত্যের বাজারে নতুন চমক ঠোঙায় ভরা কবিতা। প্লাস্টিকের ঠোঙায় প্লাস্টিকের ওপর ছাপা রকমারী চুটকি কবিতা পয়সা ফেলে কিনতে পারেন। কিনে এনে বাজারের থলেতে লাগাতে পারেন, ঘরে টাঙিয়ে রাখতে পারেন, কিংবা কাউকে উপহার দিতে পারেন। তাছাড়া প্লাস্টিকে ছাপা বলে এগুলি ভেজে না।

এই চুটকি কবিতা যদি বাজারে চলে, তাহলে প্রকাশকরা উঁচুদরের কবিতাও বাজারে ঠোঙায় ভরে ছাড়বেন বলে জানিয়েছেন। কবিতা ছাড়া পশ্চিম জার্মানীতে আজকাল ভাস্কর্যের নকল ছাপিয়ে আসবাবপত্রের দোকান থেকে বিক্রি করা হচ্ছে। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কথা হচ্ছে যে, গণতন্ত্রের যুগে শিল্প ও সাহিত্যকে মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

উটের দৌড়

ইউরোপে উটের দৌড় এই প্রথম। মরোক্কো থেকে আনা আটটি উট এতে যোগ দিয়েছিল। ছ'হাজার মিটারের দৌড়ে যে উটটি বজি জিতেছে, তার নাম তুয়ারাক ১। সময় লেগেছে ১৬ মিনিট ২১'২ সেকেণ্ড। পুরস্কার হিসেবে চালককে সোনার চেন লাগানো সোনার একটি গোলক দেওয়া হয়েছে।

১। তড়াগ সলিল মাঝে ফুটেছে কমল,
জুটেছে মধুর আশে মধুপ সকল।
বসিল প্রত্যেক অলি প্রত্যেক ফুলেতে,
একটির বসিবার স্থানাভাব তাতে।
প্রতি ফুলে বসি দুই, সবে স্থান পেল।
তড়াগের পুষ্প, অলি, সংখ্যা কত বলো?

শ্রীঝুমুর রায় (বোম্বাই)

২। শীতকালে জন্ম মোর
গ্রীষ্মকালে ক্ষয়;
বড়ই আশ্চর্য মোর
হাড়ে লোম হয়।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিপুরা)

৩। তিনজন, ছয় চরণ
কিন্তু চার পায়ে চলে
সপ্ত মাথা, অষ্ট জিহ্বা
উনিশ লোচন জ্বলে।

শ্রীকামিনী কর (বজবজ)

৪। এবার তাড়াপুকুরের মেলায় ৫ টাকায় একটা বানর, ২ টাকায় একটা ভেড়া, ১ টাকায় দুটো খরগোশ ও ১ টাকায় পাঁচ জোড়া সাদা ইঁদুর বিক্রি হয়েছিল। একজন লোক একশো টাকা নিয়ে মেলায় গিয়ে ঐ দরে সকল রকমের একশোটি বস্তু কিনলেন। বলো দেখি, তিনি কোন কোন রকমের জন্তু ক'টা করে কিনেছিলেন?

শ্রীমহাদেব মাইতি (মেদিনীপুর)

৫। তিনটি ছেলে একটি বাড়িতে থাকে। তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বাড়ি ফিরে আসে। সকালে সদর দরজার কড়ায় তিনটে তালা লাগিয়ে তারা চলে যায়। তিনটি তালার তিনটি চাবি তিনজনের কাছে থাকে, একটি তালার চাবি অপর তালাটিতে লাগে না, অথচ যে যখন আসে তালা খুলে দরজার ভেতর দিয়ে বাড়িতে ঢোকে। এটা কি করে সম্ভব?

শ্রীরবি সোম (কলকাতা)

(উত্তর আগামীবারে বেরুবে)

মধুচক্র

অনেকদিন পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হলো। বিজয়ার শুভেচ্ছা, ভাইফোঁটার ভালবাসা—এসব পার হয়ে এসেছি, তবু তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বসলেই সেই কথা মনে হয়।

সব উৎসবের দিনগুলি গড়িয়ে, পরীক্ষার দ্বার ছেড়ে প্রথম তোমাদের উদ্বেগজনক বিশ্রাম—ফল ভালই হবে আশা করি। এদিকে শীতের মরশুম পড়ে গেছে, খেলাধূলো ও অন্যান্য সবকিছুই পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়েছে। এবার শীরটাকে সুস্থ করে নেবার সময়ও এলো। ধীর-স্থির হয়ে, শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে, এবার তোমাদের নতুন বছরে নতুন করে চলবার পালা—আশা করি মনে রাখবে।

জীবনজ্যোতি কথা

প্রতিদিন কত ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে—কেউ তার হিসেব রাখে না—কিন্তু কখনও কখনও এমন সব ঘটনা ঘটে, যার কথা মানুষ যুগ যুগ ধরে মনে রাখে। এমনি এক ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে পাঞ্জাবের তালবন্দি গ্রামে। এইখানে এক মধ্যবিত্ত ছত্রীপরিবারে জন্ম হয়েছিল শিখগুরু 'নানক'-এর। পরিবারের অর্থ-সামর্থ তেমন ছিল না তাই সামান্য লেখাপড়া শেখার পর তাঁকে বেরোতে হলো কর্মসংস্থানে। এক ব্যবসায়ীর কাছে কিছু দিন কাজ করলেন, কিন্তু কাজের প্রতি তেমন আগ্রহ তাঁর দেখা গেল না। ওজন করতে গিয়ে কোথায় চলে যেতো মন—হিসেবে গরমিল হয়ে যেতো। অনেক সময় দুঃস্থ-দরিদ্রকে অর্থ বিলিয়ে ফিরে আসতেন শূন্য হাতে। কাজের অবসরে তাঁকে দেখা যেত নদীর ধারে খোলা আকাশের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতে। সংসারের বোঝা চাপানো হলো, কিন্তু তবুও তাঁর নির্বিকার ভাব মিটলো না। বিয়ের কিছুদিন পরেই তিনি নিজেকে আর সংসারের মধ্যে বেঁধে রাখতে পারলেন না। যে সত্যকে তিনি জেনেছিলেন—সকলকে তা জানিয়ে দেবার ভার নিলেন। তাই ছোট্ট পরিবারের গণ্ডী তাঁকে আবদ্ধ করতে পারলো না। সারাদেশ পর্যটনে বার হলেন—তাঁর কণ্ঠে সঙ্গীত, মানুষে মানুষে ভেদ ঘুচে দেবার মন্ত্র তাঁর মুখে। বাইরের অনুষ্ঠান পালন করলেই ধর্মপালন হয় না, একথাই তিনি সকলকে বোঝাতে চাইলেন। অনেকে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। ক্রমে একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠলো, তাঁকে কেন্দ্র করে। পাঞ্জাবের সীমানা পেরিয়ে তিনি আর তাঁর অনুগামীরা পর্যটন করলেন সারা উত্তর-ভারত। ক্রমে পশ্চিম-পূব দক্ষিণ-ভারতেও তাঁদের পরিক্রমা। নতুন পথের সন্ধান পেলো মুক্তিকামী নরনারীর দল—কিন্তু এতেও পরিতৃপ্ত হলো না নানকের মন। এবার পর্যটন ভারতের বাইরে। অপরিচয়ের কোনো বাধাই তাঁকে নিরস্ত করতে পারলো

না, কারণ তিনি মানুষের কাছে কথা কহিতেন না, তিনি কথা কহিতেন প্রাণের ভাষায় আর শুধু কথা নয় গান, সে স্বর্গীয় সংগীত একেবারে মর্মে স্পর্শ করতো। তাদের মনে হতো ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে কোনো ভেদই নেই।

উপলব্ধ সত্যকে প্রচার করার আগ্রহ নিয়ে তিনি বহুদেশ পর্যটন করেছিলেন। মুসলমানদের পবিত্র তীর্থভূমি মক্কাও বাদ যায়নি। সেখানে ক্লান্ত শিখগুরু বিশ্রাম লাভের আশায় শুয়ে আছেন—এমন সময় একজন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে: আপনি কাবার দিকে পা দিয়ে শুয়ে আছেন—পা ঘুরিয়ে নিন।

নানক হেসে বললেন: সেখানে যাঁর উপাসনা হয়—সেই খোদাতালা যেদিকে নেই দেখিয়ে দাও সেখানে পা রাখবো।

হরিদ্বারে ভ্রমণের সময়ে এমনি তাঁর আর একটি অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। দেখতে পেলেন গঙ্গাতীরে সূর্যমুখী হয়ে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হচ্ছে। নানক তাদের পাশে গিয়ে এক গণ্ডুষ জল নিয়ে নিক্ষেপ করলেন পশ্চিম দিকে। সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলো—পশ্চিমে নয়, পূর্বদিকে জল নিক্ষেপ করলে পিতৃপুরুষেরা পাবে।

নানক বললেন, আমার জন্মভূমি তালবন্দি, পশ্চিম দিকে—তাই সেদিকেই জল ফেললাম, কিন্তু জানি সেখানকার জমিতে এ জল পৌঁছবে না। আর তোমরা ভাবছ সূর্যমুখী হয়ে জল নিক্ষেপ করলে এ জল পৌঁছবে তোমাদের পূর্বপুরুষরা যেখানে রয়েছেন সেই লোকে? এমনি করেই নানক সাধারণের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করতেন, বিশ্বাস করতেন—ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, তার মহিমা ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্ব-চরাচরে। তাঁর নামগানের মধ্যে মানুষ পাবে মুক্তি, মোল্লা আর পুরোহিতদের প্রাধান্য তিনি মানতেন না। জাতিভেদেরও কোনো মূল্য স্বীকার করিতেন না। মানুষের একমাত্র পরিচয় সে ভগবানের সন্তান, তাঁরই জন্য উৎসর্গীকৃত।

রাজারাজড়ার কথা, দিগ্বিজয়ী বীরের কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষের মনের পাতায় তাঁরা দাগ কাটেন না, কিন্তু এমনি মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন যাঁদের কথা যুগ-যুগান্তরেও মানুষ ভোলে না। নানক ছিলেন এমনি অবিস্মরণীয় মানুষ—তাই শিখগুরু নানকের জন্ম মুহূর্তটি পাঁচশো বছর পরেও আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হচ্ছে। নানক আর শ্রীচৈতন্য ছিলেন একই যুগের মানুষ। পাঞ্জাব আর বাংলা এঁদের জন্মভূমি, কর্মস্থল সারা ভারতবর্ষ।

তিনি বলতেন: সৃষ্টির আদিতে সত্য ছিল, যুগের প্রারম্ভে সত্য ছিল, বর্তমানেও সত্য রয়েছে, ভবিষ্যতেও সত্য থাকিবে।'

শুভেচ্ছা সহ—

তোমাদের—মধুদি'

সম্পাদক: শ্রীসুপ্রিয় সরকার
শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য: ০·৬০ পয়সা

পশ্চিম জার্মানীর সেণ্টা ক্লস
(উপরে ছেলেরা কেরল গান গাইছে)

৫০শ বর্ষ] মাঘ ঃ ১৩৭৬ [১০ম সংখ্যা

সীমান্ত-গান্ধীর জন্মদিনে

সু—মো—দে

নাম সীমান্ত-গান্ধী তোমার
আবদুল গফ্‌ফর।
আজাদী জেহাদে বীর সেনাপতি
কীর্তি অনশ্বর।

মহাত্মাজীর পরম ভক্ত
বিবেক-পন্থী মানুষ শক্ত,
গান্ধীবাদের মূর্ত প্রতীক
অহিংসা বিশ্বাসী ;
হিঁদু-মুসলিম দুই এক প্রাণ
সবাই ভারতবাসী।

সুধী আবদুল গফ্‌ফর খান
নির্ভীক নেতা পূত মহাপ্রাণ,
জন্মদিবসে সম্ভ্রম সহ
জানাই অভিবাদন ;
তোমারে লোভিয়া খুশি দেশমাতা
কৃতার্থ জনগণ।

বায়না

শ্রীনিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কাঁদছে খোকা দিন-রাত্তির বায়না ভারী তার
হাতের কাছে চাঁদ পেতে চায় নয়কো কিছু আর।
দাদা তারে কত ভুলায় দিদি আদর করে
খোকা তবু কেঁদে কেঁদে তেমনি বায়না ধরে।
পরিয়ে দিয়ে আদর ক'রে নতুন রঙিন জামা
ছাতের 'পরে নাচায় তারে কাঁদে তুলে মামা।
নাচের তালে লাগলো যে ঘুম খোকার চোখে এসে
মামার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে শেষে।
ঘুমের ঘোরে দেখল খোকা যাচ্ছে ভেসে ভেসে
আঁধার রাতে অসীম পথে চাঁদা-মামার দেশে।
তারাগুলি দূর আকাশে জ্বলছে মিটিমিটি
পৃথিবীটা ক্রমেই যেন হচ্ছে গুটিগুটি।
কালো আকাশ এমনি কালো যায় না বলা তারে
উল্কারাশি চাঁদের পথে ঘুরছে ভীষণ জোরে।
চাঁদটি ক্রমেই হচ্ছে বড় যাচ্ছে মুছে হাসি
গা যেন তার ভাঙাচোরা গর্ত রাশি রাশি।
নেইকো সেথা মোটেই হাওয়া ঠাণ্ডা বেজায় রাতে
ভীষণ গরম দিনের বেলায় সূর্যি ওঠার সাথে।
নিথর এক রুক্ষ জগৎ নাইকো শ্যামল কিছু
ঘুরছে কেবল কক্ষপথে পৃথিবীটার পিছু।
খোকা ভাবে, এই কি সে চাঁদ, চেয়েছিলাম যারে
নাইকো সেথায় জনমানব কাছে কিংবা দূরে।
ভাঙল যে ভুল মিটলো আশা দেখলো পিছন ফিরে
ধরণীরে আছে যেন আলো-আধার ঘিরে।
ঘুমটি খোকার গেল ভেঙে দেখলো চেয়ে দূরে
চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে আকাশ মাটি জুড়ে।
চাঁদকে সে আর চায় না কাছে, দেখেছে তার হাসি
নিথর নিঝুম স্তব্ধপুরি গর্ত রাশি রাশি।
মামাকে সে বল্লে চুপে, চাঁদ চাই না তার
অমন করে বায়না কভু ধরবে নাকো আর।

অন্নপূর্ণা-বিজয়

হালদার

খাড়া বরফের পাহাড়।

বরফ আর বরফ। সাদা জমাট বাঁধা বরফের স্তূপ।

ওঁরা দু'জন ফিরে চলেছেন উৎরাইয়ের দিকে। পিচ্ছল বরফের প্রাচীর পা রাখা যায় না। কাঁটাওয়ালা জুতোয় ভর দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে হচ্ছে। কোমরে বাঁধা দড়ি আর ডান হাতে বরফ-কুঠার। মাঝে মাঝে তুলোর মতন ঝুরো বরফ। দেখে, বুঝে পা ফেলতে হয়।

সূর্যের মুখ ম্লান হয়ে আসছে। আসন্ন শীতের রাত।

ওঁর দু'জন পর্বতারোহী—মরিস হারজোগ আর ল্যুই লাচেনাল।

অপরাজেয় অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ জয় করার জন্য ওঁরা শেষ ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছিলেন। মনে ছিল দুরন্ত শপথ—জয়ী ওঁরা হবেনই। ছাব্বিশ হাজার চার শ' বিরানব্বুই ফুট উঁচু অন্নপূর্ণার শিখরে ফরাসীদেশের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে তাঁরা এক অসমসাহসিক কাজ করবেন। কিন্তু কাজটা তো সহজ নয়। পদে পদে বিপদ। মরণ যেন এখানে এই হিমালয়ের বরফ চূড়ায় ওত পেতে আছে। একবার পা পিছলে গেলে কিংবা হাত ফসকালে গড়িয়ে পড়তে হবে হাজার ফুট নীচে বরফের খাদে। সভ্য জগতের কাছে খবরটুকুও পৌঁছবে না।

এত উঁচুতে মেঘেরা ঘর বাঁধে না।

খাড়াই উঁচু উঁচু বরফের শৃঙ্গ। মাঝে মাঝে খসে খসে পড়ছে বড় বড় বরফের চাঙড়—দুরন্ত তার গতিবেগ। চোখের নিমেষে পথের সামনে সব কিছু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওগুলো ভয়ংকর হিমবাহ।

বাতাসের চাপ ক্ষীণ। অক্সিজেনের অভাবে উৎরাইয়ে কষ্ট করে নামতে বুকে হাঁফ ধরে—চড়াইয়ের পথে পা আর উঠতে চায় না। দেহের শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হয়ে আসে।

কিন্তু থামলে চলে না।

এখন এখানে থামার অর্থ মৃত্যু। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে খোলা তুষার-ঢাকা শিখরে রাত কাটালে দেহ জমে পাথর হয়ে যাবে। মৃত্যু গ্রাস করবে। এর উপর যদি তুষার-ঝড় সুরু হয়, তাহলে অভিযানকারীর শীত-জমা দেহ পেঁজা তুলোরমত বরফের কুঁচোয় ঢাকা পড়ে যাবে।

উদ্ধারকারী বন্ধুরা খুঁজেও পাবে না মৃতদেহগুলো।

অক্সিজেন সিলিণ্ডার আনা উচিত ছিল—কিন্তু ওঁরা আনেন নি। বাড়তি ভারবহন করবেন না বলে, আর তাড়াতাড়ি অভিযান শেষ করার আশায়, ওঁরা ভার-মুক্ত হয়ে এসেছিলেন। এখন অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ল্যুই ল্যাচেনাল নামকরা ফরাসী পর্বত-আরোহী। হিমালয়ের পথ-ঘাট চেনেন—জানেন বরফ-ঢাকা চড়াই-উৎরাইয়ে পথচলার নিয়ম-কানুন। এক সময় উনি বলেছিলেন চল, ফেরা যাক। অক্সিজেন-ম্যাস্ক নিয়ে আসছে-কাল উঠলেই হবে।

অভিযানের নেতা মরিস হারজোগ। যুবক। মনে দুরন্ত সাহস। অজেয়কে জয় করবার, যা বিপদসঙ্কুল তার বুকের উপর হেঁটে যাওয়াই তাঁর সাধনা। না না—ওই তো দেখা যাচ্ছে অন্নপূর্ণার শৃঙ্গ। এই পথটুকু পার হতে পারলে ওঁরা পৌছে যাবেন শিখরে—আজ পর্যন্ত কোনও মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি যে বরফের স্তূপে ওঁরা সেখানে হাজির হবেন।

সৃষ্টি করবেন পর্বত আরোহণের ভাস্বর নজির।

হারজোগ বললেন—না, আমি ফিরব না।

শপথ-কঠিন মানুষের কাছেই তো দুর্গম বাধা পরাজয় স্বীকার করে। অসীম সাহসীই তো এগিয়ে যায় সেই পথে—যে পথের কল্পনায় দুর্বলের হৃদয় কেঁপে ওঠে ভয়ে। বিপদের ঝুঁকি যে নেয় সেই হয় বিজয়ী।

অবশেষে ওঁরা অন্নপূর্ণার শিখরে উঠলেন।

সেটা উনিশ শ' পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দের তেসরা জুন।

মেঘের রাজপুরী ছাড়িয়ে বরফের মিনারে উঠে দেখলেন এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। বরফ আর বরফ—কে যেন ছোট বড় আগুনতি বরফের তাঁবু খাটিয়ে রেখেছে। রুপোলী রোদে ওগুলো ঝিকমিক করছে। গলে বরফ নামছে নীচের দিকে, কিন্তু অফুরন্ত এই বরফের ভাণ্ডার। ফুরিয়েও ফুরোয় না।

নির্জন নিথর পরিবেশ। একটানা বইছে কনকনে হাওয়া।

আর সেই হাওয়ায় উড়ছিল ফরাসী দেশের জাতীয় পতাকা।

মরিস হারজোগ ছবি তুলছিলেন।

ল্যুই ল্যাচেনাল বললেন—সূর্যের দিকে দেখ। বেলা পড়ে আসছে। এর পর যদি তুষার ঝড় সুরু হয় তা'হলে ক্যাম্পে ফেরা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

অভিযানের বিপদ সম্বন্ধে হারজোগ যথেষ্ট হুঁশিয়ার। কিন্তু তবু এমন প্রাকৃতিক

দৃশ্যকে নিথর ছবির মধ্যে ধরে রাখবার জন্য দারুণ ইচ্ছা হয়েছিল ওঁর মনে। চারিদিকের ছবি তুলছিলেন। সূর্য আরও ঢলল পশ্চিমে—তেজ কমল।

তারপর এক সময় ওঁরা নামতে শুরু করলেন।

ফরাসী পর্বত-আরোহী দল আসলে বেরিয়েছিলেন ধবলগিরি শৃঙ্গ জয় করার জন্য। ধবলগিরিও অপরাজেয় পর্বত-শৃঙ্গ। নেপালের গভীর পার্বত্য-জঙ্গল পার হয়ে ওঁরা হাজির হলেন বরফ-ঢাকা হিমালয়ের পর্বতশৃগগুলোর রাজ্যে। ওখান থেকে মানচিত্র দেখে চলতে হয়। বাঁধা-ধরা আর কোনও পথ নেই।

অভিযানের দিনগুলো খুবই সীমিত।

শীতের শেষে সুরু। তখনও জমাট-বাঁধা বরফ গলতে আরম্ভ করে না। সূর্যের তেজও থাকে স্তিমিত। তারই মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বরফ-প্রান্তর পার হতে হয়। গ্রীষ্মের সুরু থেকে বরফ গলতে থাকে। বড় বড় বরফের চাঙড় নামতে থাকে পাহাড়ের গা বেয়ে। তখন এই হিমবাহ-পথ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

হিমবাহ-প্রান্তরের সীমানায় হাজির হয়ে ফরাসী অভিযানকারীরা দূরে ধবলগিরির চূড়া দেখলেন। ওর উচ্চতা ছাব্বিশ হাজার আট শ' এগার ফুট। কিন্তু ওর পাদ-দেশে যাওয়া একরকম অসম্ভব কাজ। ও-পথে এর আগে কেনোও মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি।

ধবলগিরির পাশেই অন্নপূর্ণা।

ওঁরা অন্নপূর্ণার শৃঙ্গে আরোহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। এ-পথেও মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। তবে অনুসন্ধানী দল অনেক পরিশ্রম করে বেস-ক্যাম্প তৈরী করার উপযুক্ত স্থান পেলেন।

সুরু হ'ল বরফ-প্রান্তর পার হয়ে অন্নপূর্ণা শৃঙ্গে আরোহণের লড়াই।

শৃঙ্গ থেকে কয়েক শ' ফুট নীচে চতুর্থ ক্যাম্প।

হারজোগ এবং ল্যাচেন্যাল খুব সাবধানে নামছিলেন।

এক সময় ল্যাচেন্যাল দেখলেন হারজোগের দু'হাতে দস্তানা নেই। শুধু হাতে হারজোগ বরফের চাঙড়া আঁকড়ে ধরে ধরে নামছেন।

সভয়ে বললেন—তোমার দস্তানা কোথায় গেল ?

খুলে গেছে। খুঁজে পাচ্ছি না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হারজোগের হাত দু'খানা ঠাণ্ডায় নীল হয়ে এল। শক্ত বরফের

মত হয়ে গেল। বরফ-ক্ষত। এরপর একদম অক্ষম হয়ে যাবে। কিন্তু থামবার উপায় নেই। ওদিকে দ্রুত আলো কমে আসছে। হাওয়ার জোর বাড়ছে।

সহসা একটা হিমবাহ নেমে এল।

দু'জনে দু'দিকে ছিটকে পড়ে। বরফের টুকরোগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যায় অনেক নীচে।

অধিনায়ক হারজোগ একখানা বরফের শক্ত চাঙড়া আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচিয়েছেন। খাদে পড়ে যাননি। আবার নামতে থাকেন। কিন্তু ল্যাচেনাল কই? কোথাও তো তাকে দেখা যাচ্ছে না! তবে কি হিমবাহের চাপে পিষ্ট হয়ে খাদে পড়ে গেছে? খাড়াই পাহাড়ের গায়ে লম্বমান দড়িতে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে যতদূর সম্ভব মাথা তুলে হারজোগ একবার চারিদিক দেখে নিলেন। না কোথাও তো ওকে দেখা যাচ্ছে না।

—ল্যাচেনাল! ল্যাচেনাল! ডাকলেন হারজোগ।

কেউ সাড়া দিল না।

হারজোগ আবার নামতে থাকেন।

টপ-ক্যাম্পে একাই হাজির হয়ে হারজোগ শিখর বিজয়ের কথা বললেন।

রিবুফাত আর টিরে অবাক হয়ে ওঁর ঠাণ্ডায় শিঁটিয়ে যওয়া দু'খানা হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—ল্যাচেনাল কোথায়?

—হারিয়ে গেছে বরফের মধ্যে। হাঁফাতে হাঁফাতে জবাব দিলেন হারজোগ।

সহসা বাইরে থেকে মৃদু একটা চিৎকারের আওয়াজ ভেসে এল।

—বোধ হয় ল্যাচেনাল ডাকছে। পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

রিবুফাত আর টিরে তাড়াতাড়ি ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর ল্যাচেনালের সন্ধান পাওয়া গেল। উনি বরফের খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। ঠাণ্ডায় তার দু'খানা পা-ই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

রাত কাটল—অনেক দুঃখের রাত।

সকাল হ'ল তুষার ঝড়ের মধ্যে।

ওঁরা আবার নামতে লাগলেন। দুর্বার গতিতে হাওয়া বইছে—গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার ঝরছে। বরফের দেওয়ালে বারে বারে পা পিছলে যায়। আশঙ্কা হয়, ঝড়ের দাপটে এই বুঝি ওঁরা ছিটকে পড়ে যান বরফের খাদের মধ্যে। সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। দিনের বেলায় চারিদিক আঁধারে ঢাকা!

এর উপর চলতে চলতে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন ল্যাচেনাল ।

সে রাতে সেইখানেই ওঁদের রাত কাটাতে হ'ল। ওঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওঁরা পথ হারিয়েছেন। এখন নূতন করে পথ খুঁজে পাওয়া শক্ত।

পরের দিন আবার নামা সুরু হ'ল।

সবাই দু'নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছলেন।

হারজোগ আর ল্যাচেনাল হাঁটার শক্তি একদম হারিয়েছেন ।

'স্কি'-তে করে ওঁদের বেস-ক্যাম্পে আনা হ'ল। তারপর শেরপাদের সাহায্যে ওঁদের আনা হ'ল নীচে। ওঁদের হাত-পায়ের বরফ-ক্ষত থেকে গ্যাংগ্রীন দেখা দিয়েছিল। দু'নম্বর ক্যাম্পে অস্ত্রোপাচার করেও কোনও ফল হ'ল না।

অন্নপূর্ণা শিখর জয়ের মূল্য দিতে হ'ল হারজোগ আর ল্যাচেনালকে ;

ল্যাচেনালের পায়ের আঙলগুলো কেটে ফেলতে হ'ল।

আর হারজোগের হাত ও পায়ের সব ক'টি আঙুল অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হ'ল।

ফরাসীদেশের মানুষ তাদের বীরদের আজও ভোলেনি ।

মরিস হারজোগ পরবর্তীকালে ফ্রান্সের ক্রীড়ামন্ত্রী হয়েছিলেন। সত্যিকারের একজন খেলোয়াড় হয়েছিলেন খেলাধূলার মন্ত্রী।

বড়দিন

শ্রীক্ষিতীশ সাঁতরা

বড়দিন, বড়দিন বড়ই তো সত্য,
জড়তা ভেঙেছো, দিয়ে আলোকের তথ্য।
তুমি এলে তাই আজ আলোকিত বিশ্ব,
করুণার ধারে তব ভরে যত নিঃস্ব।
শোনালে নতুন কথা, একেবারে ভিন্ন,—
"পাপকেই ঘৃণা করো, পাপী নহে ঘৃণ্য।"
ক্ষমা তব অমলিন ঝ'রে পড়ে হাস্তে,
প্রেমে জয়ী, বাঁধা তুমি প্রেমিকের দাস্তে।
আজকের হানাহানি, নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব,
জাগায়ে মানুষে আজ করোগো তা বন্ধ—
তোমার অমর ছবি মনে আনে শক্তি
ক্রুশে মাথা নত করি, লহ যত ভক্তি।

বুড়ী চাঁদ ও বুড়ো সূর্য

(সাঁওতালী উপকথা)

শ্রীসুখেন্দু দত্ত

রাত্রির কালো আকাশে রাশি রাশি তারা ঝলমল করে। দিনের আলোয় দেখা যায় না, কিন্তু আঁধার হয়ে এলেই রাতের কালো শাড়ির উপর কেমন হাজার হাজার তারার চুমকি জ্বলে ওঠে। যুগ যুগ ধরে তারা এমনি করে আমাদের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে, তাকে আলো দিচ্ছে।

তোমরা মাঝে মাঝে হয় তো ভাব, দিনের বেলা দেখা যায় না, শুধু রাতের বেলাই তারাগুলো অমন মিটমিট করে জ্বলে কেন?

তা'হলে শোন বলি।

সে হ'ল অনেক অনেক কাল আগেকার কথা। স্বর্গে থাকত এক বুড়ো আর এক বুড়ী। আকাশের ঐ সূর্যই হ'ল সেই বুড়ো। সিঞ বোঙ্গা বা সূর্যদেবতা বলে সবাই তাকে জানে। তিনিই এই পৃথিবীতে রাত করছেন, দিন করছেন, রোদ দিচ্ছেন, জল দিচ্ছেন। সেই বুড়ী হ'ল ঞিন্দা চাঁদো, মানে চাঁদ। আর ঐ যে আকাশ-ভরা তারা দেখতে পাচ্ছ, তারা হ'ল সব বুড়ো-বুড়ীরই ছেলেমেয়ে।

বুড়ী চাঁদ আর বুড়ো সূর্যের ছিল অনেক ছেলেমেয়ে, ছেলেরা থাকত বাপের সঙ্গে আর মেয়েরা মায়ের সঙ্গে। সূর্য আলো দেয়, তেজ দেয়। আর চাঁদ? চাঁদের আলো তো সূর্যের কাছেই ধার করা। তাই তার কোন তেজ নেই।

আকাশে একটা সূর্যের তেজ দেখছ তো? তার সঙ্গে আবার তখন ছিল দিনের তারারাও। তারাও আলো দেয়, তেজ দেয়। এখন তো একটা সূর্যের তেজেই সবাই অস্থির। তখন এই একটা সূর্যের সঙ্গে ছিল আবার দিনের তারারাও। দিন নেই, রাত নেই, এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই, সমানে আগুন ছড়াত তারা পৃথিবীর বুকে। তাদের প্রচণ্ড তাপে পৃথিবী তো জ্বলে যাবার মত হ'ল। গাছপালা, লতাপাতা সব তো জ্বলেপুড়ে খাক হলই, মানুষ, পশুপাখীও সব নিশ্চিহ্ন হবার যোগাড় হ'ল। পৃথিবীতে দেখা দিল ভয়ংকর বিপদ।

মানুষজন, গাছপালা, কীটপতঙ্গ সবাই তখন কাতরস্বরে বলতে লাগল, 'সিঞ বোঙ্গা ঞিন্দা চাঁদো, রক্ষা কর, রক্ষা কর! তোমাদের তেজে সমস্ত পৃথিবী যে জ্বলে যায়!'

বুড়ীর দয়ার শরীর। পৃথিবীর সেই কাতর প্রার্থনা শুনে বুড়োকে সে বলল, 'দেখ, পৃথিবীকে তো না বাঁচালে নয়। এসো আমাদের ছেলেমেয়েগুলোকে আমরা খেয়ে ফেলি। তা না হ'লে মানুষজন গাছপালা সব পুড়ে যাবে, খাল-বিল-নদী-নালা সব শুকিয়ে যাবে, পৃথিবীতে প্রাণী বলতে আর কিছু থাকবে না।'

বুড়ো সূর্য তখন বুড়ীকে বলল, 'তুই আগে তোর মেয়েদের খেয়ে ফেল। তাতেও পৃথিবী ঠাণ্ডা না হলে ছেলেদেরও আমি খেয়ে ফেলব।'

শুনে বুড়ী তো পড়ল বিপদে। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে একটি বুদ্ধি বের করল। মেয়েদের সব এক জায়গায় জড় করে একটা ডালা দিয়ে তাদের ঢেকে ফেলল। তারপর বুড়োর কাছে গিয়ে বলল, মেয়েদের তো খেয়ে ফেললুম, তা আগুনের তেজ কমেছে কৈ ?

বুড়ো দেখল, সত্যিই তো। আকাশে চাঁদের তারকা নেই, এদিকে পৃথিবীতে তাপও কমেনি।

বুড়ী তখন সূর্যকে বলল, এবার তুমি তোমার ছেলেদের খেয়ে ফেল, নইলে পৃথিবী বাঁচবে না।

শুনে বুড়ো বলল, বেশ !

এই করে বুড়ী চাঁদ তো বুড়ো সূর্যকে ঠকাল। বোকা বুড়ো, বুড়ীর কথায় ছেলেদের সব খেয়ে ফেলল।

পৃথিবীও এবার ঠাণ্ডা হ'ল। মানুষ-জন, গাছপালা, পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ সবাই প্রাণে বাঁচল।

তারপর একসময় দিনের সূর্য ডুবে গেল। রাতের আঁধারে ভরে উঠল আকাশ। বুড়ী চাঁদ এবার আকাশে উঠল, তারপর ডালা তুলে ছেড়ে দিল তার মেয়েদের।

মাথার উপর চোখ তুলে সূর্য তখন দেখল, অনন্ত আকাশ জুড়ে অসংখ্য তারার মেলা। স্থির জোনাকীর মত জ্বলছে তারা মিটমিট করে, বুড়োর দিকে তাকিয়ে যেন পিটপিট করে হাসছে।

দেখে বুড়ো তো ভীষণ রেগে গেল। বুড়ী চাঁদ তা'হলে তাকে ঠকিয়েছে। মস্ত এক তরোয়াল হাতে নিয়ে বুড়ো তখন ছুটল চাঁদের পিছনে পিছনে। নাগালের মধ্যে পেয়েই তারপর বসিয়ে দিল এক কোপ। কুমড়োর ফালির মত হয়ে বুড়ী কাটা পড়ল।

তরোয়ালের আর এক ঘায়ে সূর্য বুড়ী চাঁদকে হয়তো শেষ করেই দিত। কিন্তু বুড়ী তাকে দু'টি মেয়ে দিয়ে শান্ত করল। তখনকার মত রেহাই পেল চাঁদ।

বুড়োর রাগ কিন্তু একেবারে গেল না। সেই থেকে আজও সে বুড়ী চাঁদকে খুঁজে বেড়ায়। দিনের বেলায় আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত—তরোয়াল হাতে তার পিছু ধাওয়া করে। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ দেয়। সন্ধ্যাবেলা বুড়ো বিশ্রাম নিতে গেলে তবেই বুড়ী আকাশে দেখা দেয়, তার আগে নয়। মাঝে মাঝে বুড়োর প্রাণে যখন একটু শান্তি আসে, তখন দু'এক দিনের জন্য বুড়ী চাঁদকে সে রেহাই দেয়। তখনই শুধু আমরা আকাশে আস্ত চাঁদকে দেখতে পাই। বুড়ো যে মেয়ে দুটোকে পেল, তাদের নাম দিল সে ভুরকা আর আযুপ ইপিল, মানে শুকতারা আর সন্ধ্যাতারা।

তাই তো আজও আমরা রাতের আকাশে তারা দেখতে পাই, কিন্তু দিনের বেলা দেখতে পাই না। সূর্য উঠলেই তারা ভয়ে লুকিয়ে পড়ে। মাসের দু'এক দিন ছাড়া বুড়ী চাঁদকেও আস্ত দেখতে পাই না। বুড়ো যে রোজই তরোয়াল দিয়ে তাকে খানিকটা করে কেটে ফেলে! তরোয়ালের সেই কোপ একদিন বড় হয়ে পড়ে। কুমড়োর ফালির মত তখন কাটা পড়ে চাঁদ। বুঝতে না পেরে আমরা বলি, বাঁকা চাঁদ উঠেছে আকাশে।

॥ পল্লী গেল ডেকে ॥

শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী

পল্লী গেল ডেকে
বেরিয়ে এসো ইট-পাথরের
বদ্ধ খাঁচা থেকে।
আলোয় করো স্নান
নীল আকাশে মিশুক তোমার
দরদ-ভরা গান।
যেন সবুজ ঘাসের কোলে
ছন্দে গাঁথা বাণীর ছোঁয়ায়
হৃদয় তোমার দোলে,
ফিরবে ঘরের পানে
কান জুড়োবে মিঠে সুরে
পাখির কলতানে।

পড়ে আসবে বেলা
দেখবে সাদা মেঘের বুকে
নানা রঙের মেলা।
এমন ছলনা
সোনার দিনটা কখন গেল
বোঝা-ই গেল না।
মাঠের তৃণ 'পরে
কেমন ক'রে কে জানে গো
শিশির কখন ঝরে।

স্যালুট

শ্রীচিত্রভা দেবী

**
*

কৌশিককে তার দিদিমা একটা ভারী সুন্দর টেবিল আর চেয়ার কিনে দিয়েছে। টেবিলটা চমৎকার ফিকে নীল রঙ করা; তাতে আবার লাল-কালো দিয়ে বিলিতী ইঁদুর আঁকা আছে। মিকিমাউসরা বই নিয়ে পড়াশুনো করছে। ভারী মজার ছবিটা।

কৌশিক বড় হয়ে অবশ্য ওর চেয়েও অনেক ভালো ছবি আঁকবে। আপাতত ও টেবিলে একটা সাদা ড্রইং খাতা খুলে মস্ত একটা জাহাজ আঁকছে। জাহাজ আঁকতে কৌশিকের খুব ভাল লাগে। এরি মধ্যে তিন-চারটে জাহাজ আঁকা হয়ে গেছে। কোনটাই অবশ্য তার তেমন পছন্দ হয়নি। ওর ইচ্ছে করে আসল জাহাজের মত করে আঁকে।

আসল জাহাজ কৌশিক অনেক দেখেছে, মা-বাবার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে। বাবার হাত ধরে জেটির উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে জাহাজের কাছে চলে এসেছে কতবার।

মা তো আর কৌশিক আর তার বাবার মত অত জোরে ছোটে না। তাই মা ডাকে "কুসু, অত জোরে ছুটো না, পড়ে যাবে।" মা ভাবে যে কৌশিক বুঝি এখনো তেমনি ছেলে-মানুষ আছে। ওর যে পাঁচ বছর বয়স, সে কথা মা হয়ত ভুলেই যায়।

জেটির উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখতে কৌশিকের ভারী ভালো লাগে।—ডেকের উপরে কত কি সব মাস্তল-টাস্তল, ফানেল-টানেল!

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, জাহাজের গা বেয়ে যে দড়ির সিঁড়িটা ঝুলছে, সেইটে বেয়ে উঠে যায়। ও অনেক মাঝি-মাল্লাকে ওভাবে উঠতে দেখছে।

কিন্তু ও যদি দড়ির সিঁড়িটা একবার ছুয়ে দেখে, তা হলেই বোধ হয় মা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে, আর কখনো গঙ্গার ধারেই নিয়ে যাবে না। তাই কৌশিক সিঁড়ি ধরে না। তা ছাড়া সত্যি বলতে কি, ওর নিজেরও যে একটু-একটু ভয় করে না এমন নয়।

সেদিন যে ছেলেটা সিঁড়ি বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে উঠছিল, বাপ্‌রে তার কি সাহস! দেখতে দেখতে কৌশিকের বুকের মধ্যে দুলে-দুলে উঠছিল। ভয়ে না ভালো লাগায় অমন হচ্ছিল ঠিক বুঝতে পারেনি।

তাই জাহাজ আঁকতে-আঁকতে ও একটা দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কেবিন-গুল কিছুতেই আঁকতে পারছিল না। গাড়ীতে যেতে যেতে দূর থেকে ক্ষুদে ক্ষুদে কেবিন-গুলোকে কেমন সারি সারি আলোর বিন্দুর মত মনে হয়। কৌশিক ভাবছিল, ও যদি বড় হয়ে জাহাজে কাজ নেয় তো কেমন হয়। ওই ছেলেটার মত দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হত তা'হলে আর ভয় করত না, কি অদ্ভুত।

কৌশিক যখন এইসব ভাবতে ভাবতে ছবি আঁকছে, তখন হঠাৎ সিঁড়ির কাছে হৈ হৈ শুনতে পেল। মা-বাবা যেন কার সঙ্গে কথা বলছে না? কৌশিক চেয়ার ছেড়ে উঠল না, শুধু কান খাড়া করে রইল।

ওমা রবিকাকা এসেছে। ও বাড়ির রবিকাকা। কৌশিকের ভারী হাসি পেতে লাগল।

ওমা ঠাকুর পো যে! কৌশিক মায়ের গলা শুনতে পেল। মা আরও বললে, কবে এলে শুনি?

এসেছি দিন সাতেক। রবিকাকা বলল, সাতদিনে সাতটা সিনেমা দেখেছি, আর সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে মোটরে করে ঘুরেছি।—

বাবা বলল, তারপর?

রবিকাকা বলল, তারপর কাল চলেছি ফিরে আমার বাসায়, অর্থাৎ জাহাজে।—এবারে পাড়ি দেব অষ্ট্রেলিয়ায়।

অষ্ট্রেলিয়ায়!—চট্ করে কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়ল খাতা বন্ধ করে। ইচ্ছে করল খুব খানিকটা ছুটোছুটি করে, কিন্তু তা না করে আস্তে আস্তে, গুটিগুটি এসে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

ওকে দেখে রবিকাকা প্রথমতঃ হা হা করে খুব এক চোট হেসে নিল,—তারপর বলল, এই যে মাষ্টার 'কে. কে', কি খবর?

সাদা নেভির পোশাকে রবিকাকাকে কি চমৎকার মানিয়েছিল।

রবিকাকা কৌশিককে মস্ত একটা সেলাম ঠুকে বলল, যাবে নাকি জাহাজ দেখতে, বল? তা'হলে ঠিক পাঁচ মিনিটে তৈরী হয়ে নাও।

ওমা সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি বই কি।

মা-বাবাও সঙ্গে সঙ্গে রাজী। শুধু তাই নয়,—তারাও চলল। মারও খুব সখ জাহাজ দেখবে। বাবারও নিশ্চয় ইচ্ছে ছিল, নইলে কেন এক কথায় রাজী হয়ে যাবে।—বাঃ রে!

তারপরে কি মজা! মা নিজে থেকেই সেই নতুন সেলার স্যুটটা পরিয়ে দিল কৌশিককে। তাতে কালো দড়ি বাধা যে হুইসলটা ঝোলানো আছে, পরতে পরতেই সেটা কৌশিক দু'বার জোরে জোরে বাজিয়ে নিল। মা বললেন, গাড়ী চড়ার আগে যদি কৌশিক আর একবারও হুইসল বাজায়, তাহলে ওই স্যুট খুলে সেই ব্রাউন সার্ট আর কালো হাফ-প্যাণ্টটা পরিয়ে দেবে। শুনে কৌশিক হুইসলটা তার বুক পকেটে রেখে দিল। তারপর সাদা মোজা, আর কালো চকচকে জুতো পরে ফিটফাট হয়ে মা-বাবার সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে বসল।

তারপরে আর কি, হুহু করে গাড়ী চালিয়ে সোজা স্ট্র্যাণ্ডে। স্ট্র্যাণ্ডের চওড়া কালো রাস্তাটা দিয়ে একেবারে ভুস্ করে এসে জেটির পাশে গাড়ী লাগাল বাবা।

আর দড়ির সিঁড়ি নয়। জাহাজ থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি লাগানো রয়েছে জেটির উপরে।

সেই সিঁড়ি বেয়ে সবাই তরতর করে উঠে গেল। কৌশিকও একাই উঠছিল, কিন্তু মা ধমক্ দিয়ে বললেন, রবিকাকার হাত ধরে ওঠ।

ছ্যাখো দেখি,—পাঁচ বছরের ছেলে কখনো কারু হাত ধরে ওঠে? মা যে কি বলে!

জাহাজে উঠে সব ঘুরে ঘুরে দেখল কৌশিক। ডেক, কেবিন, খাবার ঘর, বসার ঘর, ইঞ্জিন ঘর। কোনটা বোট সাইড, কোন্টা পোর্ট সাইড— সব। তারপরে সবার

'রবিকাকা মস্ত একটা সেলাম ঠুকে বলল, যাবে নাকি জাহাজ দেখতে?'—পৃঃ ৪৬০

উপরে স্টীয়ারিং ঘর,—যেখানে বসে স্টীয়ারিং ধরে জাহাজ চালায়। সব দেখতে দেখতে দেখা যেন আর শেষ হচ্ছিল না। যত দেখছিল তত অবাক হচ্ছিল। শেষকালে রবিকাকা ক্যাপটেনের সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললে, আমার বন্ধু, শ্রী ও শ্রীমতী গুপ্ত। আর তাদের ছোট্ট ছেলে, মাষ্টার কৌশিক।"

ক্যাপটেন তার প্রকাণ্ড হাতের থাবা দিয়ে কৌশিকের ছোট্ট হাতটা ধরে খুব জোরে হ্যাণ্ডশেক করে দিল। কৌশিকের যদিও খুব লজ্জা করছিল, কিন্তু যেই হ্যাণ্ডশেক শেষ হোল, অমনি সেও রবিকাকার মতন একটা স্যালুট ঠুকে দিল ক্যাপটেনকে। ক্যাপটেন আবার তক্ষুনি তেমনি করে পা ঠুকে স্যালুটটা ফিরিয়ে দিল কৌশিককে।

তারপরে রবিকাকার কেবিনে বসে চা, কেক, স্যাণ্ডউইচ।

কে জানত আজ বিকালে এত মজা হবে। খুশীতে কৌশিকের মনের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠছিল।

দেখতে দেখতে ফিরে যাবার সময় হয়ে এল।

কিন্তু জাহাজ ছেড়ে যেতে কৌশিকের পা উঠছিল না। শেষকালে একেবারে বাবার হাত ছাড়িয়ে, 'একটু একবার ডেকটা ঘুরে আসি', বলে একছুটে ডেকে চলে এসেছিল কৌশিক।

ডেকের উপুরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের কথা মনে হচ্ছিল কৌশিকের। সমুদ্র কখনো দেখেনি কৌশিক। সে নাকি শুধু নীল আর নীল। কে জানে কেমন তার ঢেউ, কেমন তার ঝিকিমিকি ফেনা।

কিন্তু সমুদ্র না দেখুক, গঙ্গা তো দেখেছে। এখানে দাঁড়িয়ে গঙ্গাকেই ওর যেন সমুদ্রের মত মনে হতে লাগল। আর উপুরে আকাশটাকেও মনে হলো যেন অনেক কাছে নেমে এসেছে। মাথা তুলতেই সাদা সাদা মেঘের ছিট্ দেওয়া তার নীল জামাটা চোখে ঠেকল।

আর অমনি ক্যাপটেনের মত পা ঠুকে মস্ত একটা স্যালুট করল কৌশিক,—একবার আকাশকে আর একবার গঙ্গাকে।

তারপরেই পিছনে ফিরে দেখল কেউ দেখতে পায়নি তো!—ভাগ্যিস,—দেখলে নিশ্চয় হেসে উঠত। কৌশিক যাই করুক সবাই কেন যে হেসে ওঠে কে জানে!

শীতের ছড়া

শ্রীনিখিল বসু

শীতবুড়ী থুড়থুড়ি
তার বড়ো দাপটে
দাঁতে দাঁত ঠকঠক
কার ঠোঁটে রা' ছোটে।

রঙচঙে স্যুট কোট
পেলে ভরে বুকটা,
তার চেয়ে ভালো লাগে
সূর্যের মুখটা।

শিশিরের জল পড়ে
জিবে জল টপটপ
পিঠে চাই পুলি চাই
খাব সব গপগপ।

সেই লোভে ঠাণ্ডায়
খোকাখুকু ঘুরঘুর—
ঝলমলে করে তোলে
শীতের সে রোদ্দুর।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অফিসার-ইন-চার্জ লীলার পরিচয় জানতে চাইলে সে ছলছল চোখে বলেছিল—আমার ছোট বোন।

তারপর সে জানিয়েছিল, 'স্যার, আমি আর লিখতে পারবো না। দয়া করে আমার খাতাখানা জমা করে নিন্।'

তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'বেশ তুমি খাতা নিয়ে এস। কি অবস্থায় তুমি লেখা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছ তা তোমার খাতায় লিখে দিচ্ছি।'

রজত খাতা এনে দিলে তিনি তার ওপর মন্তব্য লিখলেন,—"প্লিজ্ কন্‌সিডার দি কেস্ অফ্ দিস্ বয় ফেবারেব্‌লি। হি ওয়াজ ইনফর্ম্‌ড্ বাই এ টেলিগ্রাম দ্যাট্ হিজ্ সিস্টার ওয়াজ ডেড্ এণ্ড হিজ্ মাদার ওয়াজ সিরিয়াস্‌লি ইল। সো হি ওয়াজ কমপেল্‌ড টু লিভ্ দি হল্ আর্‌লিয়ার।' (অনুগ্রহ করিয়া বালকটির সম্বন্ধে সদয়ভাবে বিবেচনা করিবেন তাকে তার ভগিনীর মৃত্যু-সংবাদ ও মাতার সাংঘাতিক পীড়ার কথা টেলিগ্রামে জানানো হয়। সেইজন্য সে নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্বে 'হল' ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।) তার নীচে নিজের নাম ঐ অফিসার-ইন-চার্জ সই করে দিলেন।

রজত তাঁকে নমস্কার করে বাইরে চলে গেল।

বাইরে আসতেই মেসের ম্যানেজারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি জানালেন, 'টেলিগ্রামখানা পড়েই ওখানা নিয়ে এখানে চলে আসি। তোমার দুঃখ বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করবে বল, সবই ভগবানের ইচ্ছে। এখন বাড়ী গিয়ে যাতে তোমার মা তাড়াতাড়ি সেরে ওঠেন সেই চেষ্টা কর।

তাঁর সঙ্গে মেসে ফিরে রজত তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মিটিয়ে দিলে। তারপর প্রথম যে ট্রেন পেল তাতে চেপে বাড়ী ফিরে গেল।

বাড়ী এসেই সে যা দেখলে তাতে প্রথমটায় সে বিহ্বল হয়ে পড়লো। ঘরের এক পাশে তার মা অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন আর অন্যপাশে আর একটা বিছানায় তার বাবা শুয়ে আছেন। তাঁরও কলেরা হয়েছে।

সে বুঝতে পারলো, কলেরা হয়েই লীলা মারা গিয়েছে, মারও অবস্থা শোচনীয়। মনে সাহস এনে সে তখনই চিকিৎসককে ডেকে নিয়ে এল ও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী উভয়ের শুশ্রূষায় মন দিলে। কিন্তু তার সব চেষ্টাই বিফল হ'ল। পরদিন তার মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বুকের মধ্যে অসহ্য বেদনা চেপে রেখে সে তার বাবাকে বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'ল না। কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনিও দেহত্যাগ করলেন।

আকস্মিক বেদনার আঘাতে তার মন বিমূঢ় হয়ে গেল। তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল বার হ'ল না। সে যন্ত্র চালিতের মত তার পিতামাতার শেষ কাজ করে যেতে লাগলো। তারপর শ্মশানে যখন তাঁদের নশ্বর দেহ ছাইয়ে পরিণত হ'ল, তখন সে গঙ্গার ঘাটে অবসন্নভাবে বসে পড়লো। এতক্ষণে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ভগবানের বিরুদ্ধে তার মনটা নিস্ফল অভিমানে গর্জে উঠলো। সে তার দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এই সময়ে তাঁর দূর সম্পর্কের পিসেমশাই হরনাথ দত্ত এসে বললেন, 'দেখ রজত, তোমাকে এখন জানাতে ইচ্ছা করছে না, অথচ না বলেও উপায় নেই। আর পরে যখন জানাতেই পারবে, তখন বলাই ভাল।'

হরনাথের কথার মধ্যে একটা ভাবী অমঙ্গলের ইঙ্গিত আশঙ্কা করে রজত নিজেকে সংযত করে মাথা তুলে বললে, 'বলুন পিসেমশাই। আমি একটুও বিচলিত হব না। আপনার

কথা শুনে মনে হচ্ছে—আপনি কোন এক অজানা বিপদের কথা শোনাবেন। বাপ-মাকেই যখন হারালুম, তখন আর কোন বিপদকেই ভয় করি না।'

হরনাথ খুশি হয়ে বললেন, 'তবে শোন। তোমার বাবা বাড়ী বাঁধা দিয়ে আমার কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নেন। তুমি ছেলেমানুষ, টাকা শোধ দেবার ক্ষমতা তো তোমার নেই। কাজেই আমাকে বাড়ীটা নিয়ে নিতে হচ্ছে। শ্রাদ্ধ মিটে গেলেই আমি ও-বাড়ীটা দখল করব, তোমাকে এখন থেকে জানিয়ে রাখছি।'

রজত ধীরভাবে উত্তর দিয়েছিল, 'বাবার ঋণ আমি রাখব না। তিনি কত টাকা ধার নিয়েছিলেন পিসেমশাই?'

হরনাথ বলেছিলেন, 'তিন হাজার টাকা।'

রজত তখন বলেছিল, 'বাড়ী আর জমি-জায়গা যা আছে সব বিক্রী করলে কমপক্ষে দশ-বারো হাজার টাকা হবে। টাকার ব্যবস্থা করতে না পারলে আমি বিক্রী করে সব দেনা শোধ করে দোব।'

হরনাথ মৃদু হেসে বললেন, 'তা'হলে তো ভালই হয়। কিন্তু আজই আদালত থেকে মুহুরী এসে এক মাসের নোটিশ জারি করে গেছে। তাতে তোমার বাবার সইও আছে। কাজেই এর মধ্যে বাড়ী বিক্রী করে অথবা যে কোন উপায়েই হোক টাকা শোধ করে দিতে পার ভাল, আর তা না হলে আমি বাড়ী দখল করব।' এই বলে তিনি চলে গেলেন।

সেদিন সকালে হরনাথ কি একটা কাগজ এনে তার বাবাকে সই করতে বলেছিলেন; তাঁর তখন জ্ঞান ছিল না। কাজেই সেই কাগজে তাঁর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ সই করে নিয়েছিলেন। সেটা যে কি তা জিজ্ঞাসা করবার মত মনের অবস্থাও তাঁর তখন ছিল না। এখন হরনাথের কথায় সে বুঝতে পারলে, ওটাই আদালতের নোটিশ। ওরই জোরে তিনি তাকে নিরাশ্রয় করতে চলেছেন।

তারপর হতে সে বহুস্থানে বাড়ী বিক্রী করার জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নাবালকের সম্পত্তি, বিশেষতঃ আবার বন্ধকী সম্পত্তি কিনতে কেউই রাজি হ'ল না। আর তিন হাজার টাকা দিয়ে হরনাথের দাবী মেটাবার ব্যবস্থা কে করবে? এমন কে আছে যে, সে তাকে অত টাকা ধার দেবে? তার এই দুর্দিনে আত্মীয়েরাও কেউ সাহায্য করলে না। অবশেষে সে হরনাথকে বহু অনুনয় করেছিল, কিন্তু কিছু ফল হ'ল না।

রজতের মনে পড়ে গেল,—বাবা বেঁচে থাকতে এই হরনাথ তাঁকে কত আদর করেছেন, তাঁকে খুশি রাখার জন্য কত চেষ্টা করেছেন। এখন সে বুঝতে পারছে, তাদের সম্পত্তি হাত

করার জন্যই তাঁর এত ছল-চাতুরি। সে কি আজকের চেষ্টা! তার বাবা যখন পাটের ব্যবসা করতেন তখন থেকে।

তার বাবা তপনকুমার রায় ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। সংসারে স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা ছাড়া আর কেউ না থাকায় বেশ সুখেই দিন কেটে যাচ্ছিল। ত্রিবেণীতে গঙ্গার ধারে বিস্তৃত জায়গায় মনোরম পরিবেশে সুন্দর দ্বিতল বাড়ী, স্বচ্ছল শান্তিপূর্ণ জীবন অনেকেরই মনে ঈর্ষা জাগাতো। কিন্তু হরনাথের মত আর কেউই বহু বছরের চেষ্টায় তপনবাবুর বিশ্বাস অর্জন করে তাঁকে সর্বস্বান্ত করতে পারেনি।

প্রায় এক বছর আগে তপনবাবুর এক দূর সম্পর্কের ভগিনীপতি এই হরনাথ দত্ত তাঁকে খনিতে টাকা খাটাবার প্রলোভন দেখালেন। রজতের বেশ মনে আছে, তখন তাদের গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। সে সময়ে এক রবিবার সকালে হরনাথ এসে জানালেন, 'বিহারে হাজারিবাগ অঞ্চলে এক জায়গায় অভ্রের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার শেয়ার চারিদিকে বিক্রী হচ্ছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টাররা বছরের শেষে শতকরা একশত টাকা করে ডিভিডেণ্ট ঘোষণা করেছে। এতে টাকা খাটালে কয়েক বছরের মধ্যে বহু লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যাবে, বুঝলে ভায়া ?'

পাটের ব্যবসায়ে এই হরনাথই ছিল তপনবাবুর প্রধান সহায়। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী পাট কিনে এ পর্যন্ত একবারও লোকসান করেন নি ব'লে তাঁর ওপর তপনবাবুর একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল। তিনি একবারও ভাবতে পারেন নি, সেই ধূর্ত তাঁর বিশ্বাস অর্জন করে, তাঁর সর্বনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করছে।

হরনাথের বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে এবং কোম্পানীর প্রসপেক্টাস সমূহ দেখে প্রলুব্ধ হয়ে তপনবাবু তাঁর সমস্ত অর্থ দিয়ে খনির শেয়ার ক্রয় করেছিলেন। কিছুদিন পরে শোনা গেল যে, খনি থেকে আর কিছু উঠছে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টারেরা তাদের শেয়ার বিক্রী করে দিয়ে সরে পড়েছে। তপনবাবু তাঁর শেয়ার বিক্রী করার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিনবে কে ? তখন খনির অবস্থা জানতে আর কারও বাকি নেই।

হরনাথকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, 'তাই তো, এ যে দেখছি দিনে ডাকাতি আরম্ভ হ'ল। বাজারে সুনাম দেখে তোমায় খবর দিলুম। তুমিও তো প্রসপেক্টাসগুলো দেখেছিলে। কত বড় বড় লোক ওর মধ্যে ছিল। তারা যে এ রকম জোচ্চুরি করবে তা কেমন করে বুঝবো ভাই।'...

এদিকে সংসার চালানো ও ব্যবসা বজায় রাখতে অর্থের প্রয়োজন। পরিচিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে কারও কাছ হতে টাকা ধার করা চলে, কিন্তু তাতে মর্যাদার হানি হতে পারে মনে করে তপনবাবু সরল বিশ্বাসে সেই হরনাথের কাছেই সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখলেন। ভাবলেন,

কয়েক বছরের মধ্যেই সব দেনা শোধ করে দেবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর বিধাতা-পুরুষ অলক্ষ্যে থেকে সব পালটে দেন।

এই সময়ে গ্রামে কলেরা দেখা দিল। হঠাৎ লীলার একদিন কলেরা হ'ল। স্থানীয় চিকিৎসকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো গেল না।

তারপর রজতের চোখের সামনেই তার মা মারা গেলেন, তার কয়েক ঘণ্টা পরেই তার বাবাও তাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

এ রকম অবস্থা যে তার জীবনে আসতে পারে তা সে কল্পনাতেও আনতে পারেনি। আজ সে হরনাথের কৌশলে সর্বহারা। মাথা গোঁজবার মত একটা আশ্রয়ও তার নেই। উন্মুক্ত আকাশের নীচে একটা কাঠের বেঞ্চ-ই তার শয্যা।

হরনাথের ষড়যন্ত্র আর ভাগ্যের বিড়ম্বনা তাকে আজ যে অবস্থায় এনে ফেলেছে, তা থেকে তাকে আজ উদ্ধার পেতেই হবে। পিতার অন্তিম কথাগুলো এ সময়ে তার মনে পড়ে গেল। সে বলে উঠলো, 'জন্মেছি যখন তখন এই পৃথিবীর বুকে একটা দাগ রেখে যেতে হবে।'

এইবার তার মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। ফলে অল্পক্ষণ পরেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই রজত অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলো। তারপর একে একে সব কথা তার মনে পড়ে গেল। সে সম্মুখের জলাশয় হতে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে আবার বেঞ্চিতে এসে বসলো। এবার সে খিদের জ্বালা অনুভব করতে লাগলো। এর আগে সে কখনও খিদের কষ্ট ভোগ করেনি। কিন্তু সে এখন সম্পূর্ণ নিরুপায়। গতকাল সন্ধ্যায় তার শেষ সম্বল দুটি পয়সা দিয়ে সে মুড়ি কিনে খেয়েছে। আর তার কিছু নেই। গতকালের দেখা রাস্তার ধারে ভিখিরীদের মলিন মুখগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তবে কি তাকেও তাদের মত ভিক্ষা করে বেঁচে থাকতে হবে ?

অন্যমনস্ক হবার জন্য সে নানা কথা ভাবতে লাগলো। কিন্তু খিদের জ্বালা একটুও কমলো না। জীবনে এই প্রথম খিদের কষ্ট অনুভব করে সে ক্ষণকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। তারপর বহু চেষ্টায় আত্মসংবরণ করে সে চৌরঙ্গীর দিকে চলতে সুরু করলো। পথে দু'একটা অফিসে অনুসন্ধান করল, কিন্তু অত সকালে সব কটাই বন্ধ।

এরকম নিরাশ হৃদয়ে, ব্যর্থ অন্বেষণে বহুক্ষণ ঘোরার পর, তার দৃষ্টি একটা বড় বাড়ীর নীচের তোলার একটা ঘরের বাহিরে একটা লেখার প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। সেখানে ইংরেজীতে লেখা ছিল—

মিঃ রবার্ট পিরাসন

সাক্ষাতের সময় : সকাল ৭টা থেকে ৯টা, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা।

কি উদ্দেশ্যে দেখা করতে বলছে তার বিষয় কিছু লেখা না থাকায়, সে একটু ইতস্ততঃ করলো। গতকাল থেকে বহু চেষ্টা করেও কোন অফিসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারেনি। দেখা হলেই যে চাকরী মিলতো তাও নয়, তবু সে যে সব রকম চেষ্টা করেছে এই সান্ত্বনাটুকু লাভ করতো। কাজেই সে এ সুযোগ নষ্ট হতে দিল না। সে দরোয়ানের কাছ থেকে কাগজ পেনসিল চেয়ে নিয়ে নিজের নাম লিখে পাঠালো। একটু পরেই দরোয়ান ফিরে এসে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

ঘরে প্রবেশ করার সময় রজত দেখলে যে, ঘরের প্রায় মাঝখানে একখানা টেবিল পাতা রয়েছে। তার এ পাশে দুটো খালি চেয়ার রয়েছে, আর ওপাশে একটা চেয়ারে একজন সাহেব বসে আছেন। সে সাহেবকে 'good morning sir' বলে সেলাম করে দাঁড়াতেই সাহেব তার দিকে আশ্চর্য হয়ে অল্পক্ষণ তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি চাকরী করতে এসেছ ?'

রজত উত্তর দিলে, 'হাঁ মহাশয়।'

(ক্রমশঃ)

গাংশালিকের বিয়ে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ছাদনাতলায় বাজনা বাজে
গাংশালিকের বিয়ে,
বর এসেছে ধেড়ে ইঁদুর
টোপর মাথায় দিয়ে।

ধর বর বব্‌বর
মাটির তলায় ঘর,
বৌ নিয়ে গে' রাখবি কোথায় ?
আগে চিন্তা কর।

ডানা আছে ? উড়তে পারিস্‌ ?
ও বর গাছে চড়,
তাও না পারিস—সুড়সুড়িয়ে
গর্তে ঢুকে পড়।

ভেংচি দিয়ে ভেঙে দিল
অমন মজার বিয়ে
গাংশালিকের মাসতুতো বোন
ঝগড়াটে সে টিয়ে।

বিনয়　　দীনেশ　　বাদল

অলিন্দ যুদ্ধের তিন বীর

শ্রীঅমল সেন

ঝড়! প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড ঝড়ে গাছপালা আলুথালু হয়ে সারা বনকে যেমন আন্দোলিত করে, তেমনি প্রবল ঝড়ে সারা বাংলা দেশ আন্দোলিত, উদ্বেলিত। সারা বাঙলা দেশ কাঁপছে— কাঁপছে বাঙলা দেশের প্রতিটি মানুষের মন। সেই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিন থেকেই বাঙলা দেশের আকাশ ঢাকা ছিল গাঢ় কালো মেঘে, কখন যে ঝড় উঠবে তার ঠিক ছিল না। বজ্রগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। অবশেষে ঝড় এলো, প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ে বিদ্যুতের ঝলকানি আর বজ্রের গর্জন কাঁপিয়ে তুলেছে সেই কালো মেঘে ঢাকা আকাশ, জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগিয়ে তুলেছে এক অদ্ভুত শিহরণ, এক অনাস্বাদিত চেতনার আভাস। চট্টগ্রামের সমুদ্রতীর থেকে শোনা যাচ্ছে তরুণ বিপ্লবীদের কণ্ঠে জীবনের জয়ধ্বনি।

তা হ'লে কি বাঙলা দেশই সবার আগে হাতছাড়া হয়ে যাবে?—সেদিন স্বাভাবিক কারণেই ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর মনে এই প্রশ্ন ও দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে চিরকাল তারা বাঙালীকে সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে, তাদের মনে মনে ভয় করেছে, তাদের মধ্যে রাজভক্তির অভাব লক্ষ্য করে সংকিত হয়েছে। বাঙালীরা কোনদিনই ইংরেজের দাসত্বকে নিজেদের ভাগ্যলিপি বলে মেনে নেয়নি। যখনই যে কারণ ঘটেছে বিদ্রোহের, বাঙালীরা তাতে

যোগ দিয়েছে। বাঙালীরা চিরদিন বিদ্রোহী, বিপ্লবী। পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাদের অনপনেয় মজ্জাগত ঘৃণা, অবিরাম আপসহীন সংগ্রাম। তারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে কোনদিন স্বস্তিতে ও নির্বিবাদে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে দেয়নি। তাই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বাঙলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে বাঙালীর মেরুদণ্ড ভেঙে বাঙালী জাতটাকে দুর্বল শক্তিশূন্য করে ফেলবার দুরভিসন্ধি যখন করেছিল তখন সমস্ত বাঙালী ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল বাঙালীর রুদ্র রোষ। দ্বিখণ্ডিত বাঙলা আবার জোড়া লেগে এক হ'ল। বাঙালীর সেদিনকার সেই জাগারণ সারা ভারতবর্ষের বুকে নব জাগরণের ঢেউ ব'য়ে এনেছিল।

বৃটিশ সরকার সেদিনকার সেই অপমানের জ্বালা কিছুতেই ভুলতে পারে না। তাই চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন তাদের আবার নতুন করে ভাবিয়ে তুললো।

আজ আবার বাঙলা দেশের ছেলেরা মুক্তি কামনায় অধীর এবং চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়-চূড়ায় দাঁড়িয়ে বাঙলার অগ্নিশিশুরা—মাষ্টার দা, সূর্য সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং, অম্বিকা চক্রবর্তী, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, কল্পনা দত্ত এবং কচি বালক টেগরা বল যে অসীম দুঃসাহস ও মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামের পরিচয় দিয়েছিল, তাতে সারা বাঙলা দেশ স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেদিন তাদের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে বলেছিল, ধন্য চট্টগ্রাম।

বাঙলার তারুণ্যে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী অনেক দিন থেকেই বিদ্রোহের রক্তিম শিখা লক্ষ্য করে আসছে। তাদের একথা এখন আর বুঝতে বাকী নেই যে, এদেশ থেকে তল্পিতল্পা গুটোবার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

মুক্তির উদাত্ত আহ্বান শুনে বাঙলার তরুণ চিত্তে রক্তের দোলা লেগেছে, যুবশক্তি জেগে উঠেছে। বাঙলায় বিদ্রোহী কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল : "রক্তে আমার লেগেছে আজিকে সর্বনাশের নেশা।" মুক্তির সেই ডাক শুনে শৃঙ্খল ছেঁড়ার কঠিন শপথ নিয়ে মুক্তি-পাগল তরুণরা নেমে এসেছে কণ্টকাকীর্ণ মুক্তপথের ধূলায়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার, মধ্যাহ্ন বেলা ১২টা থেকে ১ টার মধ্যে এই জাগ্রত উদ্দীপিত যৌবনশক্তিকে মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো অমিত তেজে জ্বলে উঠতে দেখেছিলাম রাইটার্স বিল্ডিংস্‌য়ের অলিন্দ যুদ্ধে।

সেদিনটির কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। রাইটার্স বিল্ডিংস্‌য়ের সেই অলিন্দ যুদ্ধের সংবাদ বিদ্যুতের মতো তখন সারা কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘর ছেড়ে আমরা ছুটে রাজপথে বেরিয়ে এসেছি। আনন্দে আর উত্তেজনায় কাঁপছি। যেন একটা

অসহ্য সুখ সারা অন্তরে বিদ্যুৎ প্রহারের মতো প্রবেশ করে স্থির থাকতে দিচ্ছে না আমাকে। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি! এমনটি আমার জীবনে আগে আর কখনও হয়নি।

পরাধীনতা এবং অত্যাচার উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তিলাভের জন্য যে সংগ্রাম চলেছে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আর একটি নতুন পৃষ্ঠা যুক্ত হ'ল—সমগ্র পৃষ্ঠাটাই রক্তে মাখানো। সে যুদ্ধের বিবরণ যেমন উন্মাদনাময়, তেমনি রোমাঞ্চকর। অভাবনীয় অথচ আকাঙ্ক্ষিত এক বিদ্যুৎ চমক। সে বিদ্যুৎ চমকে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ সেদিন চমকিত হয়েছিল।

একদিকে বাঙলার বিপ্লবীরা যেমন বৃটিশ সাম্রজ্যবাদকে সমূলে উৎখাত করার জন্য স্বাধীনতার সংগ্রামে জীবন-মরণ তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছে, অন্য দিকে ইংরেজও নির্মমভাবে দমন-নীতি চালাতে শুরু করেছে। কিন্তু তা দেশের তরুণ-তরুণীদের উদ্যমকে স্তিমিত করতে পারেনি, তারা বীরবিক্রমে এগিয়ে চলেছে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে একটা নব জাগরণের সূচনা হ'ল। দেশের নানা জায়গায়, বিশেষ করে পূর্ব-বাঙলায় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেল। বাঙলার গভর্ণর স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন ঢাকা পরিদর্শনে যাবেন। তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্দেশ্যে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল ল্যোম্যান ঢাকা গেলেন। ঢাকা তখন ছিল বিপ্লবীদের কর্মযজ্ঞের প্রধান কেন্দ্র। লোম্যান ঢাকার পুলিশ সুপারিন-টেণ্ডেণ্টকে সঙ্গে নিয়ে মিটফোর্ড হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলেন, সেখানে বিনয় বসু নামে এক তরুণ বিপ্লবী রিভলবার নিয়ে খুব কাছে থেকে তাদের উপরে গুলী চালালেন (২৯শে আগষ্ট, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে)। বিনয়কে চেনা গেল, কিন্তু ধরা গেল না। বিনয়কে ধরার জন্য পুলিশ মরিয়া হয়ে লাগলো। পুলিশের অত্যাচার মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। অত্যাচার থেকে বালক-বৃদ্ধ-যুবা কেউ রেহাই পেল না। বিশেষ করে যুবকদের উপরে পুলিশের আক্রোশ হ'ল সবচেয়ে বেশী, সেইজন্য যুবকদের আস্তানা কলেজের হোষ্টেল এবং বোর্ডিংগুলিতে পুলিশের অত্যাচার যে কী ভীষণ আকার ধারণ করলো তা বর্ণনা করা যায় না। তাদের নারকীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এক যুবক বাড়ীর উপরতলা থেকে লাফ দিয়ে পড়েছিল। সারা ঢাকা শহরে তিনশোর বেশী বাড়ীতে পুলিশ তল্লাসী চালিয়েছিল এবং শত শত লোককে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু বিনয়কে গ্রেপ্তার করা পুলিশের সাধ্যে কুলালো না। তাঁর মাথার জন্য পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ল। কিন্তু কোথায় বিনয়? জনসাধারণের সমর্থন যাকে বর্মের মতো ঘিরে রাখে, পুলিশ তার কী করতে পারে? তাই বিনয় ঢাকায় কোথায় কিভাবে আত্মগোপন করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। শোনা যায় তাঁকে নিজের

বাড়ীর মধ্যে এক গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন এক পতীতা নারী। সমাজে তার স্থান নেই, মান নেই, কিন্তু তার সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তার বিরাট দেশপ্রেম চিরদিন বাঙালী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

ঢাকা থেকে তিনটি তরুণ ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে এসে হাজির হ'ল কলকাতায়। বিনয় এসে উঠলো খিদিরপুরের পাইপ রোডে, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গুহের বাড়ীতে। রাজেন বাবু সমস্ত জেনেশুনেই পলাতক বিপ্লবী বিনয় বসুকে ভাইয়ের মতো সস্নেহে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাজেনবাবুর স্ত্রী বিনয়কে যে স্নেহ-ভালোবাসা এবং যত্নের মধ্যে রেখেছিলেন, জগতে একমাত্র মা পারে তার সন্তানকে তেমন ভালোবাসা ও যত্ন দিয়ে ঘিরে রাখতে। বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে এমনি কত মা আর কত বোন যে ছিল সেদিন আর তারা তাদের অন্তরের স্নেহ ও মাধুর্য দিয়ে, আশীর্বাদ ও শুভকামনা দিয়ে বিপ্লবীদের রক্ষা করেছে, অশ্রুজলে তাদের শির অভিসিক্ত করেছে, তার হিসাব কে রেখেছে? তাই বাঙলার বিদ্রোহী কবি নজরুল বাঙলার এইসব মা-বোনদের কথা মনে করেই লিখেছিলেন—

"কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাস,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে,
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মীনারী।"

মেটিয়াবুরুজের সেই পাইপ রোডের বাড়ী থেকে বিদায় নেবার আগের মুহূর্তে বৌদিকে প্রণাম জানালো বিনয়। অশ্রুজলে বৌদির বুক ভেসে গেল, তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল, বুকের মধ্যে চেপে ধরে বিনয়কে তিনি আশীর্বাদ করলেন। আর রাজেন বাবু দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে এই মহিমময় দৃশ্য দেখলেন। তাঁরও মন অপ্লুত। তাঁর সমস্ত হৃদয় মন্থন করে যে আশীর্বাণী ঝরে পড়লো তা যেন নীরবে বললো, হে মুক্তির অগ্রদূত, বাঙলা দেশের হে বিপ্লবী বীর তুমি জয়ী হও! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ, চরিতার্থ হোক।

বিনয় বসু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পলাতক অবস্থায় কলকাতায় আসার পরে বাঙলা দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নেতা শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষের প্রতিষ্ঠিত এবং স্বর্গত অনিল রায় ও শ্রীমতী লীলা নাগ (রায়) কর্তৃক সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের 'বিপ্লবীদের সঙ্গে' পরামর্শ

ক'রে রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। সেই পরিকল্পনা বিনয় সঙ্গে নিলেন।

প্রায় একই সময়ে আরও একখানা ট্যাক্সি সেখানে এসে থামলো। সেই ট্যাক্সিতে ক'রে পার্ক সার্কাস সেণ্টার থেকে এসে নামলো বিপ্লবী সহযোগী নিকুঞ্জ সেনের সঙ্গে বাদল আর দীনেশ।

তারপর পূর্ব পরিকল্পনা মত আর একখানি নতুন ট্যাক্সিতে চ'ড়ে শুরু হ'ল বিনয়-বাদল-দীনেশের সম্মিলিত মুক্তি অভিযান।

অন্যান্য সব গাড়ীগুলির মতো সেই ট্যাক্সিখানাও এসে থামলো রাইটার্স বিল্ডিংসের ফটকে। কারুর কোনো সন্দেহ হ'ল না। একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই আর দশজনের মতো বিনয়-বাদল-দীনেশও ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। পথ চিনে নিতে তাদের কোনই অসুবিধা হ'ল না। রাইটার্স বিল্ডিংসের পুরো মানচিত্র রয়েছে তাদের সঙ্গে। তা ছাড়া বাদল এসে আগে থেকেই জেনে গিয়েছিল কোন্ সাহেব কোন্ ঘরে বসে এবং সেই সব ঘরে কোথা কিভাবে যেতে হয়। কাজেই তাদের সেদিনকার সর্বপ্রধান লক্ষ্য যিনি বন্দীদের ওপরে নির্মম অত্যাচারকারী জেলের বড়কর্তা "ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ" কর্ণেল সিম্পসনের কক্ষেই তারা সবার আগে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লো। সাহেবকে দিয়ে তার পি. এ. তখন ফাইল সই করিয়ে নিচ্ছিলেন।

এই হ'ল স্বর্ণ সুযোগ, মাহেন্দ্র লগ্ন। এই লগ্নে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সেনাপতি বিনয় বসু "ফায়ার" অর্ডার দেবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনালিকার মুখ থেকে দু'টি গুলি বেরিয়ে এসে বিদ্ধ করলো সিম্পসনকে। জাঁদরেল পুলিশ অফিসার সিম্পসন ধরাশায়ী হলেন মুহূর্তের মধ্যে—একটিও টুঁ-শব্দ করার অবসর পেলেন না।

বৃটিশ ভারতের প্রাণকেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিংসে বিপ্লবীরা আঘাত করলো। সময়টা ছিল দুপুর ১২টা থেকে ১টার মধ্যে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার, ইতিহাসের এই অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটলো। বিনয়-বাদল-দীনেশ তিনজন ক্ষিতির ও স্বাধীনতার মধ্যে উদ্বুদ্ধ বাঙালী তরুণ বিপ্লবাত্মক নাটকের চরম মুহূর্তে চূড়ান্ত আঘাত দেবার জন্যে এবং ভারতের রাজনৈতিক জগতে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসবার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এসেছিল।

(আগামীবার সমাপ্য)

ওস্তাদের মার শেষ রাত

শ্রীশ্যামসুন্দর বসু

মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই প্রবাদ-প্রবচনের সৃষ্টি। এই প্রবাদ-প্রবচনের মূলেই আছে এক-একটি শিক্ষামূলক সুন্দর গল্প। আজ এমন একটি গল্প তোমাদের বলছি: যে গল্পটি থেকে 'ওস্তাদের মার শেষ রাত' এই প্রবচনটি সৃষ্টি হয়েছে।

এক রাজার দরবারে এক বুড়ো তরোয়াল খেলোয়াড় ছিলেন। যদিও তাঁর বয়স হয়েছিল আশী, তবুও দেশ-বিদেশের কোন তরোয়াল খেলোয়াড় তাঁর সামনে তরোয়াল ধরতে চাইত না। সেই ওস্তাদের ছিল এক শিষ্য। ওস্তাদ তাকে তাঁর যাবতীয় বিদ্যা শিখিয়েছিলেন।

একদিন রাজদরবারে বুড়ো ওস্তাদ যেতে পারেন নি। সভাসদরা সকলেই বুড়ো ওস্তাদের তারিফ করে বলতে লাগলেন, 'এমন ওস্তাদ পৃথিবীতে আর হয় না'। হঠাৎ শিষ্যটি বলে উঠলেন, 'ওস্তাদ কিন্তু আমার সঙ্গে পারবেন না, তাঁর সকল বিদ্যাই আমার জানা আছে আর তিনি বয়সে বৃদ্ধ, আমি তরুণ। তাই তিনি কিছুতেই আমার সঙ্গে পেরে উঠবেন না।'

সভাসদরা সকলেই বিরক্ত হলেও চুপ করে রইলেন। রাজার কিন্তু কথাটা ভাল লাগল না। তিনি গুণের কদর করতেন, তাই তাঁর প্রচুর সুনাম ছিল। রাজা শিষ্যটিকে বললেন, 'তোমার কথার প্রমাণ দিতে হবে।' শিষ্য তখনই বলে উঠল, 'আমি লড়াই করে দেখিয়ে দেব। রাজা বললেন, 'তাই হবে।' সভাসদরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'কি নেমকহারাম।' কিছুক্ষণ পরে গুরু রাজ-দরবারে এসে সব কিছু শুনে খুব দুঃখিত হলেন। পরক্ষণেই তিনি বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, আমি লড়তে প্রস্তুত।' সভাসদরা তখন তাঁকে বোঝাতে লাগলেন যে, তিনি তো তাঁর সকল বিদ্যা ওকে শিখিয়ে দিয়েছেন, এখন ও জিতে যাবে ওর গায়ের জোরে।' গুরু কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি রাজাকে জানিয়ে দিলেন যে কালই তিনি শিষ্যের সঙ্গে লড়বেন।

পরের দিন ময়দানে ভীষণ ভিড়। গুরু এসে ঢুকলেন সবার শেষে। কোমরে ঝুলছে একখানি কুড়ি হাত লম্বা তলোয়ারের খাপ। তলোয়ারের বাঁটের উপর হীরা-জহরতের কাজ করা। একজন ভৃত্য তলোয়ারের খাপের পিছন দিকটা ধরে নিয়ে এল। শিষ্য তখন চীৎকার করে রাজামহাশয়কে বলে উঠল, 'মহারাজ, আমার তলোয়ার মাত্র আড়াই হাত লম্বা, আর উনি তো কুড়ি হাত লম্বা তলোয়ার নিয়ে এসেছেন, দূর থেকেই আমায় কেটে ফেলবেন।' গুরু তখন বলে উঠলেন, 'এরকম তলোয়ার দিয়ে যে লড়াই করা চলবে না,' সে কথা তো কালকে বলনি। যাই হোক কালকে তুমি তোমার পছন্দমত তলোয়ার নিয়ে এস।' শিষ্যের অনুরোধে রাজা ঘোষণা করলেন যে তিনদিনের পরে লড়াই হবে।

তিনদিন পরে শিষ্য বাইশ হাত লম্বা এক তলোয়াল নিয়ে এসে হাজির। লড়াই সুরু হবার আগে গুরু তাকে বারবার বোঝাতে লাগলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে পারবে না। এখনও নিরস্ত হও।' শিষ্য কিন্তু অটল, সে লড়বেই।

রাজা তখন দু'জনকে প্রস্তুত হতে বললেন। একটু পরে যেই বলেছেন 'আরম্ভ হোক', অমনি সঙ্গে সঙ্গে গুরু তলোয়ারের খাপ হতে একটি দু'হাত লম্বা তলোয়ার বের করে কোমর হতে খাপ ফেলে দিয়ে শিষ্যের গলা চেপে ধরলেন। শিষ্য তখনও বাইশ হাত লম্বা তলোয়ার খাপ হতে বের করতে পারেনি। তত বড় তলোয়ার কি সহজে বার করা যায়। গুরু তখন তলোয়ার উঁচিয়ে শিষ্যকে বললেন, 'এবার হার মানলে তো? তাই বলছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে পারবে না। তোমাকে আমি তলোয়ার খেলার সব কৌশল শিখিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ কৌশলটা তলোয়ার খেলার নয়। আর এ কৌশলটা আমার মাথায় এল, যখন তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করতে চাইলে।'

জনতা ওস্তাদের জয়ধ্বনি করে উঠল। রাজা ওস্তাদকে জড়িয়ে ধরলেন আর শিষ্য ওস্তাদের পা ধরে ক্ষমাভিক্ষা করলেন।

সকল গুণীর সকল কলাকৌশল শেষ হয়ে যাবার পরও ওস্তাদের কাছ হতে এমন নতুন কিছু বেরোয় যা সকলকে অবাক করে দেয়, তাই প্রবাদ আছে 'ওস্তাদের মার শেষ রাত।'

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বাণী

যে ব্যক্তি রাতে শুতে দেরি করে না আর প্রত্যূষে ওঠে, সে স্বাস্থ্য, সম্পদ ও জ্ঞানের অধিকারী হয়।

*

কাঁচ, চীনামাটির বাসন ও সুনাম—এ তিনই অতিশয় ভঙ্গুর এবং একবার ভাঙলে এগুলি আর পুরোপুরি জোড়া লাগে না।

*

আমাদের একে অপরকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে হবে; বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে একা-একা মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

*

বন্ধুর ভাল করবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য; আর শত্রুর ভাল করবে তাকে জয় করার জন্য।

*

তুমি যদি টাকার মূল্য জানতে চাও, তবে বেরিয়ে গিয়ে একবার ধার করার চেষ্টা করে দেখ।

মূল ইতালীয় লেখক

এলভিও বারলেত্তানি

অনুবাদ করেছেন

শ্রীপ্রণতা দে

ভবঘুরে কুকুর ল্যাম্পো

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কিন্তু এমন ভুল মাত্র একবারই হয়েছে। দ্বিতীয়বার এমন কাজে ল্যাম্পো আর কখনও পড়েনি। সেই থেকে fast expressকে আলাদা করে চিনতে শিখল এবং তাকে এড়িয়ে চলত। আমাদের মানতেই হ'ল যে ওর কোন কষ্ট অনুভূতি আছে। শেষ পর্যন্ত ল্যাম্পোর শখের সম্বন্ধে আমরা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা বোঝা আরও সহজ হোত যদি আমরাও ধৈর্য ধরে, এক-আধবার ওকে অনুসরণ করতাম।

প্রথম প্রথম যখন ও এইরকম রেলযাত্রা শুরু করেছিল, অনেকসময় ওর ফিরতে দেরি হোত। ফলে আমাদের ভাবনা হোত। তাই ওর যাত্রায় আমরা রকমারী বাধা সৃষ্টি করতাম। বিশেষ কৃতকার্য কিন্তু হতাম না। যদি একটা গাড়ী থেকে ওকে জোর করে বের করতাম ও তড়াক্ করে লাফিয়ে অন্য আর একটা গাড়ীতে বসে পড়ত। যদি ওকে আপিস ঘরে বন্ধ করে রাখতাম ও বিচলিত হোত না। ঘুমিয়েই ওর বন্দী অবস্থাটুকু কাটিয়ে দিত। যেই প্রথম মওকাটি পেতো, যেত ওমনি তীরবেগে ছুটে যেত প্রথম যে গাড়ীটি ছাড়ছে তা'তে। বরং একচোট ঘুমিয়ে নিয়ে ও শরীরে, মনে আরও প্রফুল্ল বোধ করতে, ঈপ্সিত যাত্রাটির আনন্দের স্বাদ বেশী করে পেতো।

ল্যাম্পোর এক্সপ্রেস গাড়ীর ডাইনিং কার চিনতে পারা, অন্যান্য হাজার রকম ব্যাপারে ওর

অন্তর্দৃষ্টি, আমার মেয়ের স্কুলের সময় সম্বন্ধে ওর সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদির জন্য ল্যাম্পো বেজায় রকম বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল। এখন ওর রেলযাত্রার শখ ওকে আরও জনপ্রিয় করে তুলল।

ও যেন এমন করতেই জন্মেছিল। ওর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বেড়ানো। প্রথমে তো শুধু রেলবিভাগের লোকেরাই ওর কেরামতী দেখে বিস্মিত হোত। পরে ওর কথা চারদিকে প্রচার হয়ে সাধারণের ভেতরে ওর সম্বন্ধে বিস্ময় এবং অবিশ্বাস দুই-ই বেড়ে যেতে লাগল। ফলে ভ্রাম্যমাণ কুকুর "ল্যাম্পো" এই যথাযোগ্য নামে ল্যাম্পো পরিচিত হ'ল।

ল্যাম্পোর দোষাবলী

যাত্রী হিসেবে ল্যাম্পো যেরকম কেরামতী ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে লাগল, তাতে বোঝা গেল যে ল্যাম্পো একদিন বিখ্যাত হবেই। ওর গুণগ্রাহীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল, আর ও অবিরত ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগল। ও এক গাড়ী বদলে অন্য গাড়ীতে যায়, এক ষ্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যায়। নতুন নতুন ফার্ম, গ্রাম, শহর ও বাড়ীর সঙ্গে পরিচিত হতে থাকল ল্যাম্পো। যখন একটা বড় এলাকার সব ক'টি স্টেশন ওর জানা হয়ে যেত, তখন সেখানকার যে যে জায়গাগুলি ওর বিশেষ পছন্দসই, সেইগুলি আবার ঘুরে ঘুরে কখনও উপর্যুপরি ক'দিন ধরে দেখতে যেত। তারপর সেখানকার সব কিছু জানা ও দেখার শখ যখন ওর পূর্ণ হয়ে যেত, তখন অন্য স্টেশনের দিকে মন দিত। এইভাবেই চলত ওর ঘোরাফেরা।

রেল-বিভাগের লোকেরা মজা করে ওর গলাতে পুরোনো টিকিট বেঁধে দিত। রকমারী পুরোনো—যথা, দৈনিক টিকটে, রিটার্ন টিকিট, সাপ্তাহিক টিকিট ও মাসিক টিকিট। তাতে লেখা থাকত 'ভ্রাম্যমাণ কুকুর ল্যাম্পো'র জন্য ফ্রি পাশ।' ও এতে বেশ গর্ব বোধ করত, আর কেউ যদি ওর গলা থেকে বিশেষ 'পাশ' খুলে নেবার চেষ্টা করত, তা'হলে ভীষণ রেগে গিয়ে গর্‌গর্‌ করত। ল্যাম্পো কিন্তু ওর বেড়াবার শখের এতটা প্রচার ক'রে খুব বুদ্ধির কাজ করেনি। ও বুঝতে পারেনি যে শখ নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করলে তাতে বাধা পড়বার আশঙ্কা থাকতে পারে।

আমরা সকলেই একমত ছিলাম যে, এভাবে ট্রেনে বেড়িয়ে ল্যাম্পো একটা অসাধারণ কাজ করছে। কিন্তু এটাও বুঝতাম যে, এভাবে বিনা টিকিটে ঘুরে সে খুবই বে-আইনী কাজ করে চলেছে। রেলের আইনকানুনগুলোকে তো অগ্রাহ্য করবার নয়। অনেকে অবশ্য ল্যাম্পোর ব্যাপারে ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকত। কিন্তু এমন লোকও ছিলেন, যাঁরা লাল ফিতে বাঁধা আইন খুবই মেনে চলতেন। তাঁরা ল্যাম্পোর এভাবে বিনা টিকিটে বেড়ানোতে খুবই আপত্তি করতেন। তাঁরা যে কোনরকম হীন মনোবৃত্তি বা সংকীর্ণতার বশবর্তী হয়ে আপত্তি করতেন তা নয়। সত্যি কথা বলতে কী একটা কুকুরের মনে কী আছে কে জানে? গাড়ীর কোন

ক্ষতিও তো ও করতে পারে? যদি কোন যাত্রীকে কামড়ে দেয় তা'হলে রেল-বিভাগের কর্মচারীরা তাদের দায়িত্ববোধের কী কৈফিয়েৎ দেবে?

অতএব ওর রেলযাত্রায় বাধা দেবার সময় এল। কিন্তু কর্মচারীদের চোখে ধুলো দিয়ে সেয়ানা জন্তুটি বেশ নিজের মতলব তামিল করে নিতে। ও লুকিয়ে গাড়ীতে উঠে হয় সীটের নীচে, নয় বাথরুমের মধ্যে ঢুকে বসে থাকতো। প্রত্যেকবারই যে সফল হোত তা নয়। কিন্তু কোনদিনই হার মানবে না, এই ওর ছিল গুণ, হয়ত একটা কোচ থেকে তাড়া খেয়ে নেমে এল, ভাব দেখালো হার মেনে নিয়েছে, কিন্তু সে গাড়ী থেকে নেমেই একছুটে একেবারে শেষ বগিটাতে গিয়ে লাফিয়ে উঠত। এইভাবে রেলকর্মচারীদের ও খুব নাকাল করত। যারা ওর যাত্রাপথে বাধা দিতো, তাদের ল্যাম্পো কখনও ভুলত না। যদি তারা পরে কখনও ওর কাছে আসত, ওর সঙ্গে কথা বলত, কি ওর পিঠে চাপড়াতো, ও মুখ খিঁচিয়ে গর্জ্জন করে সরে যেত।

ওর এই ব্যবহারের জন্য ও আস্তে আস্তে অনেকের সহানুভূতি হারাতে লাগল। আগে যারা ওর সম্বন্ধে উদারচেতা ছিল তারাও এখন প্রতিপক্ষের দ্বারায় প্রভাবান্বিত হ'ল এবং ওর ট্রেনে ওঠায় বাধা দিতে লাগল।

আমরা ক্যাম্পিগ্‌লিয়ার কর্মচারীরা ওর অসাধারণ গুণাবলীতে এমন মুগ্ধ ছিলাম যে ওকে খুবই প্রশ্রয় দিতাম। ল্যাম্পো একেবারে দোষমুক্ত ছিল না। যদিও ওকে আমি খাটো করতে চাই না, তবুও সত্যি কথা বলতে কি অনেক ভাল গুণ সত্ত্বেও ও জেদি, অহংকারী, বদমেজাজী, খিট্‌খিটে এবং ক্ষমাহীন ছিল। যদি কোন রেলকর্মচারী বা কেউ কখনও ওকে বোকা বানিয়েছে তো ও তার কাজটি এত খারাপ বলে মনে করত যে অপরাধীর সঙ্গে ওর তৎক্ষণাৎ সব সম্পর্ক ছেদ করে দিত। আসলে ওর মধ্যে বিনয় ও অমায়িকতাটা ছিল কম এবং ঔদ্ধত্যটা ছিল বেশী। যারা ওকে একবার চিঠির থলেতে ভরে দিয়েছে বা কখনও ল্যাজে টিন বেঁধে দিয়েছে, অথবা যখন ও ঘুমিয়েছিল ওর কানের কাছে লাইনস্‌ম্যানের ভেঁপুটা বাজিয়ে দিয়েছে, ও কখনও তার বা তাদের রসিকতাকে ক্ষমা করেনি। এক বৃদ্ধ এঞ্জিন ড্রাইভারকে ল্যাম্পো কখনও মার্জনা করেনি। কারণ সে ওর মাথায় ষ্টেশন মাষ্টারের টুপি পরিয়ে সিগন্যাল-প্যালেটটি পাশে রেখে ওর চোখের ওপরে ফ্ল্যাশ জ্বেলে (আলোর জন্য) ছবি তুলেছিল। এমনকি পিওম্বিনোর সেই রেলওয়ে মজুর যে ওকে কুকুর-ধরার লোকদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ওর ঘাড় ধরে ওকে রেলওয়ে সীমানার বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তার ওপরেও ও খাপ্পা।

কিছুদিনের মত ল্যাম্পো বেড়ানো বন্ধ রাখল। কারণ ওকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। কিন্তু টিকিট-কালেক্‌টর্ ও আমাদের ষ্টেশন মাষ্টারের মধ্যে ল্যাম্পোকে নিয়ে অনেক আলোচনা

হয়ে গিয়েছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল, ল্যাম্পোকে ট্রেনে চড়ে বেড়াতে এত বেশী স্বাধীনতা দেবার ফল ভাল নাও হতে পারে। কাজেই, বেড়াবার নেশাগ্রস্ত এই কুকুরটির সম্বন্ধে এবারে একটা হেস্তনেস্ত হওয়া একান্তই আবশ্যক।

ষ্টেশন মাষ্টারের অবস্থা হয়েছিল বড়ই সঙ্কটজনক। উনি জানতেন আমরা সবাই ল্যাম্পোকে কিরকম পছন্দ করি, আর উনিও তা করতেন। নিজের কৃতিত্বের জোরেই উনি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে আজ এই বিশিষ্ট ষ্টেশনের অধিকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এখন ক্যাম্পিগলিয়া ষ্টেশনের সহজ ও ভালভাবে কাজকর্ম চলাবার গুরুদায়িত্ব ওঁরই মাথার ওপরে। প্রায় আটান্ন বছরের বৃদ্ধ উনি এবং গোলগাল বেঁটে ধরনের মানুষ। বাদামের মত দেখতে কালো কালো দুটি চোখ। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা পরতেন অনেক সময়। সব-সময় ছিমছাম পোষাকে থাকতেন এবং চেহারা সম্বন্ধে বেশ সচেতন ছিলেন। আসলে মানুষটি মোটেও কড়া ও কর্কশ ধরণের ছিলেন না। আমরা সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু সব বিষয় একটু বেশী সাবধানী ছিলেন, আর ঘাবড়ে গিয়ে কোন বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের হৈচৈ করতেন। আমাদের ব্যবহার এবং আচরণ সম্বন্ধে ওর অভিযোগ থাকতই। এখন চব্বিশ ঘণ্টা ওঁর মনের মধ্যে ঐ একই চিন্তা খোঁচা মারছে—"ওপরওয়ালার কাছে জবাবদিহি।" কথাটা ওঁর মুখে চিরকালই শুনে আসছি। যেখানে ওপরওয়ালার কোন প্রশ্ন ওঠে না—সেখানেও। উনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে এমনই বাতিকগ্রস্ত ছিলেন যে, সমস্ত আপিসময় একগাদা ছাইদানীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সত্ত্বেও কোথাও একটা দেশলাইয়ের কাঠি দেখলে ক্ষেপে আগুন হতেন। ওর সঙ্গে থাকাই তো আমাদের পক্ষে, বিশেষ করে ঝাড়ুদারদের একেবারেই দুরূহ ব্যাপার ছিল। তবুও বলব : ওঁর স্বভাবটি ভাল এবং উনি দয়ালু লোকই ছিলেন।

পূর্বে উল্লিখিত ঘটনাগুলির অভিযোগ ওঁর কাছে আসাতে, ল্যাম্পোর প্রতি ওঁর মনোভাব বদলে গেল এবং রীতিমত তার প্রতি উনি বিরূপ হয়ে পড়লেন। কুকুরটা অবশ্য এক্ষেত্রে যতটা সম্ভব সহজভাবে থাকা যায় তাই করল এবং ষ্টেশনমাষ্টারকে খুশি রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করত।

যাই হোক আমরাও সব দিক ভেবেচিন্তে ল্যাম্পোকে ট্রেনে চড়তে যতরকম উপায়ে নিরস্ত করা যায় সেই ধান্ধায় থাকতাম।　　　　(ক্রমশঃ)

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত

শ্রীনির্মল সরকার

সম্প্রতি চতুর্থ ও পঞ্চম টেষ্ট ক্রিকেট ম্যাচ কলকাতা এবং মাদ্রাজে হয়ে গেল। খেলায় হারজিত আছে; সুতরাং ভারত হেরে গেছে বলেই যে তাকে দোষারোপ করতে হবে এমন কোন কারণ নেই। ক্রিকেট জগতে অস্ট্রেলিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করেছে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। তার বিরুদ্ধে ভারত যেভাবে খেলেছে সেটাই এখন বিচার করতে হবে।

টিম গঠনে ভারত এবার নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সরিয়ে দিয়ে তরুণদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এতে সুফলই হয়েছে। বিশ্বনাথ, সোলকার, মানকড়, প্রসন্ন ও বেদী এরাই অগ্রগণ্য। প্রসন্ন বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার বলে স্বীকৃত হয়েছে। মাদ্রাজে প্রসন্নর কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ২ ইনিংসে সে দশটি উইকেট নিয়েছে। তারমধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২৪ রানে অস্ট্রেলিয়ার ছ'জন প্রথমশ্রেণীর ব্যাটসম্যানকে আউট করা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিষেন সিং বেদীও খুব ভাল বল করেছেন। কলকাতায় বেদী একাই অস্ট্রেলিয়ার আটজনকে আউট করেছে। ভেঙ্কটরাঘবন এবং অমরনাথও বোলার হিসেবে যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখিয়েছে। কিন্তু শুধু বোলার নিয়েই তো আর টিম চলে না, ভাল ব্যাটসম্যান এবং ফিল্ডারের প্রয়োজনও এই খেলার সমধিক। এদিক দিয়ে আমরা বেশ পিছিয়ে আছি বলেই মনে হয়। ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে মানকড় যদিও আগের টেষ্টগুলিতে ভাল রানই করেছিলেন, কিন্তু কলকাতা ও মাদ্রাজে সে শোচনীয়ভাবে বিফল হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারের উইকেটরক্ষণ যেমন ত্রুটিপূর্ণ, ব্যাটিং তেমনি ছেলেমানুষীর পর্যায়ে পড়ে। যেন ফেষ্টিভ্যাল ম্যাচ খেলতে নেমেছে, এমনই একটা ভাব তার ব্যবহারে ফুটে উঠেছিল।

সব খেলার মধ্যে ক্রিকেট খেলা হ'ল এমন, যাতে একজনকে এগারজনের বিরুদ্ধে খেলতে হয়। ব্যাটসম্যান একজন, কিন্তু তার প্রতিপক্ষে এগারজন খেলোয়াড় দাঁড়িয়েছে তাকে আউট করার জন্যে। সেই কারণে ক্রিকেট খেলার মধ্যে ধৈর্য, মনোবল এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন

সর্বাধিক। এইখানেই বিচ্যুতি ঘটেছে আমাদের ব্যাটসম্যানদের। কয়েকজন যেন খেলাকে ছেলেখেলা বলেই ধরে নিয়েছিল। তারা যে একটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে একথা যেন ভুলে গিয়েছিল। সে যাই হোক্, ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বিশ্বনাথ, ওয়াদেকার এবং মাদ্রাজে পতৌদি কিছুটা চেষ্টা করেছিল। বোলারদের আমরা অভিনন্দন জানাই তাদের সফলতার জন্য। চ্যাপেল, ওয়াল্টার্স, লরী, শিহান প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ব্যাটসম্যানদের তারা দস্তুরমত দমিয়ে রেখেছিল। ভারতের বোলারদের তারা রীতিমত সম্মান দেখিয়েছে। শুধু তাই নয়, অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন এবং ম্যানেজার, ভারতের টিমকে যে বেশ কষ্ট করেই হারাতে হয়েছে, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার খেলাও আশানুরূপ হয়নি বলেই অনেকের ধারণা। তাদের রান-সংখ্যা প্রত্যেক ইনিংসেই তিনশ'র নীচে ছিল। তাছাড়া তাদের ব্যাটিংও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় বলেই অনেকে মন্তব্য করেছেন। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রয়োজনের সময়ে তাঁরা অসীম ধৈর্য আর মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন। মাদ্রাজে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। ঠিক এই জায়গায় আমাদের খেলোয়াড়রা হেরেছে। মাঠে তাদের দেখলে মনে হয়েছে, তারা যেন কেউ কেউ সুস্থ নয়। ক্ষিপ্রতা ছিল না তাদের ভঙ্গিমায়, গতি ছিল তাদের মন্থর। অন্য দিকে অষ্ট্রেলীয় খেলোয়াড়দের আচরণ ছিল অনুকরণীয়। তারা মাঠে 'জিতব' এই মন নিয়েই যেন নেমেছিলেন।

অষ্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে চ্যাপেল, ওয়াল্টারস্ এবং রেডপাথ ভাল ব্যাট করেছেন। বোলার হিসাবে ম্যাকেঞ্জী ও ম্যালেট-ই প্রায় সব কৃতিত্ব ভাগ করে নিয়েছে।

একথা সকলেই জানে যে, চরিত্র-গঠনের দিক দিয়ে ক্রিকেট খেলাকে বিশেষ একটি স্থান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং খেলোয়াড়দের ব্যবহার খেলোয়াড়-সুলভ হবে বলে সকলে আশা রাখেন। সেদিক দিয়ে ইডেন উদ্যানে অষ্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন বিল লরীর ব্যবহার কেউই সমর্থন করেন নি। অপরপক্ষে অব্যবস্থা ও নিয়ম না মেনে চললে যে কি ভয়াবহ দুর্ঘটনা হতে পরে, তার প্রমাণ কলকাতার টেষ্ট ম্যাচে সকলেই দেখেছেন।

সে যাই হোক, তোমাদের মধ্যে যারা ক্রিকেট ভালবাস এবং খেলে থাক, তাদের অনুরোধ করব, তারা যেন যত্ন নিয়ে অনুশীলন করে। কেবলমাত্র সীজন এলেই ক্রিকেট খেলব, এ ধারণা থাকলে কোনদিনই ভাল খেলোয়াড় হতে পারবে না। সারা বছরই প্র্যাকটিস করতে হবে। একাগ্রচিত্তে এবং ধৈর্যসহকারে যদি নিয়মমত প্র্যাকটিস কর তা'হলে ভবিষ্যতে তোমরাই বা টেষ্টম্যাচে জায়গা পাবে না কেন?

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট একমাত্র নজির

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে এক ইনিংসের খেলায় 'ডাবল' সেঞ্চুরী : ২৮৭ রান—আর ই ফস্টার (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, সিডনি, ১৯০৩-৪।

একটি সিরিজে দু'বার একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী : ক্লাইভ ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫ সালের সিরিজ। সেঞ্চুরী : ১২৬ ও ১১০ রান (ত্রিনিদাদ) এবং ১৫৫ ও ১১০ রান (কিংস্টন)।

একদিনের খেলায় ব্যক্তিগত ৩০০ রান : ৩০৯ রান—স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লিডস, ১৯৩০।

একদিনের খেলায় দলগত ৫০০ রান : ৫০২ রান (২ উইকেটে)—ইংল্যাণ্ড (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা), লর্ডস, ১৯২৪ সালের ৩০শে জুন।

টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ৭০০০ রান : ৭২৪৯ রান (৮৫টি টেস্টে)—ওয়ালী হ্যামণ্ড (ইংল্যাণ্ড)

এক ইনিংসে দলগত ৯০০ রান : ৯০৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)—ইংল্যাণ্ড (বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া), ওভাল, ১৯৩৮।

এক সিরিজে ৫টি সেঞ্চুরি : ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫।

উপর্যুপরি ৫টি ইনিংসে সেঞ্চুরী : এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)—১৯৪৭-৪৮ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১টি এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৪টি।

এক ইনিংসে ১০টি ওভার বাউণ্ডারী : ১৯৩২-৩৩ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে অক্‌ল্যাণ্ডে ওয়ালী হ্যামণ্ড (ইংল্যাণ্ড) তাঁর নট আউট ৩৩৬ রানে এই ১০টি ওভার বাউণ্ডারী করেন।

টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ৩০০ উইকেট : ৩০৭টি (৬৬২৫ রানে)—ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড), ৬৭টি টেস্ট খেলায়।

এক ইনিংসে ১০টি উইকেট : ৫৩ রানে ১০ উইকেট—জেমস লেকার (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬।

একটি খেলার উভয় ইনিংসে 'হ্যাটট্রিক' : হাগ ট্রাম্বল (অষ্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, মেলবোর্ণ, ১৯০১-২।

টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে হ্যাটট্রিক এবং সেঞ্চুরী : ইংল্যাণ্ডের জে ব্রিগস এই নজির সৃষ্টি করেন। এক ইনিংসে তাঁর সেঞ্চুরী (১২১ রান) অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মেলবোর্ণে ১৮৮৪-৮৫ সালে এবং হ্যাটট্রিক—অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনিতে ১৮৯১-৯২ সালে।

দলের শূন্য রানের মাথায় ৪৯ উইকেট পতন : ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লিডস মাঠের প্রথম টেস্টে ভারতবর্ষ কোন রান সংগ্রহ করার আগেই দ্বিতীয় ইনিংসের চারটি উইকেট খুইয়েছিল।

খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে হ্যাটট্রিক : এম জে সি এ্যালম (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ক্রাইস্টচার্চ, ১৯২৯-৩০।

একটি খেলার ৪র্থ ইনিংসে ৬০০ রান : ৬৫৪ রান (উইকেটে)—ইংল্যাণ্ড (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা), ডার্বান, ১৯৩৮-৩৯। এই খেলায় ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের জন্যে ৬৯৬ রানের প্রয়োজন ছিল।

ক্রিকেটের 'obstructing the field' আইন ভঙ্গের জন্য আউট : লেন হাটন (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ওভাল, ১৯৫১।

নেতাজীকে

শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য

রক্ত দিয়ে ফুটিয়ে গেলে
স্বাধীনতার ফুল
বীর নেতাজী ক'জন আছে
তোমার সমতুল !
তোমার কথা যতই ভাবি
অবাক হয়ে রই
ইচ্ছে করে তোমার মত
মস্ত বড় হই।

'আজাদ' গড়ে বৃটিশ রাজে
হানলে আঘাত জোর
চেতনা হারা ভগ্ন জাতির
ভাঙলো ঘুমের দোর।
বীর নেতাজী তোমার নামে
গর্বে ফোলাই বুক
তোমার গানে আমরা সবাই
ভুলি সকল দুখ।

ভোরের এসপ্ল্যানেড

শ্রীজয়ন্তী সরকার

ঘুমটা বড্ড তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল। ঘড়িটা টিক্‌টিক্ শব্দে বেজেই চলেছে। আলোটা জেলে দেখি সবে সাড়ে চারটে। বসলাম গিয়ে বারান্দায়। বাগানের ফুলগুলোর আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙছে। শিশু বয়সের কবিকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। কারণ, 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল', আজও বেশ মনে আছে। গরমের সকাল, তাই পাখীদেরও বোধহয় তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙেছে। হঠাৎ মনে হ'ল, একটু বেড়িয়ে আসি। ঘড়িতে তখন পাঁচটা। দরজার খিলটা আস্তে খুলে বেরিয়ে পড়লাম কোন একটা কিছুর খোঁজে। হেঁটেই চলেছি—কোথায় চলেছি হুঁস নেই। হঠাৎ চেয়ে দেখি, সামনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একি! হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেডে এসে পড়েছি! চারিদিক অসম্ভব নির্জন। নেই কোন জনকোলাহল বা কোন অকারণ গোলমাল। ইংরেজ শাসকদের বহু স্মৃতি-বিজড়িত সেই গল্‌ফ্ খেলার মাঠটাও জনশূন্য। দেখে মনে হ'ল, এরা যেন কেউ কোনদিন জাগেনি। এই রাস্তার বুকে কেউ হাঁটেনি, কারুর সুখ-দুঃখের কথা গ্রহণ করেনি এ। ভোরের সূর্যের অরুণ-রাঙা আলো ঝিলিক দিচ্ছে ভিক্টোরিয়ার চূড়োয়। রাস্তাগুলো জলে ভিজে। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় ধুলো পরিষ্কারের জন্য জল দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে গেছে রাস্তা। মেমোরিয়ালের কালো পরীটাকে নিয়ে একটা সুন্দর গল্প পড়েছিলাম একটা বইতে। আমারও মনে হ'ল যেন কালো পরীটা সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে এসে আবার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঐ যে দূরে দু'একজন লোক দেখা যাচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততায় বোধহয় আর ওদের বিশ্রাম নেবার নেই। তাই বেড়িয়ে পড়েছে কাজের তাড়ায়। কিন্তু আজ কি আমার কোন তাড়া নেই? মনে তো হচ্ছে না। ভাবতে ভাল লাগছে, আমি মুক্তি পেয়েছি। সত্যিই মুক্তি, প্রকৃতির মধ্যে এই মুক্তির আনন্দ যে পেয়েছে, সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না এই ভাললাগার সার্থকতা। তাই অপার আনন্দে আর মনের সুখে গেয়ে উঠলাম—

"কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা, মনে, মনে।"···

এই ইঁট-কাঠের নীরস কলকাতায় এত অদ্ভুত একটা অনুভূতি খুঁজে পাব, কোনদিন ভাবিনি। কোথায় প্রতিদিনের সেই চিরপরিচিত কলকাতা! কোথায় সেই কেতাদুরস্ত, সৌখীন এসপ্ল্যানেডের সত্যি চেহারা! বড় বড় দোকানের ঝাঁপিগুলো তালাবন্ধ। টিউব লাইটের আলোগুলোও চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে না। মোটের উপর, এখন নেই কোন কৃত্রিমতা। সবটাই প্রকৃতিদেবীর দখলে, কি সুন্দর এই সকাল, কি সুন্দর এই শহর! কলকাতার একটা

বৈশিষ্ট্য-ভরা ছবি ফুটে উঠল চোখের সামনে। এখানে আছে চরম দারিদ্র্য, আছে প্রাচুর্য। আছে জঞ্জাল, আবার আছে 'শান্তির নীড়' ভিক্টোরিয়ার প্রান্তর। খুঁজে পাওয়া যায় না প্রকৃতির একটুকরো স্পর্শ, আবার চোখ চেয়ে দেখলে ওরই মধ্যে পাওয়া যায় প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোলটিকে—বিচিত্র ভাবনায় ভরে গিয়েছিল মনটা। কখন এসে বসে পড়েছি মেমোরিয়ালের মাঠে, বুঝতে পারিনি। চমক ভাঙল এক বৃদ্ধের গলার স্বরে, "ক'টা বাজল, মা ?" হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি ছ'টা! এক ঘণ্টা কেটে গেল! সময় কি সত্যিই ম্যাজিক নাকি ? উঃ! আবার ফিরে যেতে হবে সেই একঘেয়ে জীবনের মধ্যে। কবে আর খুঁজে পাব এই মনোহর সকালটিকে ? কিন্তু উপায় নেই। ফিরে যেতেই হবে। তাই মনের ব্যথা মনেই রেখে পা বাড়ালাম ঘরের মুখে। তারপর আবার মিশে গেছি 'প্রাণধারণের আর দিনযাপনের গ্লানিতে।' তার মধ্যেও যেদিন এসেছে একটু অবসর, একটু ক্লান্তি, সেদিনই মনের কোণে ভেসে উঠেছে ভোরের এস্প্ল্যানেডের সেই আবছা ঘুমভাঙা পাখীডাকা সকালটির ছবি।

॥ একটি ছড়া ॥

শ্রীঅতীন মজুমদার

তবলাতে বোল তোলে উজবুক খাঁ।
তেরে কেটে ধিন তা, ধেরে কেটে ধা।
তাই শুনে খড়দা'র বড়দা' তো হাঁ!
দাশরথি দাঁ বলে ঃ বাঃ—বাঃ—বাঃ!
হাঁটুতে যে তাল ঠোকে ভগবতী তা,
নেচে ওঠে ঘাটালের শ্রীনিবাস ঝা,
হৈ চৈ-য়ে খুকু কেঁদে ডাকে—মা-মা!
ভড়কিয়ে ব্যা ব্যা করে ছাগলের ছা,
শেষকালে রেগে গিয়ে রঘুবীর শা,
তবলা ফাঁসাল দিয়ে জোর এক ঘা!
ভয় পেয়ে সব চুপ,—মুখে নেই রা।

১। জীয়ন্তে মৌনী সে মরিলে ডাল ডাকে,
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে।
আনে নর তারে ঘরে মঙ্গল বিধানে,
চতুবর্ণে চুম্বে তার পবিত্র বদনে।

শ্রীরাজা বিশ্বাস (পাটনা)

২। তিন ফুঁয়ের কাজ করে ভাই যারা,
বলো দেখি তারা সব কারা ?

শ্রীসুজন কর (মুর্শিদাবাদ)

৩। তিন বর্ণ সংযোগেতে
কিবা কথা হয়,
মস্তক ছাড়িলে পরে
'পাণি' অর্থ হয়।
মধ্যম ত্যজিলে তার
'চতুর্থ' বুঝাবে,
লেজ বিনা যার মধ্যে
মিষ্টরস পাবে।

কুমারী মঞ্জুলা দেব (দুর্গাপুর)

৪। যাহা সকলেই চায়, সকলেই দেয়,
কিন্তু কেহই লয় না, সে জিনিসটি কি ?

শ্রীভরদ্বাজ সাউ (কটক)

৫। কোন একটি লোক নবদ্বীপ যাচ্ছিলেন। পথে চার জায়গায় কালী-মন্দির থাকায় তিনি মানস করেছিলেন যে, তাঁর কাছে যে অর্থ আছে তা দ্বিগুণ হলে প্রথম মন্দিরে দু'টাকা দিয়ে পূজা দেবেন। এই ভাবে অর্থ দ্বিগুণ হওয়ায় প্রথম মন্দিরে দু'টাকা দিয়ে পূজা দিয়েছিলেন এবং পর পর ঐ মানসিক মত প্রত্যেক জায়গায় অর্থ দ্বিগুণ হওয়ায় ঐ মত দু'টাকা দিয়ে পূজা দিয়েছিলেন। কিন্তু ৪র্থ মন্দিরে দু'টাকা দিয়ে তাঁর সব অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেল। বল দেখি বেরুবার সময় তাঁর হাতে কত অর্থ ছিল।

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

শ্রীকরুণা মিত্র (ধুবড়ী)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। একটি কমল ও দুইটি অলি। ২। আম ৩। সাপ কাঁধে নিয়ে ষাঁড়ের উপর বসে মহাদেব। ৪। ৮ বানর ৪০ টাকা, ১০ ভেড়া ৪০ টাকা, ৩২ খরগোস ১৬ টাকা, ৪০ সাদা ইঁদুর ৪ টাকা ৫। প্রথম বালক বাইরে যাবার সময় একটা দরজার কড়ায় তালা লাগিয়ে যাবে। দ্বিতীয় বালক অপর দরজার কড়ায় তালা লাগিয়ে যাবে। তৃতীয় বালক দুটি দরজাই বন্ধ করে ঐ তালা দুটির কড়ার ভেতর দিয়ে আপনার তালা লাগাবে। তাহলে সে যখন বাইরে যাবে, ঘর একেবারে বন্ধ হ'ল। অথচ, যে যখন আসবে নিজের চাবির সাহায্যে আপনার তালা খুলে ঘরে ঢুকতে পারবে।
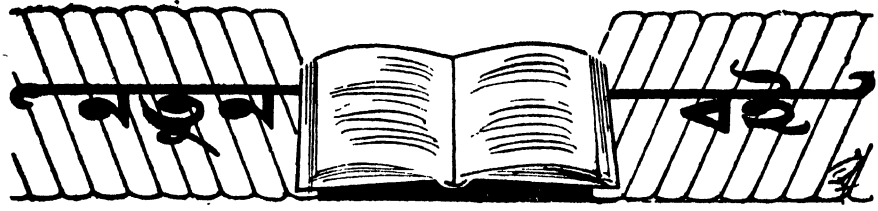
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

চলো যাই দূর দেশে—ডঃ দিলীপ মালাকার। প্যাপিরাস, ৯, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯। মূল্য ২'৫০

ডক্টর মালাকার ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক। পৃথিবীর নানা দেশ তিনি ঘুরেছেন, নানা জিনিস দেখেছেন। দেখেছেন তাঁর সজাগ দৃষ্টি মেলে, খোলা মন নিয়ে। ইউরোপের এই দেশগুলির বিচিত্র কাহিনী তোমাদের মত করে সহজ সুন্দর ভাষায় পরিবেশন করেছেন লেখক এই বইখানির মধ্যে। বিশেষ করে ফ্রান্সে ছেলেমেয়েরা, ছাত্র-ছাত্রীরা কি ভাবে আনন্দ-উৎসবের মধ্যে দিয়ে পড়াশোনা করে, সরকার বা স্কুলের কর্তৃপক্ষরা তাদের স্বাস্থ্য ও খেলাধূলার প্রতি কতটা যে সজাগ, তা জানা যায় বইখানি পড়লে।

এছাড়া বইখানির শেষের দিকে ভারী মজার ও উপভোগ্য কয়েকটি কাহিনী আছে বিদেশের ঘটনা নিয়ে। সান্তা ক্লাউস, ওয়ালু, ফানুস, পুলিস-পুলিস খেলা, আপেল চোর, জমিদার কাহিনী, প্রতিধ্বনি ও টিরোলের দেশপ্রেমিক তোমাদের সকলেরই ভাল লাগবে। তাছাড়া এই বই তোমাদের জ্ঞানের সীমানাও বাড়িয়ে দেবে এবং ইউরোপের মানুষজন ও তাদের চালচলন সম্বন্ধেও অনেক কিছুই জানতে পারবে তোমরা। রঙিন প্রচ্ছদপটটি ভারী মনোরম।

বাংলার বিদুষী—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। মূল্য ২'৫০

আমাদের দেশে অনেক মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে নানা ধরনের মহিলা আছেন। আলোচ্য বইয়ের লেখক তাঁদের মধ্যে থেকে বিশেষ ভাবে কবি, বাগ্মী, লেখিকা ও প্রতিভাময়ী ষোল-জন নারীর জীবন-কথা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এ থেকে দেশের মেয়েরা প্রভূত উৎসাহিত হবে ও জ্ঞানলাভ করবে। এই ষোলজনের মধ্যে আছেন—চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী, বৈজয়ন্তী, প্রিয়ংবদা, দ্রবময়ী, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, প্রসন্নময়ী দেবী ও প্রিয়ংবদা দেবী, সরলা দেবী চৌধুরাণী, উমা দেবী, তরু দত্ত, বেগম রোকেয়া, সরোজিনী নাইডু, লীলা রায়।

প্রত্যেকের একটি লাইন ব্লক ও সেই সঙ্গে একটি হাফটোন চিত্রও আছে। বইখানি মেয়েদের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে ঘরে ঘরে স্থান পাওয়া উচিত।

কেনারাম—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ০০.৭৫

বড় টাইপে ছাপা খুব ছোটদের যুক্ত-অক্ষর বর্জিত গল্পের বই। কেনারাম ছিল ডাকাত, কিন্তু পূর্ববঙ্গের ভক্ত-কবি বংশী-দাসের সংস্পর্শে এসে সেই ডাকাত কিভাবে ভগবদ্‌ভক্ত হয়ে উঠেছিল, সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীটি সহজ ও সাবলীলভাবে এর ছোট্ট অথচ সুন্দর বইখানির মধ্যে বলা হয়েছে। বইখানির চারটি সংস্করণ হয়েছে। কভারের ছবিটি ভারী সুন্দর।

ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীনির্মল রায়। প্রকাশক: শ্রীবিশ্বনাথ রায়, বারাসাত। প্রাপ্তিস্থান: গ্রন্থকারের নিকট বালুড়িয়া, নবপল্লী, পোঃ বারাসাত, ২৪ পরগণা। মূল্য ১.০০

ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান দুটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক বিষয়। এর মধ্যে অসংখ্য জিনিসের নাম করা যায়। কিন্তু অধ্যাপক রায় ছোটদের উপযোগী এই বইখানির মধ্যে কয়েকটি মাত্র শিল্প ও বিজ্ঞানের বিষয় সুন্দর ও সহজভাবে গল্পচ্ছলে বলেছেন।

প্রথমেই তিনি শিল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, 'শিল্প বলতে কি বোঝায়' তা যেমন বলেছেন, তেমনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায়'। শিল্পের মধ্যে প্রধানতঃ আছে—কুটিরশিল্প, পশুপালন শিল্প, রঙ শিল্প ও কাঁচ শিল্পের বিষয় এবং বিজ্ঞানের মধ্যে আছে—কৃষি শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, মহাকাশবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়।

বইখানিতে বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় থাকলে ভাল হ'ত। তাহলেও এই বই থেকে তোমরা অনেক জ্ঞানলাভ করবে।

সম্পাদক: শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০.৬০ পয়সা

খেলার তোড়জোড়

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্র *

৫০শ বর্ষ]　　ফাল্গুন ঃ ১৩৭৬　　[১১শ সংখ্যা

রাবণ রাজা

শ্রীকার্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য

লংকা দ্বীপের রাবণ রাজার দশটা যদি মাথা—
রোদ-বাদলে লাগ্‌তো কি তার গণ্ডা আড়াই ছাতা ?
দশটা মাথা, এক কুড়ি হাত, কেমন করে শুতো ?
পাশ ফিরতেন কেমন করে ভাবতে লাগে গুঁতো !
কেমন করে পরতো রাজা মালা মতির হার ?
দশটা মাথা গলিয়ে মালা, ক্যামনে হ'ত পার ?
চাঁচতে দাড়ি নাপিত ভায়ার লাগ্‌তো কতক্ষণ ?
বাব্‌রী ছাঁটার দিনে কি তার বিগ্‌ড়ে যেতো মন ?
ছেলেবেলায় দশটি মুখে কাঁদতো যখন জোরে—
সেই আওয়াজে বাড়ীর লোকে টিকতো কেমন করে ?
মা নিকষা কেমন করে নিতো তারে কোলে ?
কোন্ মুখেতে দিত চুমু মানিক আমার বলে ?
দশটি মুখে তুললে হাই, কয়টা দিত তুড়ি ?
কেমন করে দুধ খাওয়াতো মা নিকষা বুড়ী ?

লুকোচুরি খেল্‌তে যখন ঢুক্‌ত খাটের নীচে—
ঠুক্‌তো কি তার দশটা মাথা, করলে তাড়া পিছে ?
কাক তাড়াতে ক'খান হাতে ছুঁড়তো রাজা ইট্ ?
গরমকালে ক'খান হাতে চুল্‌কে নিতো পিঠ ?
ক'খান হাতে কাট্‌তো সাঁতার, ক'খান হাতে খেতো,
দু'খান পায়ে রাবণ রাজা কেমন ক'রে যেতো ?
পাঠশালাতে ভুল্‌তো যখন পড়া কিংবা আঁক,
কয়টা কানে গুরুমশাই দিতেন ক'ষে পাক ?
জ্বরজাড়িতে রাবণ রাজা শয্যা যখন নিতো,
বদ্যি এসে কোন বগলে থার্মোমিটার দিতো ?
একটা মুখে তেতো ওষুধ দিতো যখন ঢেলে,
আর ন'টা মুখ হেসে হেসে দেখতো কি চোখ মেলে ?
গভীর ঘুমের ঘোরে যখন ডাকত রাজার নাক,
ভাবতো লোকে বাজছে বুঝি বিয়ে বাড়ীর শাঁখ ?
কয়টা হাতে রাবণ রাজা দিত গানের তাল ?
রাগলে পরে কয়টা মুখে পাড়তো বসে গাল ?
কোন মুখেতে টানতো তামাক, কোন মুখেতে বিড়ি ?
বস্‌তো যখন সিংহাসনে দিয়ে আসনপিঁড়ি ?
হদিস্ না পাই ভেবে ভেবে রাবণ রাজার দশা,
কোন্ মুখেতে তেঁতুল খেতো, কোন্ মুখেতে শশা ?
রামের বাণে কুড়ি চোখে দেখলো যখন ধোঁয়া,
কয়টা হাতে তুল্‌লো পটল ফেলে মুড়ির মোয়া ?
এসব কথা কোন্ পুঁথিতে কোথায় আছে লেখা,
পাওয়া গেলে এমন পুঁথি, অনেক যেতো শেখা ॥

ভাই ভাই ভাই
মামার বাড়ি যাই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

টুলটুলি পাটনার থেকে এসেছিল কলকাতায়। সামার ভ্যাকেশনে মামার বাড়ি বেড়াতে। আমার বাসায় পা দিয়েই সে দুঃখ করল আমার মামী নেই বলে।

'আবার আমার মামী কিরে, তোর মামী বল্।'

'ওই হোলো।' বলে তার দ্বিতীয় দফার খেদোক্তির শুরুতেই আমি ওর স্বরটা পালটাতে চাইলাম—'ইতু কেমন আছে বল্।'

'মা? ফাস্ ক্লাস্।'

'পরিমল?'

'বাবা? ফাস্ ক্লাস্।'

'তুই যে ফাস্ ক্লাস আছিস তা তো দেখতেই পাচ্ছি, তোকে আর বলতে হবে না। এখন ......' বলে অন্য কথা পাড়ি—'এতটা পথ এলি কি করে?'

'ফাস্ ক্লাস?'

'ফাস্ ক্লাস—তার মানে?'

'রিজার্ভেশন করে আমায় ফাস্ ক্লাসে তুলে দিয়েছিল কাল সন্ধেয়—আর আজ সকালে হাওড়ায় নেমে ট্যাক্সি চেপে সোজা চলে এলুম এখানে। ফাস্ ক্লাস জার্নি, বুঝলে মামা?'

বলে আবার সে তার পুরনো দুঃখের পুনরুক্তি করতেই আমি বাধা দিলাম—'মামীকে পাচ্ছিস না তো কী হয়েছে? মামী তো তোর জন্ম থেকেই নেই। এজন্মেই নেই—থাকবেও না, থাকাতেও চাইনে। কিন্তু মামীকে না পাস আমাকে তো পাচ্ছিস্? মামাকে পাচ্ছিস তো। মামাকে দিয়ে কি তোর মামীর আশ্ মেটে না রে?'

'দুধের সোয়াদ ঘোলে?'

ঘোল খাওয়ানোতে আমার রাগ হয়—'বেশ, মামী নেই, মাসী তো রয়েছে। বিনি মাসী তো আছে এখানে।' আমি বলি।

'বিনা মামীর দুঃখু কি বিনি মাসীতে মেটে মামা?' টুলটুলি এবার তার কথার তালে ছড়ার টুলটুল বাজায়—'ভাই ভাই ভাই! মামার বাড়ি যাই! মামী দিল দুধে ভাতে চেটেপুটে খাই!! এর ভেতরে মাসীর কোনো কথাই নেই মামা!'

কলকাতায় ক'দিন টুলটুল খুব ফুর্তিতেই কাটালো। সিনেমা দেখল, সার্কাস দেখল, চিড়িয়াখানা দেখল, মিউজিয়াম দেখল, ফুলের প্রদর্শনী আর প্ল্যানেটরিয়ম গেল—বিনিকে

নিয়ে। আমাকে কোনো ট্রাবল্ দিল না। ওর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমি টলটল করতে লাগলাম অন্তরে অন্তরে।

অবশেষে ওর ফেরার দিন আসতেই বাধল ফ্যাসাদ। বিনি বলল, ওকে সঙ্গে করে পাটনায় পৌঁছে দিয়ে আসতে।

বাধা দিল সে-ই। 'কেন বিনি মাসী, আমি একলা কেমন তোফা এলাম, আর একলা ফিরে যেতে পারব না? মামাকে আবার কেন আমার সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছ? মামার কত কাজ কলকাতায়। আমি তুফান মেলে তোফা চলে যাব।'

আমার সাফাই সে-ই ভালো গাইল। আমি কেবল ডিটো দিলাম তার কথায়—'সত্যিই তো। টুলটুলি কি আর সেকেলে মেয়ে নাকি! রীতিমতন আধুনিকা আগামী যুগের মহিলা।'

'ঠিক বলেছো শিব্রাম্ মামা। এই জন্যেই তোমাকে আমি এত ভালোবাসি।'

আমিও ওর ভালোবাসার ব্যত্যয় করতে চাই না। বলি যে, 'হঁা, একলাই যাবে। নিজের দায়িত্ব নিতে শিখুক্। আমি বরং হাওড়ায় গিয়ে টিকিট কিনে একটা খালি গাড় দেখে ভালো জায়গায় ওকে বসিয়ে দিয়ে আসব।'

'তারও দরকার হবে না। মামা, তুমি আমায় একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও কেবল। আমি নিজেই গিয়ে টিকিট কেটে গাড়ি দেখে চেপে বসতে পারব—তুমি একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও খালি।'

'খালি ট্যাক্সি কি আর পাওয়া যায় রে কলকাতায়? দেখাই মেলেনা রাস্তায়। তোকে বাসে করে নিয়ে যাচ্ছি চ।...'

'বাসে বেজায় ভিড় মামা।'

'তোর আবার ভিড় কিসের! যতই ভিড় থাক, তুই যেতে না যেতেই লেডিজ্ সীট ফাঁক হয়ে যাবে, তোর পাশপোর্ট বগলে নিয়ে চাই কি আমিও সেই ভিড়ের ভেতর পাশে বসে যেতে পারব আরামে, তোকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সেই সুবিধে।'

'তোর মামা যা কঞ্জুস, তোকে আবার ট্যাক্সি করে নিয়ে যাবে—সেই আশাতেই বসে থাক! চকরবরতিরা ভারী কঞ্জুস হয় জানিস নে!'

'টের পেয়েছি কালকেই—মামার সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে। ফুল হাউস ছিল কাল, একখানাও টিকিট নেই। কেবল সাড়ে তিন টাকার খান কয়েক ব্যালকনির সীট বাকী। তাই কিনতে বললাম মামাকে। মামা বললে, দাঁড়া, এখুনি দশ আনার টিকিট দিতে শুরু করবে, ঘাবড়াচ্ছিস্ কেন? সে কী লম্বা লাইন দশ আনায়, কী বলব! মামা বললে আমায়, যা সামনে গিয়ে দু'খানা টিকিট কেটে নিয়ায়। আমি টিকিট কাটলে তিন শো লোকের পরে গিয়ে দাঁড়াতে

হবে এখন, লাইনের আদ্ধেক না পেরুতেই সব টিকিট খতম্‌ হয়ে যাবে। তুই আগে গিয়ে কাটলে কেউ কিছু বলবে না—একটু মিষ্টি মধুর হাসিস বরং। লেডিজ ফার্স্ট বলে না? কী করব, কাটতে হ'ল গিয়ে। নইলে ছবিটাই দেখা হয় না!'

'আরে, তুই আর কী! তোর মা যখন তোর মতন এইটুকুন, তাকেও ল্যাজে বেঁধে অনেক সিনেমা দেখেছি ওমনি করে।' 'আমি জানাই— আমি দেখেছি, একলা দেখতে গেলে চারগুণ খরচ-আর ইতুকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হাফের হাফ!'

'ইতুর কথা রাখ তো।' বিনি আমায় ধমক দেয়: 'তোমার ইতিহাস আওড়ানো থাক। ট্রেনের টাইম হয়ে এল দেখছ না।'

'আমি তো তৈরি বিনি মাসী!' টুলটুল এক পায় খাড়া।

'নাও, ধরো টাকাটা!' একশ টাকার নোটখানা আমার মুঠোয় গুঁজে দিয়ে বিনি বলে: 'এতেই হয়ে যাবে বোধ হয়? পাটনার রেল ভাড়া হবে না এতে?'

'এতর কিসের দরকার? এত লাগে না, আমার ধারণা।' আমার থার্ড ক্লাসের ধারণা ব্যক্ত করি।

'থার্ড ক্লাসের কগুণ দিতে হয় ফাস্ ক্লাসে? ওর ডবাল হ'ল ইন্টার ক্লাস—ইন্টার ক্লাস নেই আবার আজকাল—তার ডবোল সেকেণ্ড ক্লাস—তার ডবোল হোলো গে ফাস্ ক্লাস। তাই না?'

'তাই হবে বোধ হয়। কিন্তু ফাস ক্লাসের টিকিট বোধ হয় মিলবে না—সে তো দশ দিন আগে আবেদন করে রিজার্ভেশন বুক করতে হয় জানি। তাহলে সেটা টুলটুলের এখানে আসার আগেই করে রাখতে হ'ত।

'সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পাওয়া যায় না ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট? কী যে বলো তুমি! টাকা দিলে টিকিট মেলেনা আবার।'

'মিলবে না কেন? কিন্তু সে টিকিট কেটে কোনো লাভ হয় না। বসবার জায়গা পাওয়া যাবে না। ফাস্ ক্লাস্ টিকিট হাতে করে দাঁড়িয়ে যেতে হবে থার্ড ক্লাসে। থার্ড ক্লাসের সেই ভিড়ের ভেতর ঠেলে ঠুলে উঠে যদি দাঁড়াবার জায়গা মেলে তবেই।'

'কেন, ফাস্ ক্লাসের কোনো সীটে বসতেও দেবে না নাকি?'

'দেবে কেন? তারা বার্থ রিজার্ভ করে যাচ্ছে, তাদের এলাকায় ফালতু কাউকে এলাউ করবে কেন? দাঁড়িয়েও যেতে দেবে না সেখানে!'

'আশ্চর্য্যি!'

'তারা ফাস্ ক্লাস লোক না? অবাক্ হবার কি আছে? তাছাড়া...।' আমার ধারা

বিবরণী চলে : 'তাছাড়া ফাস্ ক্লাসে বিপদ-আপদের আশঙ্কাও বেশি। বড় লোকরা যায় বলে যতো রাহাজানি, ডাকাতি, খুনখারাপি ঐ ক্লাসেই হয়ে থাকে—কাগজে পড়িসনে? সেদিক দিয়েও টুলটুলির ফাস্ ক্লাসের যাত্রী হওয়া আমি নিরাপদ মনে করিনে।'

'তাহলে?'

'যাবে এক নম্বরে নয়, একশ এগারো নম্বরে, সনাতন থার্ড ক্লাসে। সেখানে ভিড়ের ভেতর ছিনতাই-ফিনতাই কিচ্ছু হবার জো-টি নেই। আমি ওকে যথাসম্ভব ফাঁকা গাড়িতে ভদ্রলোকদের হেফাজতে রেখে আসব, তুই ভাবিসনে।'

'যতক্ষণ না গাড়ি ছাড়ে ততক্ষণ প্লাটফর্মে থেকো কিন্তু।'

'থাকব বই কি। গাড়ি ছাড়লে ওর দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে রুমাল উড়িয়ে তুই কি 'টা টা' করতেও বলছিস আমায়?' আমি জানতে চাই : 'চাই তাও বলব না হয়। তাহলে একখানা ভালো রুমাল দে।'

'খুব সাবধান কিন্তু।'

'খুব খুব।'

'লেডিজ্ কম্পার্টমেণ্ট নেই? দেখবে আগে।'

'দেখব বইকি। থাকলে তাতেই তুলে দেব ওকে। সে আর আমায় বলতে।'

'ভালো জায়গায় বসিয়ে দিয়ো কিন্তু।'

'এমনকি ওর বসার জায়গাটায় কম্বল বিছিয়ে শোবার জায়গা করে দেব, যাতে রাতটা ঘুমিয়ে যেতে পারে।'

'অবশ্যি অবশ্যি।'

'ট্রেন ছাড়ার আগে যেন চলে এসো না?'

'কেউ আসে কখনো?'

"ওর জিনিসপত্র সব ঠিক করে গুছিয়ে ওর মাথার কাছটিতে রেখে দিয়ো।'

'বেশি করে বলতে হবে না।'

'একটা বাচ্চা মেয়ে, দুধের বাচ্চা বুঝতে পারছ তো!'

'বুঝতে হবে কেন, দেখতেই তো পাচ্ছি চোখের সামনে।'

রাস্তায় নেমে টুলটুল আমায় বলল, শিব্রাম্ মামা, এবার তুমি বাড়ি যাও। আমি একাই বেশ যেতে পারব স্টেশনে···।'

'বলিস কিরে!' শুনে আমি অবাক হই।

'কেন, আমি একা এলুম না? টিকিট কেটে ঠিক আমি উঠে পড়ব পাটনার গাড়িতে,

একটুও তুমি ভেব না।' বলে সে অনুযোগ করে, 'দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিজে নিজে করতে আমার বেশ লাগে। কিন্তু কেউ আমায় করতে দেয় না। এবার আমি যখন জো পেয়েছি···।'

এই সুযোগে সে হারাতে নারাজ—স্পষ্ট বাক্যে আমায় জানায়।

'না তা হয় না। এখন যদি একলা আমি বাড়ি ফিরে যাই বিনি রাগ করবে···।'

'তুমি এখন সিনেমা গিয়ে ছাখো গে, তারপরে রাত আটটার বাদ বাড়ি ফিরো।'

'কী যা-তা বক্‌ছিস! বাস এসেছে ওঠ ওঠ চট্ করে।'···

স্টেশনে পৌছেই আমার প্রথম কাজ হ'ল কাউণ্টারে গিয়ে টিকিট কেনা। কিনে, যাতে সেটা না হারায়, নিরাপদে আমার পকেটের মধ্যে গুঁজে রাখি। তারপরে বাইরের থেকে হাত ঠেকিয়ে সেটা যথাস্থানে যথাযথ রয়েছে কিনা বারবার অনুভব করে দেখি।

বোনাঝি? তিনি ভুরু তুলে তাকান

প্লাটফর্মে গিয়েই টুলু সামনের কামরার দরজায় হাত লাগায়। আমি বলি—'না না, ওটা নয়। দেখছিস্ না, জানালায় জানলায় যতো মুশ্‌কো মুশ্‌কো লোক···উস্‌কোখুস্‌কো চুল···?'

'কী হয়েছে!'

'ওরা সব গুণ্ডাপ্রকৃতির বদমায়েস। তোর ক্ষতি করতে পারে।'

'গুণ্ডাদের আমি ভয় খাই না। বরং ভালোই লাগে আমার গুণ্ডাদের।' সেই কামরাতে সে চড়বেই।

'রাস্তায় গলা টিপে মেরে ফেলবে তোকে। যা আছে সব কেড়েকুড়ে নেবে তোর।' আমি বাধা দিই প্রবলবিক্রমে।—'বিনি বলেছে তোকে মেয়েদের কামরায় তুলে দিতে।'

'মেয়েদের সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে ওদের সঙ্গে গেলে বেশি মজা।'

'মজা বইকি! তুই ঘুমুলে তোকে কেটে টুকরো টুকরো করত—মজাটা তুই টের পেতিস নে যে! এই যা।'

একথার পর টুলটুল আর গুম্‌রে ওঠে না, বিলকুল গুম্ হয়ে যায়। আর সেই ফাঁকে আমি তাকে করায়ত্ত করে পাশের লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে তুলে দিই।

সেখানে এক বর্ষিয়সী মহিলা চারধারে তাঁর মেদ-ভার বিস্তৃত করে বসেছিলেন, তাঁর কাছে খবর নিয়ে জানতে পাই, উনি কাশী যাচ্ছেন। ওঁর জিম্মায় টুলটুলিকে গছিয়ে দিয়ে বলি—'আপনি পাটনা হয়েই তো কাশী যাবেন, দয়া করে আমার বোনঝিটিকে যদি পাটনা স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে যান···।'

'বোনঝি?' তিনি ভুরু তুলে তাকান।

'হ্যাঁ, বোনঝি।' ওঁকে আরো অবাক হতে দেখে আমি হতবাক হই: 'কেন, বোনঝি হয় না বুঝি? বোনঝি বা ভাগনি যাই বলুন। ছেলের হলে বুঝি বোনঝি হয় না, মেয়েদের বেলাই হয় শুধু মেয়েদের বুঝি ভাগনি হতে নেই? কী সব গোলমলে ব্যাপার! তা সে যাই হোক, আমার মাস্তুত ছোট বোনের এই ছোট মেয়েটির কথাই বলছিলাম···'

'আর বলতে হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার চোখে চোখে রাখব ওকে।'

'বস্। এইবার বেশ আরাম করে যা। বিনি রাত্রের খাবার দিয়েছে, খিদে পেলে খাস। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাস্। এঁর অনেক লাগেজ পত্র, এঁকে বসে জেগে থাকতেই হবে—ট্রেনে যা চোর-ছ্যাচোরের উপদ্রব। ওঁর মালপত্রের সঙ্গে তোর ওপরেও উনি নজর রাখবেন।'

'সে আর তোমায় বলতে হবে না বাছা!'

তার পরেই ট্রেনের বাঁশী বাজতেই আমি নেমে পড়লাম। বাস ধরে সোজা নিজের আবাসে।

'ভালো জায়গায় বসিয়ে দিয়েছ তো?' পৌছতেই বিনি শুধোয়, 'লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে?'

'যথাস্থানে—যেমন যেমনটি বলেছিলে।'

'মনে করে টিকিট কিনেছিলে তো?'

'আলবৎ।' আমি বলি: 'টিকিট না কিনলে কি প্লাটফর্মে ঢুকতে দেয়? আমার প্ল্যাটফর্ম টিকিটও কিনতে হয়েছে আবার।'

'টিকিটটা দিয়েছিলে তো তাকে মনে করে?' সন্দিগ্ধ-স্বরে আবার সে শুধোয়: 'টিকিট কেটেছিলে তো? কিনেছো কিনা কে জানে!'

পকেটে হাত পুরে টিকিটখানা বার করে তাকে দেখাই।

'টিকিট কাটিনি তার মানে? এই তো টিকিট ত্মাখ না।'

পাখার হাওয়া

ডাঃ ননীলাল দে

এ বছরে ফাগুন গিয়ে চড়া রোদের চৈতে,
গুরুমশার ছেলের হবে ধুমধামেতে পৈতে।
শিষ্যবাড়ী ঘুরে বেড়ান চেয়ে ফেরেন ভিক্ষা,
এক সময়ে শিষ্যদের তো দিয়েছিলেন দীক্ষা।
শিষ্যরা তাই অভয় দেন নেইক কোন শঙ্কা,
পৈতা এখন হবেই হবে, বাজিয়ে দেব ডঙ্কা।
রমেন বলে, "সবাই দিচ্ছে নগদ নগদ অর্থে,
আমি দেব হাওয়া খরচ তাতেই যাবেন বর্তে।"
গুরুমশায় দুশ্চিন্তা যায়, যে যা করছে ধার্য,
তাই দিলে যে সহজেই হয়, আমার শুভকার্য।
পৈতার দিনে এসেছে সব—দানের বিরাট লিষ্টি,
রমেন শুধু পাখা চালায়, নাই কো কোথাও দৃষ্টি।
গুরু শুধান, "রমেন তুমি দিলে না তো কিচ্ছু তো,
হয়ত এখন পারবে নাকো, আছে দেবার ইচ্ছে তো।
রমেন বলে—বলেন সেকি! সবই যাবে পাওয়া,
এই যে আমি কথার মতই দিচ্ছি পাখার হাওয়া।

শ্রীপার্থসারথি চক্রবর্তী
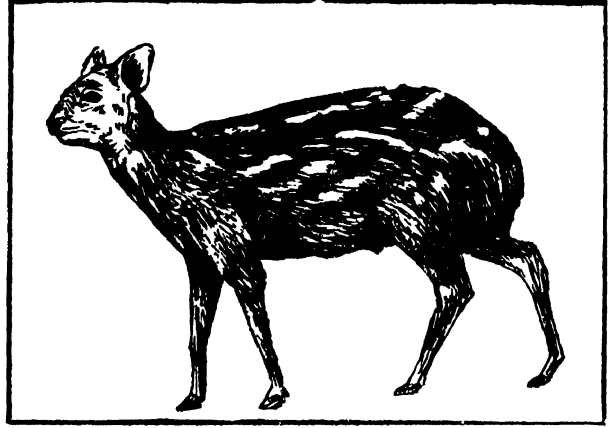
ফুল দেখতে সুন্দর। তার গন্ধও আমাদের মুগ্ধ করে। কোন্ গন্ধটা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ তা' আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারি। শিক্ষার প্রয়োজন হয় না সেজন্য।

আমরা দেখতে পাই, আধুনিক সভ্যতার জন্ম হওয়ার বহু বৎসর আগে, এমন কি খৃষ্ট-জন্মেরও পূর্বে সুগন্ধি জিনিস মানুষ ব্যবহার করত। সুগন্ধ কথাটির ইংরেজী হচ্ছে—'পারফিউম'। এর আসল অর্থ ধূঁয়ার মাধ্যমে। যদিও আজকাল কথাটি সুগন্ধি দ্রব্য হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে এবং অন্যান্য সুসভ্য দেশে সুগন্ধি ধূঁয়ার মাধ্যমে দেবতার পূজা-অর্চনা করা হ'ত। এখনও আমরা পূজায় চন্দন, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি ব্যবহার করি। কেবল দেবারাধনায় নয়—সুসভ্য দেশগুলিতে মেয়েরাও তাঁদের প্রসাধন করতেন নানারকম সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে। সুপ্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে অযোধ্যা নগরীর সুন্দর বর্ণনা আছে। তাতে বলা হয়েছে, রাজপ্রাসাদের মেয়েরা জাফ্রান, অগুরু, কস্তুরীর ধূঁয়া তাদের আলুলায়িত কেশদামে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, আর সেই ধূঁয়া বাতায়ন পথে বেড়িয়ে এসে তার সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করে তুলছে।

কস্তুরী এমন একটি অপূর্ব সুগন্ধ জিনিস। কস্তুরী মৃগ (**Musk deer**) নামে একরকম পুরুষ হরিণ বিচরণ করে হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে এবং তার লাগোয়া ব্রহ্ম ও ক্যাম্বোডিয়ায়। এরা খুব লাজুক প্রকৃতির। নির্জনে বিচরণ করতে ভালবাসে এই হরিণ। এদের নাভিমূলের গ্রন্থিতে একটা কোষ জন্মে। এই কোষটি যখন পূর্ণাঙ্গ হয়, তখন তার থেকে সুগন্ধ বেরোতে থাকে। হরিণ এই গন্ধের সন্ধানে পাগলের মত ছুটাছুটি করে। সে বুঝতে পারে না—গন্ধটা তার নিজের দেহের মধ্যেই আছে। কবি বলেছেন,—'পাগল হইয়া বনে বনে ঘুরি আপন গন্ধে মম—কস্তুরী মৃগ সম।'

বছর দশেক বয়েস হলে কস্তুরী মৃগের এই কোষটি পূর্ণাঙ্গ হয়। তখন ঐ মৃগকে হত্যা করে তার গ্রন্থিটাকে সম্পূর্ণ তুলে নিয়ে শুকানো করা হয় রৌদ্রে। একটি কোষের ওজন প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোষটির ভিতর দিকটা থাকে মসৃণ আর বাইরের দিকটায় থাকে লোম। মাঝখানে ছোট্ট একটা ছিদ্র থাকে। কাঁচা অবস্থায় ঐ গ্রন্থি বা কোষ থেকে কিছু বুঝা যায় না যে, ওর মধ্যে এত সুগন্ধ লুকানো আছে। যখন চামড়া ও লোমগুলি কোষ থেকে তুলে ফেলা হয় এবং গ্রন্থিটাকে জলে ভেজানো হয়, তখনই ওর সুগন্ধ বেরোতে আরম্ভ করে। সবচেয়ে ভালো কস্তুরী আসে তিব্বত থেকে।

গত পঞ্চাশ বছরে সুগন্ধি-দ্রব্য-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এইসব সুগন্ধি প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা হয়। অবশ্য সময় সময় বিভিন্ন পরিমাণের রাসায়নিক পদার্থের উপযুক্ত সংমিশ্রণের সাহায্যেও সুগন্ধি প্রস্তুত হয়ে থাকে। কস্তুরী অতীব উচ্চশ্রেণীর সুগন্ধি—কিন্তু খুব কম পরিমাণে হরিণের মধ্যে তা পাওয়া যায়। এক কিলোগ্রাম কস্তুরী পেতে হলে প্রায় দু-হাজার হরিণকে মেরে ফেলতে হবে। তাই রাসায়নিকরা কৃত্রিম উপায়ে এটাকে তৈরীর চেষ্টা করতে লাগলেন। জর্মান ও সুইডিস বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে কস্তুরী তৈরী করে তার নাম দিলেন—মাস্ক-কোন্ (Musk-one) বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, সিভেট (civet) নামক এক ধরণের বিড়াল এবং আমেরিকার 'মাস্ক' ইঁদুরের (Musk-rat) দেহের ভেতরও কস্তুরী মৃগের অনুরূপ সুগন্ধি পাওয়া যায়। 'সিভেট' বিড়াল থেকে প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি (civetone) সংগ্রহ করা হয় এবং কস্তুরীমৃগের ন্যায় একে মেরে ফেলার প্রয়োজন হয় না। আজকাল রসায়নাগারে কৃত্রিম পদ্ধতিতেও 'সিভেটোন্' তৈরী হচ্ছে।

পরীক্ষা করে দেখে গেছে যে মাস্ক-কোন্ এবং সিভেটোনের অণুর গঠনে মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। এদের অণু কার্বন, হাইড্রোজেন এবং একটি মাত্র অক্সিজেন দিয়ে তৈরী। পনেরো থেকে সতেরো কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট অণুরই শুধু সুগন্ধ আছে।

কস্তুরী যে কেবল হরিণ, বিড়াল বা ইঁদুরের মধ্যেই পাওয়া যায়—তা নয়। কোনও কোনও গাছের বীজ ও শিকড়ের ভিতরেও কস্তুরী লুকিয়ে আছে।

কস্তুরী শুধুমাত্র গন্ধ-পাগল করা সুগন্ধি হিসাবেই ব্যবহৃত হয় না। হৃদ্-যন্ত্রের পরিপুষ্টতার জন্য, হরমোন্ এবং ঔষধ রূপেও কস্তুরীকে ব্যবহার করা হয়।

আমার রেল-ভ্রমণ

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

আমি ছোটবেলা থেকে রেল-ভ্রমণ ভালবাসি। বেশ জানালার ধারে বসতে পাবো আর জোরে ট্রেন চলবে, আমি বসে বসে দৃশ্য দেখব, এইটাই আমার পরম আনন্দ। তবে ট্রেন খুব দ্রুত গতিতে চলা চাই, নইলে তেমন আনন্দ পাই না। মোটরে বা প্লেনে ভ্রমণ করাতেও একটা: আনন্দ আছে, কিন্তু এই সব ভ্রমণ আমার কাছে রেল-ভ্রমণের মতন আনন্দদায়ক হয় না, বিশেষতঃ প্লেন-ভ্রমণে সময় বাচে বটে, কিন্তু ভ্রমণে তেমন আনন্দ দেয় না। অবশ্য যখন বিদেশ ভ্রমণে যাই, কিংবা যখন সময়ের তাড়াতাড়ি থাকে, তখন অবশ্য আমাকে প্লেনেই যাতায়াত করতে হয়।

একথা সত্য যে প্লেনে নানারকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্লেনে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করা, বিছানা-পত্র নেওয়া, লাগেজপত্রের হিসেব রাখা, কিছুই করতে হয় না। আর মোটর ভ্রমণ আনন্দদায়ক হলেও দু'শো মাইলের বেশী একদিনে যেতে হলে আর আনন্দদায়ক থাকে না। ট্রেনে চব্বিশ ঘণ্টা ভ্রমণ করলেও আনন্দের হ্রাস হয় না, অবশ্য তোমার যদি ভালো জায়গা রিজার্ভ করা থাকে।

আমার ছোটবেলার রেল-ভ্রমণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে আজ অনেক বছর আগের কথা। তখন গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন হয়েছে কিনা মনে নেই। আমি আমার দাদা (পীযূষকান্তি ঘোষ), বৌদিদি এবং দুই ভাইঝির সঙ্গে কাশী যাচ্ছিলাম। পূজোর সময় সেকেণ্ড ক্লাসেও ভয়ানক ভিড়। সেবার আমাদের ভাগ্যে একটা ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী জুটে গেল। একটা ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী সেকেণ্ড ক্লাসে কনভার্ট করে আমাদের জন্যে Reserve করে দিল। আমি তাড়াতাড়ি করে একটা কোণের সীট দখল করে বসলুম। হাতে একটি টাইম টেবিল। একটা করে ষ্টেশন আসে, আর আমি টাইম টেবল্ মিলিয়ে দেখি। সেই যে বসলুম আর ওঠবার নাম নেই। রাত হচ্ছে দেখে বৌদিদি অনেকবার খেয়ে শুয়ে পড়তে বললেন। আমি খেলুম বটে, কিন্তু শোবার নামটি নেই। একে এই প্রথম ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়েছি, তারপর এমন আরামে যাচ্ছি। তখন আমার শোবার ইচ্ছে একটুকুও হ'ল না। একটা করে ষ্টেশন আসে আর টাইম টেব্‌লে নামটা মিলিয়ে দেখি। সেইভাবেই বসে রইলুম। শেষকালে দাদা বল্লেন, 'বসে বসে কি করছিস, শুয়ে পড় না।' আমি বল্লুম, 'ষ্টেশনের নাম মুখস্থ করছি।' দাদা বল্লেন, 'হাওড়া থেকে মোগলসরাই পর্যন্ত তুই ষ্টেশনের নাম মুখস্থ করছিস?' আমি বল্লুম, 'হ্যাঁ।' দাদা বল্লেন, 'ভালো কথা, তুমি সারারাত জেগে থাকো আমার আপত্তি নেই। কাল কাশী গিয়ে আমি টাইম টেব্‌ল খুলে ধরব,

আর তোমাকে হাওড়া থেকে বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট অবধি সমস্ত ষ্টেশনের নাম বলে যেতে হবে। তোমরা অনেকে শুনে আশ্চর্য ও আনন্দিত হবে যে, পরদিন আমি সে পরীক্ষায় পাশ করেছিলুম। এতদিন বাদে আবার এই বয়সেও এখান থেকে কাশী অবধি সব ষ্টেশনের নাম আমার মুখস্থ আছে। অবশ্য ইতিমধ্যে কতকগুলো নতুন ষ্টেশন হয়েছে, যেগুলোর নাম আমি বলতে পারব না। তখনকার কালে যতগুলো ষ্টেশন মেন লাইনে ছিল, এখনও সেগুলো মনে আছে এবং তোমরা জিজ্ঞাসা করলে অনায়াসে বলে যেতে পারি। এই মুখস্থ বিদ্যার জন্য সেই সময়ে দাদার কাছ থেকে একটা Prizeও পেয়েছিলুম।

রেল-ভ্রমণের ওপর আমার ভালবাসা থাকার জন্য আমি বহু বৎসর থেকে চেষ্টা করেছি যে, আমাদের প্রধান প্রধান ট্রেনগুলি যাতে দ্রুত হয়। আমাদের দেশের ট্রেনগুলোর স্পীড তো বাড়লই না, উল্টে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে যা স্পীড ছিল, তাও কমিয়ে দেওয়া হ'ল। অবশ্য যথাসম্ভব অ্যাক্সিডেণ্ট বাঁচবার জন্য যে এই কাজ করা হয়েছে তাতে আর ভুল নেই, কিন্তু আমি মনে করি, যদি রেলের যে সব আইন-কানুন আছে, সেগুলো যদি ভাল ভাবে মানা হয়, তাহলে স্পীড বাড়লেও অ্যাক্সিডেণ্ট হবার সম্ভাবনা খুবই কম। আর এই সব আইন-কানুন মানা না হলে, যখন-তখন অ্যাক্সিডেণ্ট হতে পারে, তাতে স্পীড যতই কম থাকুক না কেন। নইলে গুড্‌স ট্রেনে কিংবা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে অ্যাক্সিডেণ্ট হয় কেন?

এত বছরেও ট্রেনের যে গতি বাড়েনি তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। ১৯৩৩-৩৪ সালে আমি এইট ডাউন তুফান এক্সপ্রেসে দিল্লী থেকে কলকাতা এলাম। ট্রেনটা ছাড়ল বিকেল তিনটের সময় আর কলকাতা পৌছল তার পর দিন বেলা দুটোর সময়। সবসুদ্ধ তেইশ ঘণ্টা মাত্র। আর আজকের দিনে নম্বর ওয়ান মেল ট্রেন, দিল্লী মেল ২৪ ঘণ্টারও বেশী সময় নেয় এই পথ অতিক্রম করতে।

স্বর্গীয় লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন রেল মিনিষ্টার ছিলেন, তখন থেকে আমি একটা খুব দ্রুতগামী ট্রেনের সম্বন্ধে চেষ্টা করছিলাম। লালবাহাদুরজী তখন আমার বারাসতের বাড়ীতে কলিকাতায় এলেই থাকতেন। সেই সময় স্বভাবতই রেলের জেনারেল ম্যানেজারেরা আমার বাড়ীতে এসে লালবাহাদুরজীর সঙ্গে দেখা করতেন। আমি তখন সেই সুযোগ নিয়ে এখন যেমন রাজধানী এক্সপ্রেস হয়েছে, এরূপ একখানা ট্রেনের কথা বারংবার উত্থাপন করি। তখন যদিও এ সম্বন্ধে কিছুই স্থির হয়নি, কিন্তু পরে অন্য রেল মিনিষ্টারদের সঙ্গেও সুবিধা পেলেই আমি এই রকম একখানা ট্রেনের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমার অবশ্য প্রস্তাব ছিল, একটা নন্‌-ষ্টপ ক্যালকাটা-বেনারস এক্সপ্রেস, যে ট্রেনখানা হাওড়া ছেড়ে নন্‌-ষ্টপ মোগলসরাই যাবে

এবং সেখানে দু-তিন মিনিট থেকে. লাইন বদলে কাশী চলে যাবে। এখন অবশ্য কলকাতা-দিল্লী যাতায়াতের পক্ষে রাজধানী এক্সপ্রেস আরও ব্যাপক ও সুন্দর হয়েছে।

এই সঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। ১৯৪৬ সালে আমি এডিনবরা-ইউষ্টন (লণ্ডন) নন্-ষ্টপ স্কটিশ এক্সপ্রেসে ভ্রমণ করছিলুম। ট্রেনটা দ্রুতই যাচ্ছিল, কিন্তু একবার মনে হ'ল যেন অতিরিক্ত জোরে যাচ্ছে। সেটা করিডর ট্রেন ছিল, তাই গার্ডের গাড়ি থেকে এঞ্জিন অবধি বেড়ান চল্‌ত। আমি এঞ্জিনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এখন এই ট্রেন কত স্পীডে যাচ্ছে। ড্রাইভার আমাকে হাসতে হাসতে বল্লে, 'ঘণ্টায় ৯০ মাইল।' শুনে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ! কিন্তু তার চেয়েও আসল চড়কগাছ হয়েছিল জাপানের বুলেট ট্রেনের কথা শুনে। তাতেও আমি চড়েছি। সে ট্রেন ঘণ্টায় ১২০ মাইল যায়।

রেল-ভ্রমণের গল্প আজ এখানেই শেষ করি, পরে সুবিধা হলে আরও অনেক মজার কাহিনী তোমাদের বলব।

ফাগুন এল

শ্রীমতী শান্তি বসু

ফাগুন এল আগুন জ্বেলে
নিখিল ভুবন জুড়ে
জুড়িয়ে গেল হৃদয়খানি
আজকে বাঁশির সুরে।

নীলাকাশের সাধ যে ছুঁতে
দূরের সবুজ বনে,
রঙের ছোঁয়া লাগল বুঝি
আজকে সবার মনে।

সবুজ পাতায় সাজলো গাছ
ওই যে মুকুল ছেয়ে
পাখীরা সব আনন্দেতে
উঠলো যে গান গেয়ে।

দখিনা বায় দোল দিয়ে যায়
কৃষ্ণচূড়া শাখায়,
ইন্দ্রধনুর রঙ ছড়ানো
প্রজাপতির পাখায়।

অন্ধকারের পর আলো

শ্রীরমণীমোহন পাল

উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'তুমি যে একেবারে ছেলেমানুষ। তোমার বাপ-মা তোমাকে আফ্রিকা যাওয়ার অনুমতি দিলেন কি করে ?

আফ্রিকা! তবে কি রজতকে চাকরী করতে আফ্রিকায় যেতে হবে? তার পৈতৃক ভিটে বাড়ী তার হাতছাড়া হয়েছে। নিজের দেশেও কি তার স্থান হবে না? কিন্তু সে দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, 'আমার বাপ-মা সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। কিন্তু আপনি আফ্রিকা যাওয়ার সম্বন্ধে কি বলছেন?'

মিঃ পিয়ার্সন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সে কি! কি কাজ করতে হবে জান না অথচ চাকরী করতে এসেছ? তুমি কাগজে বিজ্ঞাপন দেখনি?

রজত বিনীতভাবে বললে, 'না স্যার, আমি কাল ভোরে কলকাতায় এসেছি, সারাদিন চাকরীর সন্ধানে ঘুরেছি, অবশেষে একটা পার্কে রাত কাটিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছি। এখন আমি সম্পূর্ণ অসহায় ও নিঃস্ব।'

বাংলা দেশে যে ক'জন আদর্শ ইংরেজ এসেছিলেন, মিঃ পিয়ার্সন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি যেমন ভদ্র, তেমনই গুণগ্রাহী। তিনি এই সুশ্রী কিশোরটির কথা সহানুভূতির

সঙ্গে শুনছিলেন। তার ইংরেজী বলার ভঙ্গীতে মুগ্ধও হয়েছিলেন। রজতের কথা শেষ হতে তিনি বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে যে তুমি খুব অধ্যবসায়ী। আমি তোমার বিষয় আরও জানতে ইচ্ছা করি। কিন্তু তার আগে প্রথমে তুমি ঐ চেয়ারটায় বসো।' এই বলে তিনি তাকে সমানের একটা চেয়ার নির্দেশ করলেন।

রজত এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। সে এবার চেয়ারে বসে সংক্ষেপে তার পরিচয় দিতে লাগলো। পূর্বস্মৃতি তার মনে কখনও আনন্দ, কখনও শোক, কখনও বা ঘৃণার উদয় হয়ে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখমণ্ডলেও প্রকাশ পেতে লাগলো। তারপর যখন সে তার গৃহত্যাগের করুণ কাহিনীর বর্ণনা সুরু করলো, তখন তার বাক্য অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

মিঃ পিয়ার্সন তার কথা শুনে আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিলেন। রজতকে থামতে দেখে তিনি বললেন, 'রয়, তোমার যদি বলতে কষ্ট হয় তাহলে আর ব'ল না।'

রজত আত্মসংবরণ করে বললে, 'না স্যার, আপনাকে বলতে পেরে আমার মনটা হাল্কা বোধ হচ্ছে। আপনি যখন এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনলেন, তখন কষ্ট করে বাকিটাও শুনুন।'

এইবার সে কলকাতায় তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগলো। সাহেব যখন জানতে পারলেন যে, রজত গতকাল বিকাল হতে কিছু খায়নি, তখন তিনি বেয়ারাকে ডেকে কিছু খাবার ও ফল আনতে বললেন। তারপর রজতকে বললেন, 'দেখ রয়, তোমার আত্মনির্ভরতায় আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমার মত ছেলেদেরই আমি পছন্দ করি। আমার ছেলে নেই, তবে এক মেয়ে আছে। তার নাম লিলি। তুমি যদি আমার কাছে থেকে লেখাপড়া কর, তাহলে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তারপর বি. এ. পাশ করে বিলাত থেকে কোন একটা ব্যবসা শিখে আসবে।'

রজত বললে, 'বাবার বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার পড়া শেষ করে আমি বিলাত যাব। কিন্তু এখন আর তা হয় না। এখন আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তুমি পড়তে চাইতে বলছো। আমাকে তোমার বাবার মত হিতাকাঙ্ক্ষী বলে ভাবতে পরছো না কেন?

সাহেবের কথায় রজত অত্যন্ত অভিভূত ভাবে বললে, 'অপনার স্নেহময় কথাগুলি আমার বাবার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। আপনাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কিন্তু আমার বিনীত অনুরোধ, আমাকে আপনার যে-কোন কাজে লাগিয়ে দিন। এখানে সম্ভব না হলে আমি আফ্রিকা যেতেও রাজি আছি।

মিঃ পিয়ার্সন উত্তরে বললেন, 'আচ্ছা রয়, তাই হবে। তোমায় মত স্বাবলম্বী

ছেলেরাই দেশের মুখোজ্জল করে থাকে। তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না। আমরা আফ্রিকার রেলপথ বসাতে যাচ্ছি। সেখানকার জলে কুমীর, হিপোপটেমাস আর জ্যান্তার সিংহ, গণ্ডার, সাপ। তার ওপর হিংস্র অসভ্য জাতি আর নানাপ্রকার উৎকট রোগ ঐ স্থানটাকে ভীষণ করে তুলছে। তোমাকে বাধা দেওয়ার এটাই প্রধান কারণ।'

রজত উত্তর দিলে, 'আপনি সঙ্গে থাকতে আমার ভয়ের কারণ ঘটবে না বলেই মনে করি।'

মিঃ পিয়ার্সন স্মিতমুখে বললেন, 'রয়, তুমি বন্দুক ছুড়তে জান ?

রজত বললে, 'না, স্যার।'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'বেশ, এখন হতে তুমি আমার কাছে বন্দুক ও রিভলবার ছোড়া শিখবে, আর আমার মেয়েকে বাংলা শেখাবে। এই হবে তোমার এখানকার কাজ।'

সাহেবের কথা শুনে কৃতজ্ঞতায় রজতের চোখ দুঠো ছলছল্ করতে লাগলো।

এই সময়ে বেয়ারা আসতে সাহেব তাকে খাবার ও ফল টেবিলের ওপর ঠিক বললেন। রজতও তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগলো।

মিঃ পিয়ার্সন সেদিনই মধ্যাহ্নে ত্রিবেণী রওনা হলেন। সেখানে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে বসে তিনি হরনাথকে ডেকে পাঠালেন। একজন সাহেব ডাকছে, একথা শুনে হরনাথ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে সাহেবকে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালেন।

মিঃ পিয়ার্সন তাঁকে বসতে বলে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, 'হরনাথবাবু, সম্প্রতি আপনি কোন বাড়ী কিনেছেন কি ?'

হরনাথ বুঝতেই পারলেন না, সাহেব কেন বাড়ী কেনার কথা তুললেন। তিনি প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন। পরক্ষণে নিজের স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় মুখমণ্ডলের ভাব সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত করে বললেন, 'হাঁ, একটা বাড়ী কিনেছি। কিন্তু আপনি কেন সেটার খোঁজ করছেন জানতে পারি কি ?'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে বলুন, তপন রায় আপনার কাছে কত টাকা ধার নিয়েছিলেন আর তার সুদই-বা কত বাকি ছিল ?'

হরনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, 'আপনি কি উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করছেন তা না জানলে আমার গোপনীয় কথা বলতে পারি না।'

মিঃ পিয়ার্সন হরনাথের ধূর্ততায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'দেখ হরনাথ, মাত্র তিন হাজার টাকার জন্য তুমি দশ-বার হাজার টাকার সম্পত্তি নিয়েছ। তাতেও খুশি না হয়ে সেই অনাথ নাবালককে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তুমি শাস্তি পাবার যোগ্য। তোমার প্রাপ্য টাকা নিয়ে তুমি বাড়ী ছেড়ে দাও।'

হরনাথ এতদিন ধরে কত কৌশল করে যে বাড়ী দখল করেছেন, তাকে ছেড়ে দিতে তাঁর ইচ্ছা করছিল না। অথচ সাহেবের কথা না শুনলে হয়তো বিপদ হতে পারে। কি করা উচিত সে বিষয়ে তিনি মহা সমস্যায় পড়লেন। তিনি চিন্তিতভাবে বললেন, 'আমি বাড়ী ছেড়ে না দিলে আপনি কি করবেন ?'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'আদালত থেকে টাকা মিটিয়ে দেবার ডিক্রি জারি হয়েছে মাত্র। এ অবস্থায় তুমি সম্পত্তি দখল কর কি ক'রে ?'

হরনাথ হেসে বললেন, 'কিনেছি সাহেব, দস্তুরমত নিলামে ডাক দিয়ে কিনেছি।'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'তোমার টাকার সুদ তো কখনও বাকি পড়েনি। কাজেই বাড়ী নিলামে কেনার প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষতঃ ওটা এখন নাবালকের সম্পত্তি।'

হরনাথ বললেন, 'নিলামের নোটিশ জারি হয়েছিল তপনের নামে। তাতে তার সই আছে। কাজেই নাবালকের সম্পত্তি আমি কিনি নি সাহেব।'

মিঃ পিয়ার্সন গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি যতদূর জানি, নোটিশ যখন জারি হয় তখন তপনবাবুর জ্ঞান ছিল না। তুমি তার টিপসই নিয়েছিলে মাত্র। অজ্ঞান ব্যক্তির টিপসই নেওয়া আর মরা লোকের টিপসই নেওয়া একই কথা। তুমি নোটীশে তপনবাবুর স্বাক্ষর দেখাতে পারবে ?'

হরনাথ চুপ করে রইলেন।

মিঃ পিয়ার্সন বলতে লাগলেন, 'নিলামের নোটিশ জারিও তোমার বে-আইনী কাজ হয়েছে। ওর কোন মূল্যই নেই। এখন তোমার পাওনা টাকা নিয়ে সম্পত্তি ফেরত না দিলে নাবালকের সম্পত্তি জুয়াচুরি করে নিয়ে নেবার জন্য তোমাকে অভিযুক্ত করা হবে।'

হরনাথ দেখলেন যে, তাঁর এতদিনের আশায় ছাই পড়লো। তিনি বুঝতে পারলেন বাড়ী দখলে রাখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কাজেই তিনি অবশেষে বললেন যে, নিলাম ডিক্রিজারি প্রভৃতিতে তাঁর কিছু খরচ হয়েছে, সেগুলো সব ধরে দিতে হবে।'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। আমি কাল দুপুরে রজতকে নিয়ে তার বাড়ীতে যাব। সে তার জিনিসপত্র সব বুঝে নেবে। আর দলিলগুলো সব ঠিক করে নিয়ে যেও। সেখান থেকে আমরা বরাবর আদালতে গিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিশান হিসাবে রজতকে দখল দেওয়াব।' এই বলে তিনি তখনই হুগলী কোর্টে গিয়ে রজতের নাম দিয়ে নিলাম খারিজের দরখাস্ত দিলেন।

মিঃ পিয়ার্সন বাড়ী এসে রজতকে সব কথা খুলে বললেন। সাহেবের অনুগ্রহে তার পৈতৃক বাসভবন সে ফিরে পাবে শুনে রজত আনন্দে বাক্যহারা হয়ে পড়লো। তার চোখ দুটো

অশ্রুপূর্ণ হ'ল। কয়েক মুহূর্ত পরে আত্মসংবরণ করে সে পিয়ার্সনকে বললে, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু যতদিন ঐ টাকা শোধ দিতে না পাচ্ছি, ততদিন ও বাড়ী আপনার থাকবে।'

মিঃ পিয়ার্সন মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ, সে দেখা যাবে।'

পরদিন মিঃ পিয়ার্সন, রজত ও লিলিকে নিয়ে ত্রিবেণীতে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে গাড়ী করে তাঁরা রজতের বাড়ীর দিকে চললেন। কিছুক্ষণ পরে রজতের নির্দেশে তার বাড়ীর সামনে গাড়ী থামলো। রজতের সঙ্গে একজন সাহেব আসার সংবাদে অনেকে এসে সেখানে ভিড় করে মজা দেখতে লাগলো। এমন সময়ে হরনাথ এসে দেখা দিলেন। তিনি পিয়ার্সনকে সেলাম করে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। রজত লিলি তার অনুসরণ করলো।

লিলি যখন জানতে পারলো যে বাড়ীটা রজতের, তখন সে বললে, 'মিঃ রায়, তোমার তো চমৎকার বাড়ী রয়েছে দেখছি। আশা করি, নিজের বাড়ী পেয়ে আমাদের ভুলে যাবে না।'

রজত ম্লান হাসি হেসে বললো, 'না মিস্ পিয়ার্সন। ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত এ বাড়ীতে আমি থাকবো না।'

কিছুক্ষণের মধ্যে মিঃ পিয়ার্সন রজতের সহায়তায় দলিল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাগজ এবং ঘরের আসবাবপত্র সব বুঝে নিলেন। তারপর সকলকে নিয়ে কোর্টে গেলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই রজতের বাড়ীর সুরাহা করে মিঃ পিয়ার্সন তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোককে বাড়ীটি ভাড়া দিলেন।
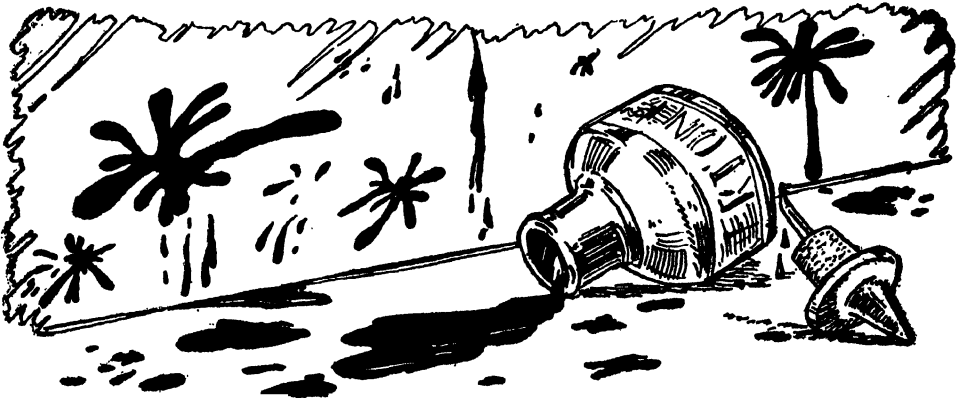
॥ 'Ink' দিয়ে নানা নাম ॥

ইংরেজীতে INK মানে কালি। এই INK শব্দটির আগে একটি বা দুটি ইংরেজী শব্দ দিয়ে অন্ততঃ নটি এমন শব্দ তৈরি করতে হবে যাদের প্রত্যেকটির অর্থ হয়। তোমরা পার কিনা দেখ, তারপর আগামীবার উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে।

সুখরঞ্জন রায়

দাঁত মানুষের মুখের শোভা। বৃদ্ধ-বয়সে সমস্ত দাঁত পড়ে গেলে মানুষের চেহারা বিকৃত রূপ ধারণ করে। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় চেহারার সৌন্দর্যবর্ধনে দাঁতের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই দাঁতের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী।

মানব-শিশুর দাঁত ছয় সাত মাস বয়স থেকেই উঠতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ নীচের পাটির সামনের দুটো দাঁত প্রথম ওঠে, পরে শিশুর দুই বৎসর বয়সের মধ্যে দেখা দেয় ক্রমে ক্রমে কুড়িটি অস্থায়ী দাঁত। এই অস্থায়ী দাঁতগুলো ছয় সাত বৎসর বয়স থেকে পড়ে যেতে আরম্ভ করে এবং সেগুলো পড়ে গিয়ে বার বৎসর বয়সের মধ্যে আবার আঠাশটি নতুন দাঁত উঠতে দেখা যায়। এগুলো সব স্থায়ী দাঁত। এর পর আরো চারটি স্থায়ী দাঁত ওঠে বছর ত্রিশেক বয়সের মধ্যে। পঁচিশ থেকে ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে উঠে থাকে চোয়ালের সর্বশেষ দাঁত বা আক্কেল দাঁত। অনেকের আবার তা ওঠেও না। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতি সারিতে থাকে ষোলটি করে সবসুদ্ধ বত্রিশটি দাঁত। দুটি পাটিরই সামনের চারটি করে আটটি দাঁতকে কৃন্তক দাঁত বলে। কোন কোন জিনিস চুষে খাওয়ার জন্যে এদের প্রয়োজন হয়। তবে মুখের শোভা বর্ধনের জন্যেই এদের প্রয়োজন বেশী। কৃন্তক দাঁতের পরেই দু'পাশে একটি করে কুকুর-দাঁত বা ছেদনকারী দাঁত থাকে। সুতো বা অনুরূপ কোন জিনিস ছিন্ন করতে হলে এদের সাহায্য নিতে হয়। ছেদনকারী দাঁতের পরে চোয়ালের দু'দিকেই থাকে দুটি করে চর্বক দাঁত এবং তিনটি করে পেষক দাঁত থাকে শেষ দিকে। এই চর্বক ও পেষক দাঁতগুলোরই প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশী। খাদ্যবস্তু চিবিয়ে খেতে হয় এগুলো দিয়েই।

চিবিয়ে খাওয়ার জন্যেই দাঁতের সৃষ্টি। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার যুগে আমাদের দেশের অফিস-যাত্রীদের প্রায় সকলেই ধীরে-সুস্থে চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যেসটি সম্পূর্ণ হারাতে বসেছে আজ। দশটার ভেতর অফিসে হাজির হবার তাগিদে কোন রকমে কয়েকটি গ্রাস গিলে ফেলে দিয়েই তাদের ছুটতে হয় ঊর্ধ্বশ্বাসে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও আজ চলেছে একই পথ অনুসরণ করে। ফলে খাদ্যবস্তু ভাল রূপ চিবিয়ে না খাওয়ার জন্যে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ এসে বাঙালী জাতির আজ নিত্যসহচর হয়ে উঠেছে। অসময়েই তাদের নির্জীব করে দিয়ে যৌবনেই তাদের দেহে আজ নেমে এসেছে বার্ধক্যের ছায়া।

সমস্ত খাদ্যই দাঁত দিয়ে ভাল করে চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যেস করা উচিত ছেলেবেলা থেকেই। এই অভ্যেসটি যাতে শেষ বয়স পর্যন্ত থাকে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত বিশেষ করে। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগকে দূরে ঠেকিয়ে রাখার এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। খাদ্যবস্তু ভাল রূপে চিবিয়ে খেলে মুখের লালার সঙ্গে উত্তমরূপে তা মিশ্রিত হয় এবং মুখেই অর্ধেক হজমের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দাঁত দিয়ে তা উত্তমরূপে পিষ্ট না হয়ে এবং মুখের লালার সঙ্গে মিশ্রিত না হয়ে পেটে গেলে সহজেই গুরুভোজন হয়ে থাকে। সেজন্তেই প্রতিটি গ্রাস বার ত্রিশেক ভাল করে চিবিয়ে তবে তা ফেলা উচিত।

খুব নরম এবং থলথলে করে রান্না করা জিনিস খাওয়া উচিত নয়। কারণ, তাতে দাঁত দিয়ে চিবানোর সুবিধা থাকে না কোন। শক্ত জিনিস চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যেস রাখলে একদিকে যেমন হজমক্রিয়ার সাহায্য হয়, অন্যদিকে তেমনি দাঁতের শক্তিও অটুট থাকে।

দাঁতের ওপরকার চকচকে পালিশ জিনিসটিকে দাঁতের এনামেল বলে। দাঁতের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই পালিশ আবরণটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এনামেল নষ্ট হয়ে গেলে দাঁতেরও ক্ষয় হতে আরম্ভ করে। অম্লরস লাগলে দাঁতের এনামেলের খুবই ক্ষতিসাধন হয়। এই অম্লরস বাইরে থেকে যেমন, অজীর্ণ রোগ হলে পেটের ভেতর থেকেও তেমনি সৃষ্ট হতে পারে। দাঁতের গোড়ায় ক্ষয় ধরলে তাতে খাদ্যবস্তুর অংশ আটকে থাকে এবং তা পচে গিয়ে দাঁতের গোড়ায় ও মুখে রোগজীবাণু সৃষ্টি করে। এই জীবাণু পেটে গিয়েই তা থেকে সৃষ্টি হয় অজীর্ণাদি ব্যাধির। দাঁতের রোগ থেকে যেমন অজীর্ণ হয়, অজীর্ণ থেকেও তেমনি দাঁতের রোগের সৃষ্টি হতে পারে এবং হয়েও থাকে। কাজেই দেখতে পাচ্ছ দাঁতের সঙ্গে পেটের নানাবিধ অসুখের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে।

দাঁতে ক্ষয় বা পোকা ধরলে দাঁত শীঘ্রই একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়া, পুঁজ পড়া এই সব নানাবিধ দন্তপীড়া ও পেটের ব্যাধির তখন সূচনা হয়। এই অকর্মণ্য পীড়িত দাঁত দিয়ে চিবানোও সম্ভব নয় ভালরূপে। পীড়িত দাঁত নানা দিক দিয়েই শরীরের অস্বাস্থ্য ডেকে আনে। এই ধরনের পীড়িত দাঁতকে ডাক্তার দিয়ে শীঘ্রই উৎপাটন করে ফেলাই বিধেয়।

দাঁতের পুষ্টিসাধনে ক্যালসিয়াম ও সি ভিটামিনের প্রয়োজন অত্যন্ত। দেহে সি ভিটামিনের অভাব হলেও দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়া, মাড়ি ফোলা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। আমলকি, পেয়ারা, কমলা লেবু ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে সি ভিটামিন থাকে। ক্যালসিয়াম ও সি ভিটামিনের বড়ি খেয়েও দেহের এই উপাদানগুলোর অভাব দূর করা যায়।

দাঁত ভাল রাখতে হলে শিশুকাল থেকেই দন্ত শোধনের অভ্যেস করা উচিত।

দাঁতের ওপর ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাস্থ্য এতটা নির্ভর করে বলেই আমেরিকার সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে দন্ত পরীক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে। নিযুক্ত ডাক্তারেরা সেখানে কিছুদিন পর পরই ছাত্রদের দাঁত পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজন মত চিকিৎসাও করে থাকেন এদের। সকালবেলা রোজ দাঁত মাজা হয়েছে কিনা শিক্ষকেরা সেখানে প্রতিদিন ক্লাসে তা খোঁজ করেন এবং অপরাধীদের লজ্জা দেবার জন্যে ব্ল্যাক বোর্ডে তাদের নাম লিখে ধরিয়ে দেন সকলের সামনে। শিশুদের দন্ত-চিকিৎসার জন্যে নানা হাসপাতাল চিকিৎসালয়ও আছে সেখানে। শুধু আমেরিকায় কেন, আজকাল অন্যান্য সভ্য দেশেও আছে শিশুদের দন্তচিকিৎসার সুবন্দোবস্ত।

পূর্বে আমাদের দেশে প্রতিদিন একটি নতুন আসসাওড়া, নীম, বাবলা কিংবা আমের ডাল প্রভৃতি দিয়ে দন্তশোধন করার প্রথা ছিল। বেশ ভাল সে প্রথাটি। এখন নানারূপ দাঁতের মাজন ও বুরুশের প্রচলন হয়েছে। বুরুশ ব্যবহার করলে প্রতিদিন তা ধুয়ে রাখা উচিত ভালরূপে। চিকিৎসকদের মতে বুরুশ ধুয়ে ভিজে বুরুশের কুচিতে লবণ লাগিয়ে রাখলে রোগ জীবাণু সঞ্চিত হতে পারে না তাতে, পরের দিন তা ব্যবহারেও তাই, আশংকার কোন কারণ থাকে না। গরম জলে লবণগুলে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় কুলকুচা করলেও মুখের রোগজীবাণু নষ্ট হয়। দেহের সমস্ত অংশের মধ্যে মুখের ভিতরই রোগজীবাণু সঞ্চিত ও বর্ধিত হবার সব চেয়ে বেশী সুযোগ পায় বলেই মুখশোধন সম্বন্ধে এত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

ভাল ভাল দাঁতের মাজন-চূর্ণ ও টুথপেষ্টের আজ অভাব নেই আমাদের দেশে। সে সব ব্যবহার করা যারা ব্যয়সাপেক্ষ মনে কর, তারা খড়িমাটি ও ফটকিরি চূর্ণ করে একত্রে মিশিয়ে নিয়ে তাতে কিছু কর্পূর গুঁড়ো দিয়ে কৌটোয় ভরে রেখে দেবে এবং প্রতিদিন বুরুশ সহযোগে দন্তশোধন করবে তা দিয়ে। ফটকিরি জিনিসটা দাঁতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বুরুশ করবার সময় দাঁতের ওপর দিয়ে সমানভাবে এবং খাড়াভাবে দু'দিকেই বুরুশ চালাবে। অন্ততঃ চার-পাঁচ মিনিট এই কাজে নিয়োগ করা উচিত। বুরুশ করা শেষ হয়ে গেলে খুব ভাল করে কয়েকবার কুলকুচা করবে। এই নিয়ম মেনে চললে দাঁতের গোড়ায় খাদ্যাংশ জমে থাকতে পারবে না, অবশ্যই তা বেরিয়ে আসবে। রাত্রিতে ঘুমোবার পূর্বেও প্রতিদিন দন্তশোধন করার পর ভালরূপে কুলকুচা করার অভ্যেস রাখা ভাল। এই সব নিয়ম পালন করলে দাঁতের পীড়া থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং সারা জীবন স্বাস্থ্য-সুখ ভোগ করাও সম্ভবপর হয়ে ওঠে।
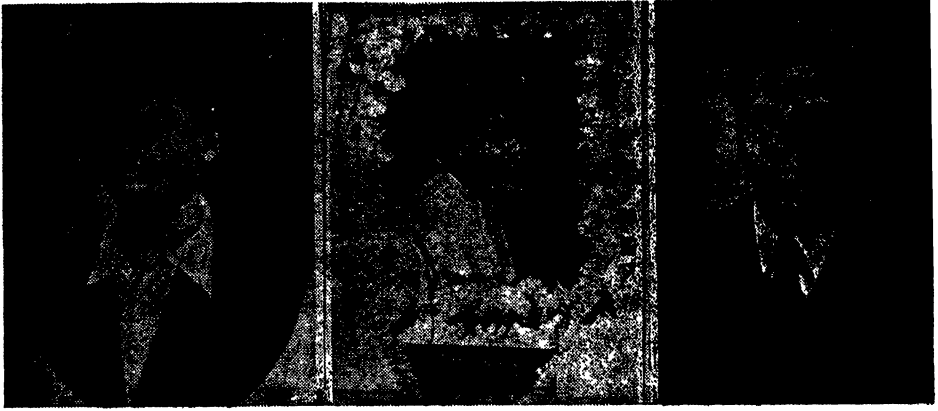
বিনয় দীনেশ বাদল

অলিন্দ যুদ্ধের তিন বীর

শ্রীঅমল সেন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাইটার্স বিল্ডিংসের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মরণ-ছন্দে নৃত্য করে বেড়াতে লাগলো তিনটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সাম্রাজ্যের দুর্গে প্রবেশ করে আগুন নিয়ে কী প্রলয়ঙ্কর খেলাই না শুরু করেছে ওরা! জাতির জীবনে পরাধীনতার অভিশাপ ব'য়ে নিয়ে আসার কলঙ্কে কলঙ্কিত এই সৌধকে পাপমুক্ত শাপমুক্ত করে স্বাধীনতার পুণ্য পাদপীঠে পরিণত করার জন্য কঠিন শপথ নিয়েছে ওরা। সেই শপথ এখন পূর্ণ হতে চলেছে দেখে উদ্ধত অফিসাররা বিপ্লবীদের রক্ত-খেলায় ভীত হয়ে পালাতে গিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকজন অগ্নিশিশুদের গুলীতে আহত হ'ল। বিপ্লবীদের গুলীতে সিম্পসনের নিহত হবার এবং সেক্রেটারী নেলসন ও টয়নাম প্রমুখ আহত শ্বেতাঙ্গ আই. সি. এস. অফিসারদের আর্তনাদ করার সংবাদ শুনে এতকালের নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত করণিকদের মুখে স্বস্তির আভাস যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাদের মনে আশার আলো জ্বলে উঠেছে, তবে এবার বুঝি অমানিশার অন্ধকার কেটে গিয়ে নতুন প্রভাত দেখা দেবে! বিপ্লবীদের কণ্ঠের বন্দেমাতরম ধ্বনি সারা রাইটার্স বিল্ডিংসকে কাঁপিয়ে তুলেছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যেই লালবাজারে খবর পৌছে গেছে। সেখান থেকে দলে দলে পুলিস এসে চারদিক ছেয়ে ফেলেছে। সমগ্র ডালহাউসী স্কোয়ার এলাকা ও রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস অবধি সবগুলি রাস্তা ও অলিগলি পুলিশে-পুলিশে একাকার। তাদের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ

ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেগ, পুলিশ কমিশনার টেগার্ট এবং ডেপুটি পুলিশ কমিশনার গর্ডন তৎক্ষণাৎ রাইটার্স বিল্ডিংসে এসে সামরিক কায়দায় সমস্ত ঘাঁটি আগলাবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন, যাতে শত্রুপক্ষের একজন লোকও পালাতে না পারে। তারা জানে না যে, নিজেদের মৃত্যু নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে লড়াই করবার জন্যই তরুণ এই তিনজন মৃত্যুর গুহায় এসে ঢুকেছে—মহাভারতের বীর অভিমন্যু বের হতে পারবে না জেনেও চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছিল। পাশপোর্ট অফিসের ঘরে ঢুকে যখন তারা সবকিছু ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড বাধিয়ে তুলেছে, তখন পুলিশ বাহিনী এসে তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তাঁরা তা বুঝতে পেরেই যে-যার গুলীভর্তি রিভলবার হাতে ক'রে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এবং পুলিশ বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণ আরম্ভ করলেন। বেশ কিছু সময় পর্যন্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ চললো। গুলীবিদ্ধ হয়েও সম্মুখযুদ্ধ থেকে এক পাও পিছু হটলেন না সতের বছর বয়সের কিশোর বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত, তিনি গুলীবর্ষণ করেই চলেছেন। বাহিনীরও অনেকে সাংঘাতিক আহত হ'ল।

সব সত্ত্বেও এ ছিল অসম যুদ্ধ—একদিকে স্বাধীনতা উদ্বুদ্ধ তিনজন মাত্র তরুণ বাঙালী—আর অন্য দিকে তিন হাজারেরও বেশী বৃটিশের পদলেহী সশস্ত্র পুলিশ, তারা বুলডগের মত বিবেকশূন্য প্রভুভক্ত, আর নেকড়ের মতো হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। আমরা যদি বলি বিনয়-বাদল-দীনেশ সেদিন গোটা বৃটীশ সাম্রাজ্যের দম্ভ ও অহিমকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তাহলে কি বেশী বলা হবে? সীমিত অস্ত্রশক্তি ও বজ্রকঠিন মানসিকতা নিয়ে তাঁরা যে সংগ্রাম করেছিলেন তাতে তাঁদের প্রাণপ্রাচুর্য ও অপূর্ব মনোবলের পরিচয় পেয়ে টেগার্টের মতো জাঁদরেল বৃটীশ পুলিশ অফিসারকেও শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াতে হয়েছিল।

গুলী নিঃশেষিত হয়ে আসতেই মেজর বিনয় বসু সহযোদ্ধাদের—বাদল ও দীনেশকে পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়তে নির্দেশ দিলেন। এবার লগ্ন এসেছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার। "বীরের মতো মরতে পেলে চাইনে কিছু আর, সব কলঙ্ক ফেলবে মুছে বুকের রক্তধারা।" সেই পুণ্য লগ্নে তিন বন্ধু একটা ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর পকেট থেকে তীব্র বিষ পটাসিয়াম সায়ানেড বের করে খেয়ে ফেললেন। বিষ মুখে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বাদল মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়ল। কিন্তু মৃত্যু এলো না বিনয় আর দীনেশের কাছে, এতো হ'তে পারে না। এক পথের পথিক তারা। মৃত্যুতে তারা আলাদা হবে কী করে! মুহূর্ত মাত্র দেরি না ক'রে, বিনয় এবং দীনেশ নিজের নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবার জন্যে রিভলবারের শেষ গুলীটা নিক্ষেপ করলেন।

দু'জনেই গুলীর আঘাতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিন্তু মৃত্যু তখনো তাদের কাছে এসে ধরা দিল না। দেশের জন্য আরও বীরত্ব, আরও সাহস, আরও ভালোবাসার প্রমাণ দেবার তখনও তাদের প্রয়োজন ছিল। তাই মৃত্যু তাদের কাছ থেকে দূরে সরে রইলো।

বিরাট পুলিশ বাহিনী সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষের দরজার সামনে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে পর পর কয়েকটা গুলী ছুঁড়লো, কিন্তু ভিতর থেকে তার প্রত্যুত্তরে কোন গুলীর আওয়াজ পাওয়া গেল না। পুলিশ অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল, কিন্তু তাদের ভয় একেবারে দূর হ'ল না। তারা আরও কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। কে আগে ঘরে ঢুকবে? কারুরই সাহসে কুলোচ্ছে না। এমন যে দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী টেগার্ট সাহেবেরও সেই অবস্থা। কিন্তু তবুও টেগার্ট'ই আবার দরজার তালা দিয়ে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে গুলী ছুঁড়লেন। কিন্তু দেখলেন ঘরের মধ্যে থেকে তার কোন জবাব এলো না। তখন তিনি কিছুটা সাহস সঞ্চয় ক'রে দরজা ভেঙে পুলিশ বাহিনী নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। তিন বীর শিশুই তখন ভূমিশয্যায় শায়িত। কিন্তু তাতে কি? সেই অবস্থায় তাদের বন্দী ক'রে টেগার্ট তাঁর বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখালেন।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজনের দেহ তখন নিস্পন্দ, নিঃসাড়। মৃত্যু এসে বাদলকে কোলে তুলে নিয়েছে। তাঁকে আর কোন রকমেই জাগানো যাবে না। আসামীর কাঠগড়ায়ও দাঁড় করানো যাবে না তাঁকে। সমস্ত আইনের তর্কাতর্কির তিনি উর্ধ্বে। বাকী দু'জনের দেহে তখনো প্রাণের স্পন্দন রয়েছে। মুহূর্তের জন্য কেমন যেন একটা আতঙ্ক ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া দেখা দিল। কিন্তু তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। বাদলের মৃতদেহ গোয়েন্দা অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল এবং মুমূর্ষু বিনয় ও দীনেশকে পুলিশ বাহিনীর প্রহরাধীনে মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হ'ল।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটীশ শাসকগোষ্ঠী বিনয় দীনেশকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য কি কম চেষ্টা করেছে তখন? তারা আশা করেছিল বিনয় এবং দীনেশকে কোন রকমে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে, তাদের দু'জনের কাছ থেকে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করা যাবে, কোথায় কোথায় বিপ্লবীদের ঘাঁটি আছে, জানা যাবে।

কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরেই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর বিনয়ের অমর আত্মা মৃত্যুহীন লোকে যাত্রা করলো। ভীষ্মের মতো ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলো বিনয়। প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটীশ গভর্নমেণ্ট তাকে আটকাতে পারলো না। অজ্ঞান অবস্থায় কিনা জানি না, মাথার গভীর ক্ষতস্থানের মধ্যে সে তার নিজের আঙুল ঢুকিয়ে ঘা'টাকে রক্তাক্ত এবং সাংঘাতিক বিষাক্ত ক'রে তুললে। এবার আর মৃত্যু তাঁর উদগ্র আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলো না। বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু বরণ করে নিল মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী বিনয়।

বিনয়ের মৃত্যুসংবাদ দাবানলের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। এক নতুন আদর্শ, এক নতুন উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করলো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বাঙালী তরুণদের মনে। সারা বাঙলা দেশে বিপ্লবীদের গোপন ইস্তাহারে ছেয়ে গেল—

"বিনয়ের রক্ত আরো রক্ত চায়।
বিনয়ের জীবন আরো জীবন বলি চায়।"

অথবা

"জাগো রে পীড়িত, অত্যাচারিত, জাগো দুর্বল দল।
ভাঙনের পালা শুরু হ'ল আজি, ভাঙ্ ভাঙ্ শৃঙ্খল।"

দীনেশের মৃত্যু হ'ল না। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং ডাক্তারদের দিবারাত্রির পরিশ্রমে ও আপ্রাণ চেষ্টায় সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি এবং তারপরে তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ থেকে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হ'ল।

দীনেশের বিচারের জন্য দায়রা জজ গার্লিকের নেতৃত্বে এক স্পেশাল ট্রিবিউনাল গঠিত হ'ল। গার্লিকের বিচারে দীনেশ গুপ্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হ'ল। প্রিভি কাউন্সিলে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হ'ল এবং আপীলের শুনানী শেষ না হওয়া অবধি আরও অতিরিক্ত তিন মাস দীনেশকে ফাঁসীর আসামীরূপে জেলে দিন কাটাতে হ'ল। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে যখন দীনেশ ফাঁসীর দিন গুণছেন, তখন সেই জেলে রয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। দীনেশের ফাঁসী তাঁর চোখেও জল এনে দিয়েছিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। প্রিভি কাউন্সিল আগের রায়ই বাহল রাখলো। মৃত্যুদেবতার পদধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন দীনেশ, এবার আর ভুল হ'ল না। কিন্তু বৃটীশের পুলিশ এখনো আশা করছে দীনেশের কাছ থেকে কোন গোপনীয় খবর বের করে নেওয়া যায় কিনা! অবশ্যি সে আশা ছিল তাদের একান্তই দুরাশা। মৃত্যুভয় যারা অবলীলাক্রমে জয় করতে পারে, জগতে এমন কোন বড় প্রলোভন আদর্শের পথ থেকে, সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে, তাদের বিচ্যুত করতে পারে কি? ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই দীনেশ গুপ্ত হাসিমুখে ফাঁসীর রজ্জু চুম্বন ক'রে চিরবিদায় নিলেন।

কিন্তু গার্লিকের কী হ'ল? দীনেশ গুপ্তের অন্যায় বিচার ক'রে সে কি রেহাই পেল? বিধাতার শাস্তি সে কি এড়িয়ে গেল? না, জনগণের অভিশাপই সে শুধু কুড়োয় নি, বিধাতার অমোঘ দণ্ড তার উপরে নেমে এসেছিল মানুষের হাত দিয়ে। তার নিজের আদালত ঘরের মধ্যেই, দীনেশের দণ্ডাজ্ঞার ঠিক কুড়ি দিন পরে বিপ্লবী কানাই ভট্টাচার্যের গুলীতে গার্লিক নিহত হ'ল।

আজ আমাদের আনন্দের দিন, তাঁদের স্মৃতিকে আমরা যে ভুলিনি তাই প্রমাণ করার দিন, বিনয়-বাদল-দীনেশের অলিন্দ যুদ্ধের ২৯ বছর পরে, তাঁদেরই স্মরণে ডালহাউসী স্কোয়ারের নাম পরিবর্তন করে 'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে'র উদ্বোধন হ'ল।

এসো আমরা এই বিপ্লবীদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে প্রণতি জানাই।

মশানজোড়ে চড়ুইভাতি

শ্রীরামপ্রসাদ সরকার

ছুটির দিনগুলোয় তোমাদের সকলের মন চায় কোথাও গিয়ে চড়ুইভাতির আসর জমিয়ে তুলতে, তাই না? সেই সঙ্গে কিছুটা বৈচিত্র্যের সন্ধানও পাওয়া যায়।

মশানজোড় এমনি একটি জায়গা যার শীতল ছায়ায় চড়ুইভাতির আসর উপভোগ্য হয়ে ওঠে। দূরত্ব এমন কিছু বেশী নয়, সিউড়ি থেকে মাত্র ২৫ মাইল। সব সময় বাস পাবে।

অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টির দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। আজও আমরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির এই খামখেয়ালীপনার হাত থেকে শস্যের ফলনকে রক্ষা করবার জন্যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা রূপ নেয়। এই পরিকল্পনার অধীনে বিহারের সাঁওতাল পরগণা মশানজোড়ে ময়ূরাক্ষী নদীকে বেঁধে জলাধার ও বন্যানিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়।

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ মশানজোড়ের এই বাঁধটি। কানাডা সরকারের সহযোগিতায় নির্মিত এই বাঁধটি 'কানাডা বাঁধ' নামেও সুপরিচিত। অবাধ্য নদীর গতি অবরোধ করে মানুষ যে দুঃসাধ্য সাধন করেছে, তার পরিচয় মেলে মশানজোড়ের এই 'কানাডা বাঁধে।'

১৯৫১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী স্বর্গত ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই বাঁধটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৫৬ সালে এর কাজ সম্পূর্ণ হয়।

২৮ বর্গমাইল ব্যাপী এবং ২১০০ ফিট উঁচু এই বাঁধটির জলাধারের পরিধি পাঁচ লক্ষ একর ফিট এবং জলের গভীরতা প্রায় ১৫০ ফিট।

মশানজোড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য খুবই মনোরম। বাঁধের কোল ঘেঁষে রাস্তা চলে গিয়েছে ভাগলপুর, বক্তিয়ারপুর পর্যন্ত। স্লুইস গেটের একপাশে ময়ূরাক্ষীর বেঁধে রাখা অগাধ জলরাশি, অপরপাশে শীর্ণকায় নদী এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে কোন্ সুদূরে।

বিভিন্ন গাছের সমারোহ সুবিস্তৃত জায়গাটিকে ছায়াশীতল করে রেখেছে। মনোমত জায়গা বেছে নিয়ে চড়ুইভাতির আসর জমিয়ে তোলো। অবাক্ হয়োনা যদি আদুড় গায়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল তোমাদের ঘিরে ধরে। তোমাদের উচ্ছিষ্ট খাবার পাবার লোভেই তাদের এ ভিড়। ওরাই আবার তোমাদের মুশকিল আসান করে দেবে। জলের প্রয়োজন, ওরাই হাঁড়ি-ভর্তি জল এনে দেবে। এরা খুবই গরীব, সকলেই ডোমের অর্থাৎ হরিজনদের ছেলেমেয়ে।

বৈচিত্র্যলোভী মানুষের ভিড়ে মশানজোড়ের শীতল ছায়ায় তোমাদের একটি দিনের চড়ুইভাতি খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

ফরাসী দেশে দেখানো ম্যাজিক

যাদুকর এ. সি. সরকার

ঘটনাটা ঘটেছিল ফরাসী দেশের বোলন শহরে। তখন আমি প্যারী শহর থেকে যাত্রা করে ফরাসী দেশের আরও কয়েকটি শহর ঘুরে সবেমাত্র পৌঁচেছি বোলনে।

একদিন সকালে হোটেলের কামরায় বসে দেশে চিঠি লিখছি, এমন সময় দরজায় পড়লো করাঘাত। চেয়ার থেকে না উঠেই মুখ ফিরিয়ে বললাম—আঁন্ত্রে অর্থাৎ ভিতরে এসো।

ঘরে ঢুকলেন হোটেলের ম্যানেজার।

ব্যাপার কি?

কোনরকম ভনিতা না করেই সাহেব বললে, "আমার ছেলে-মেয়ে-বৌ এসেছে, ওদের একটা ম্যাজিক দেখাতে হবে। ওদের কাছে তোমার বিষয়ে অনেক গল্প করেছি, একটা কিছু না দেখালে আমার আর মান বাঁচে না, মঁসিয় সরকার!"

মৃদু হেসে বললাম, "বেশ তো, আমার এই চিঠি লেখাটা শেষ হোক, মিনিট দশেক পরে ওদের নিয়ে এসো এ ঘরে।"

মেৰ্সি বকু—অনেক ধন্যবাদ, বলে বিদায় নিলো সাহেব। চিঠি লেখা শিকেয় তুলে রেখে আমি প্রস্তুত হলাম, একটা মজার ম্যাজিক দেখানোর জন্য।

ওদের আর দেরি সইছিল না। ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা এসে হাজির হলেন।

অভিবাদন বিনিময়ের পর আমি ম্যানেজার পত্নীর কাছ থেকে চেয়ে নিলাম তার রুমাল—মাদাম, ভত্র মুশোয়ার সিল ভু প্লে।

ব্যাগ থেকে বের করে তার ছোট্ট রুমালটা তিনি এগিয়ে দিলেন। সামনেই পড়ে আছে খোলা রাইটিং প্যাড সেটা হাতে তুলে নিয়ে আমি পড়লাম ম্যাজিকের মন্ত্র:

হুতোম প্যাঁচা হাকিম হয়ে—
হুলোর গলায় পরায় ফাঁসী,
আনন্দেতে ভোঁদড় নাচে,
রামছাগলে বাজায় বাঁশী!

মন্ত্র পড়া শেষ হতে ম্যানেজারের মেয়েকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম—মঁডাম জেল, কঁম্যা ভুজাপালে ভু?

মেয়েটি উত্তর করলো—জুলি।

রুমালটাকে কলমের মত বাগিয়ে ধরে তার এক কোণা নিয়ে প্যাডের উপরে আমি লিখলাম 'জুলি', তারপরে প্যাডটা বাড়িয়ে দিলাম। আমাকে কলম ছাড়া, তাদের দেওয়া রুমালের সাহায্যে এমনি ধারা ম্যাজিক লেখা লিখতে দেখে অবাক হলেন সবাই।

বলতে পার কেমন করে এই অসাধ্যসাধন করলাম? শোন তবে খুলেই বলি। এ খেলাতে হিপ্নোটিজম বা মন্ত্রতন্ত্র কিছুই প্রয়োগ করিনি। খুব সহজ একটা মামুলী কৌশলেই সম্ভব করেছিলাম এই অসাধ্যকে। কেমন করে তাই বলছি।

আমার কাছে ছিল কিছুটা মেক-অ্যাপ করার স্পিরিট গাম। থিয়েটারে নকল দাড়ি গোঁফ লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এই আঠা। ম্যানেজার সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর ছেলে-মেয়ে-বৌকে ডাকতে গেলেন আর আমি সেই অবসরে একটুকরো ছোট পেন্সিলের সীস স্পিরিট-গাম দিয়ে সেঁটে নিলাম আমার তর্জনীর ডগায়, নীচের ছবিতে যেমন দেখানো

হয়েছে ঠিক তেমনি করে। হাতের ভিতরের পীঠে থাকাতে এই পেন্সীলের সীস ওদের কারো নজরে পড়েনি। লেখবার সময়ে তো এই সীস সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছিল রুমালের তলায়। রুমালের কোন্ দিয়ে লেখার ভান করলেও আসলে কিন্তু আমি লিখেছিলাম এই লুকানো পেন্সিলের সীসের সাহায্যেই।

ভালভাবে অভ্যাস করলে তোমরাও এই ম্যাজিকটা দেখিয়ে তোমাদের বন্ধুবান্ধবকে অবাক করে দিতে পারবে।
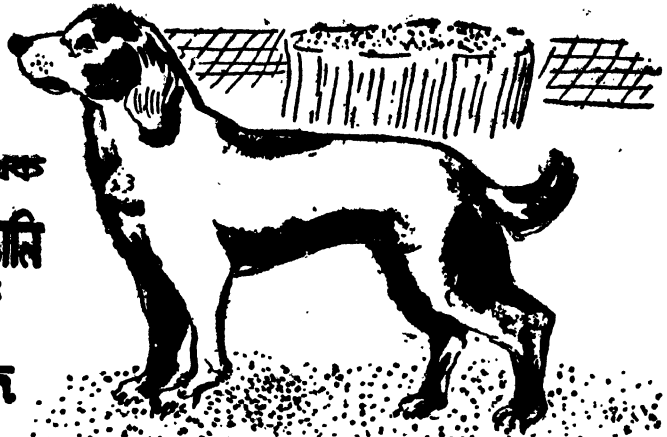
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আমি ল্যাম্পোকে কিছুদিনের জন্য আমার বাড়ীতে পিওম্বিনোয় নিয়ে এলাম। এইটাই একমাত্র উপায়, যাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। এর জন্য অবশ্য আমাকে অনেক রকম পারিবারিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এক বাধা তো আমার পরিবার ও আমার কুকুর টাইগার, আর দ্বিতীয় বাধা পিওম্বিনো ষ্টেশনের কর্মচারীদের অসন্তোষ।

আমাদের কাজ হ'ল চব্বিশঘণ্টা ওর তোয়াজ করা, ওকে আদর করা, নানারকম মনোরঞ্জন উপায় উদ্‌ভাবন করে ওর দিনগুলো ভরে দেওয়া, যাতে করে ওর ট্রেন-ভ্রমণের জন্য বেশী মনকেমন না করতে পারে।

টাইগারও যা হোক খাঁটি ক্রিশ্চানের মত ল্যাম্পোর উপস্থিতির তিক্ততাকে কোনরকমে গলাধঃকরণ করে নিলো। আর পিওম্বিনো ষ্টেশনের কর্মচারীরাও বার বার ওকে ক্যাম্পিগ্‌লিয়ার ট্রেনে বসতে বাধা দিয়ে, আটকে রেখে, যথেষ্ট সহযোগিতা করত।

যখন আমি কাজে চলে যেতাম, ল্যাম্পো বেশ আনন্দেই সময়টা কাটাতো। সে আবার তার পুরোন কাজে জুতে গেল। মির্ণাকে স্কুলে পৌছে দেওয়া এবং নিয়ে আসা, তারপর আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন বাজারে যাওয়া। তারপর সারাদিন লাল ভেলভেটের ডিভানে শুয়ে তোফা ঘুম। এই সৌভাগ্য থেকে টাইগার এমন কী আমিও বঞ্চিত ছিলাম।

যখন কাজ থেকে ফিরে আসতাম ও উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে অভ্যর্থনা জানাতো।

আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে যেন জিজ্ঞাসা করতে চাইত—"সেখানকার খবর কী? সব ভাল তো? ওরা কী বড্ড বেশী আমার অভাব বোধ করছে?"

যেহেতু আমি জানতাম যে, শ্রীমান্ বেড়াবার জন্যই জন্মেছেন, সেহেতু ভাবলাম আমার গাড়ীটি ওঁরই ভ্রমণের সেবায় ব্যবহার করা উচিত। বোঝা গেল উনিও এবারে 'কারটি'র প্রতি বেশ মনোযোগী হয়েছেন। আমি গাড়ীর দরজা খুলতে-না-খুলতেই ল্যাম্পো একেবারে ভেতরে। প্রথমে একলাফে ছোট জানলার ওপরে উঠবে, তারপর সামনের সীটে বেশ গুছিয়ে কায়দা করে বসবে, ভ্রমণটি যাতে ভালরকম উপভোগ্য হয়।

সবচেয়ে সমস্যা হ'ল ল্যাম্পো ও টাইগারের একত্র বাস। একই বাড়ীতে কী করে দুটি এত ভিন্নধর্মী জীবনাদর্শের কুকুরকে রাখা যেতে পারে? যাই হোক ধৈর্য ও দক্ষতার সঙ্গে এ সমস্যারও সমাধান করে নেওয়া গেল।

টাইগার একে আয়তনে বড় তার ওপর ওর স্বভাবটিও ভাল। ও বুঝে নিলো ল্যাম্পোকে আমরা ভালবাসি। অতএব ও যদি ল্যাম্পোর কোন অসম্মান করে, তবে সে অসম্মান আমাদের প্রতি। কাজে-কাজেই ও ঈর্ষাকে দমন করে নিলো। ল্যাম্পোর স্বভাবটি মোটেও টাইগারের মত ভাল ছিল না। কিন্তু সেও বুঝে নিয়েছিল যে, টাইগার এই পরিবারেরই একজন সদস্য—বাইরের লোক ও নিজেই। কাজেই আমাদের এ্যালসেশিয়ানকে বরদাস্ত করে নেওয়াই ও সাব্যস্ত করল।

আমরা দু'জনের প্রতিই সমান ও পক্ষপাতিত্বহীন ব্যবহার করতাম। যাতে কেউই মনে ব্যথা না পায়। কেবল খেতে দেবার সময়টা একটু পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ব্যবহার হয়ে যেত। টাইগারকে আমরা ওর সাবেকী বরাদ্দ স্যুপ ও ম্যাকরণী দিতাম। কিন্তু ল্যাম্পোকে দিতাম মাংস—এবং সেরা মাংস। এটা বাধ্য হয়ে করতে হোত। যদিও একটু খারাপই লাগত মনে মনে। কিন্তু উপায় কী? ল্যাম্পো ডাইনিংকারের থেকে সেরা মাংস খেয়ে অভ্যস্ত। অতএব আমরা দু'জনকে আলাদা সময়ে এবং আলাদা জায়গায় খেতে দিতাম।

ল্যাম্পোকে সাধারণ কুকুরদের মত খাওয়াদাওয়ায় অভ্যস্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম। কোন কোন দিন সন্ধ্যেবেলা ওকে বেঁধে রেখে দিতাম। মনে করতাম খুব যদি খিদে পায় তখন যা দেওয়া যাবে তাই খাবে। কিন্তু ভবি ভুলিবার নয়। যা-তা খাবার দিলে সে শুঁকবেনা পর্যন্ত। বরং সে অনাহারে প্রাণত্যাগ করবে, কিন্তু খাবারের পরিবর্তন মানবে না।

হ্যাঁ, একবার, কেবলমাত্র একবারই আমি ওকে পাউরুটির স্যুপ খাওয়াতে পেরেছিলাম। খাবারটা ছিল টাইগারের। ওকে সেইটার সামনে করে দিলাম। চটপট সমস্তটা গলাধঃকরণ

করে নিল কেবল এই খুশিতে যে, টাইগারকে বঞ্চিত করা গেল। সেজন্য অবশ্য টাইগারকে আটকে রাখতে আমাকে রীতিমত কসরৎ করতে হয়েছে। এ প্রচেষ্টা আর কখনই করিনি। যতদিন ল্যাম্পো আমার অতিথি হয়েছিল, কষাইয়ের বিল দুর্দান্তরকম বেড়ে গিয়েছিল।

ল্যাম্পো ও টাইগার একসঙ্গে থাকত বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে আদৌ কোন বন্ধুত্ব হয়নি। দু'জনেই পরস্পর থেকে স্বাতন্ত্র্য ও দূরত্ব বজায় রেখে চলত। কিন্তু আমরা দু'জনের সম্বন্ধেই গৌরবান্বিত ছিলাম। যখন দেখতাম দু'জনে একসঙ্গে হেমন্তের শেষ উত্তাপটুকু উপভোগ করছে, তখন খুশি হতাম।

ল্যাম্পো সারাদিন দৌড়োদৌড়ি করে সমস্ত পিওম্বিনোময় বেড়াতে লাগল। পিওম্বিনোর এমন কোন জায়গা নেই যার সন্ধান ও পায়নি। ওর সবচেয়ে প্রিয় স্থান ছিল 'পিয়াজা-বোভিও'। জায়গাটা আমাদের ছোট শহরের একটি গর্বের বস্তু ছিল। শহরের একেবারে শেষে যেখানটায় সমুদ্রে এসে মিশেছে, সেখানে এল্‌বা দ্বীপের দিকে মুখ করে আমাদের পিয়াজা-বোভিও। সেখানে সে প্রতিদিন যেতো আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকত—সেই বিশাল নীল সমুদ্রের দিকে।

শহরের যেখানটা যানবাহন বহুল, সেই সব রাস্তায় ও টোটো করে বেড়াত বলে আমরা অনেক সময়ই ওর কোন বিপদ ঘটতে পারে ভেবে উদ্বিগ্ন থাকতাম। এ ছাড়া শহরে ছিল কুকুর ধরার ভয়। একথা সকলেই জানত যে, এই বিশ্রী পেশাদারী ব্যক্তিটি তার লম্বা ফাঁস হাতে করে বেড়াতো এবং মহা উৎসাহে তার কর্তব্য পালন করত। কিন্তু ল্যাম্পো তেমন হেঁজিপেঁজি মফস্বলের কুকুর ছিল না। রাস্তার বিপদ থেকে ও নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে জানত। কুকুর-ধরাওয়ালাকে ওর গলায় ফাঁস জড়াবার সুখে ও বঞ্চিত করেছিল। টাইগার সব বিষয়ে বড় নিরুৎসাহী ও কুঁড়ে ছিল। ল্যাম্পো কিন্তু মহোৎসাহে আমাদের বাড়ী পাহারা দিত। একটু বেশীরকম নিষ্ঠার সঙ্গেই। ফলে ও যতদিন আমাদের কাছে ছিল, আমাদের আত্মীয়বন্ধুদের আসা কমে গেল। বোঝা গেল, যদি এইভাবেই চলে তবে ক্রমেই আমরা অন্যসকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। শুধু তাই নয়,—মুদি, গয়লা, রুটিওয়ালা, কেউ আর বাড়ীতে এসে জিনিস পৌঁছে দিতে রাজী নয়।

এদিকে কিন্তু ল্যাম্পো রেলওয়ে ষ্টেশনে তার চেনা ট্রেনগুলি ও সেখানকার বন্ধুদের কারো-কেই ভোলেনি। বরং ও এইটাই বুঝিয়ে দিতো যে, এখানে ওকে জবরদস্তি ছুটি কাটাতে হচ্ছে। এই জুলুমের সঙ্গে ওকে বাধ্য হয়ে খাপ্‌খাওয়াতে হয়েছে। ওর যেন বিশ্বাস শীঘ্রই এ উৎপাতের অবসান হবে।

বার কয়েক ও পিওম্বিনোর ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছে ক্যাম্পিগ্লিয়ায় পালাবার ধান্দায়। কিন্তু পিওম্বিনো রেলকর্মচারীদের কাছে বাধা পেয়েছে। তারা তাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্য, লঘুগুরু সবরকম উপায়ে ওকে নিরস্ত করেছে।

বিশেষ করে দেখেছি সন্ধ্যের দিকে যখন ও দূর থেকে ট্রেনের বাঁশী ও চাকার আওয়াজ শুনতে পায়, তখনই ও সবচেয়ে বেশী ছট্‌ফট্ করে। ছুটে যায় সদর দরজার দিকে। আঁচড়ে খোলবার চেষ্টা করে। ওর অনুনয়-ভরা দৃষ্টি দেখেও আমরা বাধ্য হয়েই নির্বিকার থাকি।

কাজের চাকা যেমন চলছিল, তেমনি চলতে থাকে। দিন আসে, দিন যায়। তেমনি করে মাল গাড়ী, প্যাসেঞ্জার গাড়ী, ক্যাম্পিগ্লিয়া দিয়ে যায়-আসে। ল্যাম্পোর অনুপস্থিতি কিন্তু লোকের দৃষ্টি এড়ায় নি। রেলের কর্মচারীরা বেশ একটা শূন্যতা অনুভব করত। কিন্তু তারা বুঝত, ওকে যদি সত্যিই নিজেদের মধ্যে ফিরে পেতে হয়, তবে কিছুদিন অন্ততঃ ওকে সরিয়ে রাখাই বুদ্ধির কাজ। স্কুলের ছেলেরাই সবচেয়ে প্রথম লক্ষ্য করল ল্যাম্পোর অনুপস্থিতি। কারণ যাত্রীরা অনবরত ওদের জিজ্ঞাসা করত, ল্যাম্পো কোথায়? কাজে-কাজেই ওরাও তার খোঁজ করত। এদিকে ডাইনিংকারের রাঁধুনীরা ওকে জানলার কাছে না দেখে অধৈর্য হয়ে হাঁক ছাড়ত, ডাকাডাকি করত। (ক্রমশঃ)
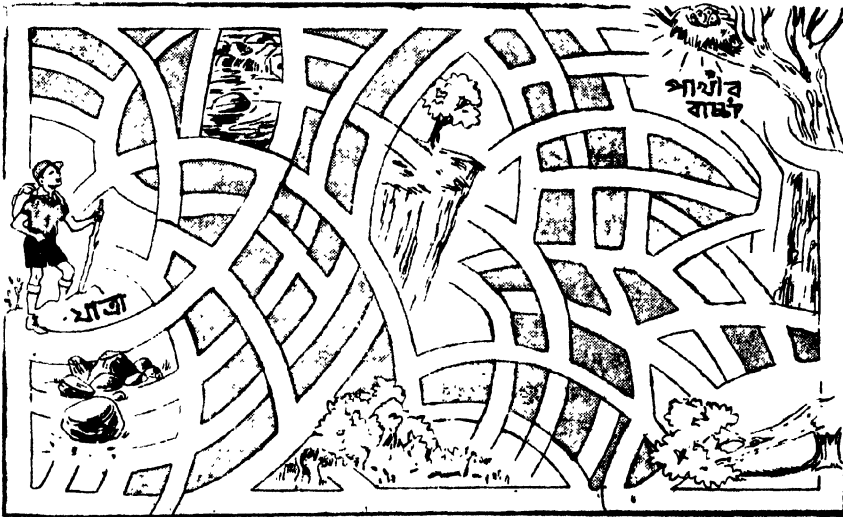
পথ বার করো

ছোলটি পাখীর বাচ্চা পাড়তে যাবে। অনেক দূরে তাকে যেতে হবে জঙ্গলের মধ্যে। পথে নানা বাধা-বিপত্তি আছে। কোন পথ দিয়ে গেলে সে 'পাখীর বাচ্চা' যেখানে আছে, সেখানে পৌছতে পারবে তা তোমরা বার করার চেষ্টা করো।

কার্শিয়ং

ঝর্ণা-ঝরা পাহাড় ঘেরা এই যে হেথা কার্শিয়ং,
ভুলালো মন দেবদারু বন তার যে ঘন সবুজ রং।
নিম্নে দেখি শ্যামলা ভূমি মখ্‌মলের গালচে পাতা,
তার মাঝেতে রুপোর রেখা চিহ্ন নদীর বুঝবে না তা।
কোথাও উঁচু কোথাও নীচু দূরে ঘুমের পাহাড় নীল,
হেথায় শত শৈল শিরে সবার সেরা সে-ডাউহীল।
পাষাণ-কারা বিদার করা অযুত ধারা নির্ঝরিণী,
'হুসেন খোলা', 'ধুবীঝোরার' শুনছি কানে ঝরঝরানি।
সকাল-সাঁঝে বেড়িয়ে যবে 'ঈগল ক্র্যাগে' বসে থাকি,
তুলনাহীন সে কোন ছবি মনের মাঝে যায় যে আঁকি।
বালাসনের উপত্যকায় দেখি ফুলের বর্ণ কতো,
কোথাও গেলে মোহন শোভা হয়না দেখা এমনটি তো।
পাহাড় গায়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে চায়ের ঝোপ,
তার মাঝেতে টিনের বাড়ী দেখতে যেন পায়রা খোপ।
সাপের মত চলছে বেঁকে খেলনা সম রেলের গাড়ী,
পৌঁছে যাবে দারজিলিং-এ সোনাদা ঘুম গেলে ছাড়ি।
মাথার সাথে ঝুলিয়ে বোঝা নামছে সবে পাহাড় বেয়ে
ওড়্‌না গায়ে ঘাগ্‌রা-পরা দেখছি কত চলছে মেয়ে।
নয়ন মেলে দেখবে হেথা সকাল হতে সন্ধ্যেবেলা
রৌদ্র সাথে মেঘ-কুয়াশার নূতন ধরন এ কোন খেলা।
ঘরের মাঝে রইবে বসে ঝাপসা চোখে দিবসযামী,
হঠাৎ যবে ঝমঝমিয়ে পড়বে এসে বৃষ্টি নামি।
বাতাস ধেয়ে আসবে ছুটে লাগিয়ে দেবে বেজায় শীত,
জবড়জং পোশাক-পরা এটাই তো এই দেশের রীত।

শ্রীমতী কুমকুম বাগচী

গাছের দর্প

মাটিরে কহিছে গাছে,
'তুমি অতি হীন,
সবার চরণতলে
রহ চিরদিন!

মোদের গাছের ফল
আর ফুলগুলি,
সকলে খেয়ে ও দেখে
যায় সব ভুলি!

মোদের ছায়ার তলে
সবে ঘুম যায়,
তব দুঃখ দেখে মোরা
করি হায় হায়!'

ভূমি কহে—'দুঃখ
নাহি মোর,
তোমরা আছ যে বেঁচে
আমার উপর।

আমি না থাকিলে বাছা
বাঁচিতে কেমনে,
নহি আমি হীন,
এটি রাখিও স্মরণে।'

শ্রীজয় ভট্টাচার্য

মৌচাক

কবি দিল তাঁর কাব্য-মাধুরী,
শিল্পী রঙিন রেখা,
লেখনীর রসে দানিল লেখক
আপন দিব্য-দেখা।
জ্ঞানী বিতরিল জ্ঞানের কুসুম
গুণ ছড়াইল গুণী,
বিজ্ঞানী দিল তথ্যাঞ্জলি
বিজ্ঞান জাল বুনি'।

হৃদয়ের যাহা শুভ ও সত্য,
সুন্দর প্রেমময়,
সৃজনী আলোকে উজ্জ্বল যাহা,
যাহা চির-অক্ষয়—
নির্যাস তার নিঙাড়ি যতনে,
সবটুকু মধু ঢেলে,
ভ'রে দিল মন-মৌচাকখানি,
'মৌচাকে' অবহেলে!

বড়দের দেওয়া আনন্দস্রোত
বহে তটিনীর ছন্দে,
সঙ্গম তার সার্থক হ'ল
শিশুর গ্রহণানন্দে!

শ্রীচন্দ্রশেখর গোস্বামী

ভোজনবীর

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

পাঁচ কিলো আলু খায় ওপাড়ার লালুয়া,
পঞ্চাশ বাটি চাই দুধ-ক্ষীর-হালুয়া।
কী পেটুক হায়রে,
ছেলে—না এ বেলে হাঁস, বোঝা বড়ো দায়রে!
দই তা'কে যতো দাও—হৈ চৈ করবে,
ছয় ধামা খৈ খেয়ে তবে সে তো নড়বে!
এ কেমন ভাইরে,
পেট তবু ফাটে নাকো বলিহারি যাইরে!

ডিম-রুটি রোজ তার চাই দশ গণ্ডা,
লোক বলে, "কোত্থেকে এলো এই ষণ্ডা!"
আহা কী যে ছেলিয়া—
সাত থালা ভাত খায় হাসিয়া ও খেলিয়া!

সকালে উঠে সে বলে, "ওরে তোরা আন্ তো
বেশী নয়—শ'খানেক লুচি আর পান্ তো!"
খেয়ে দেয় উড়িয়ে—
ঝুড়ি ঝুড়ি ঝাল-বড়া, ফুলুরি ও মুড়ি সে!

মাঝ রাতে ঘুম থেকে উঠে বলে, "খাবো কি!
তাই বলে রাক্ষস তাকে মনে ভাবো কি?
দুশো রসগোল্লা
দেদার সাবাড় করে ছেলে এক তোল্লা!

ঝোঁক তার সব চেয়ে খিচুড়ি ও পায়েসে,
একটি মিনিটে সাফ করে বিনে আয়েসে।
খায় ক'রে চুরি সে—
দিস্তে দশেক লুচি আর ডালপুরী সে!

মেঠুড়ে

টেনিস

দিল্লীতে সন্থ সমাপ্ত এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে রাশিয়ার জয়জয়কার। রাশিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় আলেকজাণ্ডার মেত্রেভেলি পুরুষদের ফাইনালে ভারতের প্রেমজিতলালকে ৬-৩, ৬-৪, ২-৬, ৩-৬ ও ৬-৩ গেমে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছেন। মহিলাদের ফাইনালে দুই রুশী মহিলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কুমারী অ্যাবাপ্তেজ কুমারী ইভানোভাকে হারিয়েছেন ৯-৭ ও ৬-৩ গেমে। মেত্রেভেলি শুধু পুরুষ বিভাগেই চ্যাম্পিয়নশিপ পাননি, মিক্সড ডাবলসের ফাইনালেও বিজয়ীর সম্মান পেয়েছেন ইভানোভাকে নিয়ে খেলে। মেত্রেভেলি ও ইভানোভা ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে হারিয়েছেন হাঙ্গেরীর গুলিয়াস ও ভারতের কিরণ পেশোয়ারিয়াকে।

এবারের এশিয়ান চ্যাম্পিনশিপের বিস্ময়কর ঘটনা দুটি: গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের জয়দীপ মুখার্জির সেমি-ফাইনালে মেত্রেভেলির কাছে স্টেট সেটে পরাজয় এবং ডাবলসের ফাইনালে জয়দীপ-প্রেমজিত জুটির পরাজয় তরুণ মিত্র এবং মিনোত্রা জুটির কাছে।

ফুটবল

ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান্স মাঠে রুশ যুব ফুটবল দল বনাম আই. এফ. এ. একাদশের খেলাকে কেন্দ্র করে মাঠে বিপুল দর্শকের সমাবেশ ঘটে। এ খেলায় আগন্তুক দলের কাছে আই. এফ. এ. একাদশ ৩-০ গোলে পরাজিত হয়। পশ্চিম বাংলার পক্ষে এবার জাতীয় ফুটবলে যাঁরা সন্তোষ ট্রফি ঘরে আনতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের প্রায় অধিকাংশ খেলোয়াড়ই এ দিনের খেলায় অংশ নিয়েছিলেম।

রাশিয়া ফুটবল দলের ভারত-ভ্রমণ এই প্রথম নয়। এর আগে রাশিয়া থেকে আগত একাধিক ফুটবল দল কলকাতার মাঠে খেলে গেছেন এবং সব ক'টি দলই বিজয়ী হয়ে দেশে

ফিরেছেন। তবে এবার রাশিয়া থেকে যে ফুটবল দলটি খেলতে এসেছিলেন তাঁরা দর্শক মনে তেমন রেখাপাত করতে পারেন নি। শারীরিক পটুতা, মাটি ঘেঁষা পাস এবং অফুরন্ত দমের অধিকারী হলেও, আই. এফ. এ. একাদশের খেলোয়াড় বলাই দে যদি দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন তাহলে রাশিয়া যুব ফুটবল দলের পক্ষে এ খেলায় এত সহজে জয়ী হওয়া সম্ভব হ'ত না। প্রথম দুটো গোলের জন্যে বলাই দে-কে দায়ী করা চলে। প্রথম গোলটার ক্ষেত্রে বলাই দে যদি দ্বিধাগ্রস্তভাবে না বেরিয়ে এসে একটু আগে গোল ছেড়ে এগিয়ে আসতেন, তাহলে রাশিয়া দলের ইসতোনিয়ার পক্ষে এত সহজে হেড করে গোল করা সম্ভব হ'ত না। দ্বিতীয় গোলটার ক্ষেত্রে বলের কাছাকাছি থেকেও বলাই দে একটু দেরিতে ঝাঁপ দিয়ে বল ধরার চেষ্টা করায় ব্যর্থ হন।

যাই হোক, যোগ্য দলের জয়লাভ নিঃসন্দেহে ক্রীড়ধারার সম্মতিসূচক জয়লাভ।

॥ ২ ॥

মেক্সিকো সিটিতে আগামী ১৯৭০ সালের মে মাসে নবম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা জুল রিমে কাপের চূড়ান্ত লীগ এবং নক আউট পর্যায়ের খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ের খেলায় ইয়োরোপের ন'টা, দক্ষিণ আমেরিকার তিনটে, উত্তর এবং মধ্য আমেরিকার দুটো, এশিয়া এবং ওসেনিয়ার একটা এবং আফ্রিকার একটা—মোট ষোলটা দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই ষোলটা দেশের মধ্যে ইংল্যাণ্ড এবং মেক্সিকো বাদে বাকি চোদ্দটা দেশকে প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে মেক্সিকোর চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতায় ইংল্যাণ্ড এবং মেক্সিকো বাদে যে উনসত্তরটা দেশ যোগ দিয়েছিল তারা ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী চোদ্দটা গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত চোদ্দটা গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান চোদ্দটা দেশ মেক্সিকোর চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। ন নম্বর গ্রুপের ইংল্যাণ্ড এবং চোদ্দ নম্বর গ্রুপের মেক্সিকো বিশেষ অধিকার বলে (ইংল্যাণ্ড গতবারের চ্যাম্পিয়ান এবং মেক্সিকো এবারের উদ্যোক্তা) সরাসরি অর্থাৎ প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে না খেলেই মেক্সিকোতে খেলবার অধিকার লাভ করেছে।

বাস্কেট বল

কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেট বল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিংশতিতম জাতীয় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস, মহিলা এবং বালক বিভাগে মহারাষ্ট্র

বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ফাইনালে পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস দল ৮৪-৬৬ পয়েন্টে রাজস্থানকে, মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র ৪৭-৩৪ পয়েন্টে মহীশূরকে এবং বালক বিভাগে মহারাষ্ট্র ৯৪-৬৯ পয়েন্টে মহীশূরকে হারিয়ে দেয়। এই নিয়ে সার্ভিসেস দল বারো বার পুরুষ বিভাগে এবং মহারাষ্ট্র মহিলা বিভাগে পর পর চারবার চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব লাভ করল।

পশ্চিম বাংলা দল তিনটে বিভাগের খেলায় যোগদান করে মহিলা এবং বালক বিভাগের সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ওই দুটো বিভাগে তৃতীয় স্থান পায়।

ক্রিকেট

পাঁচটা টেস্ট সিরিজের ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় স্কুল একাদশকে ২-০ খেলায় হারিয়ে সিংহলের স্কুল ছাত্ররা দেশে ফিরে গেছে। শুধু এই নয়, আঞ্চলিক পাঁচটা খেলার মধ্যেও সিংহলের ছাত্রদল চারটে খেলায় জয়ী হয়েছে। মোট দশটা খেলার মধ্যে সিংহল স্কুল দল ছ-টা খেলায় বিজয়ী, চারটে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত। সবচেয়ে দুঃখের ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল একটা খেলাতেও জয়ী হতে পারেনি। আমেদাবাদের দ্বিতীয় টেস্টে সিংহলের ছাত্ররা ভারতীয় ছাত্রদলকে হারায় ইনিংসের তফাতে, মাদ্রাজের শেষ টেস্টে ৫২ রানে।

আগামী ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডের স্কুল ছাত্রদলের ভারতে ক্রিকেট খেলতে আসার কথা আছে। দেখা যাক, ভারতীয় ছাত্ররা তাদের সঙ্গে খেলায় কী ফলাফল করে।

লেনিন শতবার্ষিকী যুব-উৎসব

সম্প্রতি ইডেন উদ্যানে লেনিন শতবার্ষিকী যুব-উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীরাম চ্যাটার্জী। রঞ্জী ষ্টেডিয়ামে প্রথম দিনের প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। ঐ দিন বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন তাঁদের নাম দেওয়া হ'ল। মহিলা বিভাগে: ১০০ মিটার দৌড়ে ১ম হন সিটি এ্যাথালেটস্‌-এর এডুইন স্যামুয়েল; ডিসকাস নিক্ষেপে ১ম হন শরৎ সংঘের নিভা আদক; বালিকাদের ১০০ মিটার দৌড়ে ১ম লেক স্কুলের কবরী সেনগুপ্ত; ৮০০ মিটার দৌড়ে ১ম শরৎ সংঘের জাহ্নবী চক্রবর্তী। পুরুষ বিভাগে: ১৫০০ মিটার দৌড়ে ১ম সুভাষ ভট্টাচার্য; লংজাম্পে ১ম ডি. গাঙ্গুলী; বর্ষা নিক্ষেপে ১ম ডি. ঘোষ; ডিসকাস নিক্ষেপে ১ম ভোলা মাহাতো; ৮০০ মিটার দৌড়ে ১ম এন. ভৌমিক; দীর্ঘ লম্ফনে ১ম এস. দে; সর্ট ফুট ১ম অরুণ দাস।

১। হস্ত পদ শূন্য বটে গতি সর্বস্থানে।
ভাগ্যবান পুরুষে সবিশেষ জানে॥
বাজাইলে বাজে, তার আছে
নানা সুর।
গাহিতে অক্ষম কিন্তু সেই সুচতুর॥
ব্যবহারে তারতম্য নানা গুণ ধরে।
বিধিমত লোকে তারে
সমাদর করে॥

শ্রীসুদর্শন মুখোপাধ্যায়
(কলিকাতা)

২। পাখা নেই উড়ে যায়
মুখ নেই ডাকে।
বুক ফেটে আলো ছোটে,
কান ফাটে হাঁকে।

শ্রীস্নেহ সেন (দার্জিলিং)

৩। বৃক্ষ হইতে একটি ফল পড়িল। ফলটি পতনের শব্দ যে শুনিল, সে কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও ফলটি দেখিতে পাইল না। আবার যে দেখিল, সে আনিতে পারিল না। যে আনিল সে খাইতে পারিল না। আবার যে শুনিতে, দেখিতে বা আনিতে পারিল না, সেই খাইল। অথচ তাহারা কেহই বিকলেন্দ্রিয় নয়। বলতো তাহারা কে?

শ্রীঅরিন্দম বসু (আগরতলা)

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

'বৈজ্ঞানিক শব্দের শৃঙ্খল'-এর উত্তর (অগ্রহায়ণ)—উপর থেকে নীচে: ১। নিয়ন ২। টরিসেলি ৩। নয়ন ৪। টেলিপ্রিণ্টার ৫। সিলিকা ৬। মিটার ৭। রমণ ৮। ওয়াট
পাশাপাশি: ১। নিউটন ৬। মিলি ৮। ওয়েকার ৯। মরফিয়া ১০। টলেমি।

মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর—১। শঙ্খ ২। ব্রাহ্মণ (শাঁকে ফুঁ, কানে মন্ত্র দেবার জন্য ফুঁ এবং উনুনে ফুঁ) ৩। চাকর ৪। উপদেশ ৫। ১৮৶০

সম্পাদক: শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস; ৩০ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০'৬০ পয়সা
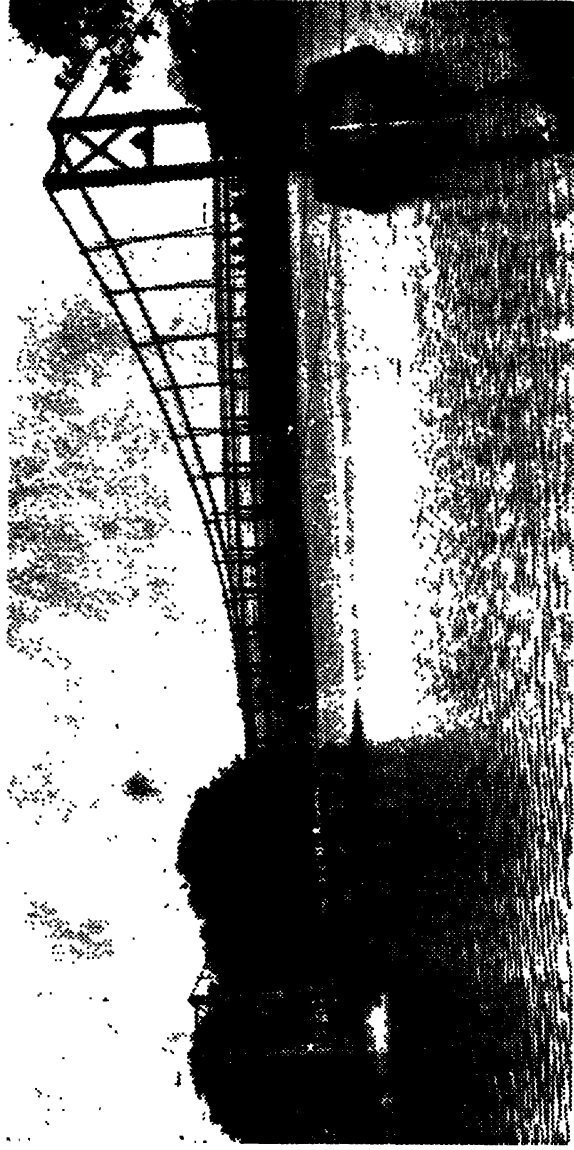
কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকে ঝুলন্ত ব্রীজ

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্র *

৫০শ বর্ষ] চৈত্র ঃ ১৩৭৬ [১২শ সংখ্যা

জেনে রাখা ভালো

শ্রীরামকৃষ্ণ কর

জীবন জলের নাম জানে বিশ্বজন
সেই জল শুদ্ধ রাখো তুমি সর্বখন।
আলোকে জীবাণু নাশে
তাই সূর্য মহাকাশে
সবাকারে ভালবাসে
উদিত হয় যে নিত্য রাঙায়ে গগন।
পবিত্র ফুলের গন্ধ,
নাহি তাতে কোনো সন্দ
আজি হতে ত্যজি মন্দ
পবিত্র হয়ে রে গন্ধ ঢালো অনুখন।
উষাকালে মুক্ত বায়ু
গ্রাসিতে পারে না স্নায়ু
সেব যদি দীর্ঘ আয়ু
লভিবে ভুবনে তুমি কর রে সেবন।

অভ্যাসের দাস হয়ে
এই বিশ্ব দেবালয়ে
ধৈর্য ধরি শ্রম সয়ে
কর তুমি পুণ্য কাজ করি দৃঢ়পণ।

মন হতে ফেলো মুছি
হবে যদি তুমি শুচি
যত অসৎ অশুচি
মিথ্যা ভয় ঘৃণা লাজ, হয়ে একমন।

সাধুসঙ্গ কর নিত্য
হলেও তুমি হীন বিত্ত
ফুল্ল রাখো তব চিত্ত
অনিত্য সংসারে থাকো প্রেমে নিমগন।

পাপীরে ভেবো না হীন
বাজায়ে প্রেমের বীণ
কর তারে প্রেমে লীন
ঘৃণা করি পাপ সদা কর রে দলন।

জীবের সেবার তরে
এসেছ ধরার পরে
এই বিশ্ব চরাচরে
পরহিত ব্রতে তুমি সঁপ রে জীবন।

প্রেম অহিংসার বাণী
কও তুমি বক্ষে টানি
জীব হিংসা দেয় গ্লানি
নিজ স্বার্থে লিপ্ত নাহি থেকো কদাচন।

গর্ব

শ্রীশিউলি সেনগুপ্ত

[শরৎকাল। আকাশে সাদা মেঘের ভেলায় দল ভেসে চলেছে। ঝিকঝিকে সোনা মাখানো রোদ্দুর। বাতাসে পূজো পূজো গন্ধ। রাস্তার ওপর দিয়ে একটি ফুলওয়ালা হেঁকে চলেছে,—ফুল চাই...আর তার ঝুড়িতে গোলাপ, শিউলি, ডালিয়া, অপরাজিতা, জবা ফুলেরা চুপিচুপি ফিসফিস করে কথা বলছে। কিন্তু ফুলওয়ালা শুনতে পাচ্ছে না।]

গোলাপ—ঝুড়িটার ফাঁক দিয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শিউলি তুমি?

শিউলি—উঁহু, কিছু পাচ্ছি নে। আসলে ঝুড়িটা যে তৈরী করেছে তারই দোষ। ফাঁকগুলো এত ছোট্ট করেছে। একদম ঠাস বুনুনী।

ডালিয়া—ঝুড়ি যে তৈরী করেছে তার দোষ হবে কেন? তোমরা বেঁটের দল। নিজেদের দোষ দেখতে পাচ্ছ না।

জবা—তোমার তো রোগা ডিগ্‌ডিগে চেহারা। শরীরটা কাঠি আর মাথাটা এত বড়। তা তুমি কি দেখতে পাচ্ছ বল না। [ডালিয়া চুপ] রাগ করছ কেন ঠিক কথাই তো বলছি।

শিউলি—ওকে ওরকম করে বললি কেন? এখন ভাঙা ওর মান।

জবা—মান ভাঙাতে বয়েই গেছে। মা কালীর পায়ের ওপর দিনরাত পড়ে থাকি। কারুর সাতেও থাকি না পাঁচেও থাকি না। সত্যি কথাগুলো স্পষ্ট বলে দিই। যার রাগ মান অভিমান হবার হয় হোক্, আমি কি করব। আবার না বলেও পারি না বাপু। আর কত ফুলই তো রয়েছে কিন্তু ওর ব্যবহারটা দেখ। এই তো গোলাপ—ফুলের রাণী—যেমন সুন্দর রূপ তেমনি মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই।

ডালিয়া—চুপ কর···তোমার সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। এই দুপুর রদ্দুরে কটকটে লাল শাড়ি পরে···

জবা—সাজ যেমনই করি না কেন, তোমার কি? ভগবান যে তোমার মত আমায় অত বড় একটা মাথা দেননি এই যথেষ্ট।

ডালিয়া—বড় মাথায় বুদ্ধি থাকে।

জবা—থাকে বটে; কিন্তু তোমারটায় গোবর।

শিউলি—উঃ, তখন থেকে তুমি কটকট করছ ডালিয়া—করবে না-ই বা কেন? তুমি যে ভিনদেশী।

ডালিয়া—তোমায় অমন করে বললে তোমারও লাগত। তখন তোমার ওই রাশি-রাশি ফুল ফোটানো হাসি কোথায় থাকত দেখতাম।

শিউলি—তোমাদের মত বেশী আয়ু আমার নয় ডালিয়া। তাই যেটুকু সময় বেঁচে থাকি সেটুকু সময় কেবল হাসি। ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় আমার জন্ম আর দুপুরের প্রচণ্ড তাপে আমার মৃত্যু। কিন্তু ডালিয়া হাসিটা যে মস্ত গুণ তা কি জান?

ডালিয়া—সময় বিশেষে গুণটা দোষে পরিণত হয়। হাসিটা তখন বদ অভ্যেস হয়ে দাঁড়ায়।

জবা—বদ অভ্যে স···বদ অভ্যেস করো না। নিজে গোমড়ামুখো··· হাসতে পার না তাই বল।

একটা গরু ডালিয়াকে ঝুড়ি থেকে টেনে নিয়ে অম্লান বদনে চিবোচ্ছে।—পৃঃ ৫৩৩

ডালিয়া—ভগবান আমায় পাঠিয়েছেন রূপের জন্য। হাসি ছড়িয়ে দেবার জন্য নয়।

জবা—ভগবান তোমায় পাঠিয়েছেন আনন্দ দেবার জন্য। কিন্তু গত জন্মে এত বেশী পাপ করেছ যে তাঁর শ্রীচরণে তোমার ঠাঁই মেলে না। তুমি থাক ঘরের ফুলদানীতে কাঁচের মধ্যে বন্ধ হয়ে।

ডালিয়া—মূর্খের দল চুপ কর। যা জান না তা নিয়ে কথা বলো না। আমার উপস্থিতি আমার রূপ ঘরের সৌন্দর্য কত বাড়িয়ে দেয় তা কি দেখেছ? আর তোমরা চন্দনের মত নোংরা জিনিস গায়ে মেখে চিত হয়ে পড়ে থাক তোমাদের ভগবানের পায়ে। সেখানে পড়ে পড়ে শুকোও। তারপর যখন মরে যাও তোমাদের পচা দেহগুলো গঙ্গায় ফেলে দেয় সকলে।

জবা—কিন্তু তোমার মৃতদেহ যে জমাদারের গাড়ীতে স্থান পায় ডালিয়া। আমাদের তবু তো কিছু পুণ্য আছে। মার বুকে ঠাঁই নিলে আর এ পৃথিবীতে জন্মাতে হয় না।

ডালিয়া—তোমাদের ওই ছোট্ট নীল মেয়েটি তখন থেকে আমার পায়ে শুড়শুড়ি দিচ্ছে। ওর উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি। নিজে পারছে না, তাই আমাকে জড়িয়ে ধরে উঠে ও রাস্তা দেখতে চায়।

গোলাপ—আহা বাচ্চা মেয়ে চাইছে····তুমি ওকে কোলে তুলে নাও না ডালিয়া···

ডালিয়া—[চিৎকার] বাঁচাও বাঁচাও আমায় !

[জবা তাড়াতাড়ি ঝুড়ির ফুটোর মধ্যে চোখ রেখে দেখে একটা গরু ডালিয়াকে ঝুড়ি থেকে টেনে নিয়ে অম্লান বদনে মুখে ফেলে চিবোচ্ছে। সে ফিসফিসিয়ে সকলকে ডালিয়ার বিপদের কথা জানালে। বল্লে, অন্য ফুলেদের মাথা নীচু করতে। সাবধান হয়ে যেতে। গরুটা যদি এসে কোনক্রমে তাদেরই চিবোতে শুরু করে···কিন্তু না, গরুটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে।]

জবা—হবে না। ভগবান অত অহঙ্কারকে এমন করেই শেষ করেন।

অপরাজিতা—ভাগ্যিস ফুলের রাণী আমি ওর ঘাড়ে চাপিনি। তাহলে আমিও শেষ হয়ে যেতাম এই মুহূর্তে।

গোলাপ—তাই তো বলছি ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।

[ফুলওয়ালা কিন্তু কিচ্ছু জানল না। তারই মাথার ওপর চাপানো ঝুড়িটার মধ্যে যে একটা মস্ত বড় নাটক ঘটে গেল, তা সে টেরও পেল না। ফুলওয়ালা তখনও চিৎকার করে হেঁকে চলেছে—ফুল চাই···ফুল···]

শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য

বন-বেড়ালের ছানা
ভয় নেই তার জানা
বন-বাদাড়ে বেড়ায় ঘুরে
শুনবে না সে মানা।
বন-বেড়ালের ছানা
খাচ্ছে এখন খানা

পাখ্-পাখালি চমকে ওঠে
এই বুঝি দেয় হানা।
বন-বেড়ালের ছানা
হাসতে কি তোর মানা
দুষ্টু মিঠু ঘুমোয়নি আজ
তার কাছে তুই যা না।

নাম ঘোড়া

*

শ্রীকাজল বল

সমুদ্রমন্থনের সময় সমুদ্রে ওঠা ঘোড়া নিয়ে বিনতা আর কদ্রুর ঝগড়া হচ্ছিল। ভীষণ ঝগড়া! কদ্রু বলে সেই ঘোড়ার রং কালো, বিনতা আপত্তি তোলে, বিনতা বলে, না! ঘোড়ার রং সাদা। তর্কের শেষ হয় না। অগত্যা কদ্রু বাজী ধরলো। বললো,—যদি কালো হয় তবে তুই সারা জীবন আমার বাঁদী হয়ে থাকবি, আর যদি ঘোড়ার রং সাদা হয় তো আমি তোর বাঁদী হয়ে থাকবো।

বিনতা রাজী হলো। ঠিক হলো পরদিন সকালবেলা ওরা দু'জনে সমুদ্রে যাবো ঘোড়া দেখতে, তারপর ওদের তর্ক থামলো।

তর্কের ঘোড়ার রং কিন্তু সাদা ছিল, কিন্তু বাজীতে জিতেছিল কদ্রু। কেননা সে কুটিল ফন্দি করে তার সর্প-সন্তানদের দিয়ে ঘোড়াকে কালো করে ফেলেছিল।···

তাই পরের দিন সকালে যখন সমুদ্র থেকে ঘোড়া উঠলো ওরা দেখলো ঘোড়ার রং কালো।

যাক। এ হলো পুরাণের কথা। এ সব কথা বাদ দিয়ে এখনো সমুদ্রমন্থন করলে যে ঘোড়ার দেখা পাওয়া যাবে না, এমন নয়। সমুদ্র-ঘোড়া দেখার জন্য সমুদ্রমন্থনেরও প্রয়োজন হবে না। স্রেফ সমুদ্রে সজাগ দৃষ্টি রাখলেই ভূরি ভূরি সমুদ্র-ঘোড়া নজরে পড়বে।

তবে এ ঘোড়ার সঙ্গে পুরাণের ঘোড়ার একটু তফাত আছে। এরা দেখতে সাদা বটে, কিন্তু পুরাণের ঘোড়ার মত অত বড় নয়। মাত্র দু' ফুট লম্বা হবে। দেহগত পার্থক্যও আছে। মুখ থেকে বুক পর্যন্ত ঘোড়ার মত। বাকী অংশের পেটটা হলো ক্যাঙারুর মত আর লেজ হলো সাপের মত। পেটের দিকে পুরুষদের ক্যাঙারুর মত একটা থলি আছে। এই থলিতে স্ত্রী সমুদ্র-ঘোড়া ডিম পাড়ে। এই ডিমকে 'তা' দেয় পুরুষ সমুদ্র-ঘোড়া। এরাই ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বার করে আর এই বাচ্চাকে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত লালনপালন করে।

ঘোড়ার যেমন চারটি পা থাকে, এদের বেলায় ওসবের বালাই নেই। থাকলে সমুদ্রে চলাফেরা করতে পারতো না। এর পরিবর্তে এদের আছে অদ্ভুত পাখনা, এই পাখনার সাহায্যেই এরা জলে সাঁতার কাটে। সাঁতার কাটে ঠিক উপর দিকে আর নীচের দিকে, ঠিক আমাদের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ও নীচে ওঠা-নামার মত। অবশ্য বেশীরভাগ সময়ই এরা সাপের মত লেজটা দিয়ে জলের গাছ-গাছড়ার ডালপালার সঙ্গে নিজেদের আটকে রেখে স্থির হয়ে থাকে।

এই সমুদ্র-ঘোড়ার দেহটা পাতলা হাড়ের খাঁজকাটা মোড়কে ঢাকা থাকে, আর পিঠের দিকে থাকে পাতলা সরু সরু নরম কাঁটা। এরা ঘোড়ার মত সাহসীও নয়, শক্তিশালীও নয়। ভীতু ও দুর্বল। এদের চেহারাই হলো এর একমাত্র কারণ। এদের রং সাদা। কিন্তু কিছু কিছু পরিবারের গায়ের রং জলজ উদ্ভিদের রং-এর মত। এতে ওরা ওদের শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

এরা কিন্তু ঘোড়ার মত ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করে না, এরা মাংসাশী ছোট ছোট জলজ প্রাণীদের মুখ দিয়ে চুষে খায়। তা ছাড়া প্রাণীদের ডিমও মাঝে মাঝে আত্মসাৎ করে।

কাজেই দেখতে পাচ্ছি ঘোড়ার সঙ্গে এই সমুদ্র-ঘোড়ার নানা দিকে অনেক পার্থক্য। আর পার্থক্য হবে নাই বা কেন? আসলে এরা তো আর ঘোড়ার বংশধর নয়, এরা হলো মাছের বংশধর। আসলে সমুদ্র-ঘোড়া হলো মাছ, সমুদ্রের মাছ। পাইপ মাছের বংশধর। সিগনেথিডি (Syngnathidae) পরিবাভুক্ত। বিজ্ঞানীরা এদের ডাকে 'হিপোক্যাম্পাস' নামে। হিপোক্যাম্পাস এ্যান্টিকোয়ারাম (Hippocampus antiquorum) এর আসল নাম।

এখন তো আর কদ্রুও নেই, বিনতাও নেই। ওরা আছে পুরাণের পাতায়। ওদের যে জিজ্ঞেস করবো ওদের ঘোড়ার অস্তিত্বের কথা, তারও জো নেই। তবে যা মনে হয় এই হিপোক্যাম্পাসকেও ঘোড়ার মত দেখতে বলে পুরাণ লেখক, হয়তো এদের দেখেই সমুদ্রমন্থনের সময় সমুদ্র থেকে ওঠা ঘোড়ার কাল্পনিক বর্ণনা দিয়েছেন, বা আদৌ তা নাও হতে পারে।

সে যাই হোক। যখন পুরাণের কথা সোচ্চারে বলার সুযোগ নেই, কদ্রু আর বিনতাও নেই, তখন তো আর নিছক বাজী ধরা যাবে না। বাজী ধরতে হলে বিজ্ঞানকে সাক্ষী রাখতে হবে। এই সমুদ্র-ঘোড়া পুরাণের ঘোড়া কিনা তার রায় দেওয়ার দায়িত্ব যে বিজ্ঞানের।

দুঃসময়

দুঃসময় যদি আসে তাতে কি আসে যায়? ঘড়ির দোলক তার দোলার গতিপথে অন্য কোণে গিয়ে পৌঁছুবেই। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। সমাধান হবে না দোলকের যদি সেই গতি বন্ধ করা যায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ একটি খারাপ দিন ॥

যখন আমি দেখলাম যে ল্যাম্পোর অভাবটা ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে সকলেই অনুভব করছে, এবং ওর প্রতিকূল ঝড়টাও শান্ত হয়ে গেছে, আমি ঠিক করলাম ওকে এবার মুক্তি দেব। ভাবলাম ওকে আর পিওম্বিনোতে নির্বাসনে রাখাটা একটু বাড়াবাড়ি। তাছাড়া কুকুরেরও তো ধৈর্যের সীমা আছে। ল্যাম্পোর ধৈর্য যে সহ্যশক্তির শেষ সীমানায় উপস্থিত হয়েছে, সেটা বুঝতেই পারতাম।

অতএব যে মুহূর্তে ও পিওম্বিনো ষ্টেশনে একা হতে পারল, ওর প্রথম কাজই হ'ল রেলকর্মচারীদের চোখে ধুলো দেওয়া। চারদিক বেশ ভাল করে দেখেশুনে ইলেকট্রিক ট্রেনের কাছে এগিয়ে গেল। তারপর লাফিয়ে উঠল। যখন ট্রেনটা চলতে শুরু করল একটা মস্ত স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। অবশেষে ও মুক্তি পেল।

আবার সেই পুরানো পারিপার্শ্বিকে ফিরে এসে, সেই বন্ধুরা সেই কোণার বিছানা, ভাইনিংকার—ল্যাম্পো একেবারে সম্পূর্ণ বদলে গেল। আমি ভাবলাম ভালই হ'ল, ল্যাম্পোর একটা শিক্ষা হ'ল। কিন্তু সত্যি, ও আর নিছক বিলাসিতার ঝোঁকে ট্রেনে চড়ে না। কেবল ওর পিওম্বিনোর কর্তব্যগুলি সারতে, যতটুকু ট্রেনে বেড়ানো দরকার, ব্যস্ ততটুকুই।

আমি যখন কাজের শেষে বাড়ী ফিরতাম, তখন সব সময় ওকে আমার সঙ্গে আনতে নিরস্ত করতাম। এইভাবে দিনে মাত্র দুটো ট্রিপ করেই ল্যাম্পো নির্বিবাদে কাটিয়ে দিচ্ছিল দিনগুলো। তাছাড়া ক্যাম্পিগ্লিয়া-পিওম্বিনো লাইনটি খুব ছোট এবং বিশেষত্বহীন হবার দরুণ পেতলের টুপি-পরা টিকিট-কালেকটারদের সম্মুখীন হবার অপ্রিয় ব্যাপারটা না-ঘটবার সুযোগ ল্যাম্পো পেয়ে যেতো। রেলকর্মীরা ওকে আবার নিজেদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখে খুশী হ'ল। যে হেতু ও আজকাল লম্বা রেলযাত্রা আর করে না, সে হেতু রেলের লোকেরা যে যখন যে কাজে যে দিকে যেতো, তাদের পেছন পেছন ও তাদের সঙ্গে চলত।

তাই বলে একথা যেন কেউ মনে না করে, যে ল্যাম্পো ট্রেন ও তার লম্বা যাত্রা ভুলে গেছে, অথবা এতে সে আর আনন্দ পায় না। বরং আর এক রকম আমোদ আর সান্ত্বনা পেতে থাকল। ওর তো ট্রেনেই চড়া বারণ? তা বেশ। ও এঞ্জিনগুলির পেছনে দৌড়ত যখন ওরা শান্টিং করত বা চলত। নচেৎ কুলি বা ডাকপিওনদের ঠেলাগাড়ীকে ধাওয়া করত।

আমরা প্রায়ই ওকে দেখতাম পিওম্বিনো অভিমুখী রাস্তায় লেভেল ক্রসিং-এর কাছে ওর এক দোস্ত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের জন্য ও অপেক্ষা করছে। ওর ধৈর্যের পুরস্কার ও পেতো। পিওম্বিনো যাবার এও ওর এক ফন্দী ছিল। এতে করে যে ট্রেনগুলো বড্ড গরম হোত ও সেগুলোকে এড়াতে পারত।

একদিন আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে বিশ্রী রকম বৃষ্টি নামল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ-করা একটা তীব্র হাওয়া সেই সঙ্গে। বিরক্তিকর দিন। ল্যাম্পো অক্লান্তভাবে ষ্টেশনের ওপরে বেড়াচ্ছিল। ওকে একটু চঞ্চল বলে মনে হচ্ছিল। চার নম্বর প্ল্যাটফরমে তিনটে চল্লিশের গাড়ী তখন প্রায় ছাড়ল ব'লে। কেবল জেনোয়া-রোম এক্সপ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগের অপেক্ষা করছিল। ও গাড়ীটা সেদিন 'লেট' ছিল। জেনোয়া-রোম আসা মাত্র যাত্রীরা হুড়মুড় করে দৌড়ল পিওম্বিনোর গাড়ী ধরবার জন্য। কিন্তু ড্রাইভার ততক্ষণে চাবি ঘুরিয়ে বিজলী প্রবাহের সুইচ টিপে দিয়েছে।

যে কর্মচারীটি গাড়ী চলবার সিগন্যাল দিতে গিয়েছিল, ল্যাম্পো তাকে অনুসরণ করছিল। হঠাৎ সে তাকে ছাড়িয়ে এক লাফে গাড়ীতে চড়ে বসল। পপুলোনিয়াতে এসে (ক্যোম্পিগ্লিয়া ও পিওম্বিনোর মাঝে একটা ষ্টপ্) ল্যাম্পো বাইরে নেমে এলো এবং অপেক্ষা করতে লাগল, আবার কখন গাড়ী ছাড়বে। ইতিমধ্যে একটা বিপরীত-মুখী অর্থাৎ ক্যাম্পিগ্লিয়া-গামী ইলেকট্রিক ট্রেন এসে পড়লো। এদিকে গার্ডের বাঁশী শুনে ল্যাম্পো ছুটলো লেভেল ক্রসিং-এর ওপর দিয়ে গাড়ীর দরজার কাছে। ঢুকতে চেষ্টা

করল। কিন্তু এবারে ওর হিসাবে একটু গরমিল হয়েছিল। কোন মতে আধখানা শরীর ঢুকতে না ঢুকতেই হাওয়া-চাপা (অটোমেটিক) দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ওর মাথা ও সামনের অংশ গাড়ীর ভেতরে এবং লেজসহ পেছনের অংশ ঝুলতে লাগল বাইরে।

ভাগ্যক্রমে অটোমেটিক দরজার পাল্লাগুলোর কিনারায় মোটা রবারের প্যাড থাকে। তাই বেচারা ল্যাম্পোর শরীর একেবারে চেপ্টে গেল না। তবুও হতভাগ্য জীবটির কাতরোক্তি ও ছটফটানিতে বেশ বোঝাই যাচ্ছিল যে ওর কত কষ্ট হচ্ছে। ঠিক যেন কোন বন্যজন্তুকে কেউ কোতল করে মারছে।

বেচারা ল্যাম্পোর কাতরোক্তি শুনে ওর সাহায্যের জন্য সমস্ত যাত্রীরা ছুটে এল। ব্যাপারটা যখন বুঝল, তখন ওরা যুগপৎ দুঃখিত হ'ল এবং কৌতুক বোধ করল। ল্যাম্পো ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এইটাই বোধহয় বলতে চাইছিল যে, "দাঁড়িয়ে আছ কেন হাঁ করে, আহাম্মুখের দল? কিছু কর তো আমার জন্যে, বাঁচাও এই বিপদ থেকে!" প্রথম বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতেই যাত্রীরা ওকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওরা কী করতে পারে? যদি ওরা ওকে ভেতরে আনবার জন্য বেশী টানাটানি করত, তাহলে ওর আধখানাই শুধু ভেতরে আসত। একজন মহিলা এ্যালার্ম চেন টানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সৌভাগ্যবশতঃ শীগগির হন্তদন্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গার্ড এসে উপস্থিত হ'ল। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সে ইঞ্জিন ড্রাইভারকে জানালো। ইলেকট্রিক ট্রেনটা যখন গতি কমিয়ে থেমে গেল, তখন ল্যাম্পোও ধপ করে মেঝের ওপরে পড়ল— যেন একটা আলুর বস্তা। বেচারা শুয়ে পড়ে বেশ খানিকটা কাতরাতে লাগল। নিজের শরীরটা খানিকটা খুঁটে দেখে নিল। তারপর নিজের চারপাশে ঘুরে ঘুরে, চেয়ে চেয়ে দেখল যে, শরীরটা পুরো একটা অংশেই আছে তো? যাত্রীরা ততক্ষণে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ছে। অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে একবার তাদের দিকে তাকিয়ে ও সোজা গিয়ে কাছেই একটা সীটের নীচে লুকিয়ে পড়ল।

একটু দূরেই একজন লম্বা মত ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর গায়ে ছিল একটি গাঢ় ছাই রং-এর ওভারকোট, আর মাথায় ছিল সোনালী ধারী দেওয়া ব্যাজ লাগানো টুপি। তিনি সমস্ত দৃশ্যটি এতক্ষণ দেখেছেন। এবার একটু হালকা হাসি হেসে তিনি গার্ডকে ডেকে কতকগুলো প্রশ্ন করলেন, বেশ অমায়িকভাবে। কিন্তু এ থেকে এটা বেশ বোঝা গেল যে, ভদ্রলোক কোন হব্যভব্য,কেউকেটা হবেন। তিনি নিজের পকেট থেকে note-book ও পেনসিল বের করলেন, তারপর একজোড়া চশমা নাকে চড়ালেন। এবার কী সব লিখে নিলেন।

ইলেকট্রিক ট্রেনটা ষ্টেশনে থামা মাত্র প্রথম যে ব্যক্তিটি নামলেন, তিনি স্বয়ং ল্যাম্পো।

সে কোনদিকে দৃকপাত করল না। সোজা প্ল্যাটফরমের খোলা অংশটির দিকে চলে গেল এবং নিমেষে উধাও হ'ল। ওকে আমরা এরপর আবার দেখলাম পরের দিন।

এ দিনটা ল্যাম্পোর পক্ষে বড়ই অশুভ দিন ছিল।

॥ কুকুরের জীবন ॥

একদিন একজন কুলি এসে বললে, "আপনার যদি দু-এক মিনিট অবসর থাকে ষ্টেশন মাষ্টার সাহেব আপনাকে ডেকেছেন, একবার দেখা করবেন।"

"আচ্ছা, ধন্যবাদ।" উত্তর দিলাম।

"কী বলতে চান বৃদ্ধ?" আপন মনেই ভাবতে ভাবতে ওঁর অফিসে ঢুকলাম।

বাইরে থেকে দরজায় টোকা মারতে, ভেতর থেকে ওঁর গলা শোনা গেল, "ভেতরে আসুন।"

"নমস্কার, আপনি কী আমাকে কিছু বলতে চান?" ঢুকেই জিজ্ঞাসা করি।

"বসুন।" একটা চেয়ার দেখিয়ে দেন। "একটু অপেক্ষা করুন, বলছি।" বলে একটা চিঠি পড়তে থাকেন তিনি। বসে বসে আমি নির্লিপ্তভাবে অফিসের জিনিসপত্রের ওপর চোখ বুলোই। এতদিনে এ-ঘরের সবই তো আমার জানা। দেওয়ালে সেই পেণ্ডুলাম ঘড়ি, গোটাকয়েক ফ্রেমে বাঁধানো টাইম-টেবিল, আমার ডান দিকের তাকে বই, কাগজপত্র এবং রসিদ ও পুঁথিপত্র ইত্যাদি পরিষ্কার এবং যথাযথ ভাবে সাজানো। ঘরের মাঝখানে কর্তার টেবিল। কেবলমাত্র রাখা আছে একটি পেনসিল-দানী ও লাল ছাই-দানী। এই ছাই-দানীটা একেবারে নতুনের মত দেখাচ্ছিল। যদিও জানি ওটা ক'বছর ধরেই ওখানে আছে।

এও ওঁর এক বাতিক। ছাই-দানীটা খারাপ হয়ে যাবে বলে, সিগারেটের কুচোগুলো ওর মধ্যে না ফেলে বাইরে গিয়ে ফেলে আসেন।

এবারে চিঠিটি ভাঁজ করে দেরাজে রাখলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখন সোজাসুজি কাজের কথাও বলি। কারণ সময়ের দাম আছে, অতএব আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।"

কথাটার সমর্থনে আমি ঘাড় নাড়ি।

"আপনাকে ঐ কুকুরটিকে এবার বিদায় করতে হবে। এই ষ্টেশনে ওকে থাকতে দেওয়া আর সম্ভব নয়।"

আমার সর্বদেহে কষাঘাত! কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হাতের ইশারায় বল্লেন, "থামুন। আমি বেশ জানি আমার এ সিদ্ধান্ত কারো কাছেই মধুর নয়। বিশেষ করে আপনার পক্ষে। কিন্তু এ কথাও ঠিক, এই ষ্টেশনের সুনাম ও সুব্যবস্থার জন্য আমারই দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। এ সব ব্যাপারে ওপরওয়ালার সঙ্গে হাঙ্গামা করা···যাই হোক, এখন এটা আপনার কাজ। তাড়াতাড়ি, যত শীঘ্র সম্ভব এবং নির্ঝঞ্ঝাটে এই কাজটি চুকিয়ে ফেলা চাই।"

"কিন্তু হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি করে এই সিদ্ধান্তের হেতুটা কী? ও কি এমন কিছু একটা গর্হিত কাজ করে ফেলেছে, যেটা করা ওর উচিত ছিল না?" আমি বিরক্ত হয়ে একটু প্রতিবাদের সুরেই বলি।

"না। তেমন একটা কিছু তো আমি জানি না। তবে করতে তো পারে? তাই আগে থেকেই আমি নিরাপদ হতে চাই। তাছাড়া ইন্‌স্‌পেকশন ষ্টাফের অনেকে এর মধ্যে আমার কাছে অভিযোগ এনেছেন যে, কুকুরটাকে একটু বেশী স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।" (ক্রমশঃ)

মহাবলিদান

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

তুমি আমাদের দিয়েছিলে স্বাধীনতা,
সে-স্বাধীনতায় নিয়েছি তোমার প্রাণ।
তুমি আমাদের বলেছিলে কত কথা,
সে সব কথায় দিইনি আমরা কান।
আপনার বলে মোদেরে করিলে বলী:
আপনারে শেষে দিলে তুমি অঞ্জলি!
তোমার বলেই হয়ে মোরা বলীয়ান,
দিলাম আমরা তোমারেই বলিদান!
তোমার মধ্যে ছিল কী পরশমণি,
মৃত প্রাণ পেত, সোনা হয়ে যেত রাং!
রামের খড়ম্—সমান সঞ্জীবনী
তব পদাতিক চালালো রাজ্যপাট।
তোমার যাত্রা পেরিয়ে ডাণ্ডীঘাট,
পার হয় আজ দুনিয়ার মাঠ-বাট।
দিকে দিকে আজ তোমার জয়ধ্বনি!
আমরা যোগ্য নই যে দিই প্রণাম॥

নিখিল ভারত পশু সম্মেলন

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

১

বনের গাধা করল চুরি
সিংহ রাজার চর্ম,
চর্ম পরি ভুলল জাতি
ভুলল নিজের ধর্ম!

২

ভাবল সে ঐ পোষাক পরি
যাবে বনের মাঝ,
এবার সে আর কেউকেটা নয়
সিংহ মহারাজ!

৩

এ দিকেতে বনের মাঝে
বিরাট আয়োজন
বসছে সেথা নিখিল ভারত
পশু সম্মেলন।

৪

সভাপতি সিংহ মশাই
বাড়ান সেথা চরণ
ব্যাঘ্র আসি করবে তারে
সভাপতি বরণ।

৫

জিরাফ আসি লম্বা গলায়
পড়বে তাহার মন্তর,
হাতী হলেন প্রধান অতিথ
গমন তাহার মন্থর।

৬

শশক আসি গাইবে গজল
তুলি লম্বা কান,
হরিণ আসি সিংহরাজে
করবে মাল্যদান।

৭

বনের মাঝে বসল সভা
সব পশুতে পূর্ণ
এবার বুঝি মানুষগুলোর
দর্প হবে চূর্ণ !

৮

যখন ঝিঁঝির বাত্তি হবে,
ব্যাংয়ের গলা সাধা,
লম্ফ দিয়ে পড়ল আসি
ছদ্মবেশী গাধা !

৯

নতুন রকম জন্তু দেখে
ভয়েই সবার শেষ !
সভাপতি আগে ভাগেই
হলেন নিরুদ্দেশ !

১০

ছুটল হাতী, ছুটল জিরাফ
সবাই ভাবে পালাই !
পায়ের চাপে মরল কত
হিসাব তাহার নাই।

১১

দূরে বসে ছিল যারা,
যারা রিপোর্ট নেবে,
প্রাণ রাখিতে ছুটল তারা
ভীষণ দাঙ্গা ভেবে !

১২

পেচক ছিল বিজ্ঞ, প্রাচীন
তুলছে ফটো যত
বলল, এটা কোন্ জানোয়ার
দেখতে গাধার মত !

১৩

লেজ কেন এর দেখছি ছুটো ?
সিংহচর্ম আর ?
কে কার তখন কথা শোনে ?
সবাই পগার পার !

রাজার ইচ্ছা

শ্রীপ্রীতিভূষণ চাকী

গভীর রাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো রাজার। তিনি বাইরে এলেন চুপি চুপি, পাছে লোক-লস্কর রাজার পেছু পেছু ছোটে। রাজা এলেন তাঁর ছোট্ট বাগানটায়। তাকালেন আকাশের দিকে। তারা-ভরা আকাশটাকে দেখে তাঁর যেন চোখটা জুড়িয়ে গেলো। বাগানে ফুলগাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা জোনাকি ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিল। রাজার মনে হ'ল ছোট্ট ছেলের মত ঐ জোনাকিগুলো ধরতে পেলে ভারী মজা হ'ত।

রোজ সিংহাসন ভাল লাগে না রাজার। হাজার রকমের সমস্যা, হাজার রকম কাজে সব সময়েই ব্যস্ত থাকেন তিনি। সারা দিন ধরে মুকুটটা পরে থাকতেও তাঁর ভাল লাগে না। মনে হয় যেন বড্ড ভারী মুকুটটা।

তাই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েন রাজা। চুপি চুপি ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগে। ওদের সঙ্গে কোন বটগাছতলায় গোল হয়ে বসে গল্প করেন। পকেট ভর্তি থাকে লজেন্স, বিস্কুট আর আচার। ঝুড়ি ভর্তি থাকে গল্প। নানান রকমের গল্প করেন রাজা। হাঁ করে শোনে ছেলেমেয়েরা।

খুব সহজেই ওদের মন জয় করে ফেলেন রাজা। ছেলেমেয়েদেরও বড় আপনার মনে হয় রাজাকে। কখনো কখনো বা কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করে বসে—আচ্ছা তোমার বাড়ী কোথায় বলো না? তখন রাজা বলেন—অনেক দূরে। ঐ যে সেই কাঞ্চন নদী আছে না? তার ঐ পারে। গোলপাতার ছাউনি ঘেরা আমার ঘর, সেখানে আমি থাকি আর গোরু চরাই, বাঁশি বাজাই। ছেলেরা ভাবে সত্যি বুঝি তাই!

রাজার ভারী ভাল লাগে যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মধ্যিখানে বসে গল্প করেন। কিন্তু আবার তাঁকে ফিরে আসতে হয় রাজদরবারে, রাজার সাজে। ভারী ভারী কাজ, কতরকম সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম শোন—সেদিন রাতে আকাশ-ভরা তারার দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবছিলেন—কী সুন্দর আকাশ! সকালের পাখি সুন্দর, রাতের তারাও সুন্দর! সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাবনা তাঁকে পেয়ে বসলো—আচ্ছা, আমার বাগানের ফুল গাছগুলো এত সুন্দর, রঙের এত বাহার, কিন্তু একটা ফুলেও গন্ধ নেই কেন? আমার রাজ্যে কোন ফুলেরই তো গন্ধ নেই! সেবার মন্ত্রী বিদেশ থেকে দামী দামী আতর এনে বাগানের সমস্ত ফুলগুলোকে মাখিয়ে দিলেন, কিন্তু সে গন্ধ কোথায় উবে গেলো। দুরন্ত বাতাস এসে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো সেই গন্ধ।

রাজা ভাবলেন—আচ্ছা, আমার রাজ্যে এমন শিল্পী কি কেউ নেই, যে ফুলের বুকে এনে দিতে পারে গন্ধ!

পরদিনই সিংহাসনে বসে রাজা ডেকে পাঠালেন রাজ্যের সেরা শিল্পীদের। বললেন, তাঁর মনের কথাটা। কে পারো তোমরা ফুলের বুকে গন্ধ এনে দিতে? রঙ-এর বিচিত্র ব্যবহার তোমরা শিখেছো, কিন্তু কেউ কি পারো রঙীন ফুলের বুকে গন্ধ আনতে? যে পারবে এই কঠিন কাজ তাকে আমি উপহার দেবো আমার মাথার সোনার এই মুকুট! সাতদিন সময় দিলাম, তারপর আসবে তোমরা আমার দরবারে।

শিল্পীরা চলে গেলো। কেউ কেউ বলেই বসলো—এও আবার সম্ভব নাকি! রাজার যত সব আজগুবি কল্পনা। চল চল সাতদিন বেশ করে খাই দাই আর ঘুমোই গে!

কিন্তু একথা বললো না একজন শিল্পী। তার চোখের ঘুম চলে গেলো। সে খায় না, দায় না, শুধু ভাবে। তার প্রিয় পাখিটার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, পাহাড়ের ধারে ঝরনাতলায় দাঁড়ায়। ঝরঝর করে বয়ে চলে ঝরনা। সেই শব্দ শোনে আনমনে, আর ভাবে—ফুলের বুকে গন্ধ আনা যায় কি করে?

সকাল গড়িয়ে হয় বিকেল, বিকেল গড়িয়ে হয় রাত, তবু খেয়াল নেই তার। সে শুধু পথ চলে আর পথ চলে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে দূরে গ্রামান্তের দিকে চলে যায়। ধুলোমাখা পথে মানুষের পায়ের ছাপগুলো দেখে উদাস হয়ে যায়। বাতাসের বুকে শনশন শব্দ শোনে আর আপন মনে প্রশ্ন করে—বাতাসই কি তার বুকে লুকিয়ে রেখেছে গন্ধ? কাতর দৃষ্টিতে সে শূন্যে তাকায়।

এমনি করে ছ'টা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেলো! তবে কি ফুলের বুকে সে গন্ধ আনতে পারবে না? মনটা ভারী দমে গেলো তার, কিন্তু নিরাশ হলে তো চলবে না। তাকে যে আনতেই হবে ফুলের বুকে গন্ধ। নইলে সে রাজ্যে ফিরবে না কিছুতেই। এমন সময় সে এক করুণ বাঁশির শব্দ শুনতে পেলো। দূর থেকে যেন ভেসে আসছে। সে ছুটতে লাগলো বাঁশির শব্দে দিশেহারা হয়ে। যতই ছুটে চলে, পথ যেন আর ফুরোয় না। কিন্তু বাঁশির আওয়াজটা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে—ঐ তো, ঐ তো! অথচ দেখা যায় না, ছোঁয়াও যায় না, তাকে। কিন্তু শিল্পী তবু ছোটে। তার পায়ে কাঁটার আঘাতে রক্ত ঝরছিলো, তবু খেয়াল নেই তার। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, সরাটা শরীর ক্লান্ত, আর যেন চলছে না। এমন সময় পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো পথের মাঝে। অসাড় হয়ে খানিকক্ষণ পড়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে চোখে নেমে এলো ঘুম। ঘুমের মধ্যে সে কিন্তু ভারী সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখলো। ছোট্ট এক ফুটফুটে মেয়ে সকালের সোনালী রঙ ছড়িয়ে নাচছে আপন মনে, অপূর্ব ভঙ্গীতে আর মিষ্টি

শিল্পীকে দেখতে পেয়ে সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি একটু এগিয়ে এসে বললো, 'পথিক, তুমি যা চাইছো তা আমি তোমাকে দিতে পারি ; কিন্তু একটা কথা, আমি যা বলবো তা কিন্তু শুন্‌তে হবে। তুমি যেখানে ঘুমোচ্ছ তার কাছেই দেখবে একটা মস্ত ঝাঁকড়া গাছ আছে। তার নিচেই দেখবে একটা মস্ত পাথর পড়ে আছে। ঐ পাথরটার নিচেই আমি চাপা পড়ে আছি এক দৈত্যের কারসাজিতে। তুমি যদি এই পাথর সরিয়ে দাও আমি বেরিয়ে চলে যাবো আকাশে। আকাশেই আমার ঘর কিনা। তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছো গন্ধকে পাবে বলে। আমার নামই তো গন্ধবতী! রূপবতী আমার মা।

'পাথর সরাতেই বেরিয়ে এল ফুটফুটে সেই মেয়ে'

হ্যাঁ একটা কথা, তুমি পাথর সরিয়ে দিলেই আমি চলে যাবো আকাশে, তখন কিন্তু আমার দিকে তাকিও না, ধরতেও চেয়ো না। তা'হলে সব মাটি হয়ে যাবে। তুমিও পাবে না গন্ধকে, আমিও চিরদিনের জন্যে মাটি চাপাই থাকবো।'

ঘুম থেকে উঠেই শিল্পীর মনটা ভারী চাঙ্গা হয়ে উঠলো। স্বপ্নের কথা মনে পড়তেই সে তাড়াতাড়ি ছুটলো ঝাঁকড়া গাছটার কাছে। গিয়ে দেখে সত্যিই তো, একটা প্রকাণ্ড পাথর পড়ে আছে। প্রাণপণ শক্তিতে সরিয়ে ফেললো পাথরটাকে। পাথর সরাতেই বেরিয়ে এলো ফুটফুটে সেই মেয়ে। চলে গেলো আকাশ আলো-করা রূপ নিয়ে, রেখে গেলো একটা ছোট্ট ফুল—অপূর্ব গন্ধে ভরা। আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো সেই গন্ধ—যেমন মিষ্টি, তেমনি প্রাণ-মাতানো।

এতক্ষণ চোখ বুজে ছিলো শিল্পী, ফুলের মিষ্টি গন্ধ পেয়েই চোখ খুললো, দেখলো ফুলটাকে। কুড়িয়ে নিলো সযত্নে। মনটা তৃপ্তিতে ভরে উঠলো তার।

ফুল পেয়ে ছুটলো সে রাজার কাছে। রাজা তো অধীর হয়ে বসে আছেন। সব শিল্পীই নিরাশ করেছে তাঁকে। শুধুমাত্র একজন শিল্পীর আশায় পথ চেয়ে আছেন তিনি।

শিল্পীকে পেয়ে আর গন্ধময় ফুলটিকে পেয়ে রাজা জড়িয়ে ধরলেন শিল্পীকে। খুলে দিলেন নিজের মাথার সোনার মুকুট।

সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, রাজ্যসুদ্ধ সমস্ত বাগানে যত ফুল ছিলো সব ফুলেই এসেছে গন্ধ। এক এক ফুলে এক এক রকম গন্ধ। এ গন্ধ আর উবে গেলো না বাতাসে; বাতাস এসে তাকে ছড়িয়ে দিলো সব দিকে, সবখানে।

চৈত্র এলো

শ্রীকরুণাময় বসু

চৈত্র এলো ফুলের হাসি ছড়িয়ে দিয়ে,
বাঁশির সুরে ভরিয়ে দিয়ে, সাদা মেঘের ঝিলিক তুলে দূরে,
শান্ত গাঁয়ের বিজন পথে আপন মনে ক্লান্ত হেসে
বকুল কুঁড়ি ঝরে;
ঘুঙুর পরা ছোট্ট মেয়ে কোন্ খেয়ালে নেচে বেড়ায়,
গান গেয়ে যায় মন ভোলানো সুরে।
নীল আকাশে শার্সি ভেঙে ঝিলমিলিয়ে সোনারোদের খুশি
ছড়িয়ে গেল ফুলের বনে, সবুজক্ষেতে, মনের কোণে,
লেজ উঁচিয়ে ছুটোছুটি করছে ছোট পুষি।
আজকে যেন অকারণেই লাগছে বড়ো ভালো,—
এই সকালে ব্যাকুল করা ছুটির বাঁশি হৃদয় মাঝে নেচে বেড়ায়
চমকে ওঠা দূর আকাশের মিষ্টি রোদের আলো।

সিংহ আর খরগোশ

*

শ্রীসুনীল সরকার

গভীর বন।

পশুরাজ সিংহ এ বনের মালিক। মালিকের অনুমতি ছাড়া এ বনে অন্য কোন প্রাণী প্রবেশ করতে পারে না। আর যে সব পশুরা এখানে বাস করে, তারাও পশুরাজের অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারবে না। এ নিয়মের নড়-চড় হলে পশুরাজ সিংহের ভোজ সেবায় তার প্রাণ যাবে।

একদিন একটি শেয়াল বিনা অনুমতিতে বাইরে যাবার চেষ্টা করে সিংহের ভোজ সেবায় লেগে যায়।

সেই থেকে বনের অন্যান্য সব পশুরা সাবধান হয়ে যায়। সাবধান হলেও তাদের মধ্যে একটা তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। এত কড়াকড়ির মধ্যে থেকে ভয়ে ভয়ে দিন কাটানো প্রায় অসম্ভব—অসহ্য। এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

একদিন বনের প্রবীণ শেয়ালের ডাকে সাড়া দিয়ে সকল পশুরা একটি গোপন সভায় মিলিত হলো। তারা আলাপ করলো কি করা যায়। কি করে রেহাই পাওয়া যায় এই চিরকেলে ভয়টা থেকে। অনেক আলাপ-আলোচনা ও সলা-পরামর্শের পর স্থির হলো: অত্যাচারী সিংহকে এ বন থেকে তাড়াতে হবে। নতুবা কৌশলে ওকে মেরে ফেলতে হবে।

প্রবীণ শেয়াল বললে: এ দায়িত্ব কে নেবে?

শুয়োর বললে: আমি পারবো না।

গণ্ডার বললে: আমি পারবো না।

ভালুক বললে: আমি পারবো না।

বাঁদর বললে: আমি পারবো না।

হরিণ বললে: আমিও পারবো না।

পুচকে খরগোশ বললে: আমি পারবো!

পুচকের কথা শুনে সকলেই হো হো করে হেসে উঠে বললে: শোন,—ট্যারা-চোখো খরগোশের কথা শোন! ভয়-কুণো শশকের বড়াই দেখো। বলে কিনা সিংহকে এ বন থেকে তাড়াবে। পুচকের নির্ঘাত মরণ এসেছে, মরণ!

সভাপতি প্রবীণ শেয়াল সকলকে বকুনি দিয়ে বললে: চুপ করো সব বীর পুরুষের দল।

সকলেই চুপ করলো।

শেয়াল বললে: বেশ, তোমার উপরেই এ দায়িত্ব রইলো।

খরগোশ বললে: তবে আমাকে এক সপ্তাহ সময় দিতে হবে।

—সভাপতি বললে, বেশ তাই হবে। বলে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

এদিকে এক সপ্তাহ সময় হাতে নিয়ে খরগোশ সিংহকে জব্দ করার ফন্দি আঁটতে লাগলো। পশুরাজের সঙ্গে শক্তিতে পারা যাবে না। ওকে কৌশল করে মারতে হবে: কুয়োতে ফেলে মারবো—না, গর্তে ফেলে মারবো? এমনি নানান ভাবনা ভাবতে ভাবতে প্রায় পাঁচ-ছয়দিন কেটে গেলো। বাকী মাত্র একদিন। এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা তার বুদ্ধির দৌড় দেখে সবাই হাসবে।

শক্তিশালী হাতী তার বিরাট শুঁড়ের সাহায্যে একটির পর একটি গাছ ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসছে।

সেদিন রাত্রে খরগোশ চরম সিদ্ধান্ত নেবে বলে একটি ঝোপের আড়ালে অস্থির চিত্তে পায়চারি করছিলো। হঠাৎ গাছ পড়ার প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলো সে। তবে কি রাতের আঁধারে কোন কাঠুরিয়া প্রবেশ করলো বনে? কিন্তু না! সে দেখলো একটি শক্তিশালী হাতী তার বিরাট শুঁড়ের সাহায্যে একটির পর একটি গাছ ভেঙে সম্মুখপানে এগিয়ে আসছে।

খরগোশ ভাবলে, এই তো সুযোগ এ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। সে আর মুহূর্ত দেরি করলো না। ছুটে গিয়ে পাগলা হাতীকে বললে :

আপনার মত বীরের কি প্রভু
এই বীরত্ব সাজে,
বীরের ধর্ম পালন করুন
বীরের মত কাজে !

খরগোশের কথা শুনে হাতী গর্জে উঠলো : বটে, কি বলতে চাস পুচকে, ভাল করে বুঝিয়ে বল ? নইলে তোকে ছুঁড়ে দেব আকাশে।

খরগোশ ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে গেলো। গিয়ে সবিনয়ে বললে :

বনের মালিক সিংহ রাজার
শাসন বড় কড়া,
তার দাপটে আমরা সবাই
বেঁচে থেকেও মরা।

বটে ! এত বড় আস্পর্ধা। দাঁড়াও ব্যাটাচ্ছেলের মজা দেখাচ্ছি। বলে হাতী বিরাট এক শালগাছ উৎপাটন করে বললে : কোথা তোদের সেই অত্যাচারী সিংহরাজ ?

খরগোশ বললে : আজ্ঞে, ঐ ঝোপের ধারে বিশ্রাম করছে।

হাতী বললে : কুছ্ পরোয়া নেহি। যা, তুই দৌড়ে গিয়ে তোর মালিককে খবর দে, বল যে, মহারাজাধিরাজ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আস্ছেন। আপনি তৈরী হোন।

খরগোশ আর মুহূর্ত দেরি করলো না। বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়ে সিংহকে পাগলা হাতীর আগমন বার্তা জানিয়ে বললে :

বনের মালিক পশুধিরাজ
রক্ষে নাহি আর,
পাগলা হাতীর শুঁড়ের প্যাচে
কেউ পাবে না পার !

পশুরাজ সিংহ রাত্রের ভোজ সেরে আরামে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। খরগোশের কথা শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, বিকট রকম হুংকার দিয়ে সিংহ বললে : কোথা সেই শয়তান ! আমার রাজ্যে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ ? এত বড় স্পর্ধা !

খরগোশ চিৎকার করে বললে : প্রভু, ঐ আস্ছে তেড়ে
রক্ষে করুন ওকে মেরে।

ততক্ষণে হাতীও এসে গেছে। সিংহও প্রস্তুত। ব্যাস্ শুরু হলো সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি। সে কি লড়াই! বীরবিক্রমে সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়লো হাতীর উপর। হাতি এর জন্যে একরকম প্রস্তুতই ছিলো। সে পাল্টা আক্রমণে সিংহের মাথায় করলো শা বৃক্ষের প্রচণ্ড আঘাত। আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহের মাথা ফেটে হলো চৌচির। বিকট আর্তনাদে সিংহের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। তারপর?

তারপর। জয়ের মালা গলায় পরে হাতী চলে গেলো। আর নিষ্ঠুর শত্রুর হাত থেকে বেঁচেছে শুনে মহানন্দে বনের পশুরা খরগোশের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলো।

সময়ের ব্যাঙ্ক নেই

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়টা কে যে করে, কোথা কারখানা তার.
কতোখনে কতো হয়—উপায় কি জানবার?
তাই হয় মুশকিল খরচের বেলাটায়
হয় কম প'ড়ে গেল, নয় বেশি থেকে যায়।
বাড়তি সময় জমা রাখা গেলে ব্যাঙ্কেতে
দরকারে চেক কেটে দেরি তা হোতো না পেতে।
ধার দিতে, নিতেও বা পারতো তো সকলেই।
কিন্তু দুখের কথা—সময়ের ব্যাঙ্ক নেই!
জমিয়ে বা গুঁড়ো ক'রে রাখা গেলে কৌটায়;
বড়ি বা পাঁপর ক'রে রাখা যদি যেতো তায়;
জ্যাম্, জেলি, মোরব্বা, আচার ও কাসুন্দি,
হিমঘরে ফ্রিজেতে বা করা গেলে বন্দী,
শুঁট্‌কি মাছের মতো রাখা গেলে শুকিয়েও,
বাড়তি সময় সবে রেখে দিতো লুকিয়েও।
অভাব বা দরকারে ভাবতে হোতো না আর,
কাজেতে লাগিয়ে দিতো যতখানি পুঁজি যার।
এদিকে সমান হাল ধনী আর গরিবের:
গরিবে পায় না কম, ধনীও পায় না ঢের।
বাড়তি সময় লোকে যখন যেটুকু পায়
খরচ না করলেও চুপি চুপি উবে যায়।
না খেলে খাবার বাঁচে, না খরচে বাঁচে টাকা।
করো বা না করো কিছু সময়ের ঝুলি ফাঁকা!

অন্ধকারের পর আলো

শ্রীরমণীমোহন পাল

উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রথম দু'দিন রজতের মুখে ক্ষণে ক্ষণে যে বিষাদের ছায়া দেখা যেত, এখন বাড়ী ফিরে পাওয়ার আনন্দে সে-ভাব আর রইল না। কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুয়ে তার বাবা, মা আর লীলার কথা প্রায়ই মনে পড়তো। তখন তার চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বহে বালিশ ভিজে যেত। তার মুখ দেখে মিঃ পিয়ার্সন বুঝতে পারতেন যে সারারাত্রি তার না ঘুমিয়ে কেটেছে, কিন্তু কিছুই বলতেন না। তিনি জানতেন যে, সময়ই সব যন্ত্রণার উপশম করিয়ে দেয়। বাস্তবিকই ধীরে ধীরে রজতের মন দৃঢ় হতে লাগলো। এই ভেবে সে নিজেকে প্রবোধ দিত যে, মৃত্যুই যখন জীবনের শেষ পরিণতি তখন দুঃখ করে আর লাভ কি!

লিলিকে যেদিন প্রথম রজত বাংলা শেখাতে আরম্ভ করলো, সেদিন তার মনের মধ্যে এলো সঙ্কোচ। তার বোন লীলার বয়স ছিল দশ বছর, আর লিলির বয়স প্রায় চোদ্দ। তা ছাড়া সে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষতঃ সে এদের আদব-কায়দার সঙ্গে মোটেই অভ্যস্ত নয়। সুতরাং তার সঙ্গে সহজভাবে মিশতে প্রথম প্রথম সে সঙ্কোচ বোধ করতো। কিন্তু লিলির অসঙ্কোচ ব্যবহার তার মন থেকে সব দ্বিধা দূর করে দিলে। ফলে, রজতের মনে তার বোন লীলা ও লিলির মধ্যে আর কোন পার্থক্যই যেন রইল না।

কাজের সুবিধার জন্য রজত তার সময় ভাগ করে নিয়েছিল। সকালে লিলিকে কিছুক্ষণ বাংলা শেখাবার পর বন্দুক নিয়ে সে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করতো। তারপর মধ্যাহ্নে আহার শেষ হলে, লিলিকে বাংলা শেখাবার পর মিঃ পিয়ার্সনের ছোট লাইব্রেরী থেকে সে বই এনে পড়তো। অপরাহ্ণে মিঃ পিয়ার্সনের বন্ধু মিঃ হেনরীর কাছে বক্সিং ও যুযুৎসুর প্যাঁচ শেখার পর সে ব্যায়াম চর্চা করতো। তারপর রাত্রে লিলিকে বাংলা শেখানোর পর সকলের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাতো। এই রকমের স্বপ্নের মত রজতের দিনগুলো আনন্দে কেটে যেতে লাগলো।

প্রায় দু'মাস পরে মিঃ পিয়ার্সন একদিন রজতকে ডেকে বললেন, 'রয়, আর এক সপ্তাহ পরে আমরা আফ্রিকায় যাচ্ছি। এখান থেকে দুইশত জন কুলি আর দশজন কেরানী সংগ্রহ হয়েছে। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে, না এখানকার কলেজে ভর্তি হবে ?

ইতিমধ্যে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গিয়েছে এবং রজত প্রথম বিভাগে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে। কাজেই সে কলেজে পড়তে চায় কিনা মিঃ পিয়ার্সন জানতে চাইলেন।

রজত এতদিন সাহেবের কাছ থেকে অনেক রকমের বই নিয়ে পড়েছিল। তার মধ্যে আফ্রিকা সম্বন্ধে বইগুলো সে আগ্রহের সঙ্গে শেষ করেছিল। এখন সেই দেশের অসংখ্য বিপদের কথা জানতে তার আর বাকি নেই। সে জেনেছে যে কত আবিষ্কারকের অমূল্য জীবন এই দেশে রোগে, হিংস্র জন্তুর কবলে ও অসভ্য জাতির আক্রমণে নষ্ট হয়েছে। সে এখন জেনেছে যে, বেকার, লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যান্‌লী প্রভৃতির অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে যদিও সে দেশের কিয়দংশের মানচিত্র তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, তবুও অনাবিষ্কৃত অঞ্চলের যে সব রহস্যময় বিচিত্র-কাহিনী জনসমাজে প্রচারিত হয়ে রয়েছে তার বিবরণ মানুষকে শঙ্কাকুল করে তোলে। কিন্তু এ সব তার মনে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারলে না। মৃত্যু সে তো আছেই। চোখের সামনে সে তার বাবা ও মাকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মরে যেতে দেখেছে। তাকেও একদিন মরতে হবে। যদি তার ভাগ্যে অপঘাতে মৃত্যুই ঘটে তবু সে ভয়ে পেছিয়ে আসবে না। সে নির্ভিকভাবে পিয়ার্সনকে জানালো, 'না ড্যাডি, আমি আপনাদের সঙ্গে আফ্রিকাতেই যাব।'

রজত কিছুদিন হ'ল লিলির অনুকরণে মিঃ পিয়ার্সনকে 'ড্যাডি' ও মিসেস পিয়ার্সনকে 'মামি' বলা সুরু করেছিল। তার কথা শুনে মিঃ পিয়ার্সন হাসিমুখে বললেন, 'তোমাকে ছাড়তে আমাদের কারও ইচ্ছা নেই। তোমার কি কি দরকার তার একটা 'লিষ্ট' করে রেখ। এর মধ্যে সব ঠিক করে ফেলতে হবে।'

কোন্ কোন্ জিনিস নেওয়া হবে সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য রজত লিলির খোঁজে চললো।

কয়েক দিনের মধ্যে মিঃ পিয়ার্সন তাঁর দল নিয়ে বোম্বাই পৌঁছিলেন। সেখান থেকে জাহাজে চড়ে তাঁরা আফ্রিকায় যাবেন।

বোম্বাই-এর জেটিতে বিস্তর লোক। সকলেরই মুখ আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় বিষন্ন। কেহ কেহ চোখে রুমাল দিয়ে কান্না রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। যারা অতিরিক্ত সাহস দেখাবার জন্য পরস্পর হাসিমুখে বিদায় নিচ্ছে, তারাও তাদের ছদ্ম-হাসির অন্তরালে দীর্ঘ অদর্শনের দুঃখকে লুকোতে পারছে না।

জাহাজের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে রজত উদাসীনভাবে এ সমস্ত দেখে যাচ্ছিল। এ বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে তার আত্মীয় বা বন্ধু এমন কেউ নেই, যে আজ তাকে বিদায় দিতে আসবে। তার এমন কেউ নেই, যার আসন্ন বিচ্ছেদের জন্য তার চোখ থেকে ঝরে পড়বে অশ্রুকণা। তবু আজ সে বিমর্ষ। সে আত্মীয় পরিত্যক্ত বলে নয়, সে এক অজ্ঞাত ভীতিপ্রদ দেশে চলেছে বলে নয়,—সে আজ ভারত ছেড়ে, তার জন্মভূমি ছেড়ে চলেছে বলে। সে এই বিশাল দেশের অধিবাসীদের পরিচয় জানে না, বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাতেও সে অনভিজ্ঞ। তবু এ যেন নাড়ীর টান। কি এক অদৃশ্য বন্ধনে ভারতমাতার সঙ্গে সে যেন যুক্ত। তাই তার চোখ দুটো ধীরে ধীরে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। সে তার দু'হাত জোড় করে মনে মনে বললে, 'বিদায় ভারতমাতা, অকর্মণ্য সন্তান তোমাব কোন কাজেই লাগলো না। আর কখনও ফিরে আসব কিনা জানি না, তাই তোমার উদ্দেশ্যে আজ আমার শেষ প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছি!'

এমন সময়ে লিলি সেখানে এসে রহস্য করে বললে, 'একি রজত'দা! দেশ ছেড়ে যেতে যদি তোমার এত কষ্ট, তবে আফ্রিকায় না গেলেই পারতে?

লিলি এখন বাংলা কথা মোটামুটি রকম বলতে শিখেছে। তাই সে রজতের সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলে। আর রজতের কথামত তাকে মিঃ রায় বলে না ডেকে রজত'দা বলে ডাকে।

লিলির কথায় রজত দীপ্তমুখে বললে, 'তুমি কি চাও যে জন্মভূমির অকৃতজ্ঞ সন্তানের মত দেশ ছেড়ে যাবার সময় আমি একটুও কাতর হব না?'

লিলি গম্ভীরভাবে বললে, 'না রজত'দা, আমি তোমার সঙ্গে রহস্য করছিলুম। যে নিজের দেশকে ভালবাসে না, আমি তাকে শ্রদ্ধা করতে পারি না। আমার কথায় যদি তোমার মনে

আঘাত লেগে থাকে, তবে তার জন্য আমায় ক্ষমা কর।' এই বলে সে তার ডান হাতখানা রজতের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

রজত তার হাত ধরে 'শেক হ্যাণ্ড' করে হাসিমুখে বললে, 'না লিলি, তোমার কথায় আমি বিন্দুমাত্র রাগ করিনি। কারণ ওটা যে তোমার আন্তরিক নয়, তা বুঝি।'

তারপর তারা সেখানে দাঁড়িয়ে লোকের ওঠা-নামা দেখতে লাগলো। কিছু পরেই জাহাজ থেকে নেমে যাবার শেষ বাঁশি বেজে উঠলো। সকলে অশ্রুসজল চোখে জেটির ওপর দাঁড়িয়ে জাহাজের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আরোহীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারাও ম্লানমুখে তাদের দিকে চেয়ে রইল। আর একটা বাঁশি বাজতেই জাহাজ ধীরে ধীরে জেটি হতে দূরে সরে যেতে লাগলো! লোকেরা কোন রকমে মুখে হাসি টেনে আত্মীয়-বন্ধুদের উদ্দেশে রুমাল অথবা হাত নাড়তে লাগলো।

জাহাজ মুখ ফিরিয়ে পশ্চিম দিকে চলতে সুরু করলো। কিছুক্ষণ পরে ভারতের তটরেখা অস্পষ্ট হয়ে গেল। এইবার জন্মভূমির শেষ দ্বীপটিও আরোহীদের চোখের সামনে অদৃশ্য হলে সকলে বিষণ্নমনে নিজ স্থানে ফিরে এল।

রজত ও লিলি যাত্রীদের দেখতে চললো।

জাহাজের খোলের মধ্যে ভারতীয় দুইশত শ্রমিক বিভিন্ন গণ্ডী সৃষ্টি করে বসেছিল যারা তেমন সুবিধামত স্থান অধিকার করতে পারেনি, তারা তখনও চীৎকার করে চলেছিল অনেকেই বিছানা বিছিয়ে শোবার জায়গা করে নিয়ে নিজের নিজের প্রাদেশিক ভাষায় সমস্বরে গান জুড়ে দিয়েছিল।

রজত লিলিকে বললে, 'এরা যেমন গরীব, তেমনই অল্পে তুষ্ট। এত অসুবিধার মধ্যেও দেখ, এরা কি রকম আনন্দে মেতে আছে।'

শ্রমিকদের কাছে যেতে তারা আশ্চর্য হয়ে রজত আর লিলির দিকে তাকিয়ে রইল। যারা চীৎকার করছিল তারা চুপ করে গেল আর গানও বন্ধ হয়ে গেল।

রজত তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই দু'একজন বলে উঠলো 'আমরা বেশ আছি বাবু।'

লিলি বললে, 'অসুবিধা হলেই আমাদের জানাবে।'

এ রকম অযাচিত অনুগ্রহে তারা উৎফুল্ল হ'ল। বিশেষতঃ একজন মেমসাহবকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে আর তাদের প্রতি দরদ দেখাতে দেখে বিস্মিতই হ'ল। তাই অনেকে এক সঙ্গে বলে উঠলো, 'আচ্ছা মেমসাহেব, দরকার হলে আপনাকে জানাব।'

তারপর আর একটু এগিয়ে যেতেই একপাশে কয়েকজন বাঙ্গালী যুবককে বসে থাকতে দেখে রজত তাদের উদ্দেশ্যে বললে, 'আপনারা বোধ হয় আমাদের সঙ্গে রেললাইন বসাবার কাজের জন্য আফ্রিকায় চলেছেন?'

রজতের সঙ্গে একজন ইংরেজ তনয়াকে দেখে তারা দাঁড়িয়ে উঠল আর একজন সম্ভ্রমের সঙ্গে উত্তর দিলে, 'হাঁ।'

রজত বললে, 'আচ্ছা, আপনারা বিশ্রাম করুন। আবার দেখা হবে।' এই বলে তারা এগিয়ে চললো।

এই সময়ে যুবকদের মধ্যে থেকে দু'জনের চোখে চোখে কিসের এক ইশারা হয়ে গেল। কেউ তা লক্ষ্য করলো না।　　(ক্রমশঃ)

চাঁদ-ধরা

শ্রীনবগোপাল সিংহ

"মাগো, আমায় সত্যি ক'রে বল—
চাঁদা-মামা তোর কি আপন ভাই ?
সবাই মিলে এবার তবে চল—
বেড়িয়ে আসি মামার বাড়ীটাই।

সাহেবগুলো সত্যি ভারী হাঁদা
চাঁদের থেকে আনলো শুধু পাথর।
আমরা সোনা আনবো মা এক গাদা
আসবো খেয়ে মামাবাড়ীর আদর।"

মা হেসে কয়, "এ মামাটির ঘরে—
নেই হাওয়া, নেই একটি ফোঁটাও জল,
মামার বাড়ীর আদর খাবি পরে
কেমন ক'রে বাঁচবি আগে বল ?

আবার ফিরে আসতে হবে হেথা—
যেথায় আছে বাঁচার আয়োজন,
মোদের তরে যাহার মাথা ব্যথা
সে হলো এই ধরাই রে খোকন!"

মহাদেশিক তাক ও ঢল

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই শুধু দিগন্তবিস্তৃত নীল জল, আর পাড়ের কাছে আছড়ে মরছে সাদা ফেনার মেখ। আমরা তার বাইরের চেহারাটাই শুধু দেখি, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় সেখানে রয়েছে কত জীব, কত জীবন, কত গভীর রহস্য। আচ্ছা সব ছেড়ে শুধু সমুদ্রের গভীরতার কথাটাই ধরা যাক—সমুদ্র কতটা গভীর? অবশ্য সব জায়গায়ই তার গভীরতা সমান নয়, কোথাও বেশী কোথাও কম। পৃথিবীর সব চাইতে গভীর সমুদ্র হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন জায়গা, তা গভীরতায় প্রায় ছ' মাইল। এভারেষ্ট পর্বতের চূড়া হচ্ছে সাগর-সমতল থেকে পাঁচ মাইল উঁচু; অর্থাৎ এভারেষ্ট পর্বতকে প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবিয়ে দিলে তার মাথার উপরে জল থাকবে অন্ততঃ এক মাইল।

কিন্তু সমুদ্রের এই গভীরতাটি তার পাড় থেকেই আরম্ভ হয়নি, এমন কি পাড়ের খুব কাছ থেকেও নয়। পাড় থেকেই সমুদ্র ঢালু হতে আরম্ভ করেছে বটে, কিন্তু সেটা খুব কম ঢালু আর সেই ঢাল গেছে অনেক দূর, কখনো পাঁচ মাইল, কখনো দশ, কখনো বিশ, ত্রিশ পঞ্চাশ কিংবা তারও বেশী। তারপরে হঠাৎ নেবে গেছে সোজা গভীর সমুদ্রে, গিয়ে পৌঁছেছে সাগরতলে।

এই অগভীর জায়গাটিকে বলা হয় মহাদেশিক তাক, আর ওর ইংরেজী নাম হলো Continental shelf, আর তারপরেই হঠাৎ ঢালু হয়ে যাওয়া জায়গাটিকে বলা হয় মহাদেশিক ঢাল বা Continental slope, তারপরে হলো সাগরতল বা Sea floor যা চলল মাইলের পর মাইল, যতক্ষণে না গিয়ে সে আবার মিশল আর এক মহাদেশিক ঢল ও তাকে।

সমস্ত দেশ, মহাদেশ ও দ্বীপের ধারে ধারেই রয়েছে এই তাক ও ঢল। কোথাও কম আর কোথাও বেশী। সাধারণতঃ এই তাকের শেষ মাথার গভীরতা ৬০০ থেকে ১২০০ ফুট অর্থাৎ ১০০ থেকে ২০০ ফ্যাদম (fathom), ৬ ফুটে হয় এক ফ্যাদম।

সব চাইতে ছোট মহাদেশিক তাক হচ্ছে ভূমধ্য সাগরে। দুই, এক, আধ, সিকি মাইলের বেশী নয়। অনেক স্থান আছে একেবারে পাড় থেকেই আরম্ভ হয়েছে ঢল। কিন্তু আর সব সমুদ্রেই এক তাক পাঁচ মাইলের কম কোথাও নয়। পঁচিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশ' মাইলও আছে। এতদিন জানা ছিল সব চাইতে বড় তাক হচ্ছে আয়ার্ল্যাণ্ডের সাগর পাড়ে তার পশ্চিম দিকে, যার বিস্তার হচ্ছে দু'শ মাইলের উপর। কিন্তু বর্তমানে তার চাইতেও বড় তাক আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটা হচ্ছে সাইবেরিয়ার উত্তর কূলে। সেখানকার তাকের বিস্তার প্রায় সাতশ' আটশ' মাইল। সেখানকার সমুদ্রটা বৎসরের সব সময়েই ঢাকা থাকে বরফে, তাই এতদিন ঐ তাকের কোন সঠিক মাপ ঠিক করা যায়নি, সেটা করা গেছে নিতান্তই সাম্প্রতিক কালে।

অন্ধ এবং দুইজন অন্ধ

শ্রীচুনীলাল রায়

(১)

১৯৬৯ সালের ৬ই থেকে ১৮ই অক্টোবর পৃথিবীর ৫২টি দেশের প্রায় সাড়ে তিনশ প্রতিনিধি বিশ্ব অন্ধ-পরিষদের সাধারণ সম্মেলন উপলক্ষে দিল্লীতে সমবেত হয়েছিলেন।

বর্তমান গতির যুগে, বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতির দিনে বাঁচার জন্য অন্ধদের কী ভাবে তৈরী করে নেওয়া যায়, সে সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনা করেছেন।

তোমরা একথা নিশ্চয়ই জান যে, পৃথিবীতে হাজার হাজার লোক অন্ধতার অভিশাপে জীবন ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশেও অন্ধলোকের সংখ্যা খুব বেশী।

এদের ঠিকভাবে গড়ে নেবার, জীবনে যথাযোগ্য মুল্যদেবার ব্যবস্থা ভালভাবে করা খুব সহজ কথা নয়। অবশ্য আজকাল অনেকে নানাভাবে সে কাজ করে চলেছেন।

এই হাজার হাজার অন্ধজনের মধ্যে আমি আজ বিশেষ করে দু'জনের কথা বলব। একজনকে আমি নিজে দেখেছি, আর অন্যজনের কথা আমি শুনেছি।

(২)

সুযোগ-সুবিধা পেলেই আমি বেড়াতে বের হয়ে পড়ি। আমার গন্তব্যস্থলে যেতে হ'লে ডিহিরী-অন্-সোন্ স্টেশনে নেমে অন্য লাইনের গাড়ী বদল করে যেতে হয়।

এভাবে বছরে বেশ কয়েকবার আমার ডিহিরী ষ্টেশন ছুঁয়ে যাতায়াত করার দরকার পড়ে।

আর এই ডিহিরী ষ্টেশনে আমি দেখেছি ওসমান খাঁ-কে।

ওসমান খাঁ সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন। দু'চোখে কিছুই দেখতে পায় না, কিন্তু তাই বলে মনে কোর না যে সে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে।

আরও দশজন মানুষের মতো সে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের পথ বেছে নিয়েছে।

ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনে যাত্রী যায় প্রচুর, আর তার বেশ একটু আগেই অপেক্ষারত যাত্রীর ভিড়ে ওসমান খাঁ-কে আমি প্রতিবার তার 'দোকান' নিয়ে হাজির হতে দেখেছি।

ওহো, দেখেছ, ভুল করে তার দোকানের কথাই বলা হয়নি! হাঁ, সেটাকে তাঁর দোকানই বলা ভাল। একটা টিনের বাক্স, তার একপাশে কাচ লাগান, আর সেই বাক্সে ওসমান খাঁ নানারকম বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে আসত বিক্রীর জন্য।

সেই যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে দিয়েই ওসমান খাঁ পথ হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে যেত।

যাত্রীরা কেউ তার হাত থেকে আবার কেউ বা বাক্স থেকেই বের করে নিত বিস্কুটের প্যাকেট। আর তার হাতে সবাই পয়সা গুণে দিত ঠিক ঠিকভাবে।

আমি নিজেও চল্লিশ পয়সা দিয়ে বিস্কুটের প্যাকেট কতবার কিনে নিয়েছি। দেখতে দেখতে তার হাতের দু'চারিটে প্যাকেট, বাক্স-র প্যাকেট সব বিক্রী হয়ে যেত।

শুধু তাকে সাহায্য করাই নয়, যাত্রীরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ওসমান খাঁ-র থেকে খুব আগ্রহের সঙ্গেই তার জিনিস কিনে নিত।

আমি অবাক বিস্ময়ে সেই অন্ধলোকটাকে দেখতাম, আর মনে মনে ভাবতাম, ও তো কোনদিনই কোনভাবে লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা পায়নি, কিন্তু জীবনের চরম অভিশাপকে হাসিমুখে মেনে নিয়ে, কেমন বলিষ্ঠভাবে জীবন-সংগ্রামে এগিয়ে চলেছে।

আর আমি বারবার তাকে মনে মনেই প্রণাম জানিয়েছি। তোমরা কেউ যদি কোন দিন ডিহিরী ষ্টেশন দিয়ে যাও, তাহলে ওসমান খাঁ-র কাছ থেকে তার বিস্কুট কিনে নিতে ভুলো না।

(৩)

আর আমি মনে মনে প্রণাম জানাই ভারত মিশ্র-কে। তোমরা অনেকেই হয়তো তাঁর কথা এর মধ্যে শুনে থাকবে।

ভারত মিশ্র বিহারের সাহাবাগ জেলার রামাপুর গ্রামে ১৯৩৭ সনের ২০শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান। তাঁর বাবার নাম পণ্ডিত চন্দ্রশেখর মিশ্র।

মাত্র ১৯ মাস বয়সে ভারত মিশ্র অন্ধ হয়ে যান। বড় হ'লে তাঁকে 'ব্রেইল' পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৯৬২ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৬৪ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ-ও পাশ করেন।

কলেজ-জীবনে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্য এবং বিভিন্ন সাব কমিটির সভ্য হিসাবেও যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

কিন্তু শুধু মাত্র এই সবই তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা নয়।

১৯৬৫ সালের ২২শে মার্চ তিনি মগধ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রিসার্চ স্কলার' হিসাবে নিযুক্ত হন।

ভারতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অধীনে তিনি গবেষণা কার্যে ব্রতী হ'ন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল, 'ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।'

এই গবেষণা কার্যেও তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর গবেষণাপত্র উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে।

আর ভারতের অন্ধ শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে ভারত মিশ্রই 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানে' সর্বপ্রথম পি. এইচ. ডি উপাধিতে ভূষিত হবার অনন্য সম্মান লাভ করেছেন। এটা ১৯৬৮ সালের ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনা।

বর্তমানে ভারত মিশ্র 'বিহার রাজ্য অন্ধ-পরিষদ'এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে কাজ করছেন। এ ছাড়া তিনি পাটনা সিস্টার নিবেদিতা উইমেনস্ কলেজেও অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

(৪)

তোমরা যে নিশ্চয় করে অন্ধদের প্রতি তোমাদের সহানুভূতির হাত সর্বদা বাড়িয়ে দেবে এবং সেই সঙ্গে এই দুইজন অন্ধর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়।

ভাগ্যফের!

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

ঘোষ পাড়াতে নেমতন্ন
　　পেলেন নিধু খুড়ো,
ভাবেন দিব্যি খাবেনদাবেন
　　মাংস, মাছের মুড়ো।
ঘোষ পাড়াতে শোনেন আরো
　　কেবল মোষের বাস,
ভাবেন খাবেন দই রাবড়ী,
　　মিটিয়ে মনের আশ।
হন্‌হনিয়ে পড়েন নেমে
　　সটান বাসের থেকে,
পথেই শোনেন মোষের দল
　　উঠছে ডেকে ডেকে!
ঘোষ পাড়াতে এসে গেছেন
　　না হয় দেরি বুঝতে,
পথ হারিয়ে কষ্ট করে
　　হয়নাকো আর খুঁজতে।

ছাড়া মোষের নেইকো অভাব
　　পথেই বেড়ায় ঘুরে,
শিং জোড়া সব দেখেই খুড়োর
　　ভয়েই পরান উড়ে!
ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে মোষের,
　　হচ্ছে পাড়া মাত,
চল্‌তে পথেই শিঙের গুঁতোয়
　　খুড়ো কুপোকাত!
মাছ, মাংস, রাবড়ী, দই
　　হ'ল খওয়া শেষ,
হাসপাতালেই ছ'টি মাস
　　ভুগিয়ে ছিল বেশ!
সেই হতে আর ঘোষ পাড়াতে
　　যান না খুড়ো ভুলে,
নেমতন্ন খাওয়া কোথাও
　　তাও দিয়েছেন ভুলে!

একটি জিজ্ঞাসা
(সত্য ঘটনা)

দেখ স্বপন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, এবার গালাগালি দিলেই কিন্তু মার দেব। কিন্তু নাঃ, ও আমাকে কিছুতেই গ্রাহ্য করতে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত আমি ওকে শায়েস্তা করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। বেশ দু'তিন দিন পরে আমাকে যথারীতি ও রাস্তায় দেখতে পেয়ে পুনরায় অকথ্য কিন্তু কচি-গলায় ভাঙা ভাঙা স্বরে মুখ খারাপ করতে লাগলো। আমি আর স্থির থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে এলাম ওর মা'র কাছে। ওর মা'র কাছে আমার অভিযোগ জানিয়ে ফিরে এলাম। ফিরবার সময় দেখি রাস্তার সামনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কোঁকিয়ে কোঁকিয়ে ও কাঁদছে।

মনে মনে একটু দুঃখ পেলাম, এগিয়ে গেলাম ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। উল্টে ও আমাকে গালাগালি দিল। কিছু না বলে সেদিন বাড়ি ফিরে এলাম। এরপর দীর্ঘ একমাস ওর অসুস্থতার জন্য ওর-আমার মধ্যে দেখাদেখি প্রায় বন্ধ রইল। দীর্ঘ এক মাস পরে ওকে দেখতে গেলাম। দেখলাম, ওর চেহারার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে ওর দুর্ব্যবহার। দু-তিন দিন ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ও কাজ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল ওর দুষ্টুমির আত্মপ্রকাশে।

সেদিনও ওকে ধরে নিয়ে গেলাম ওর মায়ের কাছে। বিকেল বেলা আমারা খেলার মাঠে খেলতে নামছি, হঠাৎ দেখা গেল স্বপন ম্লান-মুখে আমাদের মাঠের মধ্যে ঢুকছে। আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাধ্য হয়ে খেলা বন্ধ করে দেখতে লাগলাম ব্যাপারটা কি হয়। দেখলাম, ও মাঠের মধ্যে ঢুকে আমার সঙ্গে আড়ি করে চলে গেল। মনে মনে ভাবলাম, বেশ কিছুদিন সোয়াস্তির সঙ্গে কাটানো যাবে। কিন্তু সেই আড়িই যে চিরস্থায়ী ছাড়াছাড়িতে পরিণত হবে, তা আমি ভাবতেই পারিনি! মনে করে ছিলাম নিশ্চয় কিছুদিন বাদে ও সব কিছু ভুলে নিজেরই অজান্তে, আমার সঙ্গে কথা বলে ফেলবে, কিন্তু আমার সেই চিন্তাও সেদিন ভ্রান্ত প্রমাণিত হ'ল, যেদিন আমি শুনতে পেলাম ওর অবিশ্বাস্য মৃত্যু-সংবাদ।

* * *

আমার সঙ্গে আড়ি করে দিয়ে পরের দিনই ও চলে গিয়েছিল ওর মামার বাড়িতে। আমি এবং আমার বন্ধুরা সবাই মনে ভাবলাম যাক্ দু'তিন দিন বেশ ভালভাবেই কাটাবো—রেহাই পাব ছোট্ট স্বপনের অত্যাচারের হাত থেকে। কিন্তু কেন যেন স্বপনকে না পেয়ে আমাদের ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে লাগলো। মনে মনে দাগ কাটতে লাগলো বারবার তার শেষ কথা—আড়ি, আড়ি, আড়ি। শেষে সেই আড়িই হলো ওর আমার মধ্যে অভিশাপ।

ওর মামার বাড়ি ছিল ন'পাড়ায়। বাড়ির ভেতরে ছিল একটা সুন্দর স্বচ্ছ পুকুর। যা স্বপনকে আনমোনা করে তুলতো। একদিন সকলের অজান্তে ও সাঁতার কাটার জন্য পুকুরে গিয়ে নেমেছিল, কিন্তু ভাল সাঁতার না জানায় ডুবে যায়। পরের দিন ওর মৃতদেহ ভেসে উঠে উপরে।

এই দারুণ শোক-সংবাদ ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো আমাদের বরাহনগরের সারা গ্রামে। ওর মা-বাবা শোকে অধীর হয়ে ছুটে গেলেন ন'পাড়ায়। ময়নাতদন্তের পর ওর মৃতদেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তবুও আমরা বিশ্বাস করতে চাইনি এই মৃত্যু-সংবাদ। মনের মধ্যে ভাসতে লাগলো ওর ছবি। বিশেষ করে মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই কথা কিন্তু শেষে বিশ্বাস করতেই হ'ল প্রকৃতির এই অভিশাপকে।

ওর মৃত্যুর পর আজও আমার মনে একটি প্রশ্ন ঘুরেফিরে বার বার জাগে—কেন ওর এই অকাল-মৃত্যু? কেন ও আমাদের কাছ থেকে এমন করে হারিয়ে গেল?

কিন্তু আজও আমি খুঁজে পেলাম না সে জিজ্ঞাসার উত্তর—কেন মানুষ অকালে এত অল্প বয়সে এমন ভাবে হারিয়ে যায়!

শ্রীগোপাল ভৌমিক

মহাবলীপুরমের 'সমুদ্র'

বার বার মোরে ডেকেছে সাগর
স্বপনের পথ বেয়ে,
দেখিবার পর আছ তুমি মোর
সব মনখানি ছেয়ে।

গরজি গরজি সাদা ফেনা লয়ে বুকে
নীল জলরাশি ঘিরিয়া রয়েছে সুখে,
দৃষ্টি আমার দিগন্তে চেয়ে হারাল—
মোর পরে চেয়ে ধরণী দু'হাত বাড়াল।
আছড়িয়ে পড়ে কূলের ওপর ঢেউ,
জলরাশি মোর দৃষ্টির সীমা ছাড়াল।

এ মহাশিবের মন্দির পাশে—
মহাদেব সম জলধি।
ধ্যানে গম্ভীর, এ মহাতাপস;
অনন্ত যার পরিধি।

শ্রীসুদীপ্ত হাজরা

শ্রীসুনির্মল রায়

কৃত্রিম মানুষের মাংস
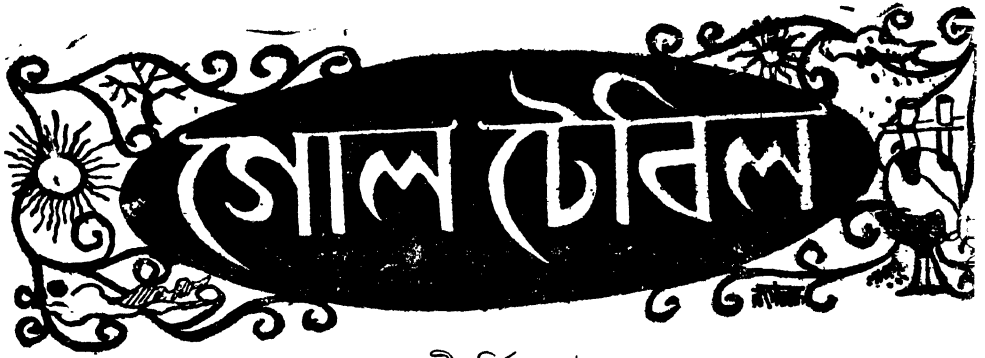
মানুষের মাংসও আজকাল কৃত্রিমভাবে তৈরী করা যায়। এটা এক ধরণের 'প্লাস্টি
জিলেটিন'। অত্যন্ত নরম আর মানুষের মাংসের মতো দেখতে। এর সাহায্যে শরীর ম
আজকাল 'রাগ্‌বি' খেলোয়াড়রা এবং অন্যান্য 'অ্যাথলীটরা নিজেদের দেহকে চোট খাওয়া
হাত থেকে রক্ষা করে। আমেরিকার 'ইউনিভার্সিটি অফ্ মিচিগান হসপিটাল'-এ এ
উন্নতপর্যায়ের কৃত্রিম মাংস তৈরী হয়েছে।

ঘুমানো এখন সহজ

দীর্ঘকাল অনিদ্রা রোগে যারা ভুগছে এটা তাদের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা
খবর। সম্প্রতি এক ধরণের বিছানা তৈরী হয়েছে, যাতে শুলে অতি অল্প সময়েই আরা
ঘুমিয়ে পড়া যায়। এটা নিয়ে আমেরিকার 'ইউনিভার্সিটি অফ্ সাউথ ক্যারোলিনা'
পরীক্ষা চলেছে। এই বিছানা বালুকণার মতো ছোট ছোট কাচের দানা দিয়ে তৈরী
একজন রুগী একনাগাড়ে কুড়ি বছর ঘুমাতে পারেন নি, অথচ এই বিছানায় শোবার প
কিছুক্ষণ পরেই তিনি সুন্দর আরামদায়ক ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েন।

অনুভূতি-নিয়ন্ত্রণ

মনে দুঃখের ভাব রয়েছে? হতাশার সৃষ্টি হয়েছে? ভয় নেই। এখন সহজেই
হতাশা আর দুঃখের ভাবকে সরিয়ে, মনে আনন্দ আর সুখের অনুভূতি সৃষ্টি করা সম্ভব
মানুষের মনকে আজকাল কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আমেরিকার 'ইয়েল ইউনিভার্সিটি
একজন বৈজ্ঞানিক এমন একটি যন্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন, যা বিদ্যুতের সাহা
মাথাকে প্রভাবিত করে মানুষের মনে ইচ্ছামত সুখ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি অনুভূতি সৃষ্টি করতে
পারে।

মেঠুড়ে

ব্যাডমিণ্টন

আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের দলগত লড়াই। রাজ্যের মধ্যে অবশ্য রেলকেও ধরা হয়। কলকাতায় এই প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। এবারের প্রতিযোগিতায় ভারতের কয়েকজন কৃতী খেলোয়াড় নিয়ে গড়া রেল দল ছ'বার আন্তঃ রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ গ্রহণ করে পাঁচবার বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

পুরুষ বিভাগে গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাব আগেই হার স্বীকার করায় কলকাতায় খেলার সুযোগ পায়নি। এখানে পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে কেরলকে হারিয়ে এবং পশ্চিম বাংলা মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। মহিলা বিভাগে ফাইনালে ওঠে মহারাষ্ট্র পশ্চিম বাংলাকে হারিয়ে এবং কেরল পাঞ্জাবকে পরাজিত করে। জুনিয়রের ফাইনালে উঠতে মহারাষ্ট্র পশ্চিম বাংলাকে এবং দিল্লী মহীশূরকে পরাজিত করে। পুরুষদের ফাইনালে রেল দল জয়ী হয় বাংলার বিরুদ্ধে। মহিলাদের ফাইনালে মহারাষ্ট্র বিজয়ী হয় কেরলের বিপক্ষে। জুনিয়ারের চ্যাম্পিয়নশিপ পায় দিল্লী, মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে।

খেলার কথা বলতে হলে বলতে হয়, কোনো খেলাই ভালো জমেনি এবং অধিকাংশ খেলাই মীমাংসিত হয়েছে স্ট্রেট গেমে। ফাইনালে প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন রেলওয়ের সুরেশ গোয়েল এবং বাংলার বৈদ্যনাথ দাসের খেলায় কিছুটা নিপুণ্যের পরিচয় মেলে। বৈদ্যনাথ স্ট্রেট গেমে হারলেও সুরেশ গোয়েলের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

॥ ২ ॥

রেলওয়ে-প্রতিনিধি এবং বাংলার ছেলে দীপু ঘোষের ব্যাডমিণ্টনে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ সত্যিই গর্ব করে বলার মতো ঘটনা। ইডেনের জাতীয় আসরের ফাইনালে সুরেশ গোয়েলকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে তিনি এই সম্মান লাভ করেছেন। শুধু সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়নশিপ

নয়, সহোদর রমেন ঘোষকে সঙ্গী করে খেলে ডাবলসেও বিজয়ী হয়ে দীপু ঘোষ দ্বিমুকুটের সম্মানও পেয়েছেন।

মহিলা বিভাগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর প্রদেশের দময়ন্তী সুবেদার এবারে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। মেয়েদের মধ্যে সিঙ্গলস ফাইনালে পরাজিত মহারাষ্ট্রের শোভা মূর্তি এবং জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন মরিন ম্যাথিয়াসের খেলাও দর্শকদে প্রচুর আনন্দ দেয়।

ফুটবল

চেকোস্লোভাকিয়ার ইণ্টার ব্রাডিস্লাভা ফুটবল দলের সঙ্গে আই. এফ. এ. একাদশের প্রদর্শনী ফুটবল খেলা দর্শকদের কাছে যত আকর্ষণীয় হবে বলে আশা করা গিয়েছিল, তা হয়নি। কারণ দুটো। প্রথম, এই অসময়ে ফুটবলের জন্যে ক্রীড়ারসিকদের মন প্রস্তুত ছিল না। দ্বিতীয়, আই. এফ. এ. দলে যেসব কুশলী খেলোয়াড়ের খেলার কথা ছিল, তাঁদের অনেকেই খেলেন নি। ফলে খেলা মোটেই জমেনি; যদিও ইণ্টার ব্র্যাডিস্লাভা ফুটবলের প্রথা-প্রকরণ এবং উন্নত নৈপুণ্য দর্শকদের মনে দাগ রেখে গেছে।

কয়েক বছর আগে স্লোভান ব্র্যাডিস্লাভা চেকোস্লোভাকিয়ার যে দলটি রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়ামে তিনটে প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল, তুলনায় সে দল ছিল অনেক শক্তিশালী। আই. এফ. এ-র বিরুদ্ধে দলটির ৩-১ গোলে জয়, তাঁদের যোগ্যতা ও নৈপুণ্য অনুযায়ী ফলাফল নয়। আমাদের ধারণা দলটির আরো গোলে জয়ী হওয়া উচিত ছিল। এ দলের খেলোয়াড়দের আধুনিক ফুটবলের যথেষ্ট শিক্ষা আছে, সাধনা আছে। মাটির ওপর বল রেখে আক্রমণ রচনার পদ্ধতি এবং পারস্পরিক যোগাযোগ প্রশংসার দাবি রাখে। রিসিভিং সত্যিই ভালো।

হকি

ভারতের ৩৫ তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা জলন্ধরে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের একুশটা রাজ্যদল এবং সার্ভিসেস, রেলওয়ে ও ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে মোট চব্বিশটা দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

জাতীয় হকির গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাবকে গ্রুপের খেলায় হারানো বাংলা দলের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। গতবারের ওই খেলাটা ছিল প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ খেলা।

টেস্ট ক্রিকেটে ভাইদের ভূমিকা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ভাই অনেক রকমের হতে পারে। যেমন আপন, জেঠতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো, মামাতো, মাসতুতো ইত্যাদি। আপন ভাইকে আমরা সাধারণতঃ ভাই বলি। আপন কথাটা বাদ দিলে কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন খেলাধূলার একই আন্তর্জাতিক আসরে দুই ভাই (বা তার বেশী) খেলেছে এমন নজির অনেক আছে। তবে ক্রিকেট খেলায় এই সংখ্যা বেশী। শুধু সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় একই আসরে যে-সব ভাইদের (অর্থাৎ আপন ভাইদের) খেলতে দেখা গেছে, তাদের কথাই তোমাদের এখানে বলছি।

ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার নামডাক সব থেকে বেশী। ক্রিকেট এই দুই দেশের জাতীয় খেলা। ইংল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রথম সুরু হয় মেলবোর্ণ মাঠে, ১৮৭৭ সালের ১৫ মার্চ। এই সূত্রেই পৃথিবীর মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন। পৃথিবীর মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলাতেই অষ্ট্রেলিয়া দলে দুই ভাইকে খেলতে দেখা গেল। তাদের নাম ডি ডবলউ গ্রেগরী এবং ই জে গ্রেগরী।

টেস্ট ক্রিকেট খেলার একই আসরে তিন ভাইকে একদলের পক্ষ নিয়ে খেলতে দেখা গেছে এ পর্যন্ত মাত্র দু'বার। প্রথম এই নজির গড়েছিলেন ইংলণ্ডের প্রখ্যাত গ্রেস পরিবারের এই তিন ভাই—ডাঃ ডবলউ জি গ্রেস, ডাঃ ই এম গ্রেস এবং জি এফ গ্রেস। এঁরা ইংল্যাণ্ড দলের পক্ষ নিয়ে ১৮৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওভালের প্রথম টেস্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলেছিলেন। এই তিন ভাইদের মধ্যে ডাঃ ডবলউ জি গ্রেস এবং ডাঃ ই এম গ্রেস ইংল্যাণ্ডের ওপানিং জুটি ছিলেন। এই খেলাতেই বড় ভাই ডাঃ ডবলউ জি গ্রেস যে সেঞ্চুরী (১৫২ রান) করেন, তা টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ড দলের খেলোয়াড়দের পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরী। ডাঃ ডবলউ জি গ্রেস মোট ২২টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। তাঁর বাকি দুই ভাইয়ের কপালে কিন্তু মাত্র একটা করে টেস্ট খেলার সুযোগ জুটেছিল। ডাঃ ডবলউ জি গ্রেসকে ইংলিশ ক্রিকেট খেলার জনক বলা হয়।

সুদীর্ঘ ৮৮ বছর পর ১৯৬৯ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে করাচীতে পাকিস্তান দলে আমরা চার ভাইকে খেলতে দেখলাম। এই চার ভাইয়ের নাম—হানিফ মহম্মদ, ওয়াজির মহম্মদ, মুস্তাক মহম্মদ এবং সাদিক মহম্মদ। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার একই আসরে একদলের পক্ষে চার ভাইয়ের খেলার নজির আর দ্বিতীয় নেই।

একই দলের পক্ষে না হলেও টেস্ট খেলার একই আসরে তিন ভাই খেলছেন এমন একটা নজির আছে। ১৮৯১-৯২ সালে কেপটাউনে ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট খেলায় এই তিনভাই—জি জি হিয়ার্নি, এ হিয়ার্নি এবং এফ হিয়ার্নি খেলেছিলেন। প্রথম দু'জন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এবং শেষ জন দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে।

সরকারী টেস্ট খেলার একই আসরে একজোড়া ভাইকে সর্বাধিক কতবার খেলতে দেখা গেছে? এ বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন এই দুই ভাই হানিফ মহম্মদ এবং মুস্তাক মহম্মদ (পাকিস্তান)। তাঁরা দু'জনে ২০টি টেস্টের একই আসরে খেলেছেন। তাছাড়া হানিফ এবং তাঁর বড় ভাই ওয়াদির মহম্মদকে ১৮টি টেস্টের একই আসরে খেলতে দেখা গেছে।

ভারতবর্ষ তার প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লর্ডস মাঠে, ১৯৩২ সালে। এবং এই আসরেই ভারতবর্ষের পক্ষে এক জোড়া ভাই—এস ওয়াজির আলী এবং এস নাদির আলী খেলেছিলেন। এখানে বিশেষ উল্লেখ্য, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশের সরকারী উদ্বোধনী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে এক জোড়া ভাইকে খেলতে দেখা যায়নি। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে মাদ্রাজের শেষ তৃতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে খেলেছিলেন দু'জোড়া ভাই—কর্ণেল সি কে নাইডু এবং সি এ নাইডু এবং এস ওয়াজির আলী ও নাজির আলী! সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার একই আসরে এই রকম ভিন্ন পরিবারের দু'জোড়া ভাইয়ের খেলার নজির আর নেই। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় একই আসরে যে-সব আপন ভাই বিভিন্ন দেশের পক্ষে খেলেছিলেন, তাঁদের নামের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

অষ্ট্রেলিয়া

ডি ডবলউ গ্রেগরী এবং ই জে গ্রেগরী (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, মেলবোর্ণ, ১৮৭৭)

এ সি ব্যানারম্যান এবং সি ব্যানারম্যান (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, মেলবোর্ণ, ১৮৭৯) জি গিফেন এবং ডবলউ এফ গিফেন (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, সিডনি এবং এডিলেড, ১৮৯২)

এ ই ট্রট এবং জি এইচ ট্রট (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ৩টি টেস্টে, ১৮৯৪-৯৫)

ইংল্যাণ্ড

ডাঃ ডবলউ জি গ্রেস, ডাঃ ই এম গ্রেস এবং জি এফ গ্রেস (বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, ওভাল, ১৮৮০)

সি টি স্টাড এবং জি বি স্টাড (বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, ৪ বার, ১৮৮২-৮৩) ই হিয়ার্নি এবং জি জি হিয়ার্নি (বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা, কেপটাউন, ১৮৯১) ডি ডবলউ রিচার্ডসন এবং পি ই রিচার্ডসন (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নটিংহাম, ১৯৫৭)

ওয়েস্টইণ্ডিজ

জি সি গ্র্যাণ্ট এবং আর এস গ্র্যাণ্ট (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, চারটি খেলায়, ১৯৩৪-৩৫)

জে বি স্টলমেয়ার এবং ভি এইচ স্টলমেয়ার (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ওভাল, ১৯৩৯)

ডেনিস এটকিনসন এবং এরিক এটকিনসন (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৫৭-৫৮)।

১। চারিবর্ণে নাম নৃপ গুণবান
ইতিহাসে বিদিত ভুবনে,
আদি বর্ণ দুটি অতি পরিপাটি
পরম মধুর আস্বাদনে।
আদি ত্যাগে হয় বিশ্রাম আলয়
অনন্তের তরে নিঃসংশয়
কি নাম তাহার ভেবে একবার
বলো দেখি তোমা সবে।

শ্রীরাজকুমার পণ্ডিত (হাওড়া)

২। নীচের এই চিঠিখানি ঠিক করে পড়তে পার কিনা দেখ। কতকগুলি জায়গার নাম ঠিক ঠিক বসাতে পারলেই পড়া সহজ হবে।

প্রিয় হিমালয়ের একটি বিশিষ্ট শৃঙ্গ,

তোমার প্রেরিত গত বৎসরের মৌচাকগুলি তোমার কথামত গুজরাটের প্রধান নগরের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি। কাল সাইবেরিয়ার একটি হ্রদে নদীতে বেড়াইবার সময় আমাদের নৌকা হাওড়া জেলার একটি গ্রামের চড়াতে পাঞ্জাবের জেলায় গিয়াছিল। পরে নদীতে স্নান করাতে যুক্তপ্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ নগর হইয়াছে। উড়িষ্যার একটি দেশীয় রাজ্য হয় শুনে সুখী হবে যে, আগামী ভাদ্র মাসে মধ্য ভারতের একটি রাজ্য আমেরিকা হইতে আসিবে। এই বৎসরের মৌচাকগুলিও পাঠাইও।

ইতি—তোমার স্নেহের
মহিশূরের একটি তীর্থস্থান

শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু (কলিকাতা-৪)

৩। এক ব্যক্তি একটি বালককে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি করিতেছ?' বালক বলিল, 'আমি কাঁটায় কাঁটা দিতেছি।' লোকটি আবার প্রশ্ন করিল, 'তোমার বাবা কি করিতেছেন?' বালকটি উত্তর দিল, 'সকলের জীবনধারণের উপায় করিতেছেন।' আবার প্রশ্ন হইল, 'বোন কি করিতেছে?' উত্তর হইল, 'একটা ভাঙিয়া দুইটা করিতেছে।' 'মা কি করিতেছেন?' 'একজনের মাথায় হাত দিয়া সকলের সংবাদ লইতেছেন।'—বলতো কে কি করিতেছে?

শ্রীনারায়ণ সরকার (কুচবিহার)

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। টাকা ২। মেঘ ৩। কর্ণ, চক্ষু, হস্ত, মুখ।

"INK দিয়ে নানা নাম"-এর উত্তর—PINK, MINK, LINK, RINK, SINK, DRINK, KINK, WINK, BRINK.

আগামী নববর্ষের মৌচাক

।। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি ।।

এই সংখ্যার সঙ্গে মৌচাকের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ আমরা পূর্ণ করলাম ; অর্থাৎ এই পত্রিকাখানির চলার পথে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হ'ল। আগামী ১৩৭৭ সালের বৈশাখ থেকে মৌচাক একান্ন বছরে পদার্পণ করবে—নতুন করে তার যাত্রা হবে শুরু।

এই নববর্ষের মৌচাককে আমরা নব-কলেবরে সাজাবার চেষ্টা করছি। নানা বিষয়ের সচিত্র লেখা ছাড়াও বহু নতুন ধরনের জিনিস থাকবে এই নতুন বছরের মৌচাকে। কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্রতিযোগিতা বৈশাখ সংখ্যা থেকেই দেওয়া হবে। তাছাড়া দুটি বিশেষ সংখ্যাও বার করা হবে সামনের বছরে। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা ছাপার জন্যও অপেক্ষাকৃত বেশী স্থান দেওয়া হবে নতুন বছর থেকে।

এই চৈত্র-সংখ্যার সঙ্গে যাঁদের বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা শেষ হবে, সেই সব গ্রাহক-গ্রাহিকা ও তাঁদের অভিভাবকদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, তাঁরা মৌচাকের প্রতি দীর্ঘদিন ধরে যে সহানুভূতি দেখিয়ে আসছেন, সেই সহানুভূতির হাতই প্রসারিত করে তাঁদের বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদাগুলি যথাসম্ভব সত্বর যেন মনিঅর্ডার যোগ পাঠিয়ে দেন আমাদের অফিসের ঠিকানায়। অবশ্য বিশেষ কারণে কারু যদি গ্রাহক-গ্রাহিকা থাকার অসুবিধা থাকে, তাহলে তাঁরাও যেন সেকথা পত্রযোগে জানিয়ে দিতে কুণ্ঠা না করেন।

যাঁদের কাছ থেকে আমরা এ ধরণের কোন পত্র পাব না, অথবা মনিঅর্ডার যোগেও টাকা যাঁরা পাঠাবেন না, তাঁদের আমরা ভি. পি. করে বৈশাখ সংখ্যা পাঠিয়ে দেব। এর জন্য নির্দিষ্ট বার্ষিক চাঁদা ছাড়াও ডাকমাশুল বাবদ কিছু বেশী পড়বে। আমরা আশা করব, আমাদের প্রিয় গ্রাহক-গ্রাহিকা ও তাঁদের সহৃদয় অভিভাবকরা এই ভিঃ পিঃতে পাঠান কাগজগুলি ফেরত দিয়ে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না।

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০.৬০ পয়সা